আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সম্পাদিত।

দ্বিতীয় বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র।)

১৩১৮

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চিত্রসূচী।

আর্য্যাবর্ত্ত—

৺ রাধেশচন্দ্র শেঠ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

মালদহে

পালনগরী রামাবতী

রামাবতীপুরী প্রতিষ্ঠার কারণ-নির্ণয়।

পুণ্ড্রনগরের সংস্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কেহ কেহ মালদহের পাণ্ডুয়াকে পুণ্ড্রনগর বলিতে চাহেন। অন্যপক্ষ বগুড়ায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্থান নির্ণয় করেন। প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা হজরৎ পাণ্ডুয়াকে পুণ্ডনগর বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত পুণ্ড্রনগর বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

হজরৎ পাণ্ডুয়াকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বলিয়া প্রমাণের পন্থা।

হজরৎ পাণ্ডুয়াই যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর, ইহার প্রমাণগুলি প্রকাশ করিতে হইলে, মালদহের ঐতিহাসিক গ্রামনগরাদির বর্ণনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমার বিশ্বাস হজরৎ পাণ্ডুয়াই প্রাচীন পুণ্ড্রনগর। আলোচ্য প্রবন্ধ এই বিশ্বাসের পোষকতা করিবে বলিয়াই লিখিত হইল। রাজা রামপাল এই পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সন্নিকটেই রামাবতীপুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কৈবর্ত্তরাজ ভীম ও হরির পরাজয় এবং শিরশ্ছেদন।

মহারাজ রামপাল কৈবর্ত্তজাতীয় রাজবিদ্রোহী ভীম ও হরির সহিত যুদ্ধ করিয়া বরেন্দ্রস্থ কৈবর্ত্তরাজ ভীমপ্রতিষ্ঠিত ডমরপুরী বিধ্বস্ত এবং মশানে ভীম ও হরির শিরশ্ছেদন করেন। রামপালের ও ভীমের জীবনীর একাংশ বর্ণনা করিলে তাৎকালিক বরেন্দ্র-ভূমির এবং গৌড়নগরীর সহিত পুণ্ড্রবর্দ্ধনের একটি অজ্ঞাত ঐতিহাসিক কাহিনী ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

মহীপাল শূরপাল ও রামপালকে কারাবদ্ধ করেন।

গৌড়পতি বিগ্রহপালের তিন পুত্র—মহীপাল, শূরপাল এবং রামপাল। বিগ্রহপাল চেদিপতি কর্ণদেবের তনয়া যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনশ্রীর গর্ভে মহীপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয়। রাষ্ট্রকূট বংশীয় মহন দেব রামপাল দেবের মাতুল হইতেন, সুতরাং রামপালের জননী রাষ্ট্রকূট-বংশীয়া ছিলেন। মহীপাল গৌড়পতি হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখেন।

বন্ধুবর্গের সাহায্যে রামপাল ও শূরপালের পলায়ন।

রামপাল ও তদীয় ভ্রাতা শূরপাল তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গের সাহায্যে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আত্মরক্ষার্থ রামপালপুত্র রাজ্যপাল সহ গৌড় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করেন।

মহীপালের অত্যাচার ও ভীমের বিদ্রোহাচরণ।

মহীপাল যৌবনে অতিশয় প্রজাপীড়ক ও কূটবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে প্রকৃতিপুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় উত্তর বরেন্দ্রের কৈবর্ত্তগণই বীর জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দিব্যক ও তাঁহার পুত্র রুদক বারেন্দ্র কৈবর্ত্তগণের নেতা ছিলেন। রুদকপুত্র যুবক ভীম মহীপালের অমানুষিক ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া সমগ্র কৈবর্ত্তজাতির সহিত পরামর্শ করিয়া দলবদ্ধ হয়েন, এবং বরেন্দ্রবাসী কৈবর্ত্তগণকে উত্তেজিত করিয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভীমের এক বন্ধু হরি এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।

ভীমবন্ধু হরি।

মহীপাল কৈবর্ত্তগণের এই ব্যাপার অবগত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করেন, কিন্তু সংগৃহীত সৈন্যগণের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধকার্য্যে অশিক্ষিত ছিল। এই প্রকারের বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি কৈবর্ত্তগণের দমনার্থ অগ্রসর হয়েন। বীর্য্যবান্ রণকুশল কৈবর্ত্তগণ মহীপালকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়া পাল-রাজধানীর অনতিদূরে ডমর নামক নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ বরেন্দ্রভূমি শাসন করিতে থাকেন।

ভীম হস্তে মহীপালের পরাজয় ও রাজ্যচ্যুতি।

পুত্রসহ রামপালের দেশ-পর্য্যটন ও মাতুলপুত্র শিবরাজের সহিত যুক্তি।

এই সময় রাজপালপুত্র রাজ্যপালসহ দেশপর্য্যটন করিয়া বরেন্দ্রস্থ পাল-রাজভবন-রক্ষক রাষ্ট্রকূট বংশীয় শিবরাজের * নিকট উপস্থিত হইয়া গৌড়সিংহাসন প্রাপ্তি এবং কৈবর্ত্তগণের সহিত ভীমের দমনার্থ পরামর্শ করেন। কাণুদেব ও শিবরাজ কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্র অধিকারপূর্ব্বক রামপালকে গৌড়সিংহাসন প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া আত্মীয়রাজন্যগণের সাহায্য-লাভের জন্য চেষ্টিত হয়েন। হিতৈষী শিবরাজের উদ্যোগে মগধাধিপ পীঠীপতি ভীমযশা,

* মহনের পুত্র কাণুদেব এবং মহনের ভ্রাতা সুবর্ণদেবের পুত্র শিবরাজ। শিবরাজ রামপালের মাতুলপুত্র, সুতরাং সম্বন্ধে ভ্রাতা ছিলেন।

রাজন্যগণের সাহায্য-প্রাপ্তি।

কোটাপতি বীরগুণ, দণ্ডভুক্তিপতি যশসিংহ, দেবগ্রামেশ্বর বিক্রমরাজ, অপরমন্দারাধিপতি লক্ষ্মীশূর, শূরপাল, তৈলকম্পাধিপতি রুদ্রশেখর, ওচ্ছালভূপাল ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয়রাজ প্রতাপসিংহ, কয়ঙ্গলীয় মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্দ্ধন, পদুবন্বাধিপতি সোম প্রভৃতি নরপতিগণ রামপালের সাহায্যার্থ সমবেত হইয়াছিলেন।

রামপালের পরম হিতৈষী মাতুলপুত্রদ্বয়ের নেতৃত্বে সমবেত রাজন্যবর্গ বিপুল বাহিনীসহ বরেন্দ্র আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভাগীরথী পারাপারের জন্য নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নৌসেতুর দ্বারা তাঁহারা গোপনে নদী উত্তীর্ণ হয়েন এবং বরেন্দ্রে উপনীত হইয়া ডমর আক্রমণ করেন।

নৌসেতুযোগে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া ডমর আক্রমণ।

"তস্য ম(মা)হাবাহিত্যাং গুপ্তায়াং তরণিসন্তবেনাভূৎ।
দ্বিষমভিসেনয়তোমুখরিতদিক্কোলাহলঃ সমুত্তারঃ॥"

(রামচরিতং)

ভীম ও হরির পরাজয় ও বন্ধন।

কৈবর্ত্তাধিপতি ভীম যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দিদশা প্রাপ্ত হয়েন। ভীমসৈন্য * ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলে ভীমমিত্র হরি উক্ত সৈন্যসমূহ একত্র করিয়া ডমরনগর রক্ষার্থ অগ্রসর হইলে তিনিও পরাজিত ও বন্দী হয়েন।

রামপাল বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড়-সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং রাজদ্রোহী বারেন্দ্রকৈবর্ত্তগণের আতঙ্ক উৎপাদনার্থ শ্রীহট্ট শ্রীহট্টরাজ চণ্ডেশ্বরের পরামর্শানুসারে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যস্থ ভূভাগে রামাবতীনামে অত্যুত্তম নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন।

ডমরনগর অধিকার ও চণ্ডেশ্বরের পরামর্শে রামাবতী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।

"অমরাবতী সমানানে[ক] বরেন্দ্রী-কৃতাতঙ্কাম্।"

(ঐ)

রামাবতী প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

রামপালের এই নবপুরী বরেন্দ্রবাসীর আতঙ্ক উৎপাদন করিবার প্রধান কারণ—

* ভীমসৈন্য নামক পল্লী বর্ত্তমান গোমস্তাপুর থানার অন্তর্গত রোহনপুরের সাত মাইল উত্তর পূর্ব্বে পুনর্ভবাতীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন; সম্ভবতঃ ভীমসৈন্য তথায় অবস্থান করিত। নবাবগঞ্জের অন্তর্গত মহানন্দাতীরে ভীমপুর নামক গ্রাম আছে।

"রামাবতীমতিশুভাং সবিভীষণশাসনামৃতস্নাতাম্॥"

(ঐ)

ভীষণ শাসন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া, রামাবতী সৌধমালাকীর্ণ ছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর উচ্চ সুবর্ণমণ্ডিত মন্দিরে নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

"কনকময়ধাম লেখাধিকরণমপি মেরুশিখরমিব॥"

রামাবতীর সৌন্দর্য্য।

সেই সমুদায় মন্দিরের মধ্যে অতি সুন্দর বিবিধবর্ণরাগে রঞ্জিত "বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত কর্ব্বুরময় মন্দির"* শোভিত ছিল। কুবেরতুল্য ধনবান্ ও সাধুজন তথায় বাস করিতেন।

"পুণ্যজনানাং বসতিমসাধুব্যবহারশঙ্কয়াশূন্যাম্।"

সুতরাং রামাবতী অমরাবতীর ন্যায় বোধ হইত।

"পরমারবিকারাভির্যুবতিভিরপি দেববারবনিতাভিঃ।
ক্বণিতমনিকিঙ্কিনীকং কৃতনেপথ্যোদ্ভটনটন্তীভিঃ॥"

নগরের শোভা বারবনিতারও প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইত।

নগরমধ্যে সুন্দর মন্দিরে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি * প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি।

বিভিন্ন দেশাগত বণিক্‌গণের বাণিজ্যের সুবিধার্থ বহু হাট বাজার ছিল। রাজা বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং একটি সমুদ্রবৎ বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া

বড় সাগরদীঘির প্রতিষ্ঠা।

গিয়াছেন। উক্ত সমুদ্রবৎ জলাশয়ের পাড় এতাদৃশ উচ্চ হইয়াছিল যে, উহা সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী সদৃশ বোধ হইত।

"স বিশালশৈলমালিতালীবদ্ধমম্বুধি [ং] সাক্ষাৎ।
অপি পুস্তং পুষ্করিণীভূতং রচয়াম্বভূব ভূপালঃ॥"

(ঐ)

ঐ উন্নত পাড়ে তিনি তিনটি শিবালয়† প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রামাবতীর

---

* কর্ব্বুরময়মন্দির—বিবিধ বর্ণের মীনা করা ইষ্টকে নির্ম্মিত, কি বর্ণলিপ্ত?

* অমরাবতী সন্নিকটে (অধিরথের কাঠালে) মানবপ্রমাণ বুদ্ধমূর্ত্তির উর্দ্ধ অর্দ্ধভাগ পতিত রহিয়াছে।

† শিবালয়ান্নিতয়ে।

অপূর্ণভবা তীর্থ ও জগদ্দলবিহার।

অনতিদূরে তৎকালে "অপূর্ণভবা" নামে একটি তীর্থ-স্থান বিদ্যমান ছিল। তিনি রামপাল নগরসান্নিধ্যে "জগদ্দলবিহার" নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রামপালের স্ত্রীসহ শুভ রামাবতী পুরীতে অবস্থান।

পুত্র রাজ্যপালের উপর গৌড়রাজ্য-শাসনের ভারার্পণ করিয়া রামপালদেব ভাগীরথীতীরস্থ শুভ রামাবতীপুরীতে পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া সস্ত্রীক নিয়ত অবস্থান করিতেন।

"তত্র স রাজা নিবসন্নানাবিষয়সন্নিবেশেন।
সূনুসমর্পিতরাজ্যো রামঃ কান্তাসখশ্চিরাংরেমে ॥"

(রামচরিতং)

সন্ধ্যাকর নন্দীর পরিচয়।

যোগদেবের পুত্র বোধিদেব রামপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ও সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার সমর-সচিব প্রজাপতিনন্দী-পুত্র। এই সন্ধ্যাকর রামচরিত * নামক কাব্যে রামপালের চরিত লিখিয়া রাখিয়াছেন; এই নন্দীবংশ হইতেই রাঢ়ীয় নন্দীগ্রামীয় থাকের উৎপত্তি হইয়াছে। রামপালের প্রধান রাজবৈদ্য ভদ্রেশ্বর, এই ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পুত্র সুরেশ্বর; ইনি সংস্কৃত ভৈষজ্যাভিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুরেশ্বর ভীমপালের অধীনে অবস্থান করিতেন।

রামপালের দেহত্যাগ।

রামপাল যে সময়ে মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রিয়বন্ধু মথনের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কর্ণ-গোচর হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিপুল অর্থাদি দান করিয়া স্বর্গীয় বন্ধুপ্রবরের সন্নিকটে গমন উদ্দেশ্যে ভাগীরথী-গর্ভে প্রবেশ করিয়া তনুত্যাগ করেন।

সেখশুভোদয়ার প্রমাণ।

"জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তনশনৈর্ধ্যাত্বাপদং চক্রিণো।
হা পালান্বয়মৌলিমণ্ডলমণিঃ শ্রীরামপালমৃতঃ ॥

(সেখশুভোদয়া)

---

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে ইহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, No 1, pp. 1-56.

রামাবতী পুরীর স্থান-নির্ণয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল, তাহাতে রামপালের চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং রামাবতী পুরী প্রতিষ্ঠার কারণ বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু রামাবতী কোন্ নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডোপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। নিম্নে রামাবতী পুরীর স্থান-নির্ণয়ে অগ্রসর হইলাম।

রমৌতী।

আইন-ই-আকবরি পাঠে অবগত হওয়া যায়—সম্রাট্ আকবরের সময়ে সরকার লক্ষ্ণৌতীর অন্তর্গত রমৌতী নামে একটি সহর ছিল। ইহার বার্ষিক কর ধার্য্য ছিল। সেই লক্ষ্ণৌতীর (বর্ত্তমান গৌড়) সন্নিকটে "রমৌতী" ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থপাঠেই অবগত হইতে পারা যায়।

আইন-ই-অকবরীর রমৌতী।

রমতী নগর।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে একাধিক বার রমতী নগরের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ময়না * (ময়না গড়—মেদিনীপুর জিলায়) হইতে গৌড় আগমনকালে, লাউসেন ও কর্পূরসেন বড় গঙ্গা পার হইয়া রমতী নগর অতিক্রমপূর্ব্বক পালরাজধানী গৌড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঘনরামের রমতী নগর।

"কর্পূর বলেন দাতা চল এক দৌড়।
আগে ঐ রমতী নগর ঐ গৌড়॥"

(ঘনরাম)

ইহাতে বোধ হইতেছে, রমতী নগর হইতে গৌড়-সীমা দৃষ্ট হইত, এবং রমতীর উত্তরে গৌড় ছিল।

রমতী।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে "রমতী" নামক স্থানের উল্লেখ আছে এবং এই রমতী নামের সহিত রাজগাঁ ও রঞ্জিত নামের উল্লেখে বিবেচনা হয়, মাণিক গাঙ্গুলি রমতী, রাজগাঁ, রঞ্জিত ও পালনগরী গৌড়ের অবস্থান বিশেষ প্রকারে অবগত ছিলেন।

মাণিক গাঙ্গুলির রমতী।

* বর্দ্ধমান জিলার বর্ত্তমান মেমারি ষ্টেশনের অনতি-দক্ষিণ-পূর্ব্বে এক "ময়নাগড়" নামক প্রাচীন চিহ্নে চিহ্নিত গড়বেষ্টিত স্থান আছে, এই "ময়নাগড়" উত্তর ময়না এবং মেদিনীপুরের ময়নাগড় দক্ষিণ ময়না নামে খ্যাত।

"রমতী রহিল পাছু রাজগাঁ, রঞ্জিত।
দেখা দেখি গৌড় নগরে উপনীত ॥"

(রাজসম্ভাষণ পালা—মাণিক)

ইহাতে বোধ হইতেছে, রমতী, রাজগাঁ রঞ্জিত ও গৌড় তখন দেখা যাইত অর্থাৎ এই গুলি পরস্পর অধিক দূরে দূরে ছিল না; এবং রমতী, রাজগাঁ, রঞ্জিত * দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিয়া গৌড়ে কর্পূর উপনীত হইয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলি একটি অত্যাবশ্যক কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—

গৌড় রমতী সন্নিকটে।

"উত্তরে গঙ্গার তীর দুকুল সহর।
দেউল দেহারা দেখ মনুষ্যের ঘর ॥"

(ঐ)

উত্তর গঙ্গার উভয় কূলেই গৌড় নগর ছিল। মালদহের কালিন্দী নদীই তৎকালে "উত্তর গঙ্গা" নামে খ্যাত ছিল বলিয়া বোধ করি। কালিন্দী গঙ্গার একটি শাখা, কিন্তু হজরৎ পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ রাজনগর বল্লাল কাঠালাদি † হইতে বর্ত্তমান অমৃতী গঙ্গারামপুর প্রভৃতি স্থান যে প্রাচীন কালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ছিল এবং এই স্থানে গঙ্গার একটি বিস্তৃত বাঁক ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং রমতী হইতে রাজগাঁ বিস্তৃত গঙ্গাবক্ষ দিয়া দেখা যাইত, এবং উহার উত্তরে গঙ্গাতীরস্থ গৌড়ও দৃষ্টিপথে ক্ষীণ রেখার ন্যায় দেখাইত।

গঙ্গার উভয় তীরে গৌড়নগর।

অমরতী (অমৃতী)।

মালদহ জিলার সদর ষ্টেশন ইংলিশ বাজার হইতে যে রাস্তা রাজমহলঘাট পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, সেই রাস্তার উভয় পার্শ্বেই "অমরতী" গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংলিশ বাজার হইতে তিন ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক দূরে বর্ত্তমান অমরতী দেয়াড় ভূখণ্ডের উপর সংস্থিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সম্ভবতঃ গৌড় যখন গঙ্গাপ্রবাহে প্রণষ্ট হইয়াছিল সেই সময়ে "অমরতী"র প্রাচীন মূর্ত্তি গঙ্গাগর্ভে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান মালদহের অমরতী।

ইহা প্রথমে রামাবতী, তৎপরে রামতী নগর, তৎপরে রমতী এবং বাদশাহী আমলে "রমৌতী" নামে খ্যাত হইয়াছিল। অদ্যাপি অমরতী হইতে গঙ্গাপরিত্যক্ত

* রাজগাঁ রঞ্জিত প্রভৃতির বিবরণ পরে লিখিত হইয়াছে।

† কাঠাল অর্থে বনভূমি।

ভূভাগের উপর দিয়া রাজপথ, বল্লাল কাঠাল দৃষ্ট হয়। রামাবতী, রমতী ও রমৌতী নাম গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান কালে অমরতী এবং ইংরাজী ভাষায় "অমৃতী" নামে পরিচিত হইতেছে। অমরতী মালদহ জিলার অন্তর্গত, সুতরাং পালরাজত্ব-কালে ভবিষ্যৎ মালদহ জিলার উপরই "রামাবতী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামাবতী, ধর্ম্মমঙ্গলে রমতী হইয়াছিল, পাদশাহী দপ্তরে ইহা রমৌতী হয়, দেশের লোকে অমরতী বলে এবং ইংরাজী দপ্তরে ইহা অমৃতী হইয়া পড়িয়াছে।

রামাবতীর সন্নিকটবর্ত্তী
রামচরিত-বর্ণিত কতিপয় প্রাচীন চিহ্ন।

(১)
অবলোকিতেশ্বর-বুদ্ধমূর্ত্তি।

রামাবতী নগরে সুন্দর মন্দিরে অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামপাল বৌদ্ধ ছিলেন, সুতরাং বৌদ্ধ দেবালয়টি (বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত কর্ব্বুরময় মন্দিরটি) মেরুশিখর সদৃশ কনকময় মন্দির ছিল বলিয়াই বোধ হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কনকময় মন্দিরের চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। অমরতী-সংলগ্ন গঙ্গারামপুরস্থ প্রাচীন ভাগীরথীখাতপার্শ্বস্থ কালু পাহলমানের* দরগায় প্রাচীন বৌদ্ধচিহ্ন পতিত রহিয়াছে। ইহারই অনতিদক্ষিণে মানবপ্রমাণ বুদ্ধমূর্ত্তির ঊর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ আজিও শায়িত রহিয়াছে।

বৌদ্ধ দেবালয়।

(২)
অপূর্ণভব তীর্থ।

"অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়ানঘপ্রবাহ(হা) পুণ্যতমাম্।
অপুর্ণভবাক্ষয়মহাতীর্থং বিকলুষোজ্জ্বলামন্তঃ॥"

(রামচরিত)

রামাবতী পুরীর নিকটে "অপূর্ণভব" নামে একটি তীর্থস্থান ছিল। আজিও মালদহবাসীর নিকট শুনিতে পাই, বরেন্দ্রাদি দেশ হইতে নরনারীগণ অমরতীর গোলাঘাটে স্নান করিতে আগমন করিত। বলিতে পারি না, কনকময় ও কর্ব্বুরময় মন্দির-শোভিত ভাগীরথী তীরে অপূর্ণভব তীর্থ ছিল কি না।

---

* পাহলমান—পালোয়ানের অপভ্রংশ—মল্ল।

পুনর্ভবা ও মহানন্দা নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে সুশর্ম্মা রাজার বাড়ী বলিয়া খ্যাত একটি বিস্তীর্ণ উন্নত ধ্বংসস্তূপাকীর্ণ স্থান বিদ্যমান আছে। ইহা বর্ত্তমান রোহণপুর ষ্টেশনের এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

রোহণপুর সন্নিকটবর্ত্তী

সুশর্ম্মারাজার গড়।

রোহণপুর ও সুশর্ম্মা রাজার গড় পুনর্ভবাতীরে। অদ্যাপি মহানন্দা-স্নান উপলক্ষে এই স্থানে লোক-সঙ্ঘট্ট হইয়া থাকে। এই স্থান পবিত্র বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে মধ্যে মধ্যে দেবদেবীমূর্ত্তির আবিষ্কার হইতেছে। অনুমান এই স্থানেই অপূর্ণভবতীর্থ ছিল। গঙ্গা ও করতোয়া ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী অক্ষয় মহাতীর্থ অপুর্ণভব।

(৩)

জগদ্দল-মহাবিহার।*

"মন্ত্রাণাং স্থিতিমুচাং জগদ্দলমহাবিহারোচিতরাগাম্।
দধতী [ং] লোকেশমপি মহত্তারোদীরিতোরুমহিমানম্॥"

(রাম)

জগদ্দল মহাবিহার নামে একটি বিহার রামপাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে লোকেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জগদ্দলবিহার রামাবতীপুরীর সন্নিকটে ছিল না, থাকিলেও উহার নাম লোপ পাইয়াছে। মালদহান্তর্গত বরেন্দ্রভূমে "জগদল" নামক প্রাচীনচিহ্নাঙ্কিত স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মালদহের জগদ্দল।

জগদলা।

ইহা বর্ত্তমান মালদহ জিলার গাজল থানার অন্তর্গত পুনর্ভবা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান কালে পুনর্ভবানদী জগদলা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে গমন করিলেও পূর্ব্বে ঐ নদী জগদলার পদপ্রান্ত দিয়াই প্রবাহিতা ছিল। জগদলা বরেন্দ্রের অন্তর্গত।

বরেন্দ্রস্থ জগদলা।

গাজল হইতে একটি রাস্তা পূর্ব্ব-দক্ষিণ মুখে প্রসারিত আছে। ঐ রাস্তা দিয়া স্থলপথে জগদলায় উপনীত হওয়া যায়। হজরৎ পাণ্ডুয়া হইতে প্রায় বার মাইল পূর্ব্বদিকে জগদলার উচ্চভূখণ্ড—ইষ্টক-প্রস্তরাঙ্কিত বনভূমি পড়িয়া আছে।

জগদলার চতুষ্পার্শ্বে—উত্তরজয়ী, দুর্গাপুর, মহাদেবপুর প্রভৃতি পল্লী আছে।

জগদল।

ইহা এই জিলার অন্তর্গত গোমস্তাপুর থানার অধীন; বরেন্দ্রভূমে অবস্থিত

* জগদ্দল-বিহারের বিশেষ বিবরণ বারান্তরে লিখিত হইবে।

প্রাচীন চিহ্নাঙ্কিত স্থান। ইহার নিকটে জগদল নামে একটি পল্লী আছে।

জগদল পল্লী। জগদল হইতে প্রায় চার মাইল পূর্ব্বে জগদলা দোগাছী নামক স্থান আছে। হাকৃয়োল, সূর্য্যপুর, ধীরেল প্রভৃতি পল্লী ইহার সন্নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা গোমস্তাপুর হইতে প্রায় নয় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

জগদলা।

পুর্ণিয়া জিলার কৃষ্ণগঞ্জের এলাকাধীন হরিপুরের সন্নিকটে জগদলা নামে

পুর্ণিয়ায় জগদলা। একটি প্রাচীনচিহ্নাঙ্কিত স্থান আছে। এক সময়ে এই ভূখণ্ডও পালরাজন্যগণের করায়ত্ত ছিল।

মন্তব্য।

এই প্রকার দুই তিনটি জগদলা নামক প্রাচীন স্থান দেখিয়া মনে হয় যে, রামাবতীর নিকটস্থ জগদ্দল-মহাবিহারের অনুকরণে, সেই সময়ে পালশাসনান্তর্গত ভূভাগে যতগুলি লোকেশ্বর প্রীত্যর্থ বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল সে সকলের নামও জগদ্দল-বিহার রাখা হইয়াছিল। রামাবতীর সান্নিধ্যে যে জগদ্দলবিহার ছিল তাহা গঙ্গাগর্ভে বিশ্রাম-লাভ করিলে কালক্রমে স্থানীয় মানবহৃদয় হইতেও জগদ্দল-স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। জগদল স্থানগুলি খনন করিলে প্রাচীন চিহ্ন আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। জগদলমাত্রেই বুদ্ধাদি দেবদেবীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৪)

ডমর নগর।*

ডমরের আর পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নাই। ডমর নগরের স্থাননির্ণয় আবশ্যক। রামচরিত্রের টীকাকার "কৈবর্ত্তস্য নৃপস্য" প্রতিষ্ঠিত "ডমরমুপপুরং"

ডমর নগর, বর্ত্তমান ডমরন। বলিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে প্রাচীন ডমর "ডমরন" "ডমরুল" "ডমরাইল" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মালদহ জিলায় খরবা থানার অন্তর্গত "ডমরল"। ডমরনের হাট দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত। মহানন্দাতীরে প্রাচীন ডমর বর্ত্তমান ছিল।

"অপিচাপদণ্ডমরপ্রতিমদ্রবিশোর্হবধূতনিখিলনৃপম্।
স ভবস্তাবিতজনকঃ করপল্লববলীলয়ালাবীৎ॥"

(রাম)

---

* ডমরন সন্নিকটে আশাপুর, কালিগ্রাম, চাঁচল।

টীকাকার "ডমরমুপপুরং" বলিয়াছেন। ভীম পালনগরীর নিকটে "ডমরপুর" স্থাপন করিয়া ছিলেন বলিয়াই "উপপুর" বলা হইয়া থাকিবে।

(৫)

স্কন্দনগর, শোণিতপুর।*

"ব্রহ্মকুলোদ্ভবাং স্কন্দনগরেণ মূর্চ্ছিতামিতাপচিতি (ম্)।
তৈরতিগুরুত্ব (লা) বাসৈরথপ্রৈর্বভরি (ত) শোণিতপুরাশ্চ॥"

বাণপুর, শোণিতপুর, স্কন্দনগর।

স্কন্দনগর পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত, শোণিতপুর তগণতীরে, বর্ত্তমান কালে শোণিতপুর কাঠাল নামে খ্যাত। বাণপুর, শোণিতপুর, স্কন্দনগর মালদহের অন্তর্গত বরেন্দ্রভূমিতে। প্রাচীন চিহ্নে চিহ্নিত। রামচরিতের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কতিপয় প্রাচীন স্থানের নাম লিখিত আছে, তাহার অধিকাংশগুলিই মালদহের অন্তর্গত।

(৬)

সাগরদীঘি।

রামপালের সাগরদীঘি; বর্ত্তমান মালদহের বড় সাগরদীঘি।

রামপালের সময় রামাবতী-পুরী ও ইহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূভাগে বহু জলাশয় খনিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রামাবতীপুরীর অনতিদূরে অম্বুধিসমান অর্থাৎ সাগরসম জলাশয় খনিত হইয়াছিলেন। ইহার পাড় সাগরকূলস্থ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ছিল। এপ্রকার বৃহৎ জলাশয় ও উন্নত—বিশাল পাড় মালদহের মধ্যে একমাত্র সাগরদীঘি ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। বড় সাগরদীঘি রামাবতী হইতে অধিক দূর নহে। হাণ্টারের মতে ইহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কৃত্রিম জলাশয়। এই সাগরদীঘি কেমন—না,—

"স বিশালশৈলমালিতালীবদ্ধমম্বুধিং সাক্ষাৎ।"
(রাম)

মালদহের বর্ত্তমান এই বড় সাগরদীঘি রামপালপ্রতিষ্ঠিত এবং রামাবতী-পুরীর সন্নিকটবর্ত্তী। সাগরদীঘি সেনরাজগণের প্রতিষ্ঠিত নহে।

(৭)

শিবালয়।

(ক)

রামপালদেবের সময় কেবল যে বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হইত তাহা নহে, তখন বহু শিবালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উন্নত ভূখণ্ডে শিবালয় বিদ্যমান থাকিবার

* পৃথক্ প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।

কথা রামচরিতে লিখিত আছে। সম্ভবতঃ বড়সাগরদীঘির পশ্চিম পার্শ্বে সোপানাবলি-শোভিত ঘাটের অনতিপশ্চিমে রামপালপ্রতিষ্ঠিত একটি শিবালয় ছিল। বাদশাহী আমলে সেই স্থানে সেই উপাদানে এবং শিবালয়ের নিম্নাংশের উপর সেখ আখী সিরাজ-উদ্দীনের সমাধিগৃহ এবং ঝনঝনিয়া মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ চিহ্নাদির অভাব নাই। এই স্থানের সন্নিকটে মমলাবাড়ী। সাগর-দীঘির ছয়টি সুবৃহৎ বাধান ঘাট ছিল।

রামপালপ্রতিষ্ঠিত তিনটি শিবালয়।

(খ)

পালখন দীঘিতীরস্থ শিবালয়।

হজরৎ পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্ত্তমান পড়ুয়া ষ্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব্বে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক সুবৃহৎ দীঘি আছে। রেলওয়েলাইন এই দীঘির উত্তরে বগচর দিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে। এই দীঘির দক্ষিণ দিকের বাঁধা ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে এক বিশাল ইষ্টকস্তূপ ও ইহার সান্নিধ্যে সূর্য্য, বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীমূর্ত্তি পতিত আছে।

রাজনগরের পালখন দীঘি।

রামপালের অন্য শিবালয় ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দীঘির উত্তর তীরে একটি মানবাপেক্ষা সুবৃহৎ বুদ্ধমস্তক (প্রস্তরময়) আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঐ স্থানের সন্নিকটে একটি বিহার বা স্তূপ ছিল। ইহা বিস্তৃত রাজনগর পরগণার অন্তর্গত। রাজনগর পরগণায় পালবংশীয় অন্যতম রাজধানী গৌড় বিদ্যমান ছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত।

মদনভস্মের ফল।

(রাজশেখর।)

মীনকেতনে দহিয়া বিধি করেছ এ কি রঙ্গ,—
মমতাহীন পেয়েছে সে যে ভুবনভরা অঙ্গ!
পঞ্চশর ভাঙ্গিয়া তা'র হয়েছে শর লক্ষ—
করিল দেহ কদমসম বিঁধিয়া দেহ-বক্ষ।

শ্রীকালিদাস রায়

অচলায়তন।

(সমালোচনা)

'বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।'

ধর্ম্মসাধনার একাধিক পন্থা আছে। কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, তিনেরই এক উদ্দেশ্য, কিন্তু উপায় ভিন্ন ভিন্ন। কর্ম্মমার্গ আচার, নিয়ম, ব্রত, সংযম, উপবাস, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা জটিল ও গহন। ভক্তিমার্গ শুধু হৃদয়ের প্রীতিশ্রদ্ধার স্নিগ্ধরসে সুগম ও সরল। জ্ঞানমার্গ আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির প্রভাবে শুষ্ক ও কঠোর। তবে জ্ঞান ও ভক্তির মণিকাঞ্চনযোগ ঘটিলে উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম মন্ত্রোচ্চারণ, বেদগান, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানবাহুল্যে সংহিতাব্রাহ্মণ-আরণ্যকাদি প্রপীড়িত। পুরাণ স্মৃতি তন্ত্রাদিও ঐ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানবাহুল্য লইয়া বিব্রত। হৃদয়ের ভক্তি, প্রাণের আকুলতা, আত্মার পিপাসা, এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর যেন হাঁফাইয়া উঠে। ক্রিয়াকাণ্ডের পাষাণচাপে হৃদয়টা একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়; প্রাণ স্তব্ধ হয়, আত্মা অসাড় হয়, মানুষ একটা যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে আচার, অনুষ্ঠান, বাছ-বিচার, জাতিভেদ, সমাজভেদ, ধর্ম্মভেদ, অধিকারিভেদ প্রভৃতি বিবিধ ভেদের বিরুদ্ধে চিরদিন মানুষের প্রাণের ভিতর একটা বিদ্রোহ, একটা সংগ্রাম চলিতেছে। সকল দেশেই এই সংগ্রাম ঘটিয়াছে। সকল দেশেই যুগে যুগে প্রকৃত সাধক আবির্ভূত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে মানুষকে শুনাইয়াছেন—

> জপ তপ আর দেব-আরাধনা
> পূজা হোম জাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা
> এ সকলে এবে কিছুই হ'বে না
> প্রাণের প্রভুরে কররে পূজা।

য়িহুদিধর্ম্মে ফ্যারিসিদিগের আচারপ্রিয়তার বিরুদ্ধে যীশুখ্রীষ্ট দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং বন্ধনমুক্ত স্বাধীন হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত ভক্তিধারা দ্বারা ঐ পাষাণস্তূপ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতে এরূপ ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়াছে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের বিদ্রোহ বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম। এক

হিসাবে গীতাও এইরূপ একটা বিদ্রোহের ফল। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' যখন যখন আচার অনুষ্ঠানের নাগপাশ-বন্ধন আঁটিয়া বসিয়াছে, তখনই তখনই এক এক জন প্রেমাবতার 'দাদাঠাকুর' আসিয়া এই সঙ্কীর্ণতা, এই যান্ত্রিকতা, এই বাহ্যশুদ্ধিপ্রিয়তা, এই আচারনিষ্ঠা অবহেলা করিয়া হৃদয়ের স্বভাবজ প্রেমভক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে রাশিকৃত অনুষ্ঠানের শেহালা ভাসিয়া গিয়াছে। কবীর, তুকারাম, গুরু নানক প্রভৃতি এই পথের পথিক। বাঙ্গালার চৈতন্যদেব এই রসের রসিক। সেদিনও রামপ্রসাদ সেন পৌরাণিক দেবতার উপাসক হইয়াও অনুষ্ঠানকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভক্তিকে সেই আসনে বসাইয়া গিয়াছেন—

'ভক্তি হ'তে মুক্তি হয় এই সার যুক্তি।'
'ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।'

শত শত বাউল ও আউলিয়া সম্প্রদায় এই ভক্তির ধর্ম্ম, এই প্রেমের ধর্ম্ম, এই বিশ্ব প্রকৃতির ধর্ম্ম, এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কর্ম্মভূমি ভারতভূমিতে প্রচার করিয়াছেন। ভারতীয় সমাজে একদিকে যেমন আচার-অনুষ্ঠানের, মন্ত্রতন্ত্রের, ব্রতনিয়মের শুষ্কতা ও কঠোরতা আছে, অপরদিকে তেমনই ভক্তির চিরন্তন উৎস ভারতীয় মানব-প্রকৃতিকে চিরসরস করিয়া রাখিয়াছে। উপনিষদের 'রসো বৈ সঃ' হইতে 'রসের নবগোরা' পর্য্যন্ত এই রসে ওতঃপ্রোত। ভারতবর্ষ চারি যুগ ধরিয়া এই গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্বের গোপ্তা। বৈদিক কালের ঋষি হইতে শান্তিনিকেতনের মহর্ষিনন্দন পর্য্যন্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যের ভিতর সেই পরমপুরুষের 'সত্যং শিবং সুন্দরং' রূপ দেখিয়াছেন।

"অচলায়তন" এই চিরন্তন সত্য—আজ বিশ্বেশ্বরীর পূজার উৎসব-দিনে নূতন করিয়া আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়াছে; দৃশ্যকাব্যের সজীব চিত্র-বিচিত্র ভাষায় ও ছলাকলায় মূর্ত্ত করিয়া—কবির প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া—সাধকের হৃদয়-রসে সরস করিয়া, আমাদের প্রাণের কাছে আনিয়া দিয়াছে। এই অচলায়তন-নামক অধিষ্ঠান য়িহুদীর Impregnable Rock বা Mount Zion, খ্রীষ্টানের Holy Catholic Church, বৌদ্ধের মঠ, হিন্দুর বেদস্মৃতিতন্ত্র-পুরাণ-শাসিত বিরাট সমাজ। ফলকথা, সকল অনুষ্ঠান-বাহুল্য-বিশিষ্ট ধর্ম্মই প্রাচীরে ঘিরিয়া লৌহকবাটে বন্ধ করিয়া নিয়মে বাঁধিয়া আচারে আঁটিয়া মন্ত্রতন্ত্রে সাধনার গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। নিসর্গসৃষ্ট বিশ্বজনীন পরিপূর্ণাঙ্গ সজীব গতিশীল ধর্ম্মের প্রাণভরা প্রেমভক্তি, হৃদয়ভরা আলোক,

মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর—এই পাষাণ প্রাচীরের ভিতর—এই অচ্ছিদ্র পুরীর ভিতর প্রবেশ করিতে পায় না। প্রবেশ করিলে সে সঙ্কীর্ণতা, সে অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, সে যান্ত্রিক আড়ষ্টভাব, সে পাথরচাপা অসাড়তা দূরীভূত হয়। উচ্চ-অঙ্গের ভক্তিসাধনতত্ত্বের এই সারসত্য।

এই ভাবে দেখিলে "অচলায়তন" সত্য শিব ও সুন্দরের সমাবেশে মনোহারী, হৃদয়দ্রবী, প্রাণস্পর্শী ও আত্মার তৃপ্তিকারী হইয়াছে, ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিব। সাধনার যে উচ্চস্তরে পৌঁছিলে শিবদুর্গা, কালীকৃষ্ণ ভেদবুদ্ধি থাকে না, সেই স্তরে পদন্যাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুটরূপে দেখাইতেছেন যে, আচারনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের গুরুদেব এবং পতিত অনাচরণীয় (নমঃশূদ্র) দর্ভকগণের গোঁসাই এবং আহারবিহারে অনাচারী ম্লেচ্ছযবনের দাদাঠাকুর একই বস্তু। ভেদ কেবল উপাসনার প্রণালীতে। দাস্য ও মাধুর্য্য, পূজাঅর্চ্চা জপতপ হোমযজ্ঞ অপেক্ষা অধিকতর মহৎ ও পবিত্র। কবি এই সনাতনী কথা কাব্যচ্ছলে শিখাইতেছেন।*

কিন্তু "অচলায়তনের" আর একটা দিক্ আছে। সেটা বোধ হয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মী, তন্ত্রস্মৃতিপুরাণভক্ত হিন্দুর মনঃপ্রীতিকর হইবে না। বিবেকানন্দ যাহাকে ছুৎমার্গ বলেন, বর্ত্তমান কবি তাহার উপর, হিন্দুর সেই আচারমার্গের উপর, বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। 'হিং টিং ছটে'র কবি আবার অনেক দিনের পর তাঁহার অক্ষয় তূণ বাহির করিয়াছেন। 'গোরায়' কৃষ্ণদয়াল বাবুর ঘেরণ্ডসংহিতায় একান্ত অভিনিবেশ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথের অক্ষয় তূণের তীক্ষ্ণ বাণ নিঃশেষ হয় নাই। কিন্তু গোরায় যেমন ব্রাহ্মসমাজের দুইশ্রেণীর লোক—পানু বাবু ও পরেশ বাবু—চিত্রিত হইয়াছেন, তেমনই হিন্দু-সমাজেরও দুইশ্রেণীর লোক কৃষ্ণদয়াল বাবু ও আনন্দময়ী চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু "অচলায়তন" হিন্দুসমাজেরই একচেটিয়া অধিকার। জপতপ মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ড স্নানদান উপবাসব্রতনিয়ম সমস্তই তীব্র শ্লেষবিষে জর্জ্জরিত। অবশ্য এই শ্লেষ কবির প্রতিভার গুণে পাঠকের উপভোগ্য হইয়াছে।

পঞ্চক তোতাপাখীর মত "তট তট তোতয় তোতয়" মুখস্থ করিতে করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম। ইহা ত আমাদেরই গায়ত্রী মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তান্ত্রিক বীজ-

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত যুগের শেষবীর অক্ষয়চন্দ্রের 'সনাতনী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইল, significant নহে কি ?

মন্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের উদ্দেশে তীব্র শ্লেষ। ইন্দ্রতৃণ আমাদেরই কুশ, খেসারিডাল আমাদেরই মাসকড়াই, একজটাদেবী আমাদেরই 'বাণের পৃষ্ঠে দেবী যান, সম্মুখে দক্ষিণে ধরিয়া থান।' কবি করন্যাসের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছেন। বালক সুভদ্র যখন 'মহাতামস' করিবার জন্য প্রাণের আকুলতা জানাইতেছে এবং কবি সেই উপলক্ষে বলিতেছেন, "হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেচে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়েছেরে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?' তখন বুঝিতেছি এ ত রঘুনন্দনশাসিত হিন্দুসমাজের বালবিধবার নির্জ্জলা একাদশীর কথা। মহাপঞ্চককে বেশ চিনিয়াছি, তবে পরিচয়টা আর খোলসা করিয়া দিব না।

অনুষ্ঠান-বাহুল্যে হৃদয় শুষ্ক হয়, মন আড়ষ্ট হয়, প্রাণ অচেতন হয়, আত্মা অসাড় হয়, তাহা অচলায়তনের আচার্য্য যেমন বুঝিয়াছেন, পঞ্চক যেমন বুঝিয়াছে, আমরাও যে তেমন বুঝি না এরূপ নহে। মন্ত্র তন্ত্র আচমন আসন অঙ্গন্যাস যে আসল বস্তু হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায় তাহাও বুঝি। বুঝিয়াও বলিতে ইচ্ছা হয়—ইহার শেষ মীমাংসা কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল ধর্ম্মেরই ত এই দশা। যে খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্ম য়িহুদীধর্ম্মের জটা ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মকে ঋজু করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও কি ক্যাথলিক মঠমন্দিরে অনুষ্ঠান-বাহুল্যে ভারাক্রান্ত নহে? যে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ধর্ম্মাচার্য্য পোপের আসনে ধর্ম্মের সারসত্য বসাইতে বদ্ধপরিকর হইয়া ধর্ম্মসংস্কার করিয়া বসিল, সে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমন্দিরের উপাসনা-প্রণালীতে পিউরিট্যান্ সম্প্রদায় কেবল অনুষ্ঠানের আবর্জ্জনা দেখিয়াছেন। যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক আচার, অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, হোম, মন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মূল করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাতেও ত শেষে অনুষ্ঠানের জটা বাধিয়াছে। Buddhistic Prayer Wheelএর মত মন্ত্রগত সাধনামার্গ ত বৌদ্ধধর্ম্মেরই উৎকট উদ্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ও যে মালাজপ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ছাড়িয়া শুধু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন এ সংবাদ পাই নাই। 'গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম,' কথাটা পাকা। গীতার আমল থেকেই বোধ হয় আমরা এ অপকর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। 'বদ্ধ জলেই দল বাঁধে', এ কথাটাও খুব ঠিক। কিন্তু মানুষ চিরকালই দুর্ব্বল, তাহার মনের বল পরিমিত, সে চিরকালই নিয়মের মোহে অভিভূত। একটা বিরাট মনুষ্যসমাজ সে মোহ কাটাইয়া 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, শুধু দাদাঠাকুরকে লইয়া

হুটোপুটি খেলিবে, তাহার লক্ষণ খুব সুস্পষ্ট দেখিতেছি না। যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার বলে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আচার্য্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারবেন সেদিন আমাদের অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে। সে দিন ঘনাইয়া আসিতেছে কি না জানি না, কিন্তু সেই শুভ অবসর আসিবার পূর্ব্বে সাবধান, যেন আগাছার সঙ্গে সঙ্গে ফশল শুদ্ধ নষ্ট হইয়া না যায়।

অনেকে হয়ত বলিবেন, প্রতিভাবান্ কবি একটা সমাজগত বা ধর্ম্মগত উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নাটকখানি লিখেন নাই, ইহা written with a purpose নহে। শুধু আনন্দ-প্রদানের জন্য কবির পরিপক্ক বয়সের এই রচনা প্রকটিত হইয়াছে। অতএব কেবল কাব্যকলার দিক্ হইতেই ইহার দোষ গুণ বিচার করিতে হইবে। কিন্তু গ্রন্থখানি যে উদ্দেশ্যহীন একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যাহা হউক আর্টহিসাবে দেখিতে গেলে নাটকখানির বহু গুণ আছে। বিদ্রূপ বাক্যগুলি উপভোগ্য, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চকের গানগুলি পড়িলে বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধনা কত উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়াছে। ইহাতে সাধকের প্রেমময় হৃদয়ের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ভাষা যেমন সরল তেমনই মধুর। গানের নৃত্য দোদুল ছন্দে ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আহ্বান শুনিয়া পাঠকের প্রাণ মন ভরিয়া যায়।

আর্টহিসাবে নাটকখানির একটি দোষ দেখা যায়। রচনাটি যেন অত্যন্ত diffuse হিং টিং ছটের সে compactness ইহাতে নাই, হেঁয়ালি নাট্যের সে খোলা প্রাণের (wit) রসিকতা যেন ঈষৎ অস্বচ্ছ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মের দিক্ হইতে অচলায়তনের বিচার করা চলে। রাজনীতির দিক্ হইতেও ইহার বিচার করা চলে। 'অচলায়তন' রাজনীতির Chinese Wall, অর্থনীতির closed door, কিন্তু সে বিচার বিশেষজ্ঞ করিবেন। আমরা যেভাবে কাব্যখানি বুঝিয়াছি, সেই ভাবেই সমালোচনা করিলাম। বলা বাহুল্য, এই কয়টি কথা বলিয়া কাব্যখানির বিচিত্র সৌন্দর্য্য নিঃশেষ করা যায় না। অপেরাগ্লাসে দুই একটা পার্থিব দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখান যাইতে পারে। কিন্তু রবির দীপ্তির কাছে এই ক্ষুদ্র কাচখণ্ড অকিঞ্চিৎকর।

২রা আশ্বিন, ১৩১৮ — শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত।

(২)

বেদব্যাস-রচিত মূল মহাভারত বা 'ভারতসংহিতা' পঞ্চসহস্রবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ, ইহা গত ভাদ্রমাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' আমি সংক্ষেপে সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এবার রামায়ণের রচনাকাল-সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার সবিস্তার আলোচনা সম্ভবে না। সুতরাং স্বল্প কথায় কালের নির্দ্দেশ করিয়াই আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

আমাদের দেশে পুরুষ-পরম্পরাগত বিশ্বাস এই যে, রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ। কোনও কোনও য়ুরোপীয় এই বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে য়ুরোপীয় অনুসন্ধিৎসু-গণের মধ্যেও ঐকমত্যের একান্ত অভাব, সুতরাং সে সকল উক্তি লইয়া বিস্তীর্ণ আলোচনা একান্ত অনাবশ্যক। আমরা সংক্ষেপে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদি দেখিয়া এই কথার আলোচনা করিব।

রামায়ণের প্রথমেই লিখিত আছে যে, বাল্মীকিমুনি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—

"কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।"

"আজ কাল পৃথিবীতে গুণবান্ বীর্য্যবান্ কে আছেন?" ইহার উত্তরে নারদ বাল্মীকিকে রামের কথা জ্ঞাপন করেন। নারদ চলিয়া গেলে বাল্মীকি স্নানার্থ তমসাতীরে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি এক বিচরণশীল ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে দেখিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যাধ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াই সেই পক্ষিদম্পতীর মধ্যে ক্রৌঞ্চকে নিহত করিল। তাহা দেখিয়া ক্রৌঞ্চী কাঁদিয়া উঠিল। এই ব্যাপারে সদয়-হৃদয় মুনিসত্তমের মনে দারুণ শোক জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

কথাটা মুখ হইতে অকস্মাৎ এরূপ ভাবে বিন্যস্ত হইয়া বাহির হইল দেখিয়া বাল্মীকি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহার পার্শ্বস্থ শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"পদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥"

"এই পদবদ্ধ সমানাক্ষর-সমন্বিত, তন্ত্রীলয়ে সঙ্গীতযোগ্য বাক্য আমার শোকার্ত্ত হৃদয় হইতে স্বতঃ বাহির হইয়াছে, সুতরাং ইহার নাম 'শ্লোক' হউক, অন্যথা না হয়। শিষ্য গুরুবাক্যের অনুমোদন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ব্রহ্মা বাল্মীকির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুরানন বাল্মীকিকে ঐ রূপ শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে বাল্মীকি কর্ত্তৃক রামায়ণ রচিত হয়।

এই বৃত্তান্ত হইতে আমরা কয়েকটি আবশ্যক তথ্য জানিতে পারি।

(১) রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমসাময়িক।

(২) রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি যে অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত বাল্মীকিই সেই ছন্দের প্রবর্ত্তক। সেই জন্য বাল্মীকি আদি কবি * এবং রামায়ণ আদি কাব্য † নামে পরিচিত।

(৩) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইদানীং বহু গবেষণার ও চিন্তার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ হৃদয়তন্ত্রীতে প্রবল ভাবে আঘাত করিলে কণ্ঠস্বর তরঙ্গায়িত ও কোমল হয়, ফলে সেই শোকার্ত্ত মানবের কণ্ঠ হইতে পাদবদ্ধ তন্ত্রীলয়সমন্বিত বাক্যাবলি স্বতঃই বহির্গত হইয়া থাকে। মহামুনি বাল্মীকির কণ্ঠ-নিসৃত শ্লোকের উৎপত্তি-বিবরণ সেই মতেরই সমর্থন করিতেছে।

রামায়ণের এই বিবরণ হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, বেদব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বাল্মীকির প্রবর্ত্তিত অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোকেই মহাভারত রচিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাউক, এসম্বন্ধে মহাভারত কি বলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমন্তপঞ্চকবর্ণনে লিখিত আছে,—

"ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অসকৃৎ পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ॥"

---

* হেমচন্দ্র।

† "আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।" (লঙ্কাকাণ্ড ১৩০।১০৫)
এই আর্ষ ও আদিকাব্য পুরাকালে বাল্মীকি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।

"স সর্ব্বং ক্ষত্রমুৎসাদ্য স্ববীর্য্যেণানলদ্যুতিঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্॥" ১।২।৩৪।

ত্রেতা ও দ্বাপরের সম্মিলন সময়ে যোদ্ধৃগণের মধ্যে প্রধান পরশুরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীর ক্ষত্রিয়দিগকে বার বার হত্যা করিয়াছিলেন। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই পরশুরাম সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে উৎসন্ন করিয়া তাঁহাদের রক্তে সমন্ত-পঞ্চকে পাঁচটি রক্তপূর্ণ হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইত্যাদি—

মহাভারতের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে—

(১) পরশুরাম যে সময়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্ষত্রিয়গণকে বার বার নিহত করেন, সেই সময়ের পর হইতেই দ্বাপর যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নামক লোমহর্ষণ ঘটনা যেমন দ্বাপরের অন্ত করিয়া কলির প্রবর্ত্তনা করিয়াছিল, পরশুরামের সহিত ক্ষত্রিয়গণের লোকক্ষয়কর যুদ্ধও সেইরূপ ত্রেতার অবসান ও দ্বাপরের আরম্ভ সূচিত করিয়াছিল। অযোধ্যা-পতি রামচন্দ্র যে সময়ে কিশোরবয়স্ক সেই সময়ে পরশুরাম বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রামচন্দ্রের নিকট পরশুরাম অপদস্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্র পরশুরামের প্রায় সমসাময়িক। এরূপক্ষেত্রে তিনি যে যুধিষ্ঠিরের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রামচন্দ্রের সময়েই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। কলির প্রারম্ভে বেদব্যাস ভারতসংহিতা রচিয়াছিলেন। সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের রচনাকাল-মধ্যে প্রায় একটি যুগের ব্যবধান এবং রামায়ণ প্রাচীনতর গ্রন্থ তাহাও বুঝা গেল।

(২) কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। এই স্থানেই ত্রেতাযুগের অবসানকালে পরশুরামের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বার বার যুদ্ধে ক্ষাত্রশক্তি বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল।

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র পুনরায় ক্ষত্রিয়শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-ব্যাপারই সেই দাম্ভিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কথিত আছে, ক্ষত্রিয়গণ সে সময়ে দুর্য্যোধনের প্রভাবে এতদূর অবনত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই বর্ব্বরোচিত ব্যাপারের প্রতিবাদ পর্য্যন্তও করিতে সাহসী হয়েন নাই। কেবল সভাস্থ কয়েকজন ব্রাহ্মণ এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করিয়া এই মর্ম্মে অভিসম্পাত করেন যে, এই পাপে কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্র-বীর্য্য বিলুপ্ত হইবে এবং কলিতে আর ভারতে ক্ষাত্রবল উদ্বুদ্ধ হইবে না।

সুতরাং বুঝা গেল রামায়ণে যে ক্ষত্রশক্তির অভ্যুদয় বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহারই বিলয়ব্যাপার বর্ণিত রহিয়াছে। উভয় গ্রন্থই উহাদের বর্ণিত বিষয়ের সমকালে লিখিত। সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহাভারতের বনপর্ব্বে রামায়ণী কথা বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন,—

"শৃণু রাজন্। যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।
সভার্য্যেণ যথাপ্রাপ্তং দুঃখং রামেণ ভারত॥"

(বনপর্ব্ব; ২৭৩ অধ্যায়)

"হে রাজন্! ভার্য্যার সহিত রাম যে দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি যথাযথ শ্রবণ করুন"। এস্থলে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই রামের বৃত্তান্ত পুরাতন ইতিহাস বলিয়াই বর্ণনা করিতেছেন। ইহাতে রামের ও সেই সঙ্গে রামায়ণের প্রাচীনত্বই সূচিত হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা মহাভারতকে প্রাচীনতর গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহারা মহাভারতীয় রামোপাখ্যানটি প্রক্ষিপ্ত বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও অধ্যায় আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যাহা আপনাদের কাল্পনিক মতের পরিপন্থী, তাহাই প্রক্ষিপ্ত এরূপ নির্দ্দেশের আমরা বিরোধী। প্রবল যুক্তি ভিন্ন কোনও বিষয়েই প্রক্ষিপ্ততা স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, এস্থানটি ভিন্ন মহাভারতের অন্যত্র রামায়ণের প্রাচীনতার প্রমাণ আছে কি না, তাহাই দ্রষ্টব্য।

দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে যে, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবা রণস্থলে নিশ্চেষ্ট ও মৌনব্রত অবলম্বন করিলে সাত্যকি তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। সেইজন্য সকলেই সাত্যকিকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহার উত্তরে সাত্যকি বলিয়াছিলেন;—

"অপিচায়ং পুরাগীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।
ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয় ইতি যদ্ব্রবীষি প্লবঙ্গম।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎ স্যাৎ কর্ত্তব্যমেব তৎ॥"

(দ্রোণপর্ব্ব; ১৪১ অধ্যায় ৪৯)

"পুরাকালে বাল্মীকি এই কথা শ্লোকে রচিয়া গিয়াছেন, (বানরের কথার উত্তরে দশানন বলিয়াছিলেন,) "ওরে বানর? তুই স্ত্রীহত্যা কর্ত্তব্য নহে

বলিতেছিস্, কিন্তু যাহাতে শত্রুগণের পীড়া জন্মে, তাহা করাই কর্ত্তব্য।" এস্থলে ইহাও কি প্রক্ষিপ্ত? ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইরূপ প্রমাণ মহাভারতের অন্যত্রও অনেক আছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, রামায়ণের আভ্যন্তরীণ প্রমাণে ও মহাভারতে রামায়ণের প্রাচীনতা স্বীকৃত। ইহা ভিন্ন ভারতীয় সমস্ত পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতিতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রামায়ণের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত। তথাপি অনেক য়ুরোপীয় আপনাদের গবেষণা শক্তির অসাধারণ মৌলিকতা দেখাইবার জন্য মহাভারতের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহাদের হেতুবাদের সমালোচনা করিব।

য়ুরোপীয়দিগের প্রথম ও প্রধান হেতুবাদ এই, দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন; সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে এক স্ত্রী এককালীন বহু পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। যুধিষ্ঠিরের সময় এই প্রথা প্রায় তিরোহিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এই প্রথার স্মৃতি তখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। দ্রৌপদীর বিবাহ উপলক্ষে যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, গোতম-গোত্রীয়া জটিলা সাতজন ঋষিকে এবং বৃক্ষসম্ভবা জনৈক মুনিকন্যা দশজন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাই সেই স্মৃতির নিদর্শন। রামায়ণের কোথাও বহু পুরুষের এক ধর্ম্মপত্নীর উল্লেখ নাই। রামায়ণের বিবাহ-প্রথা সুসভ্য সমাজের রুচি-সঙ্গত। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মূল মহাভারত যে সময় রচিত হইয়াছিল, সে সময় ভারতীয় আর্য্য সমাজ অসভ্য অবস্থা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই; কিন্তু যে সময় রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, সে সময় আর্য্যসমাজ সভ্যপদবীতে আরূঢ় হইয়াছিল। সুতরাং মহাভারতই প্রাচীনতর গ্রন্থ ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

ইংরাজী-শিক্ষিত ও য়ুরোপীয় চিন্তায় আবিষ্ট ভারতবাসীদিগের নিকট এই যুক্তি সহজেই অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। য়ুরোপীয়দিগের ধারণা যে, গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মানবসমাজ উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে। চারি সহস্র অথবা পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মানবজাতি যে কখনও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না বা পারেন না। যে মানবজাতি পৃথিবীতে অন্ততঃ দশ লক্ষ বৎসর আবির্ভূত হইয়াছে, সেই মানব জাতি সভ্য হইতে অসভ্য ও অসভ্য হইতে সভ্য অবস্থায় উন্নত ও অবনত হইতেছে। অসভ্য

জাতিকর্তৃক অধ্যুষিত আফ্রিকা ও আমেরিকায় অতীত সভ্যতার ক্ষীণ নিদর্শন অনুসন্ধিৎসুগণের মনে এই সত্যের অস্ফুট আভাসমাত্র প্রদান করিতেছে। ভারতেও প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে সভ্যতার এইরূপ আরোহ ও অবরোহ হইয়াছে। তবে দূরদর্শী ঋষিগণের সমাজ-বন্ধনের ফলে এদেশ একেবারে অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় নাই। সুতরাং পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজ সভ্যতার উচ্চতর চূড়া হইতে অকস্মাৎ একটু অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, একথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদেরই ভ্রান্ত সংস্কার।

বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদ্ ও জীবজগতের তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রাণিমাত্রেরই কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক ভাব বহু পুরুষ সংস্কারাবস্থায় (latent) থাকিয়া অকস্মাৎ এক পুরুষে আবার পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে। মনে করুন্, এক ব্যক্তির কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। সেই বিশেষত্বগুলি তাহার পুত্রে, পৌত্রে, প্রপৌত্রে ও বৃদ্ধ প্রপৌত্রে প্রকাশ পাইল না; শেষে ছয় বা সাত পুরুষ পরে তাহা এক বংশধরে যথাযথভাবে পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইল। রোগাদিও এইরূপ বহুপুরুষ অন্তর এক পুরুষে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Atavism বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে পূর্ব্বজগুণাবতরণ বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন বহুপুরুষ অন্তর এক পুরুষে এইরূপ পূর্ব্বজগুণাবতরণ হয়, সমাজেও সেইরূপ বহুযুগ পরে এক একটি লুপ্তপ্রথা অকস্মাৎ প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় Social atavism বলে। যদি ইহাই সত্য হইত যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে স্ত্রীজাতির বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা হইলে আমরা উহাকে সামাজিক পূর্ব্বজপ্রথাবতরণের একটি উদাহরণমাত্র বলিতাম; মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী একথা বলিতাম না। নিয়োগধর্ম্ম অনুসারে ক্ষেত্রজ সন্তানোৎপাদনের ব্যবস্থা রামায়ণে বড় একটা দেখা যায় না। মহাভারতে উহা দৃষ্ট হয়। এই হেতু-বাদে যদি মহাভারতকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের আর্য্য-সমাজীদিগকেও রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

কিন্তু বাস্তবিকই যুধিষ্ঠিরের সময়ে কি স্ত্রীজাতির বহুভর্তৃকা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল? কখনই না। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে পঞ্চ পাণ্ডবই কৃষ্ণাকে বিবাহ করিবেন,—এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই স্বয়ং দ্রুপদরাজা কখনই বলিতেন না;—

"একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ কচিৎ॥
লোকবেদবিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয়! কস্মাৎ তে বুদ্ধিরীদৃশী॥"

"হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহু পত্নীবিবাহের বিধান আছে, কিন্তু একটি রমণীর বহু পতির কথা ত কস্মিন্ কালেও শুনা যায় নাই। ইহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ, হে কৌন্তেয়, তুমি শুচি ও ধর্ম্মজ্ঞ, এ কাজ তোমার করা কর্ত্তব্য নহে। তোমার এমন বুদ্ধি কেন হইল?"

সেই সময় স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি এই প্রস্তাব শুনিয়াই প্রথমে বলিয়া উঠিয়াছিলেন;—

"অস্মিন্ ধর্ম্মে বিপ্রলব্ধে লোকবেদবিরোধকে"

"লোকাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া এই ধর্ম্ম (রমণীর বহু-বিবাহ) এখন রহিত হইয়াছে।"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যুধিষ্ঠিরের সময় ঐ প্রথা একেবারেই প্রচলিত ছিল না, সুতরাং কেবল জটিলা ও বার্ক্ষীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যুধিষ্ঠির নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে অন্য যুক্তিও দেখাইতে হইয়াছিল। সে যুক্তি এই—

"গুরোর্হি বচনং প্রাহুর্ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞসত্তম।
গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ॥
সা চাপ্যুক্তবতী বাচং ভৈক্ষবৎ ভুজ্যতামিতি।
তস্মাদেতদহং মন্যে পরং ধর্ম্মং দ্বিজোত্তম॥"

"হে ধর্ম্মজ্ঞপ্রধান! লোকে বলে গুরুর বচনই ধর্ম্মসঙ্গত অর্থাৎ গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই ধর্ম্মপালন করা হয়। গুরুগণের মধ্যে মাতাই পরমগুরু। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমাদের সেই জননীই আমাদিগকে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের ন্যায় পাঞ্চালীকে ভোগ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। সুতরাং আমি এই কার্য্যকে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকার্য্য মনে করিতেছি।" কুন্তীও তাঁহার বাক্য যাহাতে মিথ্যা না হয়, সেজন্য ব্যাসদেবকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন। সুতরাং বেদব্যাস ঐ বিবাহের অনুমোদন করিলেন।

বিরুদ্ধবাদিগণ একটা কথা বলিয়া থাকেন। দ্রুপদের কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন;—

"পূর্ব্বেষামানুপূর্ব্ব্যেণ যাতং বর্ত্মানুযামহে"

এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মগণ যে পথে গিয়াছেন আমরা সেই পথেই যাইব। থিওডোর গোল্ডষ্টুকার ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, We follow the path which has been trodden by our arcestors। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো শ্রীযুত সি. ভি. বৈদ্য ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, This is our family custom. মূল হইতে গোল্ড-ষ্টুকার ancestor ও শ্রীযুত বৈদ্য family custom বা 'কৌলিকপ্রথা' একথা কোথায় পাইলেন? উক্ত উক্তির পর দিন বেদব্যাসের সম্মুখে যুধিষ্ঠির তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বা বংশের মধ্যে বহু স্বামীর এক পত্নী বিবাহের একটি দৃষ্টান্তও দেখাইতে পারেন নাই। তিনি অতি পূর্ব্বকালের প্রচেতা নামে দশজন তপস্বী ভ্রাতা বৃক্ষসম্ভবা এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, আর সাত জন ঋষি গৌতম-বংশীয়া জটিলা নাম্নী তপস্বিনীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন এই মাত্র বলিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রবংশের অন্য কোনও রাজার এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই। সেই জন্য মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ 'পূর্ব্বেষাং' অর্থে "প্রচেতঃ-প্রভৃতীনাম্" লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও একটা আপত্তি আছে। ইহাতে "আনুপূর্ব্ব্যেণ" একথার সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকে না। কারণ জটিলা বা বার্ক্ষীর দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী জনগণ ক্রমাগতই ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয় না। বরং উক্ত চরণের অর্থ উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত যোজনা করিলে ভাল হয়। ইহার পরই যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন :—

"এবঞ্চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতম্"

"আমাদের মা এই কথা বলিয়াছেন,—আমারও ঐরূপ কার্য্য করিতে মন হই-য়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তীরা বরাবরই গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন এবং সেই আজ্ঞা প্রতিপালনকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাদের ক্ষুণ্ণ মার্গে যাইব,—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, ইহাই যুধিষ্ঠিরের 'পূর্ব্বেষামানুপূর্ব্ব্যেণ যাতং বর্ত্মানুযামহে' এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। পাণ্ডব-বংশে যদি বহু ভ্রাতার এক পত্নী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে দ্রুপদ প্রভৃতির তাহা অজ্ঞাত থাকিত না। মহাভারতে যত রাজবংশ ও অন্যান্য বংশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে আর কোথাও কোনও রমণীর বহুবিবাহের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। স্বয়ং বেদব্যাস দ্রুপদকে একান্তে স্পষ্টই বুঝাইয়াছিলেন যে, শঙ্করের বরপ্রভাবেই কৃষ্ণা এককালীন পঞ্চস্বামীর পত্নী হইবেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া দ্রুপদ বলিয়াছিলেন ;—

"যদি চৈবং বিহিতঃ শঙ্করেণ ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বা নাত্র মমাপরাধঃ।
গৃহ্ণন্তি মে বিধিবৎ পাণিমস্যা যথোপজোষং বিহিতৈষাং হি কৃষ্ণা॥"

ইহার অর্থ—"ভগবান্ শঙ্কর যখন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন পঞ্চপতির জন্যই যখন কৃষ্ণার উদ্ভব হইয়াছে, তখন এই কায ধর্ম্মসঙ্গত হউক বা না হউক, ইহার অনুষ্ঠানে আমার কোনও অপরাধ নাই।"

আর এক কথা। বেদব্যাসের অনুমোদনে বহু রাজগণের সম্মতিক্রমে পঞ্চ পাণ্ডবদিগের সহিত যথাবিধি মন্ত্রপূর্ব্বক বিবাহিতা হইলেও দ্রৌপদী সর্ব্বসম্মতিক্রমে কথনই কুলললনার সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন নাই। শত্রুপক্ষ, বিশেষতঃ দুর্য্যোধন প্রভৃতি ও সাধারণ প্রকৃতিবর্গ, তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক 'কানাঘুষা' করিত। যদি তিনি কুলবধূর সম্যক্ সম্মান পাইতেন, তাহা হইলে দুর্য্যোধনের রাজসভায় দুঃশাসন কথনই তাঁহাকে বর্ব্বরোচিত লাঞ্ছনা করিতে সাহসী হইত না। কর্ণ সভামধ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন "হে কুরুনন্দন! দেবতারা স্ত্রীলোকের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন; কিন্তু এই পাঞ্চালী অনেকের বশগামিনী হওয়াতে বন্ধকী বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, সুতরাং আমার বিবেচনায় ইহার সভাস্থলে আনয়ন বা একাম্বরধারিতা অথবা বিবস্ত্রা কিছুই বিচিত্র নহে।" বেদব্যাস যে দ্রৌপদীর বিবাহের বিধান দিয়াছিলেন, ধৌম্য যে দ্রৌপদীর বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, সভামধ্যে, রাজগণের মধ্যে, যে দ্রৌপদীর বিবাহ যথাবিধি নিষ্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র যে দ্রৌপদীকে আপনার বধূগণের মধ্যে প্রধানা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, কর্ণ সভামধ্যে সেই 'দ্রৌপদী বন্ধকী বা বারনারী বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন' একথা বলিতে কেন সাহসী হইয়াছিলেন? এই উক্তিতেই এরূপ বিবাহ তখন সমাজে একেবারেই অপ্রচলিত ছিল, ইহা সপ্রমাণ হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—যুধিষ্ঠিরের সময়ে যদি সত্য সত্যই স্ত্রীজাতির বহু পতি বিবাহপ্রথা সমাজে অবাধে চলিত, তাহা হইলেও আমরা তদ্দারা মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী এ সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম না। কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বহুশতাব্দীর লুপ্ত পদ্ধতি এক এক বার আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহাও হয় নাই। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর সহিত উদ্বাহ বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ ব্যবস্থা। সেই জন্য অধ্যাপক লাসেন পাণ্ডবের বৃত্তান্তকে রূপক মাত্র নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কারণ বৈদিকযুগের আশ্বলায়ন, মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ বিবাহের বিধান একেবারেই নাই। মহাভারতেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র

একটি ; সুতরাং ঐরূপ একটি বিশেষ ব্যাপারের হেতুবাদে মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে প্রয়াস পাওয়া বাতুলতা মাত্র।

ইহা ভিন্ন রামায়ণের সময়ে প্রচলিত আচার-ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার সহিত মহাভারতের সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় অবস্থার তুলনা করিলে রামায়ণেরই প্রাচীনত্ব অনুভূত হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার পর্য্যালোচনা-কালে আমি তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

সুতরাং সপ্রমাণ হইল যে, রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণ কতদিনের প্রাচীন, তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছি, মহাভারতের কালনির্ণয় যত সহজ, রামায়ণের কালনির্ণয় তত সহজ নহে। শ্রীযুক্ত বৈদ্য তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, জনৈক হিন্দু জ্যোতিষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মিবার ১ কোটী ২৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ১০১ বৎসর পূর্ব্বে রামরাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই গণনায় কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা সম্ভবে না। পুরাণাদিতে কালের যে গণনা দৃষ্ট হয়, তাহাই অতি-রঞ্জিত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। অনেকগুলি পুরাণের মতে রামচন্দ্র ত্রেতার শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যদি তাহাও সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বলিতে হয় যে, সমস্ত দ্বাপর ও কলির গত অব্দগুলি একত্র করিলে যত বৎসর হয়, তত বৎসর পূর্ব্বে রাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাণমতে দ্বাপরযুগাব্দ ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বৎসর। ইহার উপর কলির গত পঞ্চ সহস্র বর্ষ যোগ করিলে ৮ লক্ষ ৬৯ হাজার বর্ষ হয়। সুতরাং সাধারণ হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, রামায়ণ ৮ লক্ষ ৬৯ হাজার বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ। পক্ষান্তরে ভালবয়স হুইলার নামক জনৈক অতিবুদ্ধি ইংরাজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অর্থাৎ গাজনীর মামুদ ভারত আক্রমণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন ইহার মধ্যে কাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ্য বলিয়া স্বীকার করিব?

দেখা যাউক, রামায়ণ হইতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভবে কি না? রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডে উহা কোন যুগে লিখিত, তাহার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে যুগের একটু আভাস মাত্র পাওয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণপুত্রের অকালে মৃত্যু ঘটাতে তাহার পিতা চীৎকার করিতে করিতে রাজদ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া নারদ-প্রমুখ কতকগুলি ঋষিকে ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর

কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে নারদ বলেন যে, বর্ত্তমান যুগে শূদ্রের তপস্যার অধিকার নাই,—কিন্তু তোমার রাজ্যের সীমান্তে শূদ্র তপস্যা করিতেছে, সেই পাপে ব্রাহ্মণবালকের এই অকাল-মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই উপলক্ষে দেবর্ষি নারদ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বর্ণের তপস্যাধিকারের কথা বলিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে দেবর্ষি বলিয়াছিলেন—

"ততঃ পাদমধর্ম্মস্ত দ্বিতীয়মবতারয়ৎ
ততো দ্বাপরসংখ্যা সা যুগস্য সমজায়ত ॥"

তাহার পর (অর্থাৎ ত্রেতাযুগের অবসান হইলে পর) অধর্ম্মের দ্বিতীয় পাদ বাহির হইল, তাহার ফলে দ্বাপর যুগের উদ্ভব হইয়াছে। পাঠক দেখুন, এখানে "অবতারয়ৎ" ও "সমজায়ত" উভয় ক্রিয়াপদই অতীতকালবাচক। তাহার পর শ্লোকেই আবার আছে—

"তস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যে তু বর্ত্তমানে যুগক্ষয়ে
অধর্ম্মশ্চানৃতঞ্চৈব বর্ধে পুরুষর্ষভ ॥"

"হে পুরুষর্ষভ—সেই যুগ (ত্রেতা) ক্ষয় হইলে পর দ্বাপর যুগ বর্ত্তমান হইলে অধর্ম্ম ও মিথ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।" 'বর্ধে' অতীত কাল। অবশ্য এই শ্লোকে 'বর্ত্তমানে' এই কথাটি যুগক্ষয়ের সহিত ও তস্মিন্‌টি দ্বাপর সংখ্যের সহিত অন্বয় করিয়া তর্ক উপস্থিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে পরের শ্লোকের সহিত বিষম বিরোধ জন্মে। পরের শ্লোকেই আছে,—

"অস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যাতে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশৎ।
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ক্রমাদ্বৈ তপ আবিশৎ ॥"

এই দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ তপস্যাধিকার পাইয়াছে; তিন যুগে ক্রমে তিন বর্ণের তপস্যাধিকার জন্মিয়াছে। এই শ্লোকে 'অস্মিন্' শব্দ ও ক্রিয়াপদগুলির কাল লক্ষ্য করা আবশ্যক। তাহার পর আবার—

"হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
ভবিষ্যচ্ছূদ্রযোন্যাং হি তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে ॥
অধর্ম্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ।
স বৈ বিষয়পর্য্যন্তে তব রাজন মহাতপাঃ ॥
অদ্য তপতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম্।"

হে নৃপশ্রেষ্ঠ "আপনার রাজ্যে শূদ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, কলিযুগে ভবিষ্যৎ শূদ্রজাতির তপশ্চর্য্যায় অধিকার জন্মিবে। হে রাজন্! দ্বাপর যুগে শূদ্রজাতির তপশ্চর্য্যা পরম অধর্ম্ম, তোমার রাজ্যের শেষ সীমায় শূদ্র মহৎ

তপস্যা করিতেছে। এই সময় সেই দুর্ব্বুদ্ধি তপস্যা করিতেছে, সেই জন্য এই বালক মরিয়াছে।" ইত্যাদি। পাঠক এস্থলে দেখুন, কলিযুগের কথা ভবিষ্যৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার পরেই উক্ত হইয়াছে, "দ্বাপরে শূদ্রের তপশ্চর্য্যা অধর্ম্ম; অদ্য কোন দুর্ব্বুদ্ধি শূদ্র তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে" ইত্যাদি কথায় বুঝা যায়, দ্বাপরে রামের রাজসভায় এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব রামায়ণ হইতে বুঝা গেল যে দ্বাপরে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হন ও রামায়ণ রচিত হয়।

মহাভারত হইতেও ঐ রূপ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমন্তপঞ্চক বর্ণন হইতে আমার এই প্রবন্ধে যে শ্লোক দুইটি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পাঠে জানা যায় যে, ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে পরশুরাম ক্ষত্রিয়গণকে বার বার ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পরে পরশুরাম যখন শান্তমূর্ত্তি ধরিয়াছেন এবং ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখনই রাম তাঁহার দর্পচূর্ণ করেন। সুতরাং তখন যুগসন্ধি অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপস্থলে ইহাকে দ্বাপরের ঘটনা অনুমান করা অসঙ্গত হইতে পারে না; বিশেষতঃ পরশুরাম যখন তপস্বী, তপস্যা দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন। সুতরাং যুগসন্ধির পরই এই ঘটনা সঙ্ঘটনের সম্ভাবনা। মহাভারতের বনপর্ব্বে যে স্থলে রামকথা বর্ণিত আছে, সে স্থলেও উহা ত্রেতার ঘটনা এরূপ উল্লেখ নাই। উহা 'পুরাতন ইতিহাস' এইমাত্র উক্ত আছে। বনপর্ব্বের ভীম-হনুমৎ সংবাদেও যে রামরাবণের যুদ্ধ ত্রেতাযুগের ব্যাপার একথা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণেও কোন যুগের উল্লেখ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে স্বতঃই মনে হয় যে মূল রামায়ণ দ্বাপরেই রচিত হইয়াছিল।

মহাভারত রচনার কত বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে তাহার অনুমান করা সম্ভব নহে। তবে বিষ্ণুপুরাণের বংশতালিকাদি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, রাম হইতে কৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে ইহাই আমার ধারণা। রামায়ণের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ৪৫১০ অব্দ।†

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

† প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল বলিয়া এ সম্বন্ধে অন্যান্য যুক্তির অবতারণা করিতে পারিলাম না, সময়ান্তরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

ইংলণ্ড।

(২)

বিলাতের সুবিধার কথা কিছু বলিয়াছি, অসুবিধার কথাও কিছু বলিব। প্রধান অসুবিধার বিষয় গতবারে আভাস দিয়াছি—সেখানে পয়সার মূল্য বড় কম। আমাদের দেশে সচরাচর যাঁহাদিগকে বড়লোক বলা যায়, ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের তুলনায় তাঁহারা গরীব ভিন্ন কিছুই নহেন। যে দেশে একটা দেশালাইয়ের বাক্সের দাম চারি পয়সা, সে দেশে আমাদের মত মধ্যবিত্ত লোক যে দরিদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এতদ্ভিন্ন সে দেশে বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না। আমরা এদেশে কত কায বিনা খরচে চালাই, তথায় সব জিনিষেরই মূল্য আছে। দরজায় গাড়ী থামিলে কোথা হইতে একজন ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে, তাহাকে অন্ততঃ এক পেনি বা চারি পয়সা দাও। কাহাকেও একখানা গাড়ী ডাকিয়া দিতে বল, সে এক পেনি পাইবার আশা করিবে। তাহা না দিলে নিন্দিত হইতে হয়। থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে বাস্তবিকই শারীরিক ক্রিয়ার জন্য পয়সা দিতে হয়। কোথাও গিয়া ওভারকোট খুলিয়াছ, আসিবার সময় ভৃত্য কোটটি ধরিয়া পরাইয়া দিল, তাহারও কিছু প্রত্যাশা।

তাহার পর লণ্ডনে রবিবারে ডাক বিলি হয় না। সভ্যজগতে আর কোথায়ও এ নিয়ম আছে কি না জানি না, কিন্তু পূর্ণ একদিন ডাক বন্ধ রাখা যে কত অসুবিধাজনক তাহা বেশ বুঝা যায়। বিশেষ ধরুণ যদি ভারতবর্ষীয় ডাক শনিবার রাত্রিতে বিলম্বে পৌছায়, তবে লণ্ডনস্থ সকলে সোমবারের পূর্ব্বে চিঠি পাইবে না, কিন্তু লণ্ডনের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে রবিবারেই ডাক বিলি হইবে, এ বড় চমৎকার ব্যবস্থা।

ধোপা ও নাপিতের খরচ লণ্ডনে অত্যন্ত বেশী। সাধারণতঃ একটি সার্ট কাচিতে ।৵০ ছয় আনা, একখানি রুমাল কাচিতে ⁄১০ আনা এবং একখানি কলার কাচিতে ৵০ আনা লাগে। নাপিত দাড়ি কামাইতে ।০ আনা ও চুল ছাটিতে ॥০, ॥৵০ লয়। বড় ফ্যাসানেব্‌ল্ জায়গায় অবশ্য ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক খরচ।

ইংলণ্ডের থিয়েটারের প্রশংসা অনেকদিন হইতে শুনিতাম। পূর্ব্বেই এত অধিক প্রশংসা শুনিয়াছিলাম যে, প্রথম দিন বাস্তবিকই হতাশ হইয়াছিলাম; কারণ কল্পিত আদর্শটাকে এত উচ্চ করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, বস্তুবটা কিছুতেই তাহার নিকট পৌছিতে পারে না। তবে ক্রমে উপলব্ধি হইয়াছিল যে, বাস্তবিকই লণ্ডনের থিয়েটার প্রশংসনীয়। থিয়েটারের কিছু বিবরণ দিব। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে একটা কথা বলিয়া রাখি; থিয়েটার দেখিতে গিয়া ইংরাজজাতির সহজ সরলতায় মুগ্ধ হইতে হয়। উহারা যেরূপ সব simple situationsএ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, উহাদের রূক্ষ ভাবটা একেবারেই বাহিক, উহাদের অভ্যন্তর খুবই কোমল। আর থিয়েটার দেখিতে গিয়া লক্ষ্য করা যায়, বয়সের বিপরীত অনুপাতে রমণীর বেশভূষা। যাহার বয়স যত অল্প, তাঁহার পোষাক তত সাদাসিধা। অতি বর্ষিয়সী রমণীদের প্রায়ই রেশমের পোষাক; স্বর্ণরৌপ্যবিমণ্ডিত। ইহাতে কি তাঁহারা নিতান্তই আপনাদের বয়সের দিকে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করেন না!

লণ্ডনে প্রায় ত্রিশটি থিয়েটার আছে। তদ্ভিন্ন প্রায় ১০টি মিউজিক হল। থিয়েটারে রবিবার ভিন্ন প্রত্যহ অভিনয়। বুধ ও শনিবারে প্রায়ই দুইবার অভিনয় হয়। রাত্রি ৮টা ৮॥০ টায় আরম্ভ হইয়া ১১টায় অভিনয় বন্ধ হয়। বুধ ও শনিবারের অতিরিক্ত অভিনয় ২॥০টা ৩টা হইতে ৫টা ৬টা পর্য্যন্ত চলে। নিত্য নূতন পুস্তকের অভিনয় হয় না। প্রায় একই নাটক প্রত্যহ অভিনীত হয়। হয়ত কোনও একখানি নাটক এক বৎসর দেড় বৎসর ধরিয়া প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে, অথচ প্রত্যহই লোকারণ্য, পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ না করিলে স্থানাভাবে ফিরিতে হয়। টিকিটের মূল্য ১ শিলিং হইতে ১০॥০ শিলিং। অবশ্য বক্সের আরও অধিক দাম, দুই, তিন, পাঁচ গিনি! সর্ব্বনিম্ন দুই শ্রেণী (গ্যালারি ১ শিলিং ও পিট ২॥০ শিলিং) ভিন্ন সর্ব্বত্রই অগ্রে স্থান ভাড়া করা যায়। এই ভাড়া করার জায়গা লণ্ডনের প্রত্যেক রাস্তায় অনেকগুলি করিয়া আছে। ভাল ভাল অর্থাৎ বেশী popular অভিনয়ের জন্য ৪।৫ দিন অথবা তাহারও পূর্ব্বে স্থান ভাড়া না করিলে আসন পাওয়া যায় না। টিকিটে নম্বর দেওয়া থাকে, সেই নম্বর দেখিয়া চেয়ারে বসিতে হয়। অনেক সময় কত লোক অনেকগুলি টিকিট কিনিয়া রাখে, পরে অভিনয়ের রাত্রিতে হয়ত দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ দামে দর্শকগণের নিকট বিক্রয় করে।

থিয়েটার দর্শকদিগের জন্য অনেক Opera glass রক্ষিত থাকে। প্রত্যেক

সারির দর্শকদিগের জন্য সম্মুখের সারির চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগে কৌটার ন্যায় আধারে Opera glass সংরক্ষিত। একটি ছয় পেনি ফেলিয়া দিলে কৌটা আপনিই খুলিয়া যায়। পরে অভিনয়ান্তে দর্শক Opera glass যথাস্থানে রাখিয়া থাকেন। প্রোগ্রাম দাম দিয়া কিনিতে হয়, বিনামূল্যে দেয় না। দাম আবার একই প্রোগ্রামের সর্ব্বত্র সমান নহে। যে প্রোগ্রাম গ্যালারিতে এক পেনিতে পাওয়া যায়, ষ্টলে তাহারই দাম ছয় পেনি। বক্সে কত দাম জানি না। অভিনয়ের সময়ে দর্শকদিগের বসিবার স্থানে আলোক থাকে না। প্রত্যেক অঙ্কের অভিনয়ের পূর্ব্বে আলোক নির্ব্বাপিত হয়। কাযেই দর্শকদিগের পরস্পরের কথোপকথনের গুঞ্জন খুব কমই শ্রুত হয়। দুই অঙ্কের অভিনয়ের অবকাশকালে শুভ্রবেশপরিহিতা পরিচারিকাগণ চা, কফি, চকোলেট প্রভৃতি বিক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন মদ্য ও ধূমপানের ব্যবস্থা আছে। চকোলেট খাওয়াটা ইংরাজ জাতির বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের একটা রোগের মধ্যে। যখন তখন এবং যত ইচ্ছা চকোলেট ইহারা খায় এবং খাইতে পারে, ইহাতে বয়সে কিছু বাধে না। আবালবৃদ্ধ সকলেই চকোলেট খায়। এক একটা থিয়েটারে আমাদের দেশের রঙ্গালয় অপেক্ষা অনেক অধিক দর্শকের স্থান হয়। পিট ও গ্যালারিতে স্থান পাইতে হইলে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা আগে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। পুলিস দুইজন করিয়া সার গাঁথিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। টিকিট-ঘর খুলিলে একে একে গিয়া টিকিট কিনিয়া স্থান অধিকার করিতে হয়। হয়ত টিকিট-ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া সার সে রাস্তা পার হইয়া অন্য রাস্তা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড সর্পের ন্যায় লম্বমান। এই সারকে queue বলে। শুনিয়াছি কোনও কোনও নাটকের প্রথম অভিনয় উপলক্ষে লোকে ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সার গাঁথে, সেই রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া পান ভোজন সবই সমাধা করে, কেহ কেহ বা বাড়ী হইতে ক্যাম্প টুল প্রভৃতি লইয়া গিয়া শ্রান্তি অপনোদন করে, কেহ বা লোক ভাড়া করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে, পরে নিজে যথাকালে উপস্থিত হয়। থিয়েটারের মঞ্চগুলিও অতি প্রকাণ্ড; একসঙ্গে বহু লোকের স্থান হয়। আমি একটা অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তাহাতে একখানি মটরগাড়ী আনিয়া দেখায়, দশ বারটা ঘোড়া রঙ্গমঞ্চের উপর ঘোড়দৌড় করে এবং একটা রেলওয়ে এঞ্জিন একটা পুরাদস্তুর Horse-boxএর উপর আসিয়া পড়ে এবং সমস্ত চুরমার হইয়া যায়। সত্যমিথ্যা জানি না, শুনিয়াছিলাম এই অভিনয়ে প্রতি রজনীতে ১২০০, ১৫০০ টাকা খরচ হয়। বাস্তবিক দৃশ্যসৌন্দর্য্য অতি অসাধারণ ও অনিন্দ্যসুন্দর।

আমি সেক্সপিয়ারের Henry VIII অভিনয় দেখিয়াছিলাম। যে সময়ের ঘটনা অভিনীত পরিচ্ছদ প্রভৃতি ঠিক সেই সময়ের; এবং যে সব অভিনেতা অভিনেত্রী ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই সেই ব্যক্তির ন্যায় চেহারাও করিয়াছিলেন। বাস্তবিক রঙ্গমঞ্চে রাজা হেন্‌রিকে যেন ন্যাশানাল গ্যালারী চিত্রালয়ের হেনরীর সজীব সংস্করণ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

যত অভিনয় দেখিয়াছিলাম, দুইটি গার্হস্থ্য নাটক আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু সে দুটিতে দর্শকের তত ভিড় দেখিলাম না। ইংরাজ-জাতি স্নিগ্ধ গম্ভীর অভিনয় ভালবাসে বলিয়া বোধ হইল না।

আমি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অনেকেরই অভিনয় দেখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে সার চার্লস উইণ্ডহাম, সার হার্বার্ট ট্রি, বুরশিয়ার এবং ডুমরিয়ারের অভিনয় আমার নিকট সর্ব্বোত্তম মনে হইয়াছিল, বিশেষতঃ উইণ্ডহামের। এমন সহজ সুন্দর অভিনয় আমি খুব কমই দেখিয়াছি। দেখিলে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশের এক ষ্টার থিয়েটারের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর অভিনয়ে ঐ সহজ ভাব পরিলক্ষিত হয়। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে অমৃতবাবুর অভিনয় দেখিতাম। উইণ্ডহামকে দেখিয়া অমৃতবাবুর কথা খুব মনে পড়ে। Mannerismএর একান্ত অভাব, যাহা আছে তাহা ঠিক অমৃতবাবুর মত।

য়ুরোপে থিয়েটার ভিন্ন মিউসিক হল নামক আর একরূপ প্রমোদ-গৃহ আছে। তথায় নাটক অভিনীত হয় না, যাহা কিছু অভিনয় হয় তাহাও কেবল ভাবভঙ্গীতে; অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গ বাক্যস্ফুরণ করে না, শুধু হাবভাবে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেয়। তদ্ভিন্ন মিউসিক হলে গান, নাচ, ম্যাজিক, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি দেখায়। এইজন্য উহার আর এক নাম Variety Stage বৈচিত্র মঞ্চ। এই সব স্থলে দর্শকদিগের বসিবার ও বেড়াইবার স্থান থাকে, অনেকে সমস্তক্ষণ পদচারণা করে। এই মিউজিক হলগুলি কুপথগামী স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনস্থান। সে চিত্রের পরিচয়ে আর কায নাই।

এই থিয়েটারের প্রসঙ্গে আলবার্ট হলের বর্ণনা করিতে হয়। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ত্রিশ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে এই প্রকাণ্ড গোলাকার হল নির্ম্মিত। দশ হাজার লোক ইহাতে স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। লণ্ডনের বড় বড় রাজনৈতিক সভা এবং সঙ্গীতবৈঠক এই হলে হয়। এই দালানে প্রায় ৯০০০ পাইপযুক্ত একটি প্রকাণ্ড অর্গ্যান আছে। সমবেত

ব্যক্তিবর্গের পাদচারণের স্থানও আছে। রাজার প্রবেশদ্বার, বসিবার ঘর প্রভৃতি স্বতন্ত্র। এই হল দেখিতে তিন পেনী দর্শনী দিতে হয়। পৃথিবীতে এত বড় সভাগৃহ খুব কমই আছে। অথচ ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, মঞ্চের উপর বক্তৃতা করিলে অল্প আয়াসে সকল শ্রোতাই বক্তার কথা শুনিতে পায়; আমাদের সেনেট হাউসের মত নহে। মঞ্চটির উপরেই সহস্র ব্যক্তির স্থান হয়। দর্শকদিগের জন্য বসিবার আসন আছে। রক্ষীর নিকট শুনিলাম যে, বল নাচ বা Charity performance উপলক্ষে আসন সরাইয়া ফেলা হয়; তখন বার হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়।

এলবার্ট হলের সম্মুখেই কেনসিংটন উদ্যানের এক অংশে Albert Memorial বিদ্যমান। প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের নিম্নে প্রিন্স আলবার্টের ১৩ ফুট উচ্চ ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে নানাদেশীয় কবি, চিত্রকর, শিল্পী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি; চারিকোণে কৃষি, বাণিজ্য, স্থাপত্য ও উৎপাদকশিল্পের কল্পিত মূর্ত্তি। নিম্নে মর্ম্মরসোপান ও সর্ব্বনিম্নে য়ুরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার রূপক মূর্ত্তি। ১৮ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে এই স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মিত।

অন্য কিছু বলিবার পূর্ব্বে আজ ইংলণ্ডের যানাদি সম্বন্ধে কিছু বলিব। টিউব রেলওয়ে বা ভূমধ্যস্থিত বৈদ্যুতিক গাড়ী সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। ইহাই লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত যান এবং ইহার দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও স্বল্পসময়সাপেক্ষ। সকলেই জানেন যে, লণ্ডন খুব বড় সহর এবং ইহার প্রসার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এখন ভূমধ্যস্থিত গাড়ীর ৮।১০টি লাইন লণ্ডনে আছে এবং তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল। সহজেই বুঝা যায়, লণ্ডনের এক অংশ হইতে অংশান্তরে যাওয়ার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। লণ্ডন অবশ্য টেমস নদীর দুই তীরেই বিস্তৃত। কিন্তু টেমসের দক্ষিণ বা সহরের দিকের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প কর্ম্মকোলাহলকলম্বিত। ঐদিকে দুইটি মাত্র টিউব রেলওয়ে আছে। দুইটিরই অবশ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র tunnel বা সুড়ঙ্গ আছে। তদ্ভিন্ন ‘পদ্যপাঠের’ সেই “উপরে জাহাজ চলে নিম্নে চলে নর” সে সুড়ঙ্গ ত আছেই। মোট এই তিনটি সুড়ঙ্গ নদীর নিম্নে আছে।

এই স্থলে বলা উচিত যে, প্যারিসেও এইরূপ ভূমধ্যস্থিত রেলওয়ে আছে এবং তথাকার লাইন সমস্তই বৈদ্যুতিক আলোকমালায় আলোকিত। লণ্ডনের রেলপথগুলি অন্ধকার, কেবল গাড়ীর মধ্যে খুব আলো থাকে। দুই একটি লাইনে অত্যন্ত শব্দ হয়, গাড়ীর ভিতর কথোপকথন একরূপ অসম্ভব, তবে সব লাইনে

এরূপ নহে। কেহ কেহ বলেন যে, এই সব ভূমধ্যস্থিত গাড়ীতে দম আটকানর মত ভাব হয়। আমার সেরূপ কিছু হয় নাই। তাহার পর রেলগাড়ী। রেল-ওয়ে সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, লণ্ডনে যতগুলি লাইন আছে, সকলেরই সীমান্ত ষ্টেশন লণ্ডনের খুব জনাকীর্ণ ও কর্ম্মবহুল অংশে; আমাদের দেশের ন্যায় সহরের এক-প্রান্তে নহে। কোথাও সুড়ঙ্গ কাটিয়া কোথায়ও বা রাস্তার খুব উচ্চে পুলের ন্যায় গাঁথিয়া তাহার উপর দিয়া রেলওয়ে লাইন সহরের মধ্যে আসিয়াছে। লণ্ডন হইতে ১০।১২টি বড় বড় রেলওয়ে লাইন ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র গিয়াছে। ইহাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন সীমান্ত ষ্টেশন আছে, তন্মধ্যে ৮।৯টি প্রধান। ইংলণ্ডের বাহিরে য়ুরোপীয় মহাদেশে যাইবার প্রধান ষ্টেশন তিনটি—চেয়ারিং ক্রশ, ভিক্টো-রিয়া ও ওয়াটার্লু। এই তিনটি পরস্পর খুব সন্নিকট। সব ষ্টেশনই খুব প্রকাণ্ড; প্রায় সকল ষ্টেশনেই ১২।১৪টি প্ল্যাটফর্ম্ম এবং পাচ সাত মিনিট অন্তরই ট্রেণ ছাড়ে। আমাদের দেশে ষ্টেশনের বাহিরে মাত্র দুইটি লাইন, একটি আপ্‌ট্রেণ ও একটি ডাউন ট্রেণের জন্য, বিলাতে প্রায়ই ৫।৬টি লাইন; এক সঙ্গে ২।৩ খানা আপ্‌ট্রেণ ও ২।৩ খানা ডাউন ট্রেণ লাইনের উপরে চলে। অবশ্য লণ্ডন হইতে দূরে গেলে প্রায়ই দুইটিমাত্র লাইন। কিন্তু এই ভয়ানক ট্রেণের ঘেঁসাঘেঁসিতে লণ্ডনের কাছাকাছি জায়গায় লাইনের অবস্থান ঠিক রাখা যে কি সাবধানতার পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। বড় বড় গ্রাম বা সহরের জন্য অনেক বিশেষ ট্রেণ আছে। সে সব ট্রেণ লণ্ডন হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে সেই সব স্থানে থামে; কখনও কখনও বা দুই এক খানি গাড়ী চলন্ত ট্রেণের পশ্চাদ্ভাগ হইতে কোনও গ্রামে কাটিয়া রাখিয়া যায়। বার্ম্মিংহামগামী এইরূপ ট্রেণের গাড়ীতে আমি ষ্ট্রাটফোড অন অ্যাভনে গিয়াছিলাম। যখন পথে এক ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী থামিল তখন ট্রেণের এঞ্জিন ও পূর্ব্বাংশ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

রেলে কেবল তিন শ্রেণী। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতেই প্রায় সব যাত্রী যাওয়া আসা করে। ধনীরা বা যাঁহারা একাকী গমনাগমন করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে যাওয়া আসা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রি-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। সেজন্য অনেক ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী প্রায়ই থাকে না। সব শ্রেণীর গাড়ীরই বসিবার বন্দোবস্ত একরূপ, কেবল গদীর চামড়ার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের; তবে যে সব গাড়ী খুব অল্প দূর যায়, তাহাতে আমাদের দেশের suburban বা নগরোপকণ্ঠগামী ট্রেণের মত বেঞ্চ বেত দিয়া ছাওয়া। অন্য গাড়ী ফ্রান্সের গাড়ী যেরূপ লিখিয়াছি সেইরূপ। যে সব ট্রেণ একটু

বেশী দূর যায় অথবা যে গুলি খাওয়া দাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলে, সেগুলিতেই আহারের জন্য গাড়ী থাকে। রাত্রিতে যে সব ট্রেণ একটু বেশী দূর যায় তাহাতে ঘুমাইবার গাড়ী থাকে; এ ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর জন্য এবং তাহাতে ১৫৲ টাকা অধিক দিতে হয়। অন্য শ্রেণীতে কেবল বসিবার ব্যবস্থা; তবে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক যাত্রী কোনও কামরায় লয় না। গাড়ীর স্নানাগারে ঠাণ্ডা ও গরম জল, সাবান, তোয়ালে, শৌচার্থ কাগজ সবই পাওয়া যায়। ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া মাইল পিছু এক আনা (আমাদের দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ ভাড়ার সমান)। রিটার্ণ টিকিট সব শ্রেণীতেই পাওয়া যায়, তবে প্রায়ই ভাড়ার কিছু সুবিধা হয় না। দুই এক স্থলে মাত্র রিটার্ণ টিকিটের ভাড়া যাতায়াতের সাধারণ ভাড়ার কিছু কম। অনেক যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন বলিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে খুব ভাল বন্দোবস্ত। পার্লামেণ্টের অনেক সভ্যও তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া আসা করেন। তৃতীয় শ্রেণীর আর একটি নাম পার্লামেণ্টারি (Parliamentary Class) শ্রেণী। ছুটি অথবা পর্ব্বদিন উপলক্ষে লণ্ডন হইতে অথবা লণ্ডন পর্য্যন্ত Excursion Trains ছাড়ে, তাহার ভাড়া অতিশয় কম; যাতায়াতে অনেক সময় একবারের ভাড়ার অপেক্ষাও কম।

এই ত গেল ট্রেণের অবস্থা। এতদ্ভিন্ন ট্রাম বা ওমনিবাস (চলিত কথায় 'বাস') আছে। দেশের অনেক জায়গায় ওগুলি চলে। লণ্ডনে হিসাবে জানা গিয়াছে যে, বৎসরে লণ্ডনের প্রত্যেক অধিবাসী গড়ে এক শত বারেরও অধিক ট্রামে বা বাসে চড়ে। এগুলি প্রায় আমাদের দেশের গাড়ীরই মত। তবে প্রায়ই দ্বিতল ও ছাতের উপর যাহারা বসে তাহারাই ধূমপান করিতে পারে। সব গাড়ীরই পশ্চাদ্ভাগে দরজা ও তাহার পার্শ্বেই ছাতে উঠিবার ঘুরাণ সিঁড়ি। দূরত্বানুসারে, মাইল খানেকের ভাড়া অর্দ্ধ পেনি বা দুই পয়সা। বাস বা ট্রামের ছাত হইতে সহর দেখার বড় সুবিধা। ট্রামে, টিউবে, রেল ষ্টেশনে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপনের খুব ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপনের জালায় নবাগতের পক্ষে ট্রাম কোথায় যাইবে জানা অনেক সময় কষ্টকর। তবে যে সব নির্দ্দিষ্ট স্থানে ট্রাম থামে, সেই সব স্থানে কণ্ডাকটার গন্তব্য স্থানের নাম হাঁকিয়া জানাইয়া দেয়। বিজ্ঞাপনের মধ্যে ব্রায়াণ্ট ও মের দেশলাইয়ের বিজ্ঞাপনই খুব বেশী; তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের বয়ান Support Home Industries স্বদেশী শিল্প পোষণকর। টেম্‌স্ নদীতে অনেক ষ্টীম-বোট আছে, তাহাতেও অনেক যাত্রী যাতায়াত করেন। ভাড়াও খুব কম।

তাহার পর লণ্ডনের দোকানের কথা। বড় বড় দোকান অতি সুন্দর ভাবে

সাজান। অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক শুধু রাস্তা হইতে দোকান দেখিয়া সময় কাটান ও সখ মিটান। বাস্তবিক রাত্রিতে যখন সব দোকান বন্ধ হয়, তখনও বড় বড় জানালার (plate glass windows) ভিতর দিয়া বিদ্যুতালোকবিভাসিত সুসজ্জিত দোকান পাট দেখিতে অতি সুন্দর। পথিকের মন আপনা আপনি তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, Stores বা জুতা শেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত হয় (অথবা ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে সূচ লইতে হস্তী পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়) এরকম দোকান লণ্ডনে অনেকগুলি আছে। এই সব দোকানের শোভা ও ঐশ্বর্য্য বাস্তবিকই দেখিবার মত। দোকানে ঢুকিলে ইংরাজ যে দোকানদারের জাতি তাহা বেশ বুঝা যায়। একটা সামান্য কিছু জিনিষ চাহিলেও তৎক্ষণাৎ খরিদ্দারের মনের মত জিনিষ জোগাইবার জন্য একটি আগ্রহ দেখা যায়। আমাদের দেশে ভদ্রলোকের দোকানে জিনিষ কিনিতে গেলে বিক্রেতা যেন ক্রেতাতে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন, এ ভাব প্রায়ই দেখা যায়; এখানে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব। একটা চারি পয়সার জিনিষ কিনিতে গেলেও যত বড় দোকানই হউক, বিক্রেতা এরূপ ভাব দেখায় যেন সমস্ত দোকান ধন্য হইতেছে; তাহার পর যদি খরিদ্দারের মনের মত জিনিষ না দিতে পারে তাহা হইলে ক্রেতার ফরমাইস মত দ্রব্য তৈয়ার করাইয়া দিতেও সচেষ্ট হয়। পরে জিনিষ কিনা হইলে আবার তাহা বাটীতে পাঠাইয়া দিবে। তজ্জন্য কোনও আদায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিলাত আমাদের দেশের ন্যায় সমতল নহে, খুব অসমান; কাযেই সব গাড়ীতেই ব্রেক থাকে; ঘোড়ার গাড়ীতেও গাড়োয়ানের হাতের কাছে ব্রেকের হাতল থাকে। উপর হইতে নীচে যাওয়ার সময় সেই হাতল টানিয়া ব্রেক আঁটে। য়ুরোপে এক মিলানো (ইটালির অন্তঃপাতী মিলান) সহরে গাড়ীতে ব্রেক দেখি নাই; তাদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র আছে। এই অসমতার জন্য মধ্যে মধ্যে বড় মজা দেখা যায়। লণ্ডনে একটা খুব লম্বা রাস্তা আছে, তাহার কতক কতক অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এক অংশের নাম Holborn Viaduct (এই রাস্তার উপর প্রসিদ্ধ Tabloid মার্কা ঔষধ-বিক্রেতা Burroughs Wellcome কোম্পানীর দোকান) ইহার নীচে দিয়া খুব চওড়া অন্য এক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। উপর হইতে নীচে নামিবার সিঁড়ি আছে। গাড়ীতে গেলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়।

এই অসমতলতার জন্যই বিলাতে গাড়ীর ঘোড়াগুলি খুব বৃহদাকার ও বলবান। আমাদের দেশের ভাড়া গাড়ীর ঘোড়ার ন্যায় অস্থিচর্ম্মসার পক্ষিরাজনন্দন য়ুরোপে কোথায়ও দেখা যায় না।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

তীর্থযাত্রা।

১

যে বিবিধ উপাদানে মানব-স্বভাব গঠিত হয়, তাহার মধ্যে কবিত্ব ও দার্শনিকত্ব দুইটি আবশ্যক উপাদান। প্রথমটি ব্যঞ্জনে "গরম মসল্লারই" মত; সামান্য সংস্কারে সুখদ, কিন্তু আতিশয্যে বিস্বাদ উৎপাদক। যাহার ধাতুতে কবিত্বের প্রাবল্য থাকে সে আপনিও সুখী হয় না—স্বজনগণকেও সুখী করিতে পারে না; সংসারে তাহার অসুখ অনিবার্য্য। কারণ, সে কল্পনাতেই সুখ পায়—কল্পনাবলে অসম্ভবকে সম্ভব ভাবিয়া যে আদর্শ গঠিত করিয়া রাখে, সংসারে তাহা না পাইয়া পদে পদে বেদনা ভোগ করে; এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বজনগণকেও অসুখী করে। কিন্তু যাহার ধাতুতে দাশনিকতার প্রাবল্য প্রস্ফুট, সে সুখেও যেমন চঞ্চল হয় না—দুঃখেও তেমনই কাতর হয় না; অবস্থান্তর-প্রাপ্তি সে সংসারে অনিবার্য্য বোধে শান্তি পায়। মনোরঞ্জনের ধাতুতে দার্শনিকতার যেমন অভাব ছিল, কবিত্বের তেমনই প্রাবল্য ছিল। কাযেই সংসারে সে সুখী হইতে পারে নাই। সে স্বয়ং সুখী হইতে পারে নাই, আর সঙ্গে সঙ্গে পত্নী সরমাকেও সুখী করিতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ, সে কল্পনার অসম্ভব বর্ণে পত্নীর যে চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, সরমার সহিত সে চিত্রের অধিক সাদৃশ্য ছিল না। সে প্রেমের স্বর্ণবর্ণে পরিণীতাকে রঞ্জিতা দেখিবার পূর্ব্বেই আপনার কল্পনারচিত চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্যের অভাব দেখিয়া হতাশ হইয়াছিল।

এদিকে তরুণী সরমা স্বামীর নিকট যে ব্যবহার পাইবে আশা করিয়াছিল, সে ব্যবহার না পাইয়া বিরক্ত হইল—তাহার হৃদয়ে প্রেম বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই ঔদাসীন্য স্থায়ী হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় সংসার চলিতেছিল। ইহারই মধ্যে মনোরঞ্জনের সংসারে তৃতীয় ব্যক্তি—তাহার জননী—পুত্রকে অসুখী দেখিয়া—সে বেদনার কণ্টক বক্ষে বহিয়া সংসার হইতে চির বিদায় লইলেন। তখন সংসারে কেবল স্বামী ও স্ত্রী—দুই জনে এত নিকটে, তবু এত দূরে!

ইহার অল্পদিন পরে যখন সরমার একটি পুত্র হইল—তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যেন অকূলে কূল পাইল। আত্মজকে পাইয়া—সরমা যেন তৃষ্ণার বারি পাইল; তাহার সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা যেন তৃপ্তি-লাভ করিল। আর পুত্রকে লইয়া সে

সকল দুঃখ ভুলিল দেখিয়া মনোরঞ্জন অসীম তৃপ্তি লাভ করিল; তাহার হৃদয় হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। স্বামিসুখে সরমা সুখী হইতে পারে নাই বলিয়া যেন মনোরঞ্জন আপনাকে অপরাধীর মত মনে করিত; এবার তাহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল। সে যেন মুক্ত হইল। তাহার পিতা বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া যায়েন নাই; যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে একটা ছোট পরিবারের "ভাত-কাপড়ের" অভাব হয় না—এই পর্য্যন্ত। তাহার মধ্য হইতে সে কিছু টাকা একজন বন্ধুকে ঋণ দিয়াছিল এবং বন্ধু ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছিলেন না; সুতরাং মনোরঞ্জনের পক্ষে উপার্জ্জনের উপায় করা আবশ্যক হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এত দিন কোন কার্য্যেই তাহার মন বসে নাই। এবার সে একটা চাকরী লইল।

সরমা পুত্রকে লইয়া ও মনোরঞ্জন চাকরী লইয়া ব্যাপৃত রহিল—উভয়ের হৃদয় হইতে উভয়ে ক্রমেই দূরে যাইতে লাগিল।

২

এই ভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। সরমা ও মনোরঞ্জন এই পাঁচ বৎসরে পরস্পরের নিকট হইতে যথা সম্ভব দূরে গেল, বন্ধন রহিল কেবল পুত্র। এই সময় এক দিন মৃত্যু অতর্কিত ভাবে আসিয়া সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সরমার সর্ব্বনাশ হইল। তাহার শূন্য জীবন ও শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া যে বিরাজিত ছিল—যাহাকে পাইয়া সে পতি-প্রেম-বঞ্চিত দুঃখময় জীবন সুখের মনে করিয়াছিল, যাহাকে লাভ করিয়া সে দারুণ দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও আপনাকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিত, যে তাহার ও মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া তাহাকে জীবনে আকৃষ্ট করিয়াছিল, মৃত্যু যখন তাহাকে লইয়া গেল, তখন তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবার আর কিছুই রহিল না।

কিন্তু বন্ধনবিহীন হইয়া কেহ বাস করিতে পারে না; তাই প্রকৃতি এক বন্ধনের স্থানে আর এক বন্ধন রচনা করেন। এখন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে নূতন বন্ধন রচিত হইল। সে বন্ধন শোকের—সমবেদনার। উভয়েই শোককাতর; কাযেই উভয়ের মধ্যে সমবেদনার বন্ধন সহজেই দৃঢ় হইয়া উঠিল।

শোকে যখন হৃদয় কোমল হয়, তখন তাহাতে সহানুভূতির উৎস স্বতঃই উৎসারিত হয়। মনোরঞ্জনের শোককাতর হৃদয় সহজেই সরমার জন্য বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সরমা সে সহানুভূতিতে শান্তি বা সান্ত্বনালাভ করিতে পারিল না।

পূর্ব্বেই মনোরঞ্জনের সহিত তাহার মনোমালিন্য প্রেমের প্রবাহে বাঁধের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এখন শোকের আবেগেও তাহা অপনীত হইল না। ইহাতে মনোরঞ্জন আরও বিরত হইয়া পড়িল। সরমাকে সুখী করিবার বাসনা—তাহার শোককণ্টকবিক্ষত হৃদয়ে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ ভেষজ-প্রদানের প্রবল কামনা যেন তাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতার মত হইয়া উঠিল। যে মনোরঞ্জন পত্নীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল—তাহার ব্যবহার তাহাকে স্ত্রৈণদলভুক্ত করিবার মত হইয়া উঠিল।

৩

শোকে সান্ত্বনালাভের অন্য উপায় না পাইয়া সরমা প্রাণপণে ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানকে চাপিয়া ধরিল। বারব্রতাদির অনুষ্ঠানে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়া সে শোকজ্বালা প্রশমিত করিতে সচেষ্ট হইল। তাহার সে সকল অনুষ্ঠানে মনোরঞ্জন যথেষ্ট উৎসাহ ও যথাসম্ভব সাহায্য দান করিতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যেই সরমা কোন তীর্থস্থলে যাইয়া বাসের বাসনা ব্যক্ত করিল। মনোরঞ্জন তখন পত্নীর সুখবিধানের জন্য এমনই ব্যস্ত যে এ প্রস্তাবেও সে আপত্তি করিল না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন বন্ধুকে সঞ্চিত অর্থ ঋণ দিয়া সে রিক্তহস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রিক্তহস্তে আয়ের পথ চাকরী ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস অসম্ভব। তাই সে নানারূপ ওজর করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল। ক্রমে যখন ওজর আর চলে না—সত্য বলিতে হয় এমন অবস্থা দাঁড়াইল, সেই সময় একটা অতর্কিত দুর্ঘটনা সরমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। মনোরঞ্জন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

৪

মনোরঞ্জনের শ্বশুর মহাশয় সমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, স্বয়ং কর্ম্মঠ—কৃতী পুরুষ। তিনি অধিকাংশ বাঙ্গালীর অনুসৃত সরল ও সুগম চাকরীর পথ গ্রহণ না করিয়া ব্যবসায়ের গহনে গমন করিয়াছিলেন এবং ভাগ্যগুণে সাফল্যের কল্পতরুর ফললাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সেই সাফল্যে তিনি সমাজে সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। সহসা মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম্মকল্পনার মধ্য হইতে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে লইয়া গেল। তাঁহার পরিবারে যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। সরমা শোকার্ত্তা জননীর সেবা করিতে গেল। তাহার কাশীবাসকল্পনা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জনের কার্য্যেরও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। শ্বশুরালয়ের সহিত মনোরঞ্জনের ঘনিষ্ঠতা বা শ্বশুরালয়ে জামাতার প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না; তাহার কারণ যাহার জন্য সে সকল সম্ভব হয়, সেই পত্নীর সহিত তাহার ব্যবহার তাহার শ্বশুরালয়বাসিগণের মনোমত ছিল না। এবার এই আকস্মিক বিপদে মনোরঞ্জন শ্বশুরালয়ের সহিত একটু অধিক ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। সেইরূপ ব্যবহারে সরমাকে সুখী করাই তাহার উদ্দেশ্য।

তাহার এই ঘনিষ্ঠভাব তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক সুধীরের পক্ষে ঈপ্সিত অবলম্বনের মত হইল। সকলেই তাহাকে বলিতেছিলেন—ব্যবসা গুটাইয়া ফেল—টাকাগুলায় কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া নিশ্চিন্ত হও। এই প্রস্তাবটা প্রলোভনীয় হইলেও তাহার পক্ষে অসম্ভব—কেন অসম্ভব সে তাহা কাহাকেও বলিতে পারিতেছিল না। এখন মনোরঞ্জনের ভাব দেখিয়া সে মনোরঞ্জনকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। মনোরঞ্জনের শ্বশুর ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে যে প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল—তিনি "ব্যোম" ধরিবার আশায় "গোলাম পাড়িয়া" খেলিয়াছিলেন। মনোরঞ্জন সব শুনিল; বুঝিল—এখন ব্যবসা গুটাইলে হাতে কিছুই থাকিবে না, আরও টাকা ঢালিয়া জল দিয়া জল বাহির করিবার চেষ্টা ব্যতীত এখন অন্য উপায় নাই। কাযেই সে শ্যালককে ব্যবসা চালাইতেই পরামর্শ দিল এবং আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাকে আবশ্যক অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনোরঞ্জনের শ্বশুরের আত্মীয়বন্ধুবর্গ তাঁহার পুত্রকে ব্যবসা তুলিয়া দিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। সে সে পরামর্শ শুনিল না, পরন্তু অপরিপকবুদ্ধি ভগিনীপতির উৎসাহে ব্যবসা করিতে লাগিল—বুঝিল না, ব্যবসা পাশার দান—কি পড়িবে কেহ বলিতে পারে না—ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; যেন সে তাঁহাদিগকে অপমানিত করিয়াছে।

মনোরঞ্জনের উৎসাহে ও সাহায্যে তাহার তরুণবয়স্ক শ্যালক যেন সমুদ্রে কূল পাইল! আর তাহার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সরমা অত্যন্ত প্রীত হইল। সরমার এই আনন্দই মনোরঞ্জন তাহার যথেষ্ট পুরস্কার বিবেচনা করিল—সে তাহাতেই যথেষ্ট সুখ পাইল।

এই ভাবে কয় বৎসর কাটিল।

৫

এ কয় বৎসর মনোরঞ্জনের সমস্ত সঞ্চয় ও শক্তি সুধীরচন্দ্রের ব্যবসায়ের উন্নতিচেষ্টায় ব্যয়িত হইয়াছিল—যেন সে শ্যালকের জন্য ভাগ্যদেবীর সহিত প্রাণান্তসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় সে সফলপ্রযত্ন হইল। সুধীরচন্দ্র পিতার প্রবর্ত্তিত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল—ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইল।

কিন্তু ভাগ্যচক্রের যে আবর্ত্তনে সুধীরচন্দ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্দ্দমকলুষিত মৃত্তিকাসংলগ্ন অংশ উর্দ্ধে উত্থিত হইল, সেই আবর্ত্তনেই মনোরঞ্জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশ নিম্নে পতিত হইল। আফিসের চাকরীতে মনোরঞ্জন দিন দিন উন্নতিলাভ করিয়াছে—তাহার বেতন ও তাহার প্রতি আফিসের বড় সাহেবের বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে। সহসা এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। আফিসের "বড় সাহেব" দীর্ঘকাল কায করিয়া কারবারে আপনার অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন,—অর্থ লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। ঠিক সেই সময় আফিসের একটা বিভাগে চুরি ধরা পড়িল—তদন্তে প্রকাশ পাইল, কিছুদিন ধরিয়া চুরি হইতেছিল, ধরা পড়ে নাই। নূতন 'বড় সাহেব' সকল বিভাগে জামীনের ব্যবস্থা করিলেন; মনোরঞ্জনের কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অধিক বলিয়া তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জামীনের দাবী করিলেন। মনোরঞ্জন এতদিন এরূপ সম্মান ও সুখ্যাতির সহিত কায করিয়া আসিয়াছে যে, সে এই নূতন ব্যবস্থায় আপনাকে অপমানিত মনে করিল। সে বড় সাহেবের নিকট যাইয়া বলিল, "কোন্ অপরাধে আমার প্রতি জামীন দিবার আদেশ হইল?"

'বড় সাহেব' সম্মুখে রক্ষিত পত্রগুলি সহি করিতেছিলেন; চাপরাসী একখানি পত্র সরাইয়া ব্লট করিতেছিল, তিনি পরবর্ত্তী পত্রখানি সহি করিতেছিলেন।" তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "ইহাই আমার আদেশ।"

"কিন্তু আমার এতদিনের কাযে—"

'বড় সাহেব' বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না।"

মনোরঞ্জন বলিল, "মনিব যে কর্ম্মচারীকে বিশ্বাস করেন না; মনিবের পক্ষে সে কর্ম্মচারী না রাখাই শ্রেয়ঃ, আর কর্ম্মচারীর পক্ষেও সে মনিবের কায না করাই ভাল।"

কর্ম্মচারীর এইরূপ ধৃষ্টতায় 'বড় সাহেব' একান্ত বিস্মিত হইলেন—বলিলেন, "সেই কথাই ভাল। তোমার সহকারী কায বুঝিয়া লইলেই তোমার বিদায়।"

"তিনি এখনই কায বুঝিয়া লইতে পারেন। আমার কাযে বকেয়া নাই।"

মনোরঞ্জন মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনের চাকরী ছাড়িয়া দিল, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। সে স্থির করিল—যদি জামীন দিয়া চাকরী করিতে হয়, নূতন আফিসে অধিক জামীন দিব, কিন্তু যে আফিসে এতদিন বিনা জামীনে কায করিয়াছি, সে আফিসে অল্প জামীনও দিব না।

৬

গৃহে ফিরিবার পথে মনোরঞ্জন সুধীরচন্দ্রকে আপনার কর্ম্মত্যাগের সংবাদ দিয়া গেল। শুনিয়া সুধীর গম্ভীরভাবে বলিল,—"তাই ত। ফস্ করিয়া চাকরীটা ছাড়িলেন। অবশ্য আপনি ভাল করিয়া বুঝিয়াই কায করিয়াছেন।" তাহার কথায় আন্তরিকতার উচ্ছলিত ব্যাকুলতা ছিল না। এতদিন তাহার উন্নতিকে আপনার একান্ত ঈপ্সিত করিয়া মনোরঞ্জন আজ তাহার নিকট যে সহানুভূতি পাইবে আশা করিয়াছিল, তাহা না পাইয়া সে হৃদয়ে কিছু বেদনা অনুভব করিল। আশা করিলেই নিরাশার দংশন ভোগ করিতে হয়।

গৃহে ফিরিয়া মনোরঞ্জন সরমাকেও এ কথা বলিল। শুনিয়া সরমা বলিল, "পুরুষ মানুষ—বিশেষ এখন খাটিবার বয়স, চাকরীর ভাবনা কি? না হয় দুই চারি দিন বিলম্বই হইবে। বন্ধুকে দিয়া টাকাগুলা জলে না ফেলিলে চাকরীর দরকারই বা কি?"

সেই পুরাতন কথার আলোচনা বন্ধ করিবার জন্য মনোরঞ্জন বলিল, "আর এতদিন খাটিয়াও কি কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই?"

সরমা কখন সে সংবাদ লয় নাই, মনোরঞ্জনও কিছু বলে নাই। আজ এ কথা শুনিয়া সরমা বলিল, "তাহা ত আমি কিছু জানি না।"

"এই কয় বৎসর যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি সব দিয়া সুধীরের ব্যবসাটাকে খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুখের বিষয়, এতদিনে চেষ্টা সফল হইয়াছে। এবার সুধীর প্রচুর লাভ করিয়াছে।"

ভ্রাতার ব্যবসায়ে উন্নতি ও স্বামীর সঞ্চয়—এক সঙ্গে এই উভয় সংবাদ পাইয়া সরমা পরম আনন্দিতা হইল। তাহার মুখে ও চক্ষুতে আনন্দদীপ্তি দেখিয়া মনোরঞ্জনও আপনার সকল শ্রম সার্থক বোধ করিল।

৭

সৌভাগ্য-ক্রমে মনোরঞ্জনের চাকরীর সন্ধান পাইতে বিলম্ব হইল না। কায

জানা লোকের আদর সর্ব্বদাই থাকে। কাযে মনোরঞ্জনের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল, কাযেই অন্যান্য আফিসের অনেকেই তাহার কথা জানিত। একটি আফিসে সেই সময় কায খালি হইল। মনোরঞ্জন আফিসের কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি সব শুনিয়া তাহাকে কায দিতে চাহিলেন। সে পদের জামীন পূর্ব্বে দশ হাজার টাকা ছিল; তিনি বলিলেন, মনোরঞ্জনের কার্য্যদক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে তাহার পাঁচ হাজার টাকা জামীন দিলেই হইবে। শুনিয়া মনোরঞ্জন সানন্দে গৃহে ফিরিল।

জামীনের টাকার সম্বন্ধে তাহার কোন দুর্ভাবনাই ছিল না। কারণ গত পাঁচ বৎসরে সে সুধীরকে দশ হাজারের অধিক টাকা দিয়াছে। সুধীর বরাবরই টাকার সুদ দিবে বলিয়াছে এবং সে তাহাতে বিশেষ বিরক্তি দেখাইয়াছে। সে সরমার জন্যই সুধীরের কাযে অর্থ ও অবসর উভয়ই অকাতরে ব্যয় করিয়াছে। এবার সুধীর ব্যবসায়ে লাভ করিয়াছে—পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে সে একটা দমকা টাকা পাইয়াছে। এখন যে অনায়াসেই মনোরঞ্জনের টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিবে—বিশেষ পাঁচ হাজার টাকা হইলেই তাহার চলিবে। তাই সে নিশ্চিন্ত ছিল। এ বিষয়ে যে তাহার ঠিকে ভুল হইতে পারে সে এরূপ সম্ভাবনাকে মনে স্থান দিতে পারে নাই। সে সানন্দে এই চাকরীর সংবাদ সরমাকে জানাইল।

কিন্তু সত্য সত্যই তাহার ঠিকে ভুল হইয়াছিল। সে সুধীরের নিকট টাকা পাইবার সম্বন্ধে এমনই নিশ্চিত ছিল যে, পরদিন একেবারে তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া আফিসে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া বাহির হইল।

সুধীর তাহার চাকরী-প্রাপ্তির সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু মনোরঞ্জন যখন জামীনের কথা বলিল, তখন তাহার সে আনন্দ মেঘান্ধকারে জ্যোৎস্নার মত বিলুপ্ত হইল। সে বলিল,—"তাই ত; এখন কি করা যায়?"

মনোরঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, তুমি ত সে দিন অনেক টাকা পাইয়াছ!"

সুধীর বলিল, "আপনার টাকা দিতে বিলম্বে আমি বড়ই লজ্জিত। কিন্তু কি করি? সে টাকাটা আমার হস্তগত হয় নাই। আমি মামার নিকট টাকা লইয়াছিলাম। তিনি বিশেষ আবশ্যকে ঐ টাকাটা কাটিয়া লইয়াছেন।"

বিস্ময়ে মনোরঞ্জন নির্ব্বাক হইয়া রহিল। টাকাটা যে সুধীরের হস্তগত হইয়াছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহের কোনই কারণ ছিল না। তবে সুধীর এ মিথ্যা কথা বলিল কেন? তাহার বেদনা-চঞ্চল হৃদয়ে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা উথলিয়া উঠিল।

৮

মনোরঞ্জন গৃহে ফিরিলে সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "চাকরীর কি হইল ?"

মনোরঞ্জন কেবল বলিল, "হইল না।"

তাহার মুখভাব দেখিয়া সরমা ভাবিল, চাকরী না হওয়াতে সে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে। সে বলিল, "তাহার জন্য দুঃখ কেন ? এটা হয় নাই—আর একটা হইবে। আর এমনও ত নহে যে দুই দিন চাকরী না হইলেই তোমার চলিবে না।"

"কেমন করিয়া চলিবে ?"

"তুমিই বলিয়াছ, এ কয় বৎসরে কিছু সঞ্চয় হইয়াছে।"

মনোরঞ্জনের প্রবল বাসনা হইল সে বলে, "সে সঞ্চয়ের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রতি তাহার বিশ্বাস গিয়াছে।" কিন্তু সে আত্ম-সংযম করিল। সন্তান-হীনা, সংসারে বন্ধন-হীনা পত্নীর ভ্রাতার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস বিনষ্ট করিয়া তাহাকে বেদনা দিতে তাহার মন সরিল না। সে আর কোন কথা বলিল না।

আজ কেবল স্বার্থ-সঙ্ঘাত-সক্ষুব্ধ—নীচতা-নিলয়—সমাজ ত্যাগ করিয়া দূরে যাইবার জন্য তাহার হৃদয়ে ব্যাকুল ব্যগ্রতা বিকশিত হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। যখন সন্তান-শোকাতুরা সরমা সে প্রস্তাব করিয়াছিল, তখন যে অর্থাভাবে সে সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই, আজও সেই অর্থাভাবে সে এ বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিবে না। ক্ষতবিক্ষত হৃদয় লইয়া আবার তাহাকে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া কায করিতে হইবে। সে ভাবনাও কি কষ্টের !

৯

সমস্ত দিন মনোরঞ্জন দুশ্চিন্তার কণ্টকশয়নে অতিবাহিত করিল। সন্ধ্যার পর ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি অপরিচিত ভদ্রলোক তাহার সাক্ষাৎপ্রার্থী। একান্ত অনিচ্ছায় সে বৈঠকখানায় গেল। মৃদু দীপালোকে সে প্রথম দর্শনে আগন্তুককে চিনিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে খুঁজিতেছেন ?"

আগন্তুক হাসিয়া উঠিল, বলিল, "হাঁ। আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। যে দাড়ী রাখিয়াছি—চিনা দুঃসাধ্য বটে। আমি ভবানীচরণ।"

এ ত সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ! মনোরঞ্জন বলিল, "তুমি কোথা হইতে ?"

"ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আর দেশে মুখ দেখাইব না স্থির করিয়া আমি বিদেশে গিয়াছিলাম। যদি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারি, তবেই ফিরিব

নহিলে নহে—এই সঙ্কল্প করিয়া গিয়াছিলাম। স্বদেশে অদৃষ্টের সঙ্গে খেলায় আমি কেবলই হারিয়াছি—বিদেশে সে খেলায় আমার জয় হইয়াছে। তাই আমি আবার আসিয়াছি।”

ভবানীচরণ এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বন্ধুকে দিল, বলিল, “চৌদ্দ বৎসর পরে আজ আমি শান্তি পাইলাম।”

মনোরঞ্জন বলিল, “তুমি কোথায় আছ?”

“আমি আজই আসিয়াছি। যদি স্বদেশে আসিলাম, একবার জন্ম-ভূমি দেখিতে যাইব। আগামী কল্য তথায় যাইব।—তাহার পর আবার ফিরিয়া যাইব।”

“কেন?”

“আমার কর্ম্ম-স্রোত আমাকে ভাসাইয়া সেই কূলেই আশ্রয় দিয়াছে। আর আমার আর স্বদেশ বিদেশ কি? যত দিন মা ছিলেন, তত দিন এক এক বার দেশে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হইত।” অশ্রুর উচ্ছ্বাসে বলিষ্ঠ ভবানীচরণের কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। একটু সামলাইয়া সে বলিল, “বড় দুঃখ মা আমার দুর্ভাগ্যে কাঁদিয়া গেলেন—ভাগ্য-পরিবর্ত্তন দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।”

অকৃতদার বন্ধুর জীবনের নিস্ফলতা আজ মনোরঞ্জনের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; তাহার হৃদয় বন্ধুর বেদনায় ব্যথিত হইল। সে বলিল, “কেন আবার বিদেশে যাইবে?”

ভবানীচরণ বলিল, “আমি তথায় যে কায ফাঁদিয়াছি—তাহা সম্পূর্ণ হইলে আমার দেশবাসীদিগের অর্থোপার্জ্জনের একটা নূতন পথ হইবে। সেই পথের প্রদর্শক বলিয়া হয় ত আমার কথা লোক মনে করিবে। তাহাতে আমার নিস্ফল জীবন সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আমার পুত্র নাই যে আমার বংশে আমার নাম কেহ স্মরণ করিবে; আমার কীর্ত্তি নাই যে, আমার কথা লোক মনে রাখিবে। আমি যেন সংসার-সমুদ্রে শৈবালমাত্র—ঘটনার তরঙ্গ-তাড়নে ইতস্ততঃ চালিত হইতেছি। আজ কত দিন পরে মাতৃ-ভাষায় আলাপ করিয়া যে সুখলাভ করিলাম—সে সুখলাভ আর জীবনে ঘটিবে কি না সন্দেহ। জন্মিয়া যে মাতৃ-অঙ্কে স্থান লাভ করিয়াছিলাম, সে মাতৃ-অঙ্কে তনুত্যাগ—সে দেশের ধূলিতে দেহ-ভস্ম মিশাইবার সৌভাগ্যলাভ আমার হইবে না।”

মনোরঞ্জন বন্ধুকে প্রবাসে প্রত্যাগমনবিরত করিতে অনেক চেষ্টা করিল; পারিল না।

সে রাত্রিতে মনোরঞ্জন ঘুমাইতে পারিল না। সমস্ত দিনের ঘটনা তাহার নিকট স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। প্রভাতে সে মানব-চরিত্রের এক রূপ দেখিয়া ঘৃণায় সঙ্কুচিত ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। রাত্রিতে সে মানব-চরিত্রের আর এক রূপ দেখিয়া প্রশংসায় উৎফুল্ল ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছে। মানব-চরিত্রের জটিল রহস্য কে ভেদ করিতে পারে?

১০

পর দিন মনোরঞ্জন জামীনের টাকা লইয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইল; শুনিল, পূর্ব্ব-দিনই লোক বহাল হইয়াছে। অনুসন্ধানে সে জানিল, সুধীরই জামীনের টাকা জমা দিয়া মাতুলপুত্রের বেনামীতে কায লইয়াছে।

শুনিয়া মনোরঞ্জন স্তম্ভিত হইল। তাহার নিকট মানব-চরিত্র আরও জটিল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে মানব-জীবনে ধিক্কার প্রদান করিল; ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিল। তখন সে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে।

১১

গৃহে ফিরিয়া মনোরঞ্জন সরমাকে বলিল, "তুমি তীর্থে যাইয়া বাস করিতে চাহিয়াছিলে। যাইবে?"

সরমা এই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে একান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মনোরঞ্জন দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি যাইতেছি।"

শোকের প্রথম প্রবল আঘাত সরমার হৃদয়ে যে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়া বিচার ও বিবেচনার অবকাশ রাখে নাই, কালের সান্ত্বনায় তাহার কঠোরতার ও উগ্রতার হ্রাস হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে সংসার তাহার মায়াবন্ধনে সে হৃদয় আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। সে বলিল, "তুমি কি এ সব ছাড়িয়া যাইয়া থাকিতে পারিবে?"

মনোরঞ্জন বলিল, "পারিব।"

"সে তুমি যতই বল—তুমি পারিবে না। তোমার সে ভাল লাগিবে না; শরীরও নষ্ট হইবে।"

"তুমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। আমি যাইব। যদি তুমি না যাও, তবে তোমার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে।"

তাহার পর সরমা যে সকল ক্ষীণ আপত্তি করিল, মনোরঞ্জনের দৃঢ়সঙ্কল্প তাহাতে বিচলিত হইল না।

যে শুনিল সে-ই মনোরঞ্জনকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু কাহারও চেষ্টা ফলবতী হইল না।

যাত্রার দিন স্থির হইল। মনোরঞ্জন সকলের নিকট বিদায় লইয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া চলিল।

১২

সুধীর মনোরঞ্জন ও সরমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে গেল। একটা সংসার তুলিয়া যাওয়া, দ্রব্যাদি যথেষ্ট। গাড়ীতে দ্রব্যাদি গুছাইয়া মনোরঞ্জন নামিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইল। সুধীর ভগিনীর নিকট বিদায় লইয়া আসিয়া তাহার নিকটে দাড়াইল—বলিল, "আপনাকে এত বলিলাম—শুনিলেন না, আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন! আপনি আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনি থাকিতে আমার বুকে বল ছিল।"—মনোরঞ্জন বলিল,—"সুখের বিষয়, তোমার এখন আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই।"

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, মনোরঞ্জন যাইয়া গাড়ীতে উঠিল, সুধীর বলিল, "আমি যত সত্বর পারি টাকাটা পাঠাইয়া দিব।"

সরমা পরিচিত সব ছাড়িয়া যাইতে বড় বেদনা অনুভব করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া সে বলিল, "সুধীর গাড়ী ছাড়িবার সময় কি বলিতেছিল ?"

মনোরঞ্জনের বুক কাঁপিয়া উঠিল। পাছে কোন দিন কোন রূপে সরমা সুধীরের ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারে—পাছে তাহার নিস্ফল জীবনের বেদনা-ভার বর্দ্ধিত হয়—এই ভয়ে সে দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল। তবে কি তাহার সে চেষ্টা সাফল্যের কূলে ব্যর্থ হইয়াছে ? সে বলিল "ও একটা অন্য কথা।"

সরমা আর কিছু বলিল না। সে বাতায়ন-পথে নৈশ অন্ধকারাবৃত প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ দেখিতে লাগিল।

তখন মনোরঞ্জন নিশ্চিন্ত হইল। পত্নীকে—তাহারই উপর নির্ভর-নিরতা, সন্তান-হীনা পত্নীকে বেদনার বিষম আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া সে পরম আনন্দ ও আত্ম-প্রসাদ লাভ করিল—তাহার প্রবাস-যাত্রা তাহার নিকট সত্য সত্যই তীর্থ-যাত্রা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

——:——

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(১১)

১লা আশ্বিন, ১৩১৮।

আজ পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম "আপনার মুখ হইতে আজ স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার গোটা দুই কথা নিবেদন করিবার আছে, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।—

"প্রথম কথা,—'নিষ্ক' শব্দের কনিষ্ক হইতে উৎপত্তি সন্দেহ-জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হইতে এই পদটি আমাকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

"দেশাদ্দেশাৎ সমোঢ়ানাং সর্ব্বাসামাঢ্যদুহিতৄণাং।
দশাদদাৎ সহস্রাণ্যাত্রেয়ো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ॥"

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

আমাদের কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয় মহাভারত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

"শতং দাসীসহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥"

(মহাভারত। বনপর্ব্ব, ২৩২।৪৬)

"দ্বিতীয় কথা, যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে আলোচনাটা যেরূপ দাঁড়াইল তাহা আপনাকে শুনাইতে চাহি। শশীবাবু গত ভাদ্রমাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে আমরা সেই মত সম্বন্ধে আলোচনা করি। সে দিন রামেন্দ্র বাবুর মত আপনাকে শুনাইয়াছি; আপনার বক্তব্যটুকুও রামেন্দ্রবাবুকে শুনাইয়াছি; তাঁহার শেষ বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। এখন কি দাঁড়াইল শুনুন।

"রামেন্দ্রবাবু বলেন, যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে তিনরকম tradition আছে। (১) বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের—পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দাভিষেকের মধ্যে এক হাজার বৎসরের কিছু অধিক ব্যবধান, এই হিসাবের ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় খৃঃ পূঃ দেড় হাজার বৎসর দাঁড়ায় (round numbers দেওয়া গেল, দু'শ' এক'শ'

* পুরাতন প্রসঙ্গ, আষাঢ়।১৩১৮।

বৎসর ধর্ত্তব্য নহে।) (২) শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে কলির আবির্ভাব ; এইটাই শশীবাবু লইয়াছেন। এই হিসাবে যুধিষ্ঠিরের সময় খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসরের কিছু বেশী দাঁড়ায় (কলি ৫০০০ বৎসরের কিছু উপর, এখন খৃষ্টাব্দ ১৯১১, বাদ আন্দাজ ৩১০০।) (৩) কলির আরম্ভের আন্দাজ পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে। বোধ হয় এইটি বরাহমিহিরের Theory, বৃহৎসংহিতায় দেখিয়াছি। তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর দাঁড়ায়।

"বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে কৃত্তিকাকে নক্ষত্রচক্রের আদিনক্ষত্র বলিয়া গণনা করা হইত। তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে Verual Equinox মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত এবং সেই সময়ে বৎসরারম্ভ হইত। আজকাল পঞ্জিকায় অশ্বিনী নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের আদিনক্ষত্র বলিয়া গৃহীত হয় এবং সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বৎসরারম্ভ হয়। পঞ্জিকায় ১লা বৈশাখের পূর্ব্বদিন মহাবিষুব সংক্রান্তি লিখে, কিন্তু আজকাল বিষুবসংক্রমণ তাহার ২১ দিন পূর্ব্বে, ৯ই চৈত্র হয়। ঐ বিষুবসংক্রমণের দিনই দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে। পঞ্জিকাগণনার বর্ত্তমান পদ্ধতি প্রায় পনের শত বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে বিষুবসংক্রমণ হইত এবং ১লা বৈশাখ বৎসরারম্ভের এবং অশ্বিনীকে নক্ষত্রচক্রের আদিনক্ষত্র গ্রহণের সার্থকতা ছিল। প্রায় ষাট বৎসরে বিষুবসংক্রমণ একদিন করিয়া পিছাইয়া আইসে। এইরূপে দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ২১ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। পঞ্জিকায় যদি আর সংশোধন করা না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শীতকালে দিনরাত্রি সমান হইবে।

"এখন বেদের ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈদিককালে সূর্য্য কৃত্তিকানক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বিষুবসংক্রমণ এবং বৎসরারম্ভ হইত। এখন গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, খৃঃ পূঃ আড়াই হাজার বৎসর বা তাহার কিছু পূর্ব্বে কৃত্তিকায় বিষুবসংক্রমণ ঘটিত। কাযেই ঐ সময়কে আমরা বেদের ব্রাহ্মণযুগের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারি। বেদের মন্ত্রযুগ তখন প্রায় শেষ হইয়াছে। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

"যুধিষ্ঠিরের প্রপিতামহ শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি রাজ্যগ্রহণ না করিয়া বনে যাওয়ায় শান্তনু রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি সূক্তের ঋষি দেবাপি। ঐ সূক্তে দেবাপির নাম আছে। শান্তনুর রাজত্বকালে অনাবৃষ্টি ঘটায় দেবাপি আসিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এইরূপ

প্রসিদ্ধি আছে। ঐ সূক্ত সেই উপলক্ষে দেবাপিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যুধিষ্ঠির বেদের মন্ত্রযুগের শেষকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

"অন্যদিক হইতেও এই অনুমান সমর্থিত হয়। বশিষ্ঠ, তাঁহার পুত্র শক্তি এবং পৌত্র পরাশর ঋগ্বেদসংহিতার বহু মন্ত্রের ঋষি। পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া সেরূপ প্রসিদ্ধ নহেন, কিন্তু তিনি বেদের সঙ্কলন ও বিভাগ দ্বারা বেদব্যাস আখ্যা পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী এবং মহাভারতের রচনাকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে যুধিষ্ঠিরকে মন্ত্রযুগের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে উল্লিখিত গণনানুসারে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বা তাহার কিছু পূর্ব্বকালকে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

"বৈদিকযুগের কৃত্তিকা নক্ষত্র ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইত এরূপ প্রমাণ বেদের মধ্যেই আছে। বিষুবসংক্রমণের কাল ক্রমশঃ সরিয়া যাওয়ায় কৃত্তিকা এখন ঠিক পূর্ব্বে উদিত না হইয়া একটু উত্তর-পূর্ব্বে উদিত হয়। এই উদয়স্থান কতটুকু সরিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়াও বেদের কালনিরূপণের কতকটা সাহায্য হয়। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনুমানই অনেকটা সমর্থিত হয়।

"তাহার পর 'মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ' এই উক্তি সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু বলেন 'কৃষ্ণকমল বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। মঘা ও সপ্তর্ষি Fixed Stars তাহাদের relative positions বদলায় না। এই জন্য মঘাসু মুনয়ঃ কথাটার কোনও অর্থই হয় না। তবে আমি একটা মানে করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমাদের একটি জ্যোতিষবচন ভুল বলিয়া মনে হয়। আমার ব্যাখ্যা এই :—The Pole of the Equator is travelling around the fixed Pole of the Ecliptic in consequence of the precession of the Equinoxes. One complete revolution of the pole of the Equator is effected in about 25000 years. The pole of the Ecliptic is a fixed point but the pole of the Equator is shifting. The stars (নক্ষত্র) which are arranged approximately on the plane of the Ecliptic are fixed in position The Saptarshis (সপ্তর্ষি) are also fixed in position. Now, if a line be drawn from the pole of the Equator through some definite point in the Saptarshis, this line on being produced will cut the ecliptic at a point within

some নক্ষত্র। The Saptarshis may then be said to be lying in that নক্ষত্র। As the Pole of the Equator moves, this line wil be moving also, and the point where the line cuts the ecliptic will be moving in the opposite direction; or the Saptarshis will move successively through all the stars (নক্ষত্র) once in about 25000 years. As the number of stars is 27, the Saptarshis'duration in every নক্ষত্র is about one thousand years and not one hundred as a Jyatishic text implies."

* * * *

পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম "এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া কবি বিহারীলালের কথা বলুন।"

তিনি বলিলেন—

"বিহারীলাল আমার খুব বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন। আমা অপেক্ষা বয়সে তিনি ৩।৪ বৎসরের বড় হইতেন, কিন্তু সে কারণে আমাদের উভয়ের গলায় গলায় ভাব হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, তেজীয়ান্ ও অকুতোভয় ব্যক্তি ছিলেন। আমি চিরকালই ক্ষীণজীবী, তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা, এমন কি ভক্তি বলিলেও হয়, ছিল। সাংসারিক অভিজ্ঞতা, লোকজ্ঞতা, আমা অপেক্ষা তাঁহার অনেক অধিক ছিল; কিন্তু আমার এই সকল হীনতাসত্বেও আমি লিখাপড়ায় কিছু অগ্রসর থাকাতে উভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা ঢেথ ফাজিল হইয়া পরস্পর অনেকটা পোষাইয়া গিয়াছিল এবং উভয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও স্নেহানুগত্য ঘটিয়াছিল।

"বিহারী বাল্যকালে একটু দাঙ্গাবাজ গোছ ছিলেন। আহিরীটোলার নিকটে তাঁহার বাটী এবং আহিরীটোলার ছোকরারা দাঙ্গাবাজির জন্য কতকটা প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কোনও এক বালক বাল্যকালোচিত বিবাদকলহপ্রসঙ্গে লাঠির মধ্যে গোপন করা থাকে যে গুপ্তি তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তকে এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, রক্তে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গিয়াছিল। সন্নিকটে একজন পাহারাওয়ালা ছিল, সে রক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু কি হইয়াছে? কে আপনাকে মারিয়াছে?' বিহারী পুলিসে জানান কাপুরুষের কার্য্য বিবেচনা করিয়া কহিল, 'কেহ আমাকে মারে নাই, চৌকাটে মাথায় চোট লাগিয়াছে।' আঘাতকর্ত্তা বালক তখনও পলায় নাই, নিকটে দাড়াইয়া ছিল, এবং বিহারীর কথা শুনিতে পাইল। বিহারী পুলিসে জানাইতেছে না দেখিয়া

তাহার হৃদয়ে একটা উৎকট ভয় জন্মিল ; সে ভাবিল—বিহারী নিজেই তাহাকে খুন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুলিসের কাছে গোপন করিয়াছে। এই ভয়ে সে এতদূর অভিভূত হইল যে, সে দিনই হউক বা তাহার পরদিনই হউক, নিজে আসিয়া বিহারীর পায়ে ধরিয়া দাঙ্গা মিটাইয়া ফেলিল।

"বিহারীর লিখাপড়ার সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত কলেজে, ভর্ত্তি হইয়া মুগ্ধবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু ইস্কুল কলেজে বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল না। তাহার individuality (ব্যক্তিবৈশিষ্ট) এতই তীব্র ছিল। অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ কিছুদিন পড়িয়াছিল ; সাঙ্গ করা হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। তাহার বাড়ীর শিক্ষক ও বড় 'কেও কেটা' ছিলেন না। তিনি আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাইস-চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুর পিতা। তিনি ঐ পাড়ায় অনেক বালককে মুগ্ধবোধ পড়াইয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ সাঙ্গ হউক আর না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারক হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাস্ত্রের কয়েক খানি গ্রন্থ যথা,—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, আর বোধ হয় ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত এবং শকুন্তলা আমি তাঁহাকে পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িতে আসিতেন। এই সময়ে Monier Williams শকুন্তলার এক অপূর্ব্ব সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন, নাটকের প্রাকৃত ভাষা লাল অক্ষরে, তাহার ঠিক নীচেই প্রাকৃতের সংস্কৃত অনুবাদ কাল অক্ষরে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় হদ্দ ৫।৬ ছত্র মূল সংস্কৃত, বাকি অংশ ইংরাজী ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। ইংরাজী ব্যাখ্যার মধ্যে আবার স্থানে স্থানে তিন জন টীকাকারের সংস্কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত ছিল। কিন্তু এই সংস্কৃত ব্যাখ্যাগুলি ইংরাজী অক্ষরে ছাপা ছিল। কালিদাসের শকুন্তলার প্রতি মুদ্রণকার্য্যে কেহ কখনও এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। বহিখানির দাম হইয়াছিল, উনিশ টাকা। বিহারীদের যদিও অন্নকষ্ট ছিল না, তথাপি ১৯৲ টাকা দামের একখানি শকুন্তলা কিনেন এরূপ সঙ্গতিপন্নও তাঁহারা ছিলেন না। বিহারীর পিতা যাজ্যক্রিয়া করিতেন, অনেকগুলি ধনবান্ সুবর্ণবণিক্ তাঁহার যজমান ছিল। অন্যান্য জাতির পুরোহিতদিগের অপেক্ষা সুবর্ণবণিক জাতির পুরোহিতদিগের আয় অনেক অধিক। বিহারী পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাই তাঁহার আব্দার অগ্রাহ্য হয় নাই ; পিতা ১৯৲ দিয়া পুত্রকে 'শকুন্তলা' কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমিও বড়ই আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে সেই শকুন্তলা

একত্রে পড়িয়াছিলাম। বোধ হয় বিহারীর তখন ইংরাজী ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হইয়াছিল। ইংরাজীও তিনি কতক দূর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, বায়রণের Childe Harold এবং সেক্স-পীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র প্রভৃতি দু'পাঁচ খানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। বিহারীর ধীশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশাস্ত্র পর্য্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যে, অতি সামান্য সাহায্যেই তিনি ভালরূপ ভাবগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল যে, বাঙ্গালাসাহিত্যটা তিনি অতি উত্তমরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণ,মহাভারত, ঈশ্বরগুপ্ত, দাশুরায় ইত্যাদি তৎকাল-প্রচলিত অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ তাঁহার ভাল-রূপ পড়া ছিল। তিনি অল্প বয়সেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই পদ্যগুলিতে প্রথমাবধিই আমি একটি নূতন 'ধর্ত্তা' লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহা আমার খুবই ভাল লাগিত এবং সেই 'ধর্ত্তা' উত্তরকালে তাঁহার সমস্ত লিখাতেই লক্ষিত হয়। আমার জ্যেষ্ঠ তাঁহার পদ্যরচনার বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং উল্লিখিত নূতনত্বের জন্য বিহারীকে উৎসাহ দিতেন। সেই নূতনত্ব আমি কিরূপে বুঝাইয়া দিব, তাহা ঠাওরাইতে পারিতেছি না। বোধ হয় ইংরাজীতে পোপ ও তাঁহার অনুগামী কবিদিগের পর ক্র্যাব, কাউপার, বায়রণ ইঁহারা যে এক নবীনতা আনিয়াছিলেন, বিহারীর নবীনতা কতকটা সেই প্রকারের ছিল। ভাবব্যঞ্জক কোনও প্রচলিত শব্দই প্রয়োগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না; এবং সেকেলে ভাবসকল লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেন।

"তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা 'সঙ্গীতশতক' পাঠ করিলে ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পাঠক-সমাজে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই অপ্রতিষ্ঠা গ্রন্থের রচনার দোষে নহে, পাঠক-দিগের সহৃদয়তার অসদ্ভাবে। সঙ্গীতশতক গ্রন্থ এক শত বাঙ্গালা গানে গ্রথিত। গানগুলি 'কাণু ছাড়া গীত নাই' সে ধরণের গান নহে। কোনটিতে তাঁহার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, কোনটিতে একটি সুন্দর বৃক্ষের বর্ণনা বা একটি চমৎকার সন্ধ্যার আকাশের বর্ণবৈচিত্র্য বা একটি ফুলের বাগানের কথা ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই রচনা এরূপ সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী যে, পড়িতে পড়িতে পরম আপ্যায়িত হইতে হয়। বিহারীর গলায় সুর ছিল না কিন্তু সুরবোধ ছিল, এবং অনেকগুলি সুর তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। অনেক গান আমার নিজে নিজে গাহিয়া গাহিয়া মুখস্থ হইয়া আছে। একটি গান—

(সুর বেহাগ)

নধর নূতন তরুবর কিবা সুশোভন।
সাদরে দিয়েছে এসে লতাবধূ আলিঙ্গন।
উভয় উভয় পাশে, বাঁধা বাহু-শাখা-পাশে
কুসুম বিকাশি হাসে ভাসে ভ্রমর-গুঞ্জন।
মিলায়ে বায়ুর স্বরে, কুহুস্বরে গান করে
নাচে আনন্দের ভরে ক'রে বাহু প্রকম্পন।

আর একটি গান—

(পূরবী)

আজি সন্ধ্যা সাজিয়াছে অতি মনোহর
করিয়াছে পাঁচরঙ্গা সুন্দর অম্বর।
হাসি হাসি চন্দ্রানন, আধ ঘন আবরণ
আধ প্রকাশিত আভা কিবা শোভাকর।
কালো মেঘ কেশমাঝে, সাদা মেঘ সিঁথি সাজে,
তার মাঝে জ্বলে মণি তারকসুন্দর।
নীল জলধর পরে, যেন নীল গিরিবরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে রূপে উজলি অম্বর।

এরূপ মূর্ত্তিমান্ সন্ধ্যা-বর্ণনা আমার ত অতি অপূর্ব্ব বোধ হয়। আর একটি গান—

(সোহিনী)

কোথায় রয়েছ, প্রেম, দাও দরশন
কাতর হয়েছি আমি করি অন্বেষণ।
কপটতা ক্রূরমতি, বিষময়ী বক্রগতি
দংশিয়ে তোমারে বুঝি করেছে নিধন।

আর একটি গান—

(ঝিঁঝিট)

প্রাণ প্রেয়সী আমার,
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার।
হেরিলে তব বদন, যেন পাই ত্রিভুবন,
অন্তরে উছলি ওঠে আনন্দ অপার।

আবার—

(বাহার)

হায়, সুখময় ফুলবন হয়েছে দাহন।
নীরব এখন কোকিলের কুহুরব অলির গুঞ্জন।
আজ পূর্ণিমায় ভাসে, ফুল ফুটে নাহি হাসে,
করে না মধুর বাসে প্রমুদিত বন।

একশতটি গানের প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি অপূর্ব্বতা আছে। বিহারী বিশেষ যত্ন করিয়া উত্তম অক্ষরে উত্তম কাগজে কিছু অর্থব্যয় করিয়া গানগুলি ছাপাইয়াছিলেন। But the book fell stillborn from the press. পঞ্চাশখানিও বিক্রীত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এইত বাঙ্গালা পাঠকসমাজের সহৃদয়তা। কিন্তু বিহারী নিরুৎসাহ হয়েন নাই। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার রচনাতে পদার্থ আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি কবিতা রচনা ছাড়েন নাই।

"ইহার পর তিনি 'বঙ্গসুন্দরী' 'সুরবালা কাব্য' 'সাধের আসন' 'সারদা-মঙ্গল' এই কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট অতি চমৎকার গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান ছিল যে, উপস্থিত লোকে যতই অগ্রাহ্য করুক, কোনও না কোনও সময়ে তাঁহার রচনার প্রতি পাঁচজনের লক্ষ্য পড়িবে এবং তাহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে। অধিক দিন হয় নাই, তাঁহার পুত্ররা তাঁহার গ্রন্থাবলি ছাপাইয়াছেন। আজকাল বাজারে সেগুলির কাট্‌তি কিরূপ আমি জানি না, এবং বিহারীর উল্লিখিত ধ্রুব জ্ঞান সত্যে পরিণত হইয়াছে কি না তাহাও বলিতে পারি না। তবে তাঁহার রচনার প্রতি আমার সেই প্রথমকার admiration এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের হৃদয়েও সেই admiration প্রস্ফুরিত হইয়াছে দেখিতেছি। ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি বিহারীর বিষয়ে এত প্রশংসাপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে, তাহা আমি হেন বেহারীর ভক্তও যথেষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করি। এমন কি রবি ঠাকুর এক প্রকার নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পদ্যরচনা বিষয়ে তিনি বিহারীর ছাত্র, তাঁহার লিখা হইতে অনেক hint পাইয়াছেন।

'বঙ্গসুন্দরী' একখানি অতি সুললিত পদ্যগ্রন্থ। ইহাতে নারীজাতির সুকোমল বিচিত্রতা পরিপাটিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বিহারী কোম্‌তের বিষয় যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'বঙ্গসুন্দরীর' মধ্যে কোম্‌তের ভাব অনেক স্থলে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

নারীজাতিকে বিহারী কোমলতা, স্নেহময়তা, করুণাপরায়ণতা এই সকল গুণে পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন এবং সেই অভিপ্রায় উক্ত কাব্যে সুচারুরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

'সুরবালা' কাব্যের চমৎকারিতা সমালোচনা দ্বারা বুঝাইবার বিষয় নহে। স্বয়ং পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য যিনি অনুভব করিতে না পারেন, কাব্যের ভাবগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

'সাধের আসন' ও 'সারদামঙ্গলের' বিষয়েও ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। তবে আমার নিজের মত বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, 'সারদামঙ্গল' বিহারীর শেষাশেষি সময়ের রচনা। আমার বোধ হয়, তাঁহার জীবনের এই অংশে তাঁহার হৃদয়ে জর্ম্মাণধরণের একটু অস্ফুটতার ভাব (Vagueness) আসিয়াছিল। কিন্তু এ কথা আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিতেছি। আমার নিকট যাহা অস্ফুট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাবগ্রাহী ব্যক্তির নিকট তাহা সেরূপ না বোধ হইতেও পারে। ভাবগ্রাহিতা-বিষয়ে আমার আত্মশ্লাঘা নাই। বিজ্ঞানের পরিষ্কারতা আমার চিত্ত কিছু পছন্দ করে, সুতরাং আমি যাহা অস্ফুট বলিব, তাহার মধ্যে হয়ত সুগভীর তত্ত্ববিশেষ নিহিত আছে। আমি ত কোন কীটাণুকীট—নিউটনের মত মহীয়ান্ পুরুষ মিল্টনের Paradise Lost পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন What does it prove? ইহাতে প্রমাণ হইল কি? কিন্তু তাহা বলিয়া Paradise Lost কেহ অনাদর করে না। লোক কেবল এই মাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, নিউটন বিজ্ঞানে বড়লোক হইলেও কাব্যশাস্ত্রে বালকের ন্যায় ছিল।

"যোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে স্বহস্ত-রচিত একখানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী 'সাধের আসন' লিখেন।

"বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। নিতান্ত শৈশবে কিম্বা প্রথম উঠ্‌তি বয়সে যৎসামান্ত কিঞ্চিৎ চরিত্রস্খলন হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যতদিন দেখিয়াছি, এরূপ সচ্চরিত্র, সদাশয়, নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। তজ্জন্ত আমি যে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাক্‌পথাতীত। আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁহাকে যে কতদূর শ্রেষ্ঠ

বিবেচনা করিতাম তাহা বলিয়া কি জানাইব। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, ইহা আমি অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় ভাবিতাম। একবার মাত্র তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল পরেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সে বিষয়ে আমারই সম্পূর্ণ দোষ। তাহাতে আমার পূর্ব্বতন সদ্ভাব পুনরুজ্জীবিত হইল এবং আমি দেখিলাম যে, আমার প্রতি বিহারীর স্নেহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

"তাঁহার রচনাগুলি সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হই বলিতে পারি না।

"দেখিতে বিহারী প্রথমে যে প্রকার বলিয়াছি, যাবজ্জীবন সেই রকমই ছিলেন, দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়াদেহ ও হৃষ্টপুষ্ট। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, খুব বাল্যকালে তিনি কতকটা ছিপ্‌ছিপে ও কাহিল ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার একবার শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তৎকালপ্রচলিত নিয়মানুসারে হাঁটাপথে যাওয়া হইয়াছিল। প্রত্যহ ১০।১২ ক্রোশ হাঁটিয়া এবং চিড়া, মুড়কি, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ক্ষুধার উপর প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তাঁহার শরীর গঠিত হইয়া গেল। সেই অবধি তিনি বরাবর হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন এবং বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন। সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালীজাতির সেরূপ খুব কমই আছে।

"একবার তাঁহাতে আমাতে গঙ্গাতীরে ষ্ট্রাণ্ড পথ দিয়া আসিতেছিলাম। এক জন গোরা আমাদিগের সামনা সামনি হইল। এরূপ স্থলে প্রায় বাঙ্গালীকেই পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, গোরা সোজা চলিয়া যায়। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, গোরাটি বিহারীর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার মুখপানে একবার তাকাইয়া আপনা হইতেই পাশ কাটাইল, এবং আমরা দু'জনে সোজা চলিয়া আসিলাম।

"আর একবার, বিহারীর মুখে শুনিয়াছি যে, বড়বাজারের বাঁশতলার গলির ভিতর দিয়া মহাসমারোহে বর যাইতেছিল। অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। রাস্তার দুই ধারে বিস্তর লোক বর দেখিবার জন্য গোলমাল ও হুটোপাটি করিতেছিল। এরূপস্থলে যাহা হইয়া থাকে হইতেছিল, পুলিসের লোক দু'ধারি দাণ্ডা চালাইতেছিল, তাহার মধ্যে একজন গোরা কনেষ্টবল ছিল, সে আবার একটু অধিক মাত্রায় ঐ কায করিতেছিল। বিহারী সেই সময়ে পথের ধারে এক রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার দিকে দাণ্ডা উত্তোলন করিল। গোরা রাস্তায়, বিহারী একটু উচুতে, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, গোরার

মার খাইতে হয়। তখন তিনি আর কিছু না করিয়া অম্লানবদনে গোরার বুকের উপর এমনই সজোরে এক লাথি হাঁকরাইলেন যে, তাহাকে চিৎপাত হইতে হইল। সেই সময়ে ভিড় ভয়ানক বাড়িয়া গেল। গোরাটি উঠিয়া অত ভিড়ের মধ্যে বিহারীকে ঠাহর করিতে পারিল না। বিহারীও পুলিসের হাতে পড়িবার ভয়ে পশ্চাৎপদে সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

— —

শোক।

১

কুট্মলে শিশির-বিন্দু না পারে তিষ্ঠিতে—
ঝরি' পড়ে আঁখির নিমেষে ;
বিকচ কুসুমে কিন্তু হইলে পতিত,
বুকে বসি' নাশে তা'রে শেষে !

২

তরুণ হৃদয়ে শোক রহিবারে নারে,—
মুহূর্ত্তেই দূরে চলি' যায় ;
প্রবীণের হৃদে কিন্তু রহি' দীর্ঘকাল,
দীর্ণ,—শেষে শুষ্ক করে তায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

——:——

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

"বাজী" পোড়ান দীপালীর একটা অবচ্ছিন্ন অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। আজকার সৌধকিরীটিনী মহানগরী কলিকাতায় কেহ 'বাজী" হইতে অগ্নি-বিস্তারের আশঙ্কা করে না। কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার অবস্থা অন্যরূপ ছিল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই তারিখে ইংরাজগণ স্থির করেন—"বাজী" পোড়ান হইতে সহরে বহুবার অগ্নিদাহ হইয়াছে এবং "বাজী" পোড়াইলে সহরের বারুদঘরে বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং সহরে "বাজী" পোড়ান বন্ধ হইল এবং বাজীর কারখানা তুলিয়া দেওয়া হইল।

—•—

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যথেষ্ট জঙ্গল ছিল। তখন চৌরঙ্গীর দক্ষিণাংশে ব্যাঘ্রের ভয় ও বর্ত্তমান গড়ের মাঠে বন্য শূকরের উপদ্রব ছিল। তখন (১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ১২ই জুলাই) কলিকাতার কর্ত্তারা স্থির করেন, সহরে কলাগাছ ও গুল্মাদি কাটিয়া ফেলিলে সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা। এই জন্য তাঁহারা মার্হাট্টা খাতের মধ্যবর্ত্তী সহরে জঙ্গল কাটিবার আদেশ প্রদান করেন। ইহার পরবর্ত্তী কালে গুপ্ত কবি কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"রেতে মশা, দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

তখন আর এখন!

—o—

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তখনও দেশে ম্যালেরিয়ার বিজয়ভেরী নিনাদিত হয় নাই, জলকষ্টের সহচর কলেরা আমাদের অতিথি হইতে ঘরের লোকে দাঁড়ায় নাই। তখন যে সকল স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল, এখন অনেক স্থলে সেগুলি যমের দক্ষিণ দ্বার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাশীমবাজারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ম্যাণ্ডয়ার ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া স্বাস্থ্যলাভের আশায় কাশীমবাজারে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। শত বৎসর পরে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) এই কথায় মিষ্টার লং বলেন, বাঙ্গালার নানা স্থানেরই মত কাশীমবাজার আর স্বাস্থ্যকর নহে, তথায় পুরাতন কুঠীগুলি জঙ্গলাকীর্ণ। এখন বর্ষার বারিপাত আরব্ধ হইলেই কাশীমবাজারের মহারাজকে সৈদাবাদে পলায়ন করিতে হয়। বর্দ্ধমানও কিছুকাল পূর্ব্বে স্বাস্থ্যান্বেষীর সুখস্বর্গ ছিল।

—•—

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সৌদামিনীকে স্থির করিয়া চেরাগে পুরার কল্পনাও হাস্যোদ্দীপক ছিল। তখন তৈলের আলোক ও বাতিই রজনীর অন্ধকার যথা-সম্ভব দূর করিত। তখন কলিকাতায় ইংরাজের গোরাবারিকে দৈনিক ২৪ সের তৈল ও ২৮টা বাতি পুড়িত! কিন্তু এ খরচ কর্ত্তাদের কাছে বড় অতিরিক্ত বোধ হওয়ায় ১৮৬০খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহারা স্থির করেন, প্রচলিত অপব্যয় নিবারিত করিয়া প্রতি রাত্রিতে প্রহরীর ঘরে ২টি, রোঁদের জন্য ২টি ও টাউন মেজরের আফিসে ১টি একুনে ৫টি বাতি দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে টাউন মেজর প্রত্যহ ৬টি বাতি পাইতেন। বাতির বরাদ্দ কমাতে তিনি কি করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই।

—•—

এখন বৈজ্ঞানিক বলেন, বিদ্যুতের ও বাষ্পের শক্তি সুপ্রযুক্ত করিয়া দূরত্ব-নাশই বিজ্ঞানের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এ কথা যথার্থ। সে কালের "অশ্বমনোরথ" একালের বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক যানকে আসর দিয়া সরিয়াছে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে 'সাইরেণ' জাহাজ প্রায় চারি মাসে ভারত হইতে ইংলণ্ডে পৌছিয়াছিল। তখন তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইত। আর এখন একুশদিনও বড় লম্বাপাড়ি মনে হয়।

—•—

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশে মধ্যাহ্নে রবিকরতাপে দেহ অবসন্ন হইয়া আইসে। সেইজন্য পূর্ব্বে এদেশে প্রভাতে ও অপরাহ্নে কাছারী প্রভৃতি হইত। এখনও সরকারী ও সওদাগরী আফিস ব্যতীত অনেক স্থলে এই ব্যবস্থাই বিদ্যমান। প্রথম আমলে ইংরাজও এই দেশাচার অবহেলা করেন নাই। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা নভেম্বর তারিখে হুকুম জারী হয় যে, কর্ম্মচারীদিগকে প্রভাত ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কায করিতে হইবে। কেবল যে দিন কাউন্সিল বসিবে সে দিন তাঁহাদিগকে কাউন্সিল না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে ও উপরওয়ালারা বলিলে অপরাহ্নেও আসিতে হইবে।

—•—

১৭৬২ খৃষ্টাব্দের একটা আদেশেও পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ঐ বৎসর মিষ্টার উইলিয়ম পার্কস একটি বাগানবাড়ী কিনিয়া উহা ভদ্রলোকদিগের বিনোদবাটিকা করিবার জন্য বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বোর্ড এই অনুমতি দিবার সময় বলেন, প্রভাতে ঐ বিনোদবাটিকা বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে হয়ত অনেকে কায করিতে আসিবে না।

শ্রীঅরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

পাষাণের কথা।

(৯)

বলীবর্দ্দদ্বয়বাহিত রথে বৃদ্ধ সম্রাট্ স্তূপসন্নিধান হইতে পাটলীপুত্রে নীত হইতেছেন। স্কন্ধাবার অন্তর্হিত হইয়াছে, কয়েকজন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে শকটের পশ্চাতে চলিতেছে। মহিষী জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় বৃদ্ধ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পাটলীপুত্রে রাজদণ্ড অধিকার করিতে গিয়াছেন। কণিষ্ক-নিৰ্ম্মিত পাষাণাচ্ছাদিত পথে ঘর্ঘর শব্দে বন মুখরিত করিয়া ধীর মন্থর গতিতে সম্রাটের রথ চলিয়াছে। তখন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল পাটলীপুত্রে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে; আর কান্যকুব্জে, প্রতিষ্ঠানে ও সুদূর মহাসমুদ্রের তীরবর্ত্তী আনর্ত্তে অসহায় নরনারীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে। শতবর্ষ পরেও সে কথা শ্রবণ করিয়া মাতৃক্রোড়ে ক্রীড়ামত্ত শিশু নিশ্চল হইত। হূণপ্লাবন ত্রিবেণী হইতে সুদূর প্রতীচ্যে রোমক নগরীর তোরণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তোরমাণ যখন কান্যকুব্জ ধ্বংস করিতেছেন,তখন হূণবিপ্লবে নবীন প্রতীচ্য জ্ঞানালোক পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পঙ্গপাল আসিলে যেরূপ শ্যামল তৃণক্ষেত্রে দূর্ব্বাদল পর্য্যন্ত দেখা যায় না, সেইরূপ যে পথে হূণগণ চলিয়া যাইত, সে পথে জীবের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইত। উচ্চ ভূমি হইতে দেখিলে দীর্ঘ কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় ভস্মীভূত গ্রাম ও নগরশ্রেণী হূণপ্লাবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত। ক্ষুদ্রাকার, বৃহৎশীর্ষ, ক্ষুদ্রনাসিক মলিন শ্বেতবর্ণ হূণ অশ্বারোহীকে দেখিবামাত্র উত্তরাপথবাসিগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত, কালান্তকস্বরূপ হূণগণ অরণ্য বেষ্টন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিত ও পলায়নপর নরনারীগণকে দূর হইতে বর্ষা বা শরবিদ্ধ করিত। নগরাক্রমণ করিলেই ঝটিকাহত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় হূণগণ দুর্গপ্রাকার বা দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া অসহায় নাগরিকগণের উপর পতিত হইত, এক সময়ে নগরের নানা স্থানে অগ্নিসংযোগ করিত; তৈলসিক্ত বস্ত্রে জড়িত জীবিত শিশুর গাত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া রাত্রিকালে আলোকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত; মাতার সম্মুখে শিশুকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া শাণিত তরবারীর উপরে ধারণ করিত, হতভাগ্য শিশুর দ্বিখণ্ডিতদেহ ধূলিতে লুণ্ঠিত হইত। বৃদ্ধ সম্রাট্ অত্যন্ত পীড়িত। গোবিন্দ গুপ্ত বহু কষ্টে মগধের সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ সংরক্ষণ অসম্ভব। এই সময়ে পুরগুপ্তের নামে তরুণী মহাদেবী

সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন ; বৃদ্ধ সচিব দামোদর শর্ম্মার সকল আশার অবসান হইল।

সম্রাটের শিবির স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিলে ক্রমশঃ দুই একজন ভিক্ষু সঙ্ঘারামে আসিয়া বাস করিল। ইহারা সকলেই নিরক্ষর, বুদ্ধ অপেক্ষা উদরের প্রতি অধিক ভক্তিপরায়ণ, নির্ব্বাণ লাভাপেক্ষা তরুণী লাভের জন্য অধিক লোলুপ। ইহারা অর্থের জন্য নিরীহ তীর্থ যাত্রিকগণকে উৎপীড়িত করিত। ক্রমে ইহাদিগের ভয়ে তীর্থযাত্রিগণ আর স্তূপসান্নিধ্যে আসিতে চাহিত না। বেষ্টনী পরিক্রমণের পথ ও প্রাচীন গর্ভগৃহের দ্বার বনময় হইয়া উঠিল। এক দিন নিশীথে দূরে বহু অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলে দৃষ্ট হইল, হূণসৈন্য দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে সাম্রাজ্যের সৈনিকদিগকে ধীরে ধীরে স্তূপাভিমুখে তাড়িত করিয়া আনিতেছে। পরদিন প্রভাতে সম্রাটের সৈনিকগণ ভিক্ষুগণকে সঙ্ঘারাম হইতে দূর করিয়া দিয়া বেষ্টনী সুরক্ষিত করিল। বুঝিলাম, পুণ্যক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দূর হইতে হূণ অশ্বারোহিগণ অবিরাম বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সুতীক্ষ্ণ ফলকযুক্ত শরাঘাতে বেষ্টনীর স্থানে স্থানে আমাদিগের গাত্র ক্ষত হইতে লাগিল, বহু পরিশ্রমলব্ধ চিত্রগুলি বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু হূণ বা আর্য্য কোন জাতীয় সৈন্যই সে দিকে লক্ষ্য করিল না। প্রথম প্রহর অতীত হইলে হূণগণ অশ্বপৃষ্ঠে প্রথম বেষ্টনী পার হইবার চেষ্টা করিল, তখন বেষ্টনীর মধ্য হইতে সাম্রাজ্যের সৈনিকরা নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে নিবারিত করিল। এইরূপে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইলে হূণ অশ্বারোহিগণ স্তূপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমনপূর্ব্বক বিশ্রামের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তখন দীর্ঘকায় আপাদমস্তকবর্ম্মমণ্ডিত জনৈক যুবা সৈনিক দক্ষিণ তোরণের বাহিরে আসিয়া শত্রুসৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বেষ্টনীর মধ্যে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ বিশ্রামের আয়োজন করিতে লাগিল। তখনও দ্বিসহস্রের অধিক সৈনিক বেষ্টনীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। সেনাধ্যক্ষগণ হূণগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন যে, কিয়ৎক্ষণের জন্য যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে। সশাখ বৃক্ষসমূহ কর্ত্তৃক তোরণদ্বার চতুষ্টয় সুদৃঢ় ভাবে রুদ্ধ করিয়া সেনাধ্যক্ষ ও সৈনিকগণ বিশ্রামার্থ স্তূপের উপরিভাগে ও পরিক্রমণের পথে শয়ন করিলেন। ক্রমে কেবল কতিপয় পদাতিক ও কয়েকটি কীরদেশীয় সারমেয় জাগিয়া রহিল। ক্রমে হূণস্কন্ধাবারে রন্ধনের অগ্নি নির্ব্বা-

পিত হইল, উভয় পক্ষের সেনাই সুষুপ্তিমগ্ন হইল। নিশাদ্বিপ্রহর অতীত হইল। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া পিপীলিকার স্থায় ধীরে ধীরে কয়েকটি নিশাচর জন্তু যেন বেষ্টনী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা মনুষ্য, পশু নহে। ধীরে ধীরে একে একে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে পঞ্চবিংশতিজন হূণসৈনিক বেষ্টনী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তখন প্রহরীদলও নিদ্রিত, ক্ষীণদেহ দীর্ঘাকার কুকুরগুলি বেষ্টনী রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বতোরণের নিকটে আসিয়া হূণগণ নিমেষের জন্য দণ্ডায়মান হইল ও বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কর্পূরচূর্ণ চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে করিতে তোরণ-অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু কর্পূরের তীব্র গন্ধ সারমেয়গণের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিকে অভিভূত করিতে পারিল না, কুকুরগুলি তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রক্ষিগণ নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল যে, দুইজন হূণ আলম্বনের উপর উঠিয়াছে ও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে শরাঘাতে নিহত করিল। অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া হূণসৈনিকগণ শৃঙ্গনিনাদ করিল। দূর হইতে শৃঙ্গরবে তাহার উত্তর আসিল। দূরে হূণশিবিরে শত শত উল্কা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সাম্রাজ্যের সৈনিকগণ চেতনা লাভ করে নাই। বন্যার স্থায় অবশিষ্ট হূণবাহিনী আসিয়া বেষ্টনী আক্রমণ করিল ও পরক্ষণেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শত হস্ত পিছাইয়া গেল। এইরূপে বার বার আক্রান্ত হইয়াও সাম্রাজ্যের সৈনিকগণ আত্ম-সমর্পণ করিল না। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে আলোক দৃষ্ট হইল, সাম্রাজ্যের সৈনিকগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। হূণগণ পুনরায় বেষ্টনী আক্রমণ করিল। যখন আলম্বনের উপরিভাগে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন কতিপয় হূণসৈনিক তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে বৃক্ষকাণ্ডগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এইরূপে প্রভাতের আক্রমণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বেষ্টনীর চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। উল্লাসে কৃতান্তসদৃশ হূণ অশ্বারোহিগণ চীৎকার করিতে লাগিল ও বৃত্তাকারে পাষাণবেষ্টনীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত করিল। তাহারা জীবিত অবস্থায় একজনকেও বেষ্টনী হইতে বহির্গত হইতে দিবে না। সিংহের স্থায় গর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ম্মাবৃত যুবক তোরণপথে অগ্রসর হইলেন। জনৈক হূণ পদাতিক তাঁহার শিরস্ত্রাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিল। ফলে শিরস্ত্রাণের ঊর্দ্ধদেশ ভূমিতে পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে সমস্বরে উল্লাসে স্কন্দগুপ্তের জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইল। বাহিরে হূণগণ প্রমাদ গণিল।

বহুদিন পরে স্কন্দগুপ্তকে দেখিয়া সৈনিকগণের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইল, স্কন্দগুপ্তের নেতৃত্বে পঞ্চশত সৈনিক অবলীলাক্রমে হূণব্যূহ ভেদ করিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, পঞ্চাশৎসহস্র হূণসৈনিক চিত্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল, সেই পঞ্চশতের গতিরোধ তাহাদিগের সাধ্যাতীত। কেহ কেহ অরণ্যমধ্যে তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই পঞ্চশতের পশ্চাতে যাহারা অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদিগকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। অর্দ্ধশতাব্দী পরে জলন্ধরে বা উজ্জয়িনীতে হূণবৃদ্ধগণ বালকগণের নিকট স্কন্দগুপ্তের কৌশলযুদ্ধের কাহিনী বলিত ও শিশুদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। শতবর্ষপরে আর্য্যাবর্ত্তের মহিলাগণ প্রভাতে হূণরাক্ষসগণের কবল হইতে দেবতা, রমণী ও শস্যক্ষেত্রের ত্রাণকর্ত্তৃস্বরূপ স্কন্দগুপ্তের নাম স্মরণ করিতেন; সুদূর বঙ্গদেশে ধীবর জ্যেষ্ঠগণ মহাবিপত্ত্রাতা স্কন্দগুপ্তের নাম গান করিত ও ভক্তিজনিত অশ্রুজলে তাহাদিগের বক্ষ প্লাবিত হইত।

দহনের অসহ্য যন্ত্রণা যে কখনও অনুভব করে নাই তাহার পক্ষে আমাদিগের বর্ণনাতীত যন্ত্রণা বোধগম্য নহে। আলম্বন, স্তম্ভ ও সূচীর অভ্যন্তরস্থ স্থান ও তোরণগুলি বৃক্ষকাণ্ডে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। তাহাতে অগ্নি প্রযুক্ত হইলে সরস তরুগুলি ধীরে ধীরে শুষ্ক হইতে লাগিল ও অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তাহার শিখা গগন স্পর্শ করিল। তখন বুঝিলাম, প্রাচীন স্তূপের বিনাশের দিন আসিয়াছে। আর্তিমিদর কর্ত্তৃক স্বহস্তে বহুযত্নে নির্ম্মিত দক্ষিণ তোরণের শীর্ষস্থিত ধর্ম্মচক্র সশব্দে ভূমিতলে পতিত হইল, উত্তর তোরণের অষ্টকোণ স্তম্ভ সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল, নানাস্থানে বেষ্টনীর স্তম্ভগুলি ধরাশায়ী হইল। লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করিল। ক্রমে বেষ্টনীর পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্ব হইতে বিদীর্ণ পাষাণের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, উত্তাপ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বর্ত্তুলাকৃতি স্তূপ কম্পিত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র বজ্রনির্ঘোষের মিলিত ধ্বনির ন্যায় শব্দ পৃথিবী হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। অগরাজুর বহুযত্ননির্ম্মিত স্তূপ, মহাস্থবিরের ভিক্ষালব্ধ অর্থে নির্ম্মিত স্তূপ, সিংহদত্তের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তথাগতের শরীর একত্র সমাহিত হইতে চলিয়াছে। মহাশব্দে গর্ভগৃহ শরীর-নিধানের আধারের উপরে পতিত হইল। তদপেক্ষা ভীষণ শব্দে পাষাণনির্ম্মিত অর্দ্ধবর্ত্তুল দ্বিধা হইয়া গেল। গুরুভার পাষাণ পতনের ও বিদারণের শব্দ সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির ধ্বংসসূচক শব্দকে ক্ষণিকের জন্য পরাস্ত করিল, ধূলি ও ধূমের স্তম্ভ নীল আকাশ স্পর্শ করিল।

যন্ত্রণার লাঘব হইবার পূর্ব্বেই চিন্তা করিতে লাগিলাম, স্তূপধ্বংস হইল, কিন্তু সিংহদত্তের বহুআয়াসসঞ্চিত তথাগতের শরীর তক্ষশিলায় প্রেরিত হইল না। শুনিয়াছিলাম, তক্ষশিলায় মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষের উপরিস্থিত শ্যামল তৃণক্ষেত্রে বক্রনাশা দরদ মেষপাল মেষচারণ ও বংশীবাদন করে। পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে তক্ষশিলায় আবালবৃদ্ধ বনিতা হূণগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। আকুল হইয়া সিংহদত্তকে ডাকিলাম। স্তূপ ধ্বংস করিয়া তখন অগ্নিরাশি অরণ্যের চতুষ্পার্শ্বে ধাবিত হইয়াছে, মণ্ডলাকার ধূমরাশি মেঘরাজ্যে উত্থিত হইতেছে; দেখিলাম যেন তেজঃস্নাত দিব্যদেহ সিংহদত্ত সহাস্যবদনে দিবাকরের রাজ্য হইতে অবতরণ করিতেছেন। সিংহদত্তের ছায়া স্তূপের ধ্বংসাবশেষের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিল, দারুণ যন্ত্রণায় আকুল পাষাণকণাগুলিকে যেন বলিতে লাগিল "যাঁহার অস্থির উপরে এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি যেস্থানে আসিয়াছেন আমিও সেইস্থানে আসিয়াছি। পাটলীপুত্রবাসী মহাস্থবির, অগরাজু, অপূর্ব্বশিল্পদক্ষ যবনশিল্পিগণও সেইস্থানে আসিয়াছেন। তথায় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, যতি বা ভিক্ষু, স্তূপ বা মন্দির কাহারও আবশ্যকতা নাই। তক্ষশিলার নাগরিকগণ চিরদিনের জন্য তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিয়াছে। অগরাজুর নগরবাসিগণ তাহার শত শত বর্ষপূর্ব্বে তাহাদিগের নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি দর্প করিয়া বলিয়াছিলাম যে, নগরবাসিগণ তথাগতের ধর্ম্মে যদি কখনও বীতশ্রদ্ধ হয় তাহা হইলে তথাগতের শরীর-নিধান যেন তক্ষশিলার মহাবিহারের অধ্যক্ষকে প্রত্যর্পণ করা হয়। আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, অগরাজুর নগর তক্ষশিলার পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাগতের শরীর-নিধান সমভাবে পূজিত হইয়া আসিয়াছে। স্তূপ যে দিন ধ্বংস হইল, সে দিন কিন্তু আর তক্ষশিলায় তথাগতের শরীর-নিধান গ্রহণ করিতে জনমাত্রও নাই।" অশরীর সিংহদত্ত ধূম ধূলি ও সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন। তখন দূরে পর্ব্বতের সানুদেশে প্রজ্বলিত বনরাজি অমানিশার ঘোর অন্ধকার নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

পঞ্চশত সৈনিক লইয়া স্কন্দগুপ্ত কোন্‌স্থানে গমন করিয়াছিলেন তাহা তোমাদিগের পিতৃপুরুষরা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কীটদষ্ট জীর্ণ গ্রন্থ উদ্ধার কর, তাহার সন্ধান পাইবে। চাহিয়া দেখ, কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চশত সৈনিক গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছে, ত্রস্ত নগরবাসিগণ অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। একজন সৈনিক উচ্চৈঃস্বরে কি বলিল। চাহিয়া দেখ, পলায়নপর নগরবাসিগণ ফিরিতেছে, দলে দলে নাগরিক ও নাগ-

রিকাগণ নগ্নপদ শিরস্ত্রাণবিহীন, যুবকের সম্মুখে নতজানু হইতেছে। আগন্তুক-গণের আগমন-সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত দগ্ধাবশিষ্ট নগরীর চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। নগরের প্রধান দণ্ডনায়ক স্থানুদত্ত আসিতেছেন। যে জনতা পথশ্রমে ক্লান্ত, মলিনবেশধারী, বুভুক্ষু সৈনিকগণের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল,। কম্পিতপদে হস্তী ও অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পলিতকেশ স্থানুদত্ত নগ্নশীর্ষ যুবকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, সৈনিকগণ প্রত্যেকে শিরস্ত্রান স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিতেছে। প্রতিষ্ঠানের দণ্ডনায়ক হইবার পূর্ব্বে স্থানুদত্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বে তাঁহার অশ্ব প্রতি যুদ্ধে দৃষ্ট হইত। তিনি কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্তের শিক্ষাগুরু, স্কন্দগুপ্তের পিতামহকল্প। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে জ্যেষ্ঠপুত্র তনুদত্ত, তিনি স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন যে, রাজশক্তির সহায়তা পাইলে বৃদ্ধ পিতার অনুজ্ঞাক্রমে তিনি হূণবাহিনী মরুপারে রাখিয়া আসিবেন। সেই জন্য হূণরাজ তোরমানের আদেশে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার পুত্র হরিদত্ত প্রতিষ্ঠান নগরীর রক্ষাকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। স্থানু-দত্তের বামপার্শ্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতিষ্ঠান নগরীর অধিষ্ঠানাধরণ বিচারপতি নাগদত্ত। অপুত্রক নাগদত্ত বৃদ্ধ পিতার ক্লেশ, জ্যেষ্ঠের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আকুলপরাণ, হরিদত্তের বিয়োগজনিত অশ্রু তখনও শুষ্ক হয় নাই। লৌহনির্ম্মিত ত্রিশূলে ভর দিয়া স্থানুদত্ত অগ্রসর হইলেন। শিরস্ত্রাণ-বিহীন যুবককে দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি 'মহারাজ" মাত্র উচ্চারণ করিয়া নির্ব্বাক হইলেন। সম্বোধনে স্কন্দগুপ্ত চমকিত হইয়া উঠিলেন।

ধীরে ধীরে তনুদত্ত সকল কথা বিবৃত করিলেন কুমারগুপ্ত ইহধাম পরি-ত্যাগ করিয়াছেন, বালক পুরগুপ্ত নামেমাত্র সম্রাট; যুবতী বিধবা মজ্জনোন্মুখ তরণীর কর্ণধার, কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অলৌকিক শিক্ষার ফলে দামোদরশর্ম্মা ও গোবিন্দগুপ্ত নতশিরে আজ্ঞানুপালন করিতেছেন। বৃদ্ধ দামোদরশর্ম্মা দুশ্চরিত্রা মহিষীর বিলাস ব্যসনের ব্যয়বহন করিবার জন্য প্রজাপীড়ন করিতেছেন, অর্দ্ধ-ভুক্ত অস্ত্রবিহীন সেনাদল লইয়া গোবিন্দগুপ্ত মগধরক্ষায় নিযুক্ত আছেন। নত-জানু হইয়া তিন পিতাপুত্র ভিখারীকে সম্রাট বলিয়া অভিবাদন করিলেন ভগ্নস্বরে

স্থানুদত্ত কহিলেন,"সমুদ্রগুপ্তের নীতি অনুসারে সাম্রাজ্যের যাহা অবশিষ্ট আছে আপনি তাহার অধীশ্বর। বংশলোপ হইয়াছে তথাপিও জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

সাম্রাজ্যের কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। নাগদত্ত প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিবে, একহস্ত পুত্র ও অশীতিপর পিতা ছায়ার ন্যায় সম্রাটের অনুসরণ করিবে। মহারাজ, এই শীর্ণ দুর্ব্বল হস্তে মহাভার গরুড়ধ্বজ সিপ্রাতীর হইতে পশ্চিম সমুদ্রের তটে আনয়ন করিয়াছিলাম। সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য এখনও তাহা পুনরায় সিন্ধুতীরে স্থাপিত করিতে পারি।” নগ্নশীর্ষ, নগ্নপদ, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, ভগ্নবর্ম্মাবৃত দীন হীন ভিক্ষুক সম্রাট পিতামহের পার্শ্বচরকে আলিঙ্গন করিলেন। চাহিয়া দেখ, নবীনবলে বৃদ্ধ স্থানুদত্ত হস্তিপৃষ্ঠে গুরুভার গরুড়ধ্বজ ধারণ করিয়াছেন, সাম্রাজ্যের সেনাদল হুণযুদ্ধে পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মাবর্ত্তে তোরমান পরাজিত হইলেন, বুঝিলেন; গুপ্ত সাম্রাজ্য নূতন বলে বলীয়ান হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে এই তাঁহার প্রথম পরাজয়। দুর্লঙ্ঘ্য গোপাদ্রিশিখরে হুণরাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রেবা হইতে জাহ্নবীতীর পর্য্যন্ত আটবীক প্রদেশসমূহ হুণগণের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। জাহ্নবীর উত্তর তীর হইতে হিমাদ্রির চরণপ্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে; উত্তর মরু হইতে নূতন সেনাদল না আসিলে তোরমানের আর রক্ষা নাই, গোপাদ্রির পতন অবশ্যম্ভাবী। বিধাতার ইচ্ছা। অন্যরূপ। দূত আসিয়া সংবাদ দিল, চরণাদ্রিশিখরে গোবিন্দগুপ্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ান, স্কন্দগুপ্তের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা পাটলীপুত্রে জ্ঞাপিত হইয়াছে, বৃদ্ধ খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের দর্শন বাঞ্ছা করিয়াছেন। সম্রাটের গোপাদ্রি অধিকার করা হইল না, নতশির ক্ষুব্ধ স্কন্দগুপ্ত তোরমানের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, সন্ধিসূত্রে স্কন্দগুপ্ত গোপাদ্রিদুর্গ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা রহিল। শুভ্রকেশ স্থানুদত্তকে গোপাদ্রি-রক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া স্কন্দগুপ্ত অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে চরণাদ্রি অভিমুখে আসিতেছেন। চাহিয়া দেখ, চরণাদ্রিশিখরে গিরিদুর্গের অভ্যন্তরে কক্ষমধ্যে মুমূর্ষু গোবিন্দগুপ্ত সম্রাটকে শেষ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রবণ কর, কক্ষমধ্যে গুরু গম্ভীর স্বর এখনও ধ্বনিত হইতেছে “স্কন্দ, সমুদ্রগুপ্তের গরুড়-ধ্বজের সম্মান রক্ষা করিও, দেখিও তোরমানের বংশজাত কেহ যেন কখনও পাটলীপুত্রের সিংহাসনে না আরোহণ করে। দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিও। আর দেখিও, স্কন্দ, যদি পার যাহার জন্য সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল তাহার যথোচিত শাস্তিবিধান করিও। বিমাতা বলিয়া ভীত হইও না। সে তোমার পিতার পরিণীতা পত্নী নহে। চাহিয়া

দেখ, মগধ তীরভুক্তি কাশী ও কোশলের প্রজাসমূহ রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিয়াছে; তাহারা বলে, রাজা শস্যরক্ষা করিলে ষষ্ঠভাগ পাইবেন নতুবা নহে। সমুদ্রগুপ্তের বিখ্যাত নীতি অনুসারে গুপ্তবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের অধিকারী; সাম্রাজ্য স্কন্দগুপ্তের, পুরগুপ্তের নহে। চাহিয়া দেখ, উদপুরগুপ্তের মহাদেবী ও পুরগুপ্ত আবদ্ধ রহিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক তোরমান পুনরায় গোপাদ্রি আক্রমণ করিয়াছে, দূতপ্রেরণ না করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিয়াছে, পুনরায় হূণযুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয় হূণযুদ্ধে মৈত্রকসেনাপতি ভট্টারক কেন রাজপদে বৃত হইয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্ত কেন স্বহস্তে সমুদ্রগুপ্তের মুকুট লইয়া ভট্টারকের শিরে স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস এখনও লুপ্ত হয় নাই। স্তূপধ্বংসের সহিত আমাদিগের মনুষ্যদর্শনের আশা দূর হইয়াছে, বহির্জগতের সংবাদ পাইবার আশাও দূর হইয়াছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাধেশচন্দ্র শেঠ।

নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত ও নূতন দীক্ষায় দীক্ষিত বাঙ্গালী যখন বুঝিল—জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত জাতীয় উন্নতির পথ সুগম হইতে পারে না, তখন সে যে সাধনায় প্রবৃত্ত হইল—অতি অল্প দিনেই আমরা তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজ বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চ্চার ফলে আমরা অনেকগুলি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক চিত্র পাইয়া আমাদের অতীত গৌরবের ও অতীত দুর্ব্বলতার বিষয় জানিতে পারিয়াছি; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুরাবস্তু সংগৃহীত হইতেছে, ইতিহাস উদ্ধারের জন্য অভিযানও হইতেছে। যাঁহারা এই সাধনার প্রবর্ত্তক, যাঁহারা এই পথের পথপ্রদর্শক রাধেশ বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। রাধেশ বাবু বিবিধ সাময়িক পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন সে সকল তাঁহার অক্লান্ত শ্রমশীলতার, অসাধারণ উৎসাহের ও অনন্যসাধারণ ইতিহাসানুরাগের পরিচায়ক। বাস্তবিক "তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বাঙ্গালী গৌড়ের, পাণ্ডুয়ার ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস আলোচনায় প্রলোভিত হইয়াছেন।" রাধেশ বাবুর পাণ্ডিত্য যেমন প্রগাঢ় ছিল—তিনি তেমনই অনাড়ম্বর ছিলেন। তিনি কোন দিন আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হয়েন নাই, বরং স্বাভাবিক বিনয়বশে আপনাকে যথাসম্ভব অন্তরালে রাখিয়া কায করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিক্ষিপ্ত রচনারাজি সংগ্রহাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে জানিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি।

সংগ্রহ।

—০০—

ইতিহাস।

—০—

দিল্লী।

দিল্লী ইংরাজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের রাজধানী ছিল। এখন ও দিল্লীর সহিত ভারতের রাজধানীর স্মৃতি এমনই বিজড়িত যে, ইংরাজের দরবারও কলিকাতায় না হইয়া দিল্লীতে হইতেছে। বর্ত্তমান দিল্লী অধিক দিনের নহে। কিন্তু যে ভূমিতে বর্ত্তমান দিল্লী দণ্ডায়মান সে ভূমি অতীত-স্মৃতি-সঙ্কুল। ভারতে এই উর্ব্বর ভূমিতে, যমুনার কূলে কত রাজধানী গঠিত হইয়া ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? লিপিবদ্ধ ইতিহাসে প্রথম খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দিল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার কত কাল পূর্ব্ব হইতে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী ছিল, তাহা জানা যায় না। 'টাইমসে' দিল্লীর একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান দিল্লীর দক্ষিণে অন্ততঃ দুয়টি সহর গঠিত হইয়াছিল। এই সকল সহর ভিন্ন ভিন্ন রাজ-বংশের শোণিতে সিক্ত ভূমিতে গঠিত—ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ। আজ সে সব রাজধানী ধ্বংসকবলগত। কেবল ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় লতাগুল্মবিজড়িত সমাধিমন্দিরে বা ধর্ম্মমন্দিরে তাহাদের স্মৃতি জাগিয়া আছে। দিল্লীতে কুতব মিনার অতি বিস্ময়কর স্তম্ভ; ইহার ইতিহাস কিম্বদন্তীর শৈবালসমাচ্ছন্ন। আর দ্রষ্টব্য তোগলক শাহার অনুষ্ঠান—তোগলকাবাদ। এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাতে রাজধানী সংস্থাপিত হয় নাই।

দিল্লীর প্রান্তরে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশ রাজ্যলাভের আশায় প্রাণান্ত সংগ্রামে ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়াছে। দিল্লীর প্রান্তরে যে জয়ী হইয়াছে, সে-ই ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে। পাণিপথে তিনবার যুদ্ধে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইয়াছে—এই তিন যুদ্ধ জগতের ইতি-হাসে স্মরণীয় ঘটনা। তাহার পর সিপাহী বিপ্লবে দিল্লীতে জয়ী হইয়া ইংরাজ ভারতের আধিপত্য লাভ করেন। দিল্লীর দক্ষিণে মোগলের ইতিহাস ও উত্তরে ইংরাজের ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্র।

দিল্লীর দুর্গই দিল্লীর সৌন্দর্য্যসার। এই দুর্গই সম্রাট্ শাহজাহানের প্রাসাদ ছিল। জগতে আর কোন প্রাসাদের এমন মনোহর সিংহদ্বার নাই। বহু দিন সেনানিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়া দুর্গ-মধ্যস্থ গৃহগুলি মলিনশ্রী হইলেও তাহাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। দেওয়ান-ই-আমে রাজসভা হইত। এই কক্ষেই শাহজাহানের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন ছিল। লুণ্ঠনলোলুপ নাদের সাহ সে সিংহাসন লইয়া যায়েন। দেওয়ান-ই-খাস সম্রাটের বিলাসকুঞ্জ। এই গৃহ শ্বেত মর্ম্মরে রচিত—যেন স্বপ্নলোকের সৌন্দর্য্যস্তূপ। ইহার গম্বুজ ও চূড়া, স্তম্ভ ও প্রাচীর সবই সুন্দর। স্তম্ভগাত্র হইতে রত্নরাজি অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু এখনও এ গৃহ সুন্দর। দারুণ গ্রীষ্মের সময় নির্ঝর সান্নিধ্যে এই গৃহে সম্রাট্ মহিলাপরিবেষ্টিত হইয়া

দুর্গ।

বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেন। ইহার প্রাচীরে লিখিত উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য—"যদি জগতে স্বর্গ থাকে, তবে সে এই স্থানে—তবে সে এই স্থানে—তবে সে এই স্থানে।"

বিবিধ।

প্রাসাদ-প্রসাধিকা।

রমণীর বেশভূষানুরক্তি কাব্যে ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনে পুরুষকে পদে পদে তাহার প্রমাণ পাইতে হয়। য়ুরোপে ও আমেরিকায় ফেশানেবল বেশনির্ম্মাতার প্রভাব ধর্ম্মযাজকের প্রভাব অপেক্ষা অল্প নহে। আজও প্যারিস ফ্যাশানের কেন্দ্র; য়ুরোপের সকল দেশ ও আমেরিকা হইতে ধনবতীরা পোশাকের জন্য প্যারিসে আসিয়া থাকেন। এই সেদিন প্যারিসের কোন বেশনির্ম্মাতার প্রতিনিধি কতকগুলি নূতন নমুনা লইয়া ইংলণ্ডে আসিলে সেগুলি দেখাইবার জন্য প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার অ্যাসকুইথের পত্নী একটি মহিলা-সমিতির আয়োজন করিয়াছিলেন।

প্রসাধিকা।

কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রাজ্ঞী মেরী অ্যাণ্টয়নেটের প্রসাধিকা রোজ বার্ট্যাঁর মত প্রভাবপরিচালন-সৌভাগ্যলাভ বোধ হয় আর কোন প্রসাধিকার ভাগ্যে ঘটে নাই। অ্যাণ্টয়নেটের মত অমিতব্যয়ী রাজ্ঞী বিরল। তিনি রোজের নির্ম্মিত পোষাক না পরিয়া মহিলাসমাজে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিতেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর রোজ য়ুরোপের বেশনির্ম্মাণবিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। য়ুরোপের সকল রাণী ও ধনবতী মহিলা রোজের নির্ম্মিত বেশ পরিধান করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠেন। রোজ বুদ্ধিবলে তাঁহার মক্কেলদিগের দ্বারা যে কোন ঈপ্সিত কায করাইয়া লইতে পারিতেন। মন্ত্রী ও রাজদূত অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব ও প্রতাপ প্রবল ছিল। সে সময় ফ্রান্সের রাজনৈতিক কোন কথাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সম্প্রতি তাঁহার এক জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। রোজের জীবনকথা উপন্যাসেরই মত বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক।

আরম্ভ।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে গৃহস্থগৃহে রোজের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সামান্য সৈনিক ও মাতা শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। রোজ বাল্যকাল হইতেই রূপবতী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাশালিনী ছিলেন। যোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি প্যারিসের প্রসিদ্ধ প্রসাধিকা শ্রীমতী প্যাজেলের নিকট কার্য্যে ব্রতী হয়েন। সম্রাট্ পঞ্চদশ লুইর ভবিষ্যৎপ্রণয়িনী (কাউণ্টেস দুবারী নামে পরিচিতা) জিয়ান বেকু তখন আর একজন প্রসাধিকার দোকানে সামান্য সীবনকার্য্যে নিযুক্ত। কার্য্যারম্ভের অল্পদিন পরেই রোজকে কয়েকটি বেশ লইয়া প্রিন্সেস ডি কণ্টির নিকট যাইতে হয়। তাঁহাকে যে কক্ষে বসিতে বলা হয়, সে কক্ষে একজন বৃদ্ধা উপবিষ্টা ছিলেন। তাঁহাকে পরিচারিকা মনে করিয়া প্রিন্সেসের আগমনপ্রতীক্ষায় রোজ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করেন ও তাঁহাকে বেশ দেখান। কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া বৃদ্ধাকে সম্ভাষণ করিলে রোজ স্বীয় ভ্রম উপলব্ধি করিয়া এমন নিপুণ ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন যে, প্রিন্সেস সন্তুষ্ট হইয়া রোজকে তাঁহার দুইজন প্রিয়পাত্রীর বহুমূল্য বিবাহবেশ প্রস্তুত করিতে দেন।

এই ব্যাপার অবগত হইয়া প্যাজেল রোজকে ব্যবসায়ে অংশী করিয়া লয়েন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রোজ স্বয়ং ব্যবসা খুলেন ও কয়েক সপ্তাহমধ্যেই প্যারিসে সর্ব্বপ্রধান প্রসাধিকা বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তিনি মক্কেলদিগকে তোষামোদে তুষ্ট করিতে ও নূতন নূতন রকমের বেশ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি কেবল পোশাক প্রস্তুত করিয়াই নিরস্ত হইতেন না, পরন্তু অলঙ্কার হইতে ফিতা পর্য্যন্ত পোষাকের সকল আবশ্যক অঙ্গই প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতেন। কেশবিন্যাসেও তাঁহার পটুত্ব ছিল। মেরী এণ্টয়নেট রাজবধূরূপে ফ্রান্সে আসিলে রোজ তাঁহার সহিত পরিচিতা হয়েন। মেরী তাঁহার ব্যবহারে এমনই প্রীতা হইয়াছিলেন যে, তখনই তাহাকে বহু মূল্যবান্ বেশ প্রস্তুত করিতে দেন। পরে মেরী সাম্রাজ্ঞী হইলে রোজের প্রভাব সমগ্র য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে। তখন চূড়াকারে বন্ধ করিয়া কেশসজ্জা করা রেওয়াজ ছিল। রোজ প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন ধরণের কেশসজ্জার উদ্ভাবন করেন, কোন মহিলার মস্তকের কেশে যেন পক্ষী ফল ভক্ষণ করিতেছে, কাহারও কেশে প্রাকৃতিক দৃশ্য—কাহারও কেশে ঐতিহাসিক চিত্র—ইত্যাদি। প্রবীণারা এরূপ কেশবিন্যাস ভালবাসিতেন না। তাই রোজ এমন ব্যবস্থা করেন যে, একটি স্প্রিং টিপিলে নিমেষে কেশপাশ স্বাভাবিক আকার ধারণ করিত, আবার আর একটি স্প্রিং টিপিলে কেশপাশ পূর্ব্বসজ্জায় শোভিত হইত। রাজ্ঞীর উপর ও দেশের মহিলাগণের উপর রোজের অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সম্রাট্ ষোড়শ লুই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া ফেশানের মন্ত্রী বলিতেন। বাস্তবিক তাঁহার জন্য যে ব্যয় হইত কোন মন্ত্রীর জন্য তত ব্যয় হইত না। রাজ্ঞীই প্রধানতঃ বেশের বাবদে রোজের নিকট দুই বৎসরের ১৮০০০০টাকার ঋণজালে জড়িতা হইয়া পড়েন। রোজকে সর্ব্বদাই নব নব বেশে সজ্জিত পুত্তল য়ুরোপের নানা স্থানে পাঠাইতে হইত। তাহা দেখিয়া মহিলারা বেশের ফরমাইস করিতেন। রোজের নামে—স্বপক্ষে ও বিপক্ষে, গীত রচিত হইতে লাগিল। রোজের প্রভাব ও প্রতাপ প্রবৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজ্ঞী তাঁহাকে প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু করিয়া তুলিলেন।

ক্রমোন্নতি।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে রোজের ব্যবসায়ে অবনতি আরব্ধ হয়। য়ুরোপের নানাস্থানে বহু মহিলার নিকট তাঁহার বহু অর্থ বাকি পড়ে ও অনাদায় থাকে। এ দিকে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা-সূচিত হয়। ফরাসী সাম্রাজ্য তখন পতনোন্মুখ; অভিজাত বংশীয়গণ ব্যয়সঙ্কোচ চেষ্টায় চেষ্টিত—কিন্তু তখন আর উপায় নাই। তাহার পর বিপ্লবে রাজা ও রাজ্ঞী নিহত হইলেন। রাজ্ঞীর বন্ধু রোজ লণ্ডনে পলায়ন করিলেন ও তথা হইতে জর্ম্মাণীতে গমন করিলেন। বিপ্লবের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পতন হইলে রোজ বহু চেষ্টায় ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আবার পূর্ব্বব্যবসায়ে ব্রতী হয়েন। কিন্তু তখন তাঁহার সৌভাগ্য-তপন চিরতরে অস্তমিত। ফ্রান্সের রাজ্ঞী, রাজপারিষদ ও অভিজাতবংশীয়গণের অমিতব্যয়িতা ও তাহারই অনিবার্য্য ফল—প্রজার প্রতি অত্যাচার প্রধানতঃ ফরাসীবিপ্লবের কারণ। এই অমিতব্যয়িতার প্রসারে রোজ সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাই ফরাসীবিপ্লবের রক্তসিক্ত ইতিহাসে এই প্রসাধিকার একটু স্থান পাইবার দাবী আছে।

ভাগ্যবিপর্য্যয়।

আর্য্যাবর্ত্ত—

কুতব মিনার।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ ।

আর্য্যাবর্ত্ত ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত ।

সূচী ।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু ।

১০।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা] [বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা

Printed by—R. C. MITRA, at the VISVAKOSHA PRESS,
21/8 Santiram Ghose's Street, Calcutta.

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মালদহের পালনগরাদি।

রামচরিত-বর্ণিত নগরাদির সহিত
ধর্ম্মমঙ্গলাদি গ্রন্থ-বর্ণিত
নগরাদির সম্বন্ধ-
নির্ণয়

(১)

রাজগাঁ।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে রাজসম্ভাষণ পালায়—

রাজগাঁ বা রাজনগরের বিবরণ।

"রমতী রহিল পাছু রাজগাঁ রঞ্জিত।
দেখা দেখি গৌড় নগরে উপনীত॥"

লিখিত আছে। রমতীর পর রাজগাঁ। এই রাজগাঁ রাজনগর ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। রাজনগর শেষে শ্রীহীন হইয়া রাজগাঁর পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল।

হজরৎ-পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে রাজনগর নামে একটি মানবহীন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপাদি-চিহ্নিত ভূখণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত হইলেও পালশাসনকালে ইহা গঙ্গাতীরেই বিদ্যমান ছিল। রাজনগর যে পূর্ব্বকালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান কালে "রাজনগর পরগণা" বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। ইহা একটি বিস্তীর্ণ পরগণা। এই পরগণার মধ্যে "মদনাবতী" চাকনগর বা চক্রনগর, দৌলৎপুর প্রভৃতি প্রাচীন স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।

(ক) মদনাবতী।

রামপালপাৰ্শ্বী মদনাবতী-প্রতিষ্ঠিত মদনাবতী নগরী।

জিলা মালদহ, থানা বামুনগোলা, লাট দৌলৎপুরের অন্তর্গত মৌজা মদনাবতী, ওরফে কসবা।

সংস্থান ও বর্ত্তমান অবস্থা।

ইহা বামুনগোলা হইতে ছয় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর ভাগে অবস্থিত; প্রায় তিন চারি হাজার বিঘা উন্নত ভূখণ্ডোপরি পরিখা ও উন্নত প্রাচীর-বেষ্টিত ভূখণ্ড। প্রাচীরের ইষ্টকস্তূপ মাল্যের ন্যায় মদনাবতী-দুর্গ বেষ্টিত করিয়া আছে। অভ্যন্তরে চারি পাঁচ শত বিঘা পরিমিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সুন্দর দীঘী বর্ত্তমান। ইহার চারিটি পাড়ই

ইষ্টক-পাষাণ-মণ্ডিত ছিল এবং উহার উপর রাজপ্রাসাদ শোভিত ছিল। সমগ্র ভূখণ্ড ইষ্টক-প্রস্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কোথাও কোথাও সুন্দর, সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ-সমূহ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন স্থানে গম্বুজের কিয়দংশ, কোথাও ভগ্ন প্রাচীর ও গৃহাদির সামান্ত অংশমাত্র বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের বিশাল নিদর্শন ব্যক্ত করিতেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিকৃত দেবদেবীর পাষাণমূর্ত্তি একত্র করিলে একটি স্তূপে পরিণত হইতে পারে। নগর-প্রবেশের চারিটি তোরণদ্বার ছিল।

ঐতিহাসিক তথ্য।

রামপালদেবের এক স্ত্রীর নাম মদনদেবী। ইনি মদন পালের মাতা। রামপাল বরেন্দ্র অধিকার করিয়া উত্তর বরেন্দ্রে রাজ্ঞীর নামে মদনাবতী পুরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পুরী উত্তর বরেন্দ্রের সীমান্ত-দুর্গবৎ ছিল।

(খ) লাট দৌলতপুর (লালাগোলা)

মদনাবতীর একক্রোশ দক্ষিণে তঙ্গনতীরে অবস্থিত। ইহা মদনাবতীর বাণিজ্য-প্রধান বন্দর ছিল। মদনাবতী হইতে দৌলৎপুর পর্য্যন্ত সৌধমালা শোভিত ছিল। ভগ্ন বিকৃত প্রস্তরময় বামুণী চামুণ্ডা, কালী, শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

দৌলতপুর লালাগোলা।

(গ) চাকনগর (চক্রনগর)

চাকনগর বা চক্রনগর।

লাট দৌলৎপুর (তৌজিনম্বর ২৩৭) থানা গাজোল।

বর্ত্তমান অবস্থা।

ত্রিশ চল্লিশ বিঘা উন্নত ভূখণ্ড—প্রাচীর-বেষ্টিত। চারিদিকে চারিটি গৌড়ীয় ধরণের উচ্চ সিংহদ্বার শোভিত রহিয়াছে। অভ্যন্তরস্থ ভূখণ্ডে কতকগুলি কবর। তন্মধ্যে মকদুম সাহেবের সুবৃহৎ সমাধি বিদ্যমান। ডায়লা নামক ফকির উক্ত দরগার সেবাইত।

এই চক্রনগরের পরিসর বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। দরগার বাহিরে গড়ের উত্তরে দশ পনের রশি দূরে বহু দেবদেবীর ভগ্ন—অভগ্ন পাষাণমূর্ত্তি পতিত আছে। সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের ফুল জল যোগাইয়া থাকেন। এই স্থান বুদ্ধধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তক বা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণের বাসস্থান বা বিহার বলিয়া মনে হয়।

(ঘ) রঞ্জিত (রঞ্জ)*

পুরাতন মালদহের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বভাগে তঙ্গনতীরে। বহু অট্টালিকার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। প্রবাদ—এইস্থানে হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল। নিকটে রঞ্জবিল, গাঙ্গীনাক্ (গাঙ্গনী বিল) রোহিত (রোহিতবাসী) নামক বিল ও স্থান আছে।

রঞ্জনগর

(২)

গৌড়হাণ্ড

ইহা একটি পরগণা। উত্তর বরেন্দ্রের অন্তর্গত। প্রাচীন স্থান। বহু প্রাচীন চিহ্নে চিহ্নিত। পালগৌড়ের উত্তরসীমা। গৌড়হাণ্ডমধ্যে বহু প্রাচীন গ্রাম ও পল্লীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

গৌড়ভাণ্ডার বা গৌড়হাণ্ড।

(৩)

হাতীণ্ডা

মালদহের অন্তর্গত হাতীণ্ডা একটি বিস্তীর্ণ পরগণা। চাঁচল হইতে কৈবর্ত্তনগরী ডমর তিন ক্রোশমাত্র ব্যবধান। চাঁচল হইতে হাতীণ্ডা এক মাইল উত্তরে অবস্থিত।

হস্তীন্দ্রপুরী বা হাতীণ্ডা।

বর্ত্তমান অবস্থা।

লোকহীন অরণ্যময় স্থান। বিস্তীর্ণ উন্নত ভূখণ্ডোপরি প্রাচীন হাতিণ্ডা নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ন্যূনাধিক ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্রাধিক জলাশয় বিদ্যমান রহিয়াছে। হাতীণ্ডার পাদদেশ দিয়া সোমানদী প্রবাহিতা ছিল। ইহা মহানন্দার শাখা। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইষ্টকরাশি ও ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, ইহা একদা গৌড়নগরের ন্যায় সুন্দর নগর ছিল।

শিবপুখর, শিবলিঙ্গ

হাতীণ্ডায় বহু ভগ্ন দেবদেবী মূর্ত্তি পতিত থাকিলেও এক বিপুলকলেবর শিবলিঙ্গ অক্ষত শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। নিকটে শিবপুষ্করিণী। প্রবাদপরম্পরায় বশবর্ত্তী হইয়া বরেন্দ্র-

শিবরাজ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ।

* লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলিতে পারি না।

বাসী আজিও শিবরাত্রির দিন এই স্থানে আগমন করিয়া শিবসরোবরে স্নান ও শিবপূজা করিয়া কৃতার্থ হয়।

প্রবাদ এই নগরে শিবরাজা রাজত্ব করিতেন, তিনিই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

ঐতিহাসিক তথ্য।

রামপালের আত্মীয় মহনদেব ও সুবর্ণদেব * বরেন্দ্রে বাস করিতেন। ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ সেকালের প্রথানুসারে তাঁহারা পালরাজের নিকট বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পাইয়াছিলেন। শিবরাজ রামপালের মহাপ্রতিহার ছিলেন। মহনদেব বীর ছিলেন এবং তাঁহার সমরকুশল বহু হস্তী ছিল। তিনি হস্তিবলে বলীয়ান্ ছিলেন। তাঁহার হস্তিশালায় বহু হস্তী ছিল। তিনি "হস্তিপতি" আখ্যায় বিভূষিত হইয়া থাকিবেন। বহু সংখ্যক হস্তিমধ্যে "বিন্ধ্যমাণিক্য" নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক হস্তী ছিল। সেই বিন্ধ্যমাণিক্যে আরোহণ করিয়া তিনি দেবরক্ষিতনামা রাজাকে পরাজিত করিয়া বিপুল যশস্বী হইয়াছিলেন। বিন্ধ্যমাণিক্য হস্তীন্দ্র এবং মহনদেব হস্তীন্দ্রপতি ছিলেন। সমরকুশল বহু হস্তীর অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া মহনের হস্তীন্দ্র (হস্তী রাজ) খ্যাতির অন্য কারণ হইতে পারে।

হস্তীন্দ্র বা হাতীওার নামোৎপত্তির কারণ।

রামচরিতের টীকাকার লিখিয়াছেন—

"মহনেন বিন্ধ্যমাণিক্যং করেণুরাজমারুহ্য" ইত্যাদি.

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রাম—টীকা)

"করেণুরাজ বিন্ধ্যমাণিক্য হইতেই হস্তীন্দ্রপুর বা হাতীওা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ডমরনগর হস্তীন্দ্র (হাতীওা) পুরী হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। কৈবর্ত্তরাজ ভীম বরেন্দ্র অধিকার করিয়া পালরাজগণের বরেন্দ্রশাসনভূমি হস্তীন্দ্রপুরের সান্নিধ্যে ডমর নামক উপপুর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমি ও ডমরনগর রামপালের হস্তগত হইলে, হস্তীন্দ্রপুরের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছিল; এবং তথায় কাণুদেব ও শিবরাজ অবস্থান করিতেন। শিবরাজ হস্তীন্দ্রপুরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হাতীওা পরগণার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাচীন চিহ্নে চিহ্নিত গ্রাম ও নগর বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশই জনহীন বনাচ্ছন্ন।

* ইঁহাদের বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

হাতিণ্ডা পরগণার অধীন তিনটি প্রাচীন চিহ্ন ।

(ক) মকদুমপুর

পিরোজপুর তালুকের অন্তর্গত মৌজা মকদুমপুর ; থানা খরবা ; যোখা নদীতীরবর্ত্তী উন্নত ভূখণ্ড। চাঁচল ও সরণগঞ্জের কাঁচা রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে। হাতীণ্ডা হইতে তিন মাইল উত্তরে।

বর্ত্তমান অবস্থা।

বহু ভগ্ন গৃহাদির চিহ্নস্বরূপ ইষ্টকপ্রস্তর পতিত রহিয়াছে। অদ্যাপি একটি উচ্চ প্রাচীরের অংশবিশেষ দণ্ডায়মান আছে।

প্রবাদ।

এই স্থানে মকদুমসাহেব গাজির সমাধি বিদ্যমান আছে। প্রবাদ তিনি জীবিত অবস্থায় সমাধি লাভ করিয়াছিলেন।

(খ) ওয়াড়ী

থানা তুলসীগঞ্জের এলাকাধীন এবং ঐ স্থান হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। রাশিকৃত প্রস্তর ও ইষ্টক প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন ঘোষণা করিতেছে। এই স্থান হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবালয়ে পূর্ণ ছিল।

বিশেষত্ব।

এইস্থানে বহুসংখ্যক হস্তপদভগ্ন বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সে সকল একত্র করিলে একটি বৃহৎ স্তূপে পরিণত হইতে পারে।

(গ) লক্ষণপুর।

থানা তুলসীগঞ্জের অধীন, চাঁচল হইতে তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে প্রস্তরময়ী শ্মশানকালী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন। ইহা প্রাচীন-নিদর্শন-পূর্ণ স্থান।

উপসংহার।

পালনগরী রামাবতীর স্থাননির্দ্দেশ-কল্পে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত কতিপয় পালনগরীর সন্ধান মালদহে প্রাপ্ত হইতেছি।

রামাবতী বর্ণনায় মালদহস্থ কতিপয় পালনগরী ও কীর্ত্তির আবিষ্কার।

(১) বর্ত্তমান মালদহের অমরতী (অমৃতী) প্রাচীন পালনগরী রামাবতী। রমতীনগর, রমতী ও রমৌতী বর্ত্তমান অমরতী।

(২) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরপার্শ্বে বরেন্দ্র ভূভাগান্তর্গত (সেনরাজগণের সময়ের) বৌদ্ধগৌড় (পালরাজধানী গৌড়) রামাবতীর অনতি উত্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৩) বিখ্যাত জগদ্দলবিহার রামাবতীর পার্শ্বে ছিল। এই নামে আরও কয়েকটি জগদ্দলবিহার (জগদল) প্রাচীন কালে বর্ত্তমান মালদহ জিলায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৪) বরেন্দ্রস্থ কৈবর্ত্তনগর "ডমর" বর্ত্তমান ডমরল বা ডমরইল। বর্ত্তমান কালে মালদহ জিলার অন্তর্গত।

(৫) "হাতীণ্ডা" (বর্ত্তমান মালদহে) পালশাসনকালে হস্তীন্দ্রপুর নামে খ্যাত ছিল। রামপালের মাতুলপুত্র রাষ্ট্রকূটবংশীয় অনঙ্গদেবের বিখ্যাত হস্তী "বিন্ধ্যমাণিক্য" এই নগরে ছিল। করেণুরাজ বিন্ধ্যমাণিক্য হইতে হস্তীন্দ্রনগরের উৎপত্তি হইয়াছে। হস্তীন্দ্র হইতেই হাতীণ্ডা হইয়াছে। অধুনা "হাতীণ্ডা পরগণা" বিদ্যমান।

(৬) বর্ত্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড়ের অন্তর্গত বড় সাগরদীঘী, অমরদীঘী, রাজনগরের পালখনন-দীঘী রামপালের খনিত।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর।

'রামচরিত' লেখক সন্ধ্যাকরনন্দী রামপালের দ্বিতীয়পুত্র মদনপালের সময় রামচরিত সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পিতামহ পিনাকনন্দী এবং পিতা সান্ধি-বিগ্রহিক প্রজাপতিনন্দী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বাস করিতেন।

"বসুধাশিরোবরেন্দ্রী মণ্ডল চূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন পুরাপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥"

(রামপালচরিত্রং কবিপ্রশস্তিঃ)

সন্ধ্যাকর নন্দী—বসুধার শীর্ষস্থানীয় বরেন্দ্রমণ্ডলের চূড়ামণিরূপ শ্রীপৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নগরের অন্তর্গত কুলীনগণের বাসভূমি বৃহদ্ বটু* (?) নামক স্থানে বাস-করিতেন। এই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী ছিল না, উপনগরবৎ ছিল।

"অবদান (না) ম্ রঘুপরিবৃঢ় গৌড়াধিপরামদেবযোস্তৎ।
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল বাল্মীকিঃ॥"

(ঐ)

রামপাল গৌড়াধিপ ছিলেন। এই গৌড় "বৌদ্ধ গৌড়"; রামপালের রাজধানী এবং বরেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল। গৌড়নগর তৎকালে সুদীর্ঘ ছিল।

* বৃহদ্বটু—বড় বটর (বটোরী) বা বড়গ্রাম।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন,* ভালেশ্বরী এবং আদিনাপুর তখন গৌড়নগরের কিঞ্চিদ্দূর-বর্ত্তী উপনগর ছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বাস করিতেন।

ঐতিহাসিক তথ্য।

মহীপাল গৌড়-বরেন্দ্রে রাজত্ব করিতেন। গৌড়ান্তর্গত রাঢ়ে তাঁহার সামন্ত-শাসনজন্য নববিজিত ভূভাগে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল বিগ্রহপালের পুত্র। মহীপালের প্রকৃতি সৎ ছিল না। তাঁহার শাসনকালে বীর্য্যহীনতার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। বরেন্দ্র কৈবর্ত্তগণ প্রবল হইয়া বরেন্দ্র অধিকার করিয়া ডমরনগর স্থাপন করিলে পালরাজ্য কৈবর্ত্তগণের হস্তগত হয়।†

রামপাল পিতৃরাজ্য পুনরাধিকার করিয়া পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং রামাবতী নগরে স্ত্রীসহ বাস করিতেন। আত্মীয় স্বজন লইয়া সমগ্র পালরাজ্যে অবস্থান ও রাজ্যশাসন রামপালের শাসননীতি ছিল। কৈবর্ত্তগণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য ও অপর নরপতিগণদ্বারা উত্যক্ত হইবার আশঙ্কায় রামপাল রাজ্যের বহু স্থানে দুর্গ ও সামন্তশাসননগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শূরপাল রাঢ়ে, রাজ্যপাল গৌড়ে এবং মদনপাল মদনাবতীতে অবস্থান করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন।

কালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনসিংহাসন—গৌড়সিংহাসন নামে খ্যাত হইয়াছিল। পাল নরপতিগণের সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রভাব হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে গঙ্গা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-পার্শ্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন ও রাজনগরাদি স্থান গৌড়নামে খ্যাত হইয়াছিল অর্থাৎ সেই সময়ে বঙ্গের রাজধানী গৌড় উক্ত স্থানে ছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত।

---

* পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাচীন রাজধানী; শূরবংশের সময় খ্যাতিলাভ করে। বহুকাল "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন" নামে সম্মান পাইয়াছিল। গৌড় ও বঙ্গের রাজধানী ছিল। গৌড় রাজছত্র ও বঙ্গীয় রাজছত্র দুইটি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনোপরি শোভা পাইত। দুইটি রাজছত্র একসিংহাসনে ছিল বলিয়া ইহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। বাৎস্যরাজ (গুর্জ্জররাজ) গৌড় জয় করিয়া উক্ত ছত্র দুইটি লইয়া অতিশয় গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। (Ep. Ind. Vol VI. p. 243)

† মালদহে মহীপাল সম্বন্ধে কয়েকটি গান পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মহীপালে যুদ্ধে পরাস্ত হইবার পর দিনাজপুর অঞ্চলে প্রস্থান করেন এবং তথায় মহীপালদীঘী খনন ও সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া সাধুজীবন যাপন করেন এরূপ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু রামচরিতের বর্ণনানুসারে আমরা জানিতে পারি যে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হইয়াছিলেন। অতএব দিনাজপুর অঞ্চলে তাঁহার সাধুজীবন যাপন এবং সৎকার্য্য অনুষ্ঠানের কথা অলীক বলিয়া বোধ হয়।

চূড়ামণিযোগ।

১

পূজার সময় কোন বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। তথায় নবপ্রকাশিত বহু উপন্যাস দেখিয়া "বাঁশবনে ডোমকাণা" হইয়া কতকগুলি উপন্যাস আনিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর আপনার ঘরে একাকিনী একখানা উপন্যাস পাঠ করিতেছিলাম। সহসা ঘরে কে আসিল। মুখ তুলিয়া দেখি—আমার বড় জা। তিনি একটা নিমন্ত্রণে মামার বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া গহনা না খুলিয়া—কাপড় না বদলাইয়াই আমার ঘরে আসিয়াছেন দেখিয়া বুঝিলাম—একটা কোন জবর খবর আছে; সেটা না বলিতে পারিলে "বড়দিদির" পেট ফুলিয়া উঠিতেছে। আমি মুখ তুলিলেই তিনি বলিলেন, "শুনিয়াছ, ছোট বৌ, এবার শ্যামাপূজার পরদিন চূড়ামণিযোগ।"

আমি বলিলাম, "বটে?"

"হাঁ। দিদিমা ও বড়মামী কাশী যাইতেছেন।"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "বেল পাকিলে কাকের কি?" আমাদের গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন—আমাদের শাশুড়ী এ সব "বাড়াবাড়ি" ভালবাসেন না। তিনি বলেন, "এখনকার মেয়েদের সবই বাড়াবাড়ি।"

আমার বড় জা একটু জাঁদরেল গোছের লোক। তিনি বলিলেন, "তুমি বল কি? এত বড় একটা যোগ—পরকালের কায করিব না?"

আমি বলিলাম, "কেমন করিয়া করিবে?"

"তোমার সঙ্গে আবার মানুষ পরামর্শ করে! আমার যেমন মরণ নাই—তাই তোমাকে এ সব বলি। তুমি যাহাই বল—আমি কাশী না হয় ত্রিবেণী যাইব। ত্রিবেণী ত দূর নহে।"

রাত্রিকালে স্বামীকে বলিলাম, "এবার চূড়ামণিযোগে অনেকে কাশী—ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে যাইতেছে।"

স্বামী বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কেন, কলিকাতার অপরাধ?"

"সে সব তীর্থে যে গঙ্গা উত্তরবাহিনী"

"ঠিক বটে! সেইজন্যই আমাদের স্নানের ঘরে চৌবাচ্চাটা কলের উত্তর দিকে—জল উত্তরদিকে যায়। যে এঞ্জিনিয়ার বাড়ীর নক্সা করিয়াছিল—তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিটা খুবই প্রবল ছিল।"

ঠাট্টা করাটা আমার স্বামীর এমনই অভ্যাস যে, অনেক সময় তাঁহার কোন্ কথাটা ঠাট্টা আর কোন্‌টা নহে, স্থির করা দুর্ঘট হইয়া উঠে। ঠাট্টাটা সময় সময় কিছু অতিরিক্ত এবং কঠোরও যে না হয়, এমন নহে। আমি আর কিছু বলিলাম না। উদ্দেশে গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া নিরস্ত হইলাম।

তখন কে জানিত—আমি যখন চূড়ামণিযোগে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান-বিষয়ে নিরাশ হইলাম, তখন অদৃষ্টদেবীর মিষ্টমুখে দুষ্টহাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল?

২

চূড়ামণিযোগের আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে। প্রত্যূষে আমাদের বাটীর সম্মুখে রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী থামিল। স্বামী উঠিয়া জানালা খুলিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "এ কি?" তিনি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চশমা পরিলেন।

আমি উঠিয়া যাইয়া দেখিলাম, বাটীর সম্মুখে দুইখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। গাড়ীর উপর তোরঙ্গ ও বিছানার মোট হইতে ধামা, কুলা প্রভৃতি বহু দ্রব্যের স্তূপ। দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইলাম।

গাড়ী দুইখানি হইতে অনেকগুলি স্ত্রীলোক নামিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী পুরুষদিগকে দেখিয়া স্বামী বলিলেন, "ওঃ—গঙ্গাস্নানের যাত্রী। মামার বাড়ী হইতে সকলে আসিয়াছেন।"

তিনি নিম্নতলে বৈঠকখানায় চলিয়া যাইলেন। আমি শঙ্কিতহৃদয়ে ঘোমটা টানিয়া শাশুড়ীর ঘরের দিকে চলিলাম। আমার শঙ্কার কারণ—এ কয়দিন কত সাবধানেই থাকিতে হইবে! আমি কলিকাতার মেয়ে—কলিকাতার মেয়েদের "বাবু" ও "বিবি" অপবাদ ত আছেই, আবার অসাবধান হইয়া অপবাদ-উপাধির সংখ্যা না বাড়াই।

৩

গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দিদিশাশুড়ী, তাঁহার দুই জা ও এক ননদ প্রধান। এই ননদ অর্থাৎ আমার শাশুড়ীর পিসি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। তিনি কাশী যাইয়া যোগে গঙ্গাস্নানের প্রস্তাব করিলেন।

শাশুড়ী সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যাঁহারা গঙ্গাস্নানের জন্য এত দূর আসিয়াছেন, তাঁহারা সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা পুনঃপুনঃ শাশুড়ীর যুক্তির বিরুদ্ধযুক্তি বাহির ও জাহির করিতে লাগিলেন।

শেষে আর কোন যুক্তি না পাইয়া ডুবিবার সময় মানুষ যেমন কুটাগাছটা

যত্নে, শাশুড়ী তেমনই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কথা তুলিলেন ; বলিলেন “তাহাও কি হয় ? যোগের পরদিনই যে ভাইফোঁটা—বৌদের সব গোছগাছ করিয়া দিতে হইবে।”

আমি ঘোমটা টানিয়া একপার্শ্বে বসিয়া মামাশ্বশুরের অত্যন্ত দুরন্ত, ধূলিমলিন ছেলেটিকে “আদর করিয়া” একটু সুখ্যাতি অর্জ্জনের চেষ্টায় ছিলাম। দিদি শাশুড়ী আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল, ছোট বৌদিদি, ভাইফোঁটার সব গুছাইয়া লইতে পারিবে না ?”

আমি শাশুড়ীর ভাইঝির মারফৎ বলিলাম, “পারিব। না হয় আগের দিন বাপের বাড়ী যাইয়া সব গোছ করিব। মেজদিদি ত বাড়ীতেই থাকিবেন।” কিছুদিন পূর্ব্বে আমার মেজ জা'র ভ্রাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি এবার ভাইফোঁটায় পিত্রালয়ে যাইবেন না, ছেলেরাও একদিন তাঁহার কাছে থাকিতে পারিবে।

আমার উত্তরে গঙ্গাস্নানার্থিনীরা সোৎসাহে শাশুড়ীকে কাশী যাইবার জন্ত ধরিলেন। শাশুড়ী অনন্যোপায় হইয়া সম্মতি দিলেন।

৪

শাশুড়ী কাশী যাত্রা করিলেন। আমার বড় জা বলিলেন, “এইবার ত্রিবেণী যাইবার যোগাড় কর।”

আমি স্বামীর নিকট সে প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন, “সে কি করিয়া হইবে ?”

আমি বলিলাম, “যদি আমি বাপের বাড়ী হইতে যাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি ?”

“কে লইয়া যাইবে ?”

আমার ভ্রাতা হেমন্তকুমার বি. এ. পাশ করিয়া এম. এ পড়িতেছিল, ফুটবল খেলায়—বাইক চড়ায় ও সন্তরণে তাহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। পথচলা বিষয়ে তাহার পটুত্বে স্বামীর বিশেষ আস্থা ছিল।—তাহা আমি জানিতাম ; বলিলাম, “যদি হেমন্ত লইয়া যায় ?”

স্বামী বলিলেন, “তাহা হইলে যাইতে পার।”

আমি পুলকিত হইলাম। পুলকের কারণ দ্বিবিধ—প্রথম গঙ্গাস্নানের সম্ভাবনায়, দ্বিতীয় আপনার চেষ্টার সাফল্যে। আমরা স্ত্রীরা যদি স্বামী মহাশয়দিগের দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া সুবিধা খুঁজিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পটু না হইতাম, তবে সংসারে আমাদিগকে পদে পদে হারিতেই হইত।

আমার সাফল্যে আমার বড় জা বড়ই প্রীতা হইলেন, বলিলেন, "আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।"

আমাদের দুইজনের বাপের বাড়ী একপাড়ায়। উভয়ে পরিচয়ও বিবাহের পূর্ব্ব হইতে। পাড়ায় খৃষ্টানদিগের একটা বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। যে বাড়ীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার উঠানে এক পিপা জমাট সিমেণ্ট পড়িয়া ছিল—আমার জা সেইজন্য স্কুলকে "ছিমন্তমাটীর স্কুল" বলিতেন। আমরা দুইজনেই ছেলাবেলায় সেই স্কুলে "কর" "খল" পাঠের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টের কীর্ত্তি-কথা শুনিতাম। তথায় উভয়ে পরিচয়। তাহার পর আমার বিবাহের সময় হেমন্তকুমার বালক। তখন হইতে সে আমার শ্বশুরবাড়ী আসিতেছে। সুতরাং তাহার সহিত যাইতে আমার বড় জা'র কোনরূপ সঙ্কোচের কারণ ছিল না।

৫

ভাবিয়াছিলাম, কলিকাতায় ভিড়ে স্নানে কষ্ট পাইতে হইবে—ত্রিবেণীতে স্বচ্ছন্দে আরামে স্নান করিতে পাইব; সে অবধি যাইবার উৎসাহ কয়জনের থাকে? কিন্তু হাওড়ায় যাইয়া সে ভুল ভাঙ্গিল। বৃহৎ ষ্টেশনে স্থান নাই। ভিড়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমন্ত বলিল, "মফঃস্বলের অগঙ্গাদেশের লোক গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতায় আইসে, আর তোমাদের মত কলিকাতার লোক ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে যায়।"

আমি জা'কে বলিলাম, "কি হইবে? ত্রিবেণীতে কি এত লোকের স্নানের উপযুক্ত ঘাট আছে?"

তিনি বলিলেন, "এত লোক যদি স্নান করিতে পায়—আমরাও পাইব। ভিড়—ও আমাদের কপাল। বলে—

'আমি যা'ব বঙ্গে
কপাল যা'বে সঙ্গে।'

তাহাতে ভয় কি?"

মগরায় নামিলাম—গাড়ী বদল করিতে হইবে। সে গাড়ী কলিকাতার ট্রামেরই "বড় দাদা।" এত যাত্রীর যাইবার মত গাড়ী নাই—তাই মালগাড়ীতে লোক বোঝাই দিতে লাগিল। গাড়ী আর ছাড়ে না। আমরা ব্যস্ত হইতে লাগিলাম—বুঝি পোড়া অদৃষ্টে "সব পথ দৌড়াদৌড়ি—খেয়াঘাটে গড়াগড়ি" হয়।—বুঝি গ্রহণে স্নান হয় না! শেষে ট্রেণ ছাড়িল।

আমরা ত্রিবেণীতে পৌঁছিলাম। হেমন্ত ঘড়ী দেখিয়া বলিল, "আর পনের মিনিট আছে। শীঘ্র চল।"

সে বলিল, 'শীঘ্র চল'। কিন্তু সে ভিড়ে শীঘ্র যাই কিরূপে? বহু কষ্টে হেমন্ত আমাদিগকে জলকূলে আনিল। কিন্তু আমার জা বলিলেন, "এ যে আঘাটা! আঘাটায় স্নান করিব না।"

আমি বলিলাম, "গঙ্গা সর্ব্বত্রই সমান।"

তিনি বলিলেন, "তবে কলিকাতা ছাড়িয়া ত্রিবেণীতে আসিলে কেন?"

আমি নিরুত্তর হইলাম।

হেমন্ত বলিল, "ঐ বাঁধাঘাট দেখা যাইতেছে। কিন্তু ও ভিড়ে কি করিয়া স্নান করিবে? চল। আজ অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে।"

হেমন্ত অনেক চেষ্টায় আমাদিগকে গ্রহণের স্নান ও মুক্তির স্নান করাইয়া ষ্টেশনে ফিরাইয়া আনিল। অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ ছাড়িবার কথা।

৬

ট্রেণ যথাকালে আসিল না। ট্রেণ আসিতেই প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। তাহার উপর যাত্রীর ভিড়। আমরা যখন মগরায় আসিলাম, তখন কলিকাতার গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে; পরের গাড়ী আসিতে এক ঘণ্টার অধিক বিলম্ব আছে।

হেমন্ত হাসিয়া বলিল, "বলিয়াছি আজ অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। এখন চল, ঘরে যাইয়া বসিবে।" সে হাসিল বটে, কিন্তু আমার কষ্ট হইতে লাগিল। বেচারা সারাদিন উপবাসী রহিল! এ সব কষ্ট কি পুরুষের সহে?

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের বসিবার ঘরের দ্বারে যাইয়া দেখি, ঘরে তিনচারিজন ভদ্রলোক। আমরা পিছাইয়া আসিলাম। হেমন্ত বলিল, "আমি বলিতেছি যে, তোমরা বসিবে। ভদ্রলোকরা শুনিলে নিশ্চয়ই বাহির হইয়া যাইবেন।"

আমাদের অদৃষ্টে ভোগ আছে; কে খণ্ডাইবে? আমি বলিলাম, "থাক্ আমরা ঐ দিকে যাই।"—যথায় অন্যান্য শ্রেণীর যাত্রী মহিলারা বসিয়া ছিলেন, আমরা তথায় যাইয়া বসিলাম ও পার্শ্ববর্ত্তী দুইটী যুবতীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহারাও দুই জা; গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন, হুগলী যাইবেন। আমরা তাঁহাদের ছেলেমেয়ের কথা, শ্বশুরশাশুড়ীর কথা—সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা খুব অমায়িক; বেশ আলাপ জমাইয়া লওয়া গেল।

সহসা আমার বড় জা আমার গা টিপিলেন। আমি চাহিয়া দেখিলাম—

কক্ষে কাট্‌কিমাট্ কি জিনিসভরা একটি ধামা লইয়া একজন প্রৌঢ়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কি সর্ব্বনাশ—"যেখানে বাঘের ভয়—সেইখানেই সন্ধ্যা হয়?" ইনি যে শাশুড়ীর কৃষ্ণমাসী! ইনি শাশুড়ীর সম্পর্কে মাসী। কতকগুলি স্ত্রীলোক অকারণে ঘনিষ্ঠতা করিতে যেমন পটু,অহেতুক কলহ করিতেও তেমনই পটু। ইহারা সম্পর্কের একটু সূত্র পাইলেই ঘনিষ্ঠতা করে—কাযকর্ম্মে আসিয়া অত্যন্ত আত্মীয়তার নামে কর্ত্তৃত্ব করে, গোল করিতে বড় ভালবাসে, অনাবশ্যক চীৎকারে আপনার অতিরিক্ত শ্রমশীলতার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পায় এবং লোকের মুখের উপর কট্ কট্ করিয়া অপ্রিয় কথা বলে। এই সকল মুখরা মুখের জোরে সর্ব্বত্র জয়ী। কৃষ্ণমণি সেই দলের লোক। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা উভয়েই ঘোমটা টানিয়া দিলাম। আমার আশা ছিল, তিনি আমাকে বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারিবেন না, কারণ আমি আমার জা'র পশ্চাতে ছিলাম এবং আমার জা একটু হাড়েমাংসে জড়িত।" কিন্তু আমার ঘোমটার ঘটাটা বোধ হয় কিছু অধিক হইয়াছিল, আর সেইজন্য তিনি আমাকেই লক্ষ্য করিলেন। ধামা নামাইয়া তিনি বসিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কোথায় দেখিয়াছি?"

আমি বলিলাম "তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব?"

তখন তিনি বিরলকেশ ভ্রূযুগল পরস্পর নিকটবর্ত্তী করিয়া কোথায় আমাকে দেখিয়াছেন স্মরণ করিতে সচেষ্ট হইলেন ও আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"বড় খুকীদের বাড়ী? নাঃ। কুমোরটুলী? উঁ—হুঁ। গোরা-বাগানে? না—"

আমার জা বলিলেন, "হয় ত থিয়েটারে কি কোন নিমন্ত্রণবাড়ী দেখিয়া থাকিবেন।"

তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "না, গো না। আমাদের কি আর তোমাদের মত ধিঙ্গিপনার বয়স আছে যে, থিয়েটারে দেখা হ'বে?"

সহসা তাঁহার স্মৃতি, আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া, তাঁহাকে সাহায্য করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়েছে গো! তোমাদের বাড়ী শিমলায়। তুমি আমার ভাইঝি খোকদার বড় বৌ।"

আমার জা দারুণ দুঃসাহসবলে বলিলেন, "আমাদের বাড়ী শিমলায় নহে।" তবে "মরিয়া হইয়া" তিনি এই অসত্যের আশ্রয় লইলেন।

একথা শুনিয়া শাশুড়ীর মাসী চুপ করিলেন। কিন্তু তিনি সম্মুখস্থিত ধামার

মৃদু মৃদু করাঘাত করিতে করিতে যে ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, তিনি আমাদের মিথ্যাটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যুবতীদ্বয় আমাদের অবস্থা দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। আমরা দু'জনে কেবল ভাবিতে লাগিলাম, যদি শাশুড়ী জানিতে পারেন?

৭

ট্রেণে উঠিয়া আমি আমার জা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা যদি এক দিন ঐ স্ত্রীলোকটি বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়া সব বলিয়া দেয়?"

আমার জা'র মেজাজটা তখন ভাল ছিল না। সমস্ত দিন উপবাস, পথশ্রম, শাশুড়ী জানিলে কি বলিবেন, সেই আশঙ্কা—এই ত্র্যহস্পর্শে মেজাজ ভাল না থাকিবারই কথা। তিনি বলিলেন, "দেয় ত' আর কি করিব, বলিব—দিদিশাশুড়ী বলিয়া রঙ্গ করিতেছিলাম। দেখ না, আর কি জায়গা ছিল না? চূড়ামণিযোগের দিন মিথ্যাকথাগুলি বলাইল?"

হেমন্ত হাসিয়া উঠিল, বলিল, "মিথ্যাকথাগুলা কি জোর করিয়া কেহ বলাইয়াছে?"

আমি বলিলাম, 'দায় পড়িয়া। এসব তোমরা বুঝিতে পারিবে না।"

জা বলিলেন, "এবার মরিয়া যেন পুরুষ হই।"

হেমন্ত বলিল, "তাহা হইলে আবার আপিস করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "সে কথায় আর কায নাই। এখন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া যে পাপ করিয়া চলিলাম, তাহাতে না জানি অদৃষ্টে কি ভোগ আছে।"

৮

ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। জা'কে তাঁহার পিত্রালয়ে নামাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। হাতেমুখে জল দিয়া আসিলেই মা বলিলেন, "আহা সারাদিন অনাহারে আছিস্! আমি খাবার আনি।"

এমন সময় শশুরবাড়ীর পুরাতন ঝি সদুর মা সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

আমি একান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি, সদুর মা?"

সদুর মা এক নিশ্বাসে বলিল, "ছোটবৌদিদি, শীঘ্র বাড়ী চল। মেয়েরা ও জামাইরা সব আসিয়া উপস্থিত।"

"সে কি?"

"ছোট দাদাবাবু সব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে কিছু বলেন নাই। এখন আমাকে বলেন, 'এখনই যাইয়া বড় বৌঠাকরুণকে ও ছোট বৌকে লইয়া আইস।' কোন গোছ নাই; মেজবৌদিদি ছেলেদের লইয়া ব্যস্ত—শীঘ্র চল।

"বড় দিদির বাড়ী যাইতে হইবে?"

"তিনি গাড়ীতে।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া যাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বুঝিলাম, আমাদিগকে জব্দ করিবার জন্ত এই আয়োজন। আমার জা বলিলেন, "এ কিরূপ রঙ্গ, কোন গোছগাছ নাই, এ অবস্থায় কি জামাই নিমন্ত্রণ করে?"

৯

রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে খুব একপালা ঝগড়ার আয়োজন করিলাম, কিন্তু ঝগড়া জমিল না। আমি অনেক বকিলাম, তিনি কেবল হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন "তোমরা পুণ্য করিতে পার, আর আমরা একটু আমোদ করিতে পারিব না?"

ঝগড়ার ঝড়টা কাটিয়া গেলে তাঁহাকে সে দিনের সব কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি খুব হাসিলেন—বলিলেন, "দেখ আমি তোমাদের কত উপকার করিলাম। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে হইয়া গেল, পুণ্যটায় হাত পড়িল না।"

শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, "তোমার কথাই ঠিক হউক—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। এমন সুখের—এমন আনন্দের পরিশ্রমেই যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়।"

তিনি বলিলেন, "আমার মুখে সহসা ফুলচন্দন পড়িবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তাহাতে আমার বিশেষ আগ্রহের কারণও নাই। তবে আপাততঃ জামাইদিগের আগমনে আমার মুখে যে সকল সুখাদ্য পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইলে মন্দ হয় না।"

—•—

বিদেহরাজ জনক।

বিদেহের অপর নাম মিথিলা। ইহা অতি পুরাতন জনপদ। যে প্রাগৈতিহাসিকযুগের পুরাবৃত্ত অতীতের বিস্মৃতিগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে, সেই যুগ হইতেই বিদেহের নাম দেশবিদেশে পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই অতীত গৌরব-দিনের ক্ষীণস্মৃতি মাত্র বিদ্যমান। তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস অনাদরে কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ সেই পুরাণ-বিশ্রুত মিথিলার স্থান ও সীমা নির্দ্দেশ করা পর্য্যন্ত একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

মিথিলার স্থান নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ নানারূপ বিরুদ্ধমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কাহারও মতে, বিদেহ বর্ত্তমান ত্রিহুতের অন্তর্গত, আবার কাহারও মতে অন্যত্র। সেই তর্কবিতর্কের আলোচনা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া ফল নাই। আমাদের মনে হয় যে, আলোচ্য মিথিলা বা বিদেহ ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত ছিল। এই মতপ্রতিপোষক যুক্তি আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

১। ইংরাজ ঐতিহাসিক হণ্টার-প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্পষ্টতঃ মিথিলাকে বর্ত্তমান ত্রিহুতের অন্তর্গত জনপদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। Buddhist India নামক পুস্তকের ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্ঠায় বিদেহের আলোচনা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ বিখ্যাত অধ্যাপক রিজ ডেভিডস যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই :—

বিদেহ একটি প্রাচীন জনপদ; মিথিলা ইহার রাজধানী ছিল। এক সময়ে বিদেহরাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। নানা বৌদ্ধ জাতকে ইহার উল্লেখ আছে। এক সময়ে মিথিলা নগরের পরিধি ৫০ মাইলের অধিক ছিল। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র বৈশালী বা বিশালীর ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। ইহা বর্ত্তমান ত্রিহুতের অন্তর্গত।

২। ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত জনকপুর, মহর্ষি গৌতমাশ্রমের ভগ্নাবশেষ এবং লোকপরম্পরাপ্রচলিত বহু কিম্বদন্তী এই অতীত জনপদের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহা যে ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত জনপদ—এই মত পোষকতার পক্ষে ইহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

৩। আমরা রামায়ণ হইতে জানিতে পারি যে, তপোধন বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধযোজন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক সরযূর

দক্ষিণতীরে আসিয়া উপনীত হয়েন। সে স্থান হইতে তাঁহারা নৌকাযোগে গঙ্গা-বক্ষে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া একটি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য দেখিতে পায়েন। নদী-তীর হইতে অর্দ্ধযোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা তাড়কার বাসভবনের সন্নি-হিত হয়েন। তাঁহারা তাড়কার বধসাধন করিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হয়েন। এই স্থানে যজ্ঞ-সমাপনপূর্ব্বক, উত্তরদিকে গমন করিয়া ক্রমশঃ গিরিব্রজ (মগধ) অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বিশালাধিপতি সুমিতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরদিবস তাঁহারা বিশালা হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বোত্তর কোণাভিমুখে জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপনীত হয়েন। এই বর্ণনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণ মগধ অতিক্রম করিয়া ত্রিহুত অভিমুখে যাত্রা করেন।

৪। মিথিলা যে প্রাচীন তীরভুমি বা ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল, এ কথা চীন-পরিব্রাজক য়ুয়েংসাং স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে গঙ্গার উত্তর তীরস্থ সমস্ত প্রদেশ বৃজ্জি নামে অভিহিত হইত। এই প্রদেশ আবার নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে বৈশালী বা বিশালা, তীরভুমি বা ত্রিহুত এবং মিথিলাই প্রধান।

৫। ত্রিহুত প্রদেশে মিথিলার অবস্থান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই। এ বিষয়ে ভবিষ্যৎপুরাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

নিমে পুত্রস্ত তত্রৈব মিথির্ণাম মহান্ স্মৃতঃ।
প্রথমং ভুজবলৈর্যেন তৈরহুতস্য পার্শ্বতঃ॥
নির্ম্মিতং স্বীয় নাম্না চ মিথিলাপুরমুত্তমম্
পুরীজননসামর্থ্যাজ্জনকঃ সচ কীর্ত্তিতঃ।

এই রাজ্য কখন বা মিথিলা কখন বা বিদেহ কখন বা ত্রিহুত নামে পরিচিত হইয়াছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে গণ্ডকীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পারণ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গণ্ডকীতীরমারভ্য চম্পারণ্যান্তগে শিবে।
বিদেহভূঃ সমাখ্যাতাঃ তৈরভুক্তাভিধঃ স চ॥

এইরূপ আরও বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তাহাতে মিথিলাকে প্রাচীন ত্রিহুতের অন্তর্গত ভূভাগ বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। রামায়ণে বিদেহ, মগধ প্রভৃতি দেশকে অপবিত্র বলা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে, তখনও এই সকল দেশে আর্য্যসভ্যতা সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কারণে বঙ্গদেশে আসিতে হইলে প্রায়শ্চিত্তের

ব্যবস্থা ছিল। এ কারণেও আমরা মিথিলাকে ত্রিহুতের সন্নিহিত কোন জনপদ বলিয়া মনে করি।

ভারতের ইতিহাস নাই। কত শত পুণ্যজনপদের পবিত্র স্মৃতি বিস্মৃতি-সাগরে লীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং মিথিলার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করা সম্ভব নহে। কেবল ইহার গৌরবময় দিনের অস্তিত্ব বুঝিবার উপযোগী একটি ক্ষীণস্মৃতি আজও ভারতবাসীর হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা এককালে গৌরবের স্থান ছিল। শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, এককালে শত শত পুণ্যাত্মা ঋষির পবিত্র তপস্যায় এই স্থান পূত হইয়াছিল। মহাভারতের সময়েও মিথিলার গৌরবের হ্রাস হয় নাই। ভারতীয় মহাসমরে বিদেহরাজ কৌরবের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। অতি প্রাচীন কালেই এই জনপদ সভ্যতার উচ্চতম গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও ন্যায়শাস্ত্রের জন্য এ স্থান সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, কেবল কল্পনাপুষ্ট দুইএকটি কিম্বদন্তী এই প্রাচীন স্থানের ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

মিথিলার রাজনৈতিক ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। তাহা যতটুকু অবগত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের অব্যবহিত পরেই মহাভারতের সময়ে যদুবংশীয় নৃপতিগণ মিথিলার শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। ঐতিহাসিক যুগে যে সকল নরপতি মিথিলা শাসন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কর্ণাট হইতে আগত প্রমরবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের আদিনৃপতি ১০১১ শকে বা ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিহুতে আগমন করেঁন। প্রায় ২৩৫ বৎসর রাজত্বের পর এই বংশের শেষ রাজা হরিসিংহ দেব যবনহস্তে পরাজিত হইয়া নেপালের অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপরে এক ব্রাহ্মণ-বংশ মিথিলা শাসন করেন। এই বংশের শিবসিংহ দেবের সময়ে বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার পর হইতে ত্রিহুতের নাম আর শুনা যায় না, সে প্রাচীন জনপদ অতীতের স্বপ্নসমুদ্রে ডুবিয়া যায়।

আমরা বিদেহরাজ জনকের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়া প্রসঙ্গক্রমে মিথিলার পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। এই বার রাজর্ষির বিষয় আলোচনা করা যাউক।

মহাভাগ জনকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

রাজা নিমি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্যে অরাজকতার আশঙ্কা করিয়া মৃত নিমির শরীর মুনিগণ অরণিতে মথন করেন; এই মথনের ফলে যে কুমার উৎপন্ন হয়েন তাঁহারই নাম জনক। তাঁহার পিতা বিদেহ (দেহ-রহিত) বলিয়া তাঁহার নাম বিদেহ। মথনের ফলে উৎপন্ন বলিয়া তিনি মিথিল নামেও প্রসিদ্ধ। সুতরাং মিথিলা, বিদেহ এবং জনক এক ব্যক্তিরই নামান্তরমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে, যথা—

অরাজক ভয়ম্নৃণাম্ মন্যমানামহর্ষয়ঃ
দেহম্ মমাস্থুঃ ম নিমে কুমারঃ সমজায়ত।
জন্মনা জনকম্ সোঽভূদ্বিদেহস্তুবিদেহজঃ
মিথিলো মথনজ্জাতো মিথিলাযেন নির্ম্মিতা।

কিন্তু রামায়ণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নিমির পুত্র মিথি এবং মিথির পুত্র জনক। রামায়ণকে অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থ বোধে পণ্ডিতরা জনককে মিথির পুত্র বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়া লয়েন। অযোধ্যাপতি মহাত্মা দশরথ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন তৎকালে মিথিতনয় জনক মিথিলা শাসন করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক ও ব্রহ্মপরায়ণ। তিনি রাজেশ্বর হইয়াও ভিখারী। তিনি মণিময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও এই স্বার্থসংক্ষুব্ধ জগতের নীচতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। ফলতঃ তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু দ্বারা নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও এক দিকে তৎসমুদায়ে যেমন একেবারে স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই প্রজাপালনপরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

ভারতে যে সময় কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য নানাস্থানে যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ করিতেছিল, সেই সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা নামে পরিচিত উপনিষদবর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান ভারতের রাজন্যগণ কর্তৃক ধীরে ধীরে উদ্ভাবিত, প্রচারিত ও পরিশোধিত হইতেছিল। এই অভিনব বিদ্যা ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিতেন। ইহারই ফলে উদার বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পথ সুগম হইয়াছিল। মহাভাগ জনক এই অমূল্য তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট অসিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া প্রাচীন আর্য্যসমাজ তাঁহাকে রাজর্ষি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া শতপথ ব্রাহ্মণ রচনা করেন। এই শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজর্ষি জনক কতিপয় ব্রাহ্মণকে অগ্নিহোত্রের বিষয় প্রশ্ন করেন।

তাঁহারা কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল যাজ্ঞবল্ক্য আংশিক ভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া প্রস্থান করিলে যাজ্ঞবল্ক্য জনকের অনুসরণ করেন। ক্ষত্রিয়গণের নিকট ব্রাহ্মণগণের পরাভবের কথা বহু উপনিষদের নানাস্থানে লিখিত আছে। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন জনকের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণের আগমনবিষয় পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণপ্রভাব খণ্ডিত ও রাজন্যশক্তি স্থাপিত হয়। উপনিষদ সেই যুগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

জনকের সময় হইতেই এই ব্রহ্মবিদ্যার সূত্রপাত হয়। যে মহাত্মার আবির্ভাবে এমন মতের সৃষ্টি হইয়াছে, যে তাহার উদারতার নিকট বিংশ শতাব্দীর অধ্যাত্ম তত্ত্বও ম্লান হইয়া যায়, এবং তাহার প্রতি সভ্যতাগর্ব্বিত য়ুরোপীয় সমাজও সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না, সেই মহাপুরুষের জীবনের একটি চিত্র রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। সে চিত্র কি উন্নত! সংসারত্যাগী বিরাট পুরুষ কর্ত্তব্যানুরোধে সিংহাসনে উপবিষ্ট। তপোবনের স্নিগ্ধ ছায়ায় রাজা জনক স্ত্রীপুত্র লইয়াও সন্ন্যাসী।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

লজ্জাতুরা।

(সংস্কৃত হইতে)

আধেক হৃদয় তা'র প্রেমরসে পূর,
আধেক হৃদয় তা'র লজ্জায় আতুর;
একটি নয়ন তা'র প্রিয় মুখ পানে,
একটি নয়ন তা'র মুক্ত বাতায়নে;
একখানি পদ তার আছয়ে শয্যায়,
একখানি পদ তা'র ভূমিতলে রয়;
না পারে উঠিতে নারে রহিবারে আর;
রজনী প্রভাতে একি দায় অবলার!

—:*:—

রাজা মটুক রায়।

২

কেতাব প্রথম বয়ানেই আরম্ভ করিয়াছেন—

"ছেকন্দর নামে বাদসা বিরাট নগরে।
সংসারের কর জিনি লিল বাহু জোরে॥
তার মত বাদসা কেহ না হইল আর।
তামাম দেশেতে আছে প্রশংসা তাহার॥"

জলুহাস নামে সেকন্দর বাদসার এক পুত্র জন্মিল। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদিন মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন ও একটি মৃগের অনুসরণ করিয়া গভীর জঙ্গলে যাইয়া পড়িলেন। হরিণ এক সুড়ঙ্গ বাহিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাতালে জঙ্গ রাজার মুলুকে গমন করিলেন। অনুচরবর্গ রাজপুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া বাদসাহের নিকট সংবাদ দিল। বাদসা সেকন্দর ও বেগম অজুপাসুন্দরী এই দারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। গণক ডাকা হইল। গণৎকার বলিল, রাজপুত্র পাতালে জঙ্গ রাজার দেশে বাস করিতেছেন; কিছুদিন পরে সেই রাজার কন্যা বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবেন।

"উচাটন মন অতি পুত্রের বিহনে।
কোন মতে সান্ত্বনা করিতে পারি মনে॥
সাগর দেখিতে জাই মনে অভিলাষ।
তাহাতেও হয় যদি মনেতে উল্লাস॥"

বেগমের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য এক বিস্তৃত নদীর তীরে হাওয়াখানা প্রস্তুত হইল, বেগম সাহেবা অজুপাসুন্দরী দাসদাসী সমভিব্যাহারে সান্ত্বনা পাইবার আশায় নদীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন নদীর স্রোতে একটি বাক্স ভাসিয়া যাইতেছিল। বেগম আগ্রহসহকারে এক দাসীকে বাক্স ধরিতে হুকুম দিলেন। বাক্স ধরা দিল না। অবশেষে বেগম স্বয়ং বাক্স ধরিবার জন্য জলে নামিলে বাক্স আপনিই আসিয়া তাঁহার হাতে উঠিল। বেগম সিন্দুকের আবরণ উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে একটি স্বর্ণবর্ণের শিশু দেখিতে পাইয়া তাহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই পালিত পুত্রের নাম রাখা হইল—কালু। কালু বাদসার ভবনে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাণী একটি পুত্র প্রসব করিলেন, যতিগণ গণিয়া বলিয়া গেল,—

"এই পুত্র গুণধর, হবে অতি ছত্রধর, আর হবে কামেল ফকির। না করিয়া রাজ্যকর্ম্ম, সদা রবে দয়াধর্ম্ম, ঘরে নাহি রহিবেক স্থির। গাজীনাম কালে কয়, শুন কহি মহাশয়, গুণবান পুত্র তব এই। ছেকন্দর এত শুনে, বড় তুষ্ট হইল মনে, জনি গনে করিল বিদাই॥" গুরুর নিকট কালু ও গাজী রীতিমতন শাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। "পড়িতে লাগিল দোহে কালাম আল্লার। পড়িয়া আলেম হইল দোহে বরাবর॥ জাহেরি বাতেনি এলেম মালুম হইল। তুনিয়ার মায়া যত তুচ্ছ সে জানিল॥ ফকিরি হাছেল হইল কালু ও গাজীরে। মনে মনে থাকে কেহ জানিতে না পারে॥" গাজীসাহেব উপযুক্ত হইলে, সেকন্দর পুত্রের উপর রাজ্য-ভার অর্পিত করিবার বাসনা করিলেন। এই সময় গোলযোগ উপস্থিত হইল। গাজী সাহেব কিছুতেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন দৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে বশে আনিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ব্যবস্থার পুনরভিনয় আরব্ধ হইল। পুত্র অবাধ্য জানিয়া অবশেষে পিতা পুত্রকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা করিলেন। পুত্র অগত্যা এক রাত্রির অবকাশ লইলেন। সেই রাত্রিতে কালু ও গাজীসাহেব সেকন্দরের বিরাট রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ফকিরি লইয়া পলায়ন করিলেন। বিরাট নগর হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এক প্রকাণ্ড বনে প্রবিষ্ট হইলেন। গভীর জঙ্গলে সম্মুখে সাগর-সমান এক নদী দৃষ্টি-গোচর হইল। কি প্রকারে এই নদী পার হইবেন উভয়ে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে গাজীসাহেব হস্তস্থিত আশা আল্লার নাম করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। আল্লার মহিমায় সেই আশা নৌকায় পরিণত হইল। "উত্তম হইয়া তরি সাগরেতে ভাসে। গাজি কালু আনন্দিত মনের উল্লাসে॥ বিছামিল্লা বলিয়া মুখে চড়িল নৌকায়। সু বাও পাইয়া তরি ভেসে চৈলে জায়॥ হাঙ্গর কুম্ভির কত শুশুক মকর। গাজিকে প্রণাম করে জুড়ি তুই কর॥ প্রভুনাম জপে দোহে বসিয়া নৌকাতে। নানাদেশ ফিরি শেষে আইল বাটেতে॥ সাগরের ধারে দোহে দেখে সুন্দরবন। সে দিগে চালায় তরি ভাই তুই জন।"

নদী পার হইয়া দুইজনে সুন্দরবনে আসিলেন। "গাজী বলে ভাই কালু এই কোন্ বন। কালুবলে হয় বটে এই সুন্দরবন॥ সুন্দরবনেতে দোহে হরশিতে রয়। সে বনের বাঘ যত আসিয়া তথায়॥ মাথা নওাইয়া সবে ছালাম করিল। যত বাঘ ছিল তারা মুরিদ হইল॥ চেলা যদি বাঘগণ হইল গাজীর কাছে। জাবেজিত গাজীসাহা অতি দিল বিছে॥ এই মত অষ্টম বৎসর সেই বনে। বনফল

খাইয়া থাকএ দুইজনে ॥" কিছুদিন এই ভাবে কাটাইয়া কালুসাহেবের মনে পড়িল,—

"ফকিরের বিধি নাহি থাকা একঠাই। এই বনে আর না রহিব গাজী ভাই ॥"

এইরূপে সুন্দরবনে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি সুন্দর নগর তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। তাঁহারা পরিচয়ে জানিতে পারিলেন যে, তাহা শ্রীরামরাজার ছাপাই নগর। ফকিরদ্বয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ছাপাই নগরে প্রবেশ করিলেন, যবন বলিয়া শ্রীরামরাজা তাঁহাদিগকে রাজধানীতে স্থান দিলেন না। ফকিরের সাপে রাজার রাজ্য দগ্ধ হইতে লাগিল। শ্রীরামরাজা ইহা বুঝিতে পারিয়া ফকিরদ্বয়ের শরণাগত হইলেন। গাজীসাহেব ছাপাইনগরের শ্রীরামরাজাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন। পুনরায় দুইজন বন ভ্রমণ করিতে করিতে এক নদীকূলে উপনীত হইলেন—"এতেক কহিয়া পির বেছ-মিল্লা বলিয়া। সিন্ধুকূলে নদীধারে পৌছিল যাইয়া ॥"

এই নদীকূলে গভীর জঙ্গলে কতকগুলি কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল, তাহারা আসিয়া কালু ও গাজীসাহেবকে যথেষ্ট সম্মান করিল। গাজীসাহেব সেই বনে এক নগর স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আল্লার অনুগ্রহে সঙ্কল্প তখনই কার্য্যে পরিণত হইল। স্বর্গ হইতে পরীগণ আসিয়া সাতদিনের মধ্যে বন জঙ্গল সাফ করিয়া সুন্দর নগর নির্ম্মিত করিয়া দিল। নগরের মধ্যস্থলে সোণার মসজিদ প্রস্তুত হইল, মসজিদের চতুর্দ্দিকে মণিমুক্তা ঝল-মল করিতে লাগিল। রত্নকাঞ্চননির্ম্মিত অসংখ্য অনুপম প্রাসাদরাজি উষালোকের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া বনমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। কালু ও গাজী মনের আনন্দে স্বর্ণমন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। নগরের নাম হইল স্বর্ণপুর বা সোণারপুর। "রাখ নাম স্বর্ণপুরি, এইত মিনতি করি, কিবা হয় কহ মম স্থানে। গাজি বলে এহা হইতে, নাহি দেখি কোনমতে, আর ভাল নাম কোন খানে ॥ জত লোগ জন ছিল, সবাকে আদেশ দিল, এই স্থান জান স্বর্ণপুরি। এতেক বলিয়া পরে দুই সিংহাসন পরে, বৈসে দোহে মন শান্ত করি ॥" এই স্থানে গাজীসাহেবকে ভূতে ধরিল, রমণীয় রূপের নিকট ভগবৎ প্রেমের পরাজয় হইল। গাজীসাহেবের সোণাপুর দেখিবার জন্য রজনীযোগে দলে দলে পরীগণ আসিতে লাগিল। কালু গাজী দুই ভাই স্বর্ণসিংহাসনে নিদ্রিত আছেন, পরীগণ আসিয়া গাজীর রূপের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল, অবশেষে এমন সুন্দর পুরুষের কোন সুন্দরী পাত্রী

পাওয়া যায় কি না তাহারই আলোচনা আরব্ধ হইল। কথাপ্রসঙ্গে এক পরী বলিয়া উঠিল—"এক কন্যা আছে আমি দেখিয়াছি তায়। তার রূপ হেরি চন্দ্র-সূর্য্য লজ্জা পায়। রূপবতী তার মত না দেখিনু আর। কোটী শশধররূপের নিছনি তাহার। * * * "পুনরায় সেই পরী লাগিল বলিতে। সে দেশ অনেক দূর দক্ষিণ দিগেতে॥ সে দেশের নাম ডাকে ব্রাহ্মণনগর। গড় তার চারি দিগে দেখিতে সুন্দর॥ * * * মকুট নামেতে জান রাজা সে দেশের। না ছিল রাজতি হেন লঙ্কার রাবণের। রায়েত প্রজা যত তার ব্রাহ্মণ সকলে। তেরাত্রে করেন তারা যবন দেখিলে॥ * * * দক্ষিণা রায় নামে গোসাই রাজার। তার মত বীর নাই পৃথিবী মাঝার॥ সাত মন চালের ভাত মহিষ গোটা চার। রোজ সে ভক্ষণ করে এয়ছা জরওয়ার॥ চম্পাবতি কন্যা তার পরমসুন্দরি। গাজি হৈতে রূপ তার রূপে বিদ্যাধরি॥" এই স্থানে আরব্য উপন্যাসের সেই কুমার কমরল ও চিনার রাজকন্যা বেদৌরার উপাখ্যানের পুনরভিনয় হইল। পরীগণ উভয়ের রূপের তুলনা করিবার বাসনায় গাজীকে নিদ্রিত অবস্থায় ব্রাহ্মণনগরে চম্পাবতীর ঘরে লইয়া যাইয়া দুইজনকে এক শয্যায় শয়ন করাইল। মায়াবলে অগ্রে চম্পাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাজীর রূপে চম্পা বিমুগ্ধা হইলেন, বলিতে লাগিলেন—"না শোক মরিতে চোর আসিয়াছে হেথা। না জান মটুক রাজা হয় মোর পিতা॥ শুনিলে মটুক রাজা কাটিবে তোমায়॥ তোমাকে বাঁচাতে কিছু না দেখি উপায়। দক্ষিণা নামেতে রায় গোসাই রাজার। যাহার বলেতে লিল সকল সংসার॥ মনিশ্ব ধরিয়া সেই আহার করায়। তাহার হস্তেতে শপি দিবেক তোমায়॥ ব্রাহ্মণনগর এই শুন বিবরণ। এ রাজ্যের লোক যত সকলি ব্রাহ্মণ। অন্য জাতিরে রাজা না দেয় থাকিতে। যবন পাইলে শোপে দক্ষিণার হাতে॥ শোন চোর বলি তোমায় শোন সমাচার। লিলবতী নামে জান জননী আমার। সাত ভাই বড় মোর অশুর জিনি বল। চম্পাবতী নাম মোর কহিনু সকল॥"

চম্পাবতীর পরিচয়ের পর গাজীসাহের পরিচয় আরব্ধ হইল। গাজীসাহেব চম্পাকে বলিতে লাগিলেন, "বিরাট নগরে ঘর, পিতা মোর ছেকেন্দর, অজুপা সুন্দরী মাতা মোর। গাজীসাহা মোর নাম, শুন ওহে গুণধাম, এখানে আসিয়া হইনু চোর। আমার পিতার দাপে, সমস্ত সংসার কাঁপে, কম্পমান সব দেবগণ। কত দেব পালাইল, ত্রাসে কম্পমান হইল, কত গেল পাতাল ভুবন। * * * বেড়াইনু কত দেশে, বাঙ্গালাতে আসি শেষে, বসিলাম সুন্দর বনেতে। [illegible] যেইখানে, থাকিলাম তুষ্ট মনে, ছাপাইনগরে ফের গিয়া। শ্রীরামরাজার

তরে, খবংসে সজাতি কোরে সোনাপুরে গেলাম চলিয়া। নিবিড় কানন পুরি তাহাতে কর্ত্তন করি, সাহা পরির ওছিলাতে আয়। হাজার দালান তাতে, বানাইল পারিজাতে, মছজেদ বানায় এক তায়। সেই মছজেদ ভিতরে, আছিনু ঘুমের ঘোরে, দুই ভাই দুই পালঙ্গেতে। কে আনিল এইখানে, তাহা নাহি জানি মনে, বসিলাম তোমার সাক্ষাতে।"

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উভয়ের ভালবাসা চরমে উঠিল। চম্পাবতী জীবন-যৌবন সমস্তই গাজীর চরণে অর্পণ করিলেন। পরস্পরে অঙ্গুরী-বিনিময় পর্য্যন্তও হইয়া গেল। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন যে, পরীদিগের কৃপায় উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। গাজীসাহেব জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, তিনি সোণাপুরের মসজিদে ভ্রাতা কালুর পার্শ্বে শুইয়া আছেন। অকস্মাৎ বিরহে উভয়েই উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, কথায় আছে রমণীর 'বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না,' চম্পাবতী মনের আগুনে মনে মনেই পুড়িতে লাগিলেন। এদিকে গাজীসাহেবের প্রেমের জ্বালায় কালুসাহেব আর সোণাপুরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা ব্রাহ্মণানগরের অনুসন্ধানে দুই ভাই বহির্গত হইলেন। যাত্রা করিবার সময় তাঁহারা দক্ষিণে সর্প দেখিলেন, সন্মুখে কে "আয়" বলিয়া সম্বোধন করিল, মাথার উপর টিকটিকি ডাকিল, জননী পুত্রকে দুগ্ধ খাওয়াইতেছেন দেখিতে পাইলেন। মাহুত হস্তীর উপর বসিয়া আছে, মালিনী ফুলের ডালা লইয়া যাইতেছে, গোয়ালিনী দুধের কেঁড়ে লইয়া সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছে, ভরা কুম্ভ, সবৎসা গাভী প্রভৃতি যাবতীয় "সুলক্ষণ" তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। এই সমস্ত দেখিয়া গাজীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। পথে কালু গাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন তরফেতে দেশ পারিবে বলিতে। উত্তর দক্ষিণ কিবা পশ্চিম পূর্ব্বেতে।" গাজী বলে ঠিক তাহা না পারিক হিতে। অনুমানে বুঝি হবে দক্ষিণ দিকেতে। এইরূপে তিন মাস পথে চৈলে যায়, কোন খানে সে দেশের ঠেকানা না পায়। তার পর তিন মাস আবার চলিল, তবেত ব্রাহ্মণানগর নজরে পড়িল।"

ব্রাহ্মণানগরের চতুর্দ্দিকে নদী, নদীর এপারে কান্তিপুর, দুই ভাই ডেরা ফেলিয়া দূর হইতে নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্বেত পাতরের বাঁধাঘাট, সুবর্ণের নিশান, দূর হইতে বোধ হয়, সহরখানি যেন অগ্নিবর্ণে জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণানগরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সাতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, কারণ সেটি তখন গাজী সাহেবের নজরে অমরাপুরী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

সম্রাট্ আকবরের রত্নভাণ্ডার।

সম্রাট্ আকবরের রত্নাগারের সমুদায় রত্নের সংখ্যা করিতে অথবা তাহাদের গুণবর্ণনা করিতে গেলে আমরা বহু পৃষ্ঠা লিখিলেও ফুরাইতে পারি কি না সন্দেহ। তবে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থ তৎসমুদায়ের প্রধান প্রধানগুলির শ্রেণীবিভাগ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

এই রত্নাগারের নিমিত্ত সম্রাট একজন বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী ও কার্য্যদক্ষ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যার্থ একজন অভিজ্ঞ মুন্সী, একজন দারোগা এবং বহুসংখ্যক জহুরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রকারে রত্ননিচয় বিভাগ করিয়াছিলেন :—

পদ্মরাগমণি।

১ম শ্রেণী	মূল্য	১০০০ মোহরের কম নহে				
২য়	”	”	৯৯৯	হইতে	৫০০	মোহর পর্য্যন্ত
৩য়	”	”	৪৯৯	”	৩০০	”
৪র্থ	”	”	২৯৯	”	২০০	”
৫ম	”	”	১৯৯	”	১০০	”
৬ষ্ঠ	”	”	৯৯	”	৬০	”
৭ম	”	”	৫৯	”	৪০	”
৮ম	”	”	৩৯	”	৩০	”
৯ম	”	”	২৯	”	১০	”
১০ম	”	”	৯½	”	৫	”
১১শ	”	”	৪½	”	১	”
১২শ	”	”	½	”	½	”

ইহার নিম্নমূল্যের পদ্মরাগের কোনও বিশেষ হিসাব লওয়া হইত না।

হীরক, মরকতমণি, রক্ত এবং নীল য়াকুত (yaqut)

১ম শ্রেণী	৩০ মোহর ও তদূর্দ্ধ মূল্যের প্রস্তর			
২য় শ্রেণী	২৯ ৩/৪ মোহর	হইতে	১৫ মোহর	পর্য্যন্ত মূল্য
৩য় „	১৪ ৩/৪	”	১২	”
৪র্থ „	১১ ৩/৪	”	১০	”
৫ম „	৯ ৩/৪	”	৭	”
৬ষ্ঠ „	৬ ৩/৪	”	৫	”
৭ম „	৪ ৩/৪	”	৩	”
৮ম „	২ ৩/৪	”	২	”
৯ম „	১ ৩/৪	”	১	”
১০ম „	৮ ৩/৪ তঙ্কা	হইতে	৫ তঙ্কা	পর্য্যন্ত মূল্য
১১শ „	৪ ৩/৪	”	২ তঙ্কা	পর্য্যন্ত মূল্য
১২শ „	১ ৩/৪	”	১/৪	”

মুক্তা।

মুক্তাগুলি ১৬ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং ২০টি করিয়া এক একটি মালায় বা ছড়ায় গাঁথা থাকিত।

১ম শ্রেণীর ছড়ার	এক একটি মুক্তার মূল্য ৩০ মোহর এবং তদূর্দ্ধ			
২য় শ্রেণীর ছড়ায়	২৯ ৩/৪	হইতে	১৫ মোহর	পর্য্যন্ত মূল্যের মুক্তা
৩য় „	১৪ ৩/৪	”	১২	”
৪র্থ „	১১ ৩/৪	”	১০	”
৫ম „	৯ ৩/৪	”	৭	”
৬ষ্ঠ „	৬ ৩/৪	”	৫	”
৭ম „	৪ ৩/৪	”	৩	”
৮ম „	২ ৩/৪	”	২	”
৯ম „	১ ৩/৪	”	১	”
১০ম „	১ মোহরের নিম্ন	হইতে	৫ তঙ্কা	পর্য্যন্ত মূল্যের মুক্তা
১১শ „	৫ তঙ্কার নিম্ন	হইতে	২	”

১২শ	শ্রেণীর ছড়ায়	২ তঙ্কার	নিম্ন হইতে	১½ তঙ্কা	পর্য্যন্ত মূল্যের মুক্তা
১৩শ	,,	১½	,,	৩০ দাম	পর্য্যন্ত মূল্যের মুক্তা
১৪শ	,,	৩০ দামের	নিম্ন হইতে	২০	,,
১৫শ	,,	২০	,,	১০	,,
১৬শ	,,	১০	,,	৫	,,

যে শ্রেণীর ছড়া সেই শ্রেণীর সমসংখ্যক সূত্রে মুক্তাগুলি গ্রথিত হইত; অর্থাৎ ১৬শ শ্রেণীর ছড়ায় ১৬টি সূত্রের ব্যবহার হইত। ছড়ার সূত্রের প্রান্তভাগে সাম্রাজ্যের মোহর থাকিত, এবং প্রত্যেক মুক্তার একটি বর্ণনা তৎসঙ্গে সংলগ্ন থাকিত। পাঠকগণ, স্মরণ রাখিবেন যে, সেই সময়ে তঙ্কা বড় দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইত। অধুনা টাকার মূল্য বড় কম; অর্থাৎ টাকা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সহজলভ্য হইয়াছে। উপরিলিখিত তালিকায় মণিমুক্তার মূল্য তঙ্কায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আজকালকার টাকায় নির্দ্দিষ্ট হইলে ঐ সমুদায়ের মূল্য অনেক অধিক হইত, সন্দেহ নাই।

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

—:*:—

প্রিয়স্মৃতি।

(শেলী)

গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গানটি গেলে মরে
রয় গো স্মৃতি জেগে তাহার অনুরণনহরা;
মঞ্জরিয়া মঞ্জরিয়া কুসুম ঝরি' পড়ে
গন্ধ তা'র বন্ধ থাকে পরাণমনভরা।

গোলাপগুলি ঝরঝরিয়ে পড়িয়ে গিয়ে ঝরে'
পাঁপড়ি দিয়ে প্রিয়জনের শয্যা রচে তা'রা;
মরমরিয়ে মর্ম্মভরা তোমার স্মৃতি'পরে
প্রেমটি ঘুমে আঁকড়ে র'বে যখন তোমাহারা।

শ্রীকালিদাস রায়।

পুরাণকথা।

(১)

আজকাল প্রতীচ্য প্রথায় পুরাতত্ত্বের যেরূপ আলোচনা হইতেছে প্রাচ্য প্রথায় সেরূপ হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য প্রথমোক্ত প্রথা নানা অনুসন্ধানপ্রসূত বলিয়া অনেক স্থানে অভ্রান্ত ও অপ্রমাদ; পরবর্ত্তীর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। তথাপি যেন মনে হয়, উহাও যখন এক প্রকার পুরাতত্ত্বের আলোচনা তখন উহাও ত্যজ্য নহে।

এই প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উভয় প্রথার একটি ইংরাজী—অপরটি সংস্কৃত। সংস্কৃত ধরণের মূল গ্রন্থ আমাদের পুরাণাদি। আমি এই পুরাণাদি হইতে আমাদের পুরাণযুগে প্রচলিত পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

পুরাণের মধ্যে প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ আমার আলোচ্য বিষয়। পুরাণ বলিতে আমরা বুঝি—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ সৃষ্টি, লয়, বংশ, মন্বন্তর ও বংশকাহিনী এই পাঁচটি লইয়া পুরাণ। রাজগণের বংশাবলি প্রদানকেই বংশ বলা হইয়াছে ও তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারই কোন উল্লেখযোগ্য কাহিনী থাকিবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাও পুরাণে বর্ণিত হইবে।

এখন রাজবংশের মধ্যে আমাদের পুরাণযুগে সূর্য্যচন্দ্রবংশই রাজবংশ। বিষ্ণুপুরাণে এই দুই বংশের যে বংশবল্লী ও কাহিনী আছে তাহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিলে বিশেষ অকৌতূহলকর বলিয়া বিবেচিত হইবে, এরূপ মনে করি না। যেহেতু তাহাও এই পুরাতত্ত্বের আলোচনার দিনে সর্ব্বজনবিদিত থাকা আবশ্যক।

সূর্য্যবংশ ও তৎসংক্রান্ত কতিপয় কাহিনী।

(১) ব্রহ্মা
|
(২) দক্ষ
|
(৩) অদিতি
|
(৪) বিবস্বৎ
|

(৫) মনু

(৬) ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নভগ, নেদিষ্ট, করুষ, পৃষধ্র।

(৭) বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ড

(৮) পরঞ্জয় (ককুৎস্থ)

(৯) অনেনা

(১০) পৃথু

(১১) বিষগশ্ব

(১২) আর্দ্র

(১৩) যুবনাশ্ব

(১৪) শ্রাবস্ত

(১৫) বৃহদশ্ব

(১৬) কুবলয়াশ্ব

(১৭) দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব, কপিলাশ্ব

(১৮) হর্য্যশ্ব

(১৯) নিকুম্ভ

(২০) সংহতাশ্ব

(২১) কৃশাশ্ব

(২২) প্রসেনজিৎ

(২৩) যুবনাশ্ব

(২৪) মান্ধাতা

(২৫) পুরুকুৎস, অম্বরীষ, মুচুকুন্দ

(২৬) ত্রসদস্যু, যুবনাশ্ব হরিত

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, ইক্ষ্বাকুর (৬) একশত পুত্র। তাহার মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড এই তিনজনই প্রধান। অপর ৯৭ পুত্রের মধ্যে ৫০ জন (ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম শকুনি) উত্তরাপথ প্রদেশের ও ৪৭ জন দক্ষিণাপথ প্রদেশের রক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েন। বিকুক্ষির (৭) আর একটি নাম শশাদ। পিতা ইক্ষ্বাকু অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবেন বলিয়া বিকুক্ষি বনে শীকার করিতে যায়েন। শীকারের পরিশ্রমে ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বিকুক্ষি হত গৃহীত পশুগণের মধ্যে একটি শশক খাইয়া জল পান করেন; তাই তাঁহার শশাদ নাম হয়। পরঞ্জয়ের (৮) অপর নাম ককুৎস্থ। দেবাসুরের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে দেবতারা এক সময়ে সমরে পরঞ্জয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে পরঞ্জয় এই সর্ত্তে সম্মত হয়েন যে, তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাহনরূপে নিয়োজিত হয়েন। দেবতারা অগত্যা তাহাই স্বীকার করেন ও ইন্দ্র বৃষভরূপে পরঞ্জয়ের বাহন হয়েন। বৃষভ-রূপী ইন্দ্রের ককুদের উপর বসিয়া যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন বলিয়া পরঞ্জয়ের অপর নাম ককুৎস্থ হইয়া গেল। তদবধি পরঞ্জয়ের অধস্তন পুরুষ-গণ কাকুৎস্থ বলিয়া বিখ্যাত।

এই শ্রাবস্তই (১৪) শ্রাবস্তী (বর্ত্তমান Sahet-Mahet) নগরী প্রস্তুত করেন। কুবলয়াশ্ব (১৬) ঋষি উতঙ্কের পরম শত্রু;

(২৭) সম্ভূত
|
(২৮) অনরণ্য
|
(২৯) পৃষদশ্ব
|
(৩০) হর্যশ্ব
|
(৩১) বসুমনস্
|
(৩২) সুধন্বা
|
(৩৩) ত্রয্যারুণ
|
(৩৪) সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু)
|
(৩৫) হরিশ্চন্দ্র
|
(৩৬) রোহিতাশ্ব
|
(৩৭) হরিত
|
(৩৮) চঞ্চু
|
(৩৯) বিজয়, বসুদেব
|
(৪০) রুরুক
|
(৪১) বৃক
|
(৪২) বাহু
|
(৪৩) সগর
|
(৪৪) অসমঞ্জস
|
(৪৫) অংশুমান্
|
(৪৬ দিলীপ
|
(৪৭) ভগীরথ
|
(৪৮) শ্রুত
|
(৪৯) নাভাগ

ধুন্ধুনামক এক দানবকে বধ করেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম ধুন্ধুমার।

মান্ধাতার (২৪) এই তিন পুত্র ব্যতীত ৫০টি কন্যা ছিলেন। ঋষি সৌভরি তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। মান্ধাতার পত্নীর নাম বিন্দুমতী ; ইনি চন্দ্রবংশের অন্তর্গত যদুবংশীয় রাজা শশবিন্দুর কন্যা।

মান্ধাতার দ্বিতীয় পুত্র অম্বরীষের পুত্রদ্বয়ই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজে ইঁহারাই যথাক্রমে আদিরথ ও হারীত গোত্রদ্বয়ের প্রবর্ত্তক।

অনরণ্য (২৮) লঙ্কাধিপতি রাবণ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন।

রাজা সত্যব্রতই (৩৪) পরিশেষে ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হয়েন।

সগরের (৪৩) অসমঞ্জস (৪৪) ভিন্ন অপর ৬০ হাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহাদিগকে কপিলশাপে ভস্মসাৎ হইতে হয়। সগরকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য পাইতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সগর যখন মাতৃগর্ভে তখন হৈহয়রা আসিয়া শক, যবন ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের সাহায্যে সগরের পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দেয়। তখন রাজা ও রাণী কোনক্রমে বনে পলায়ন করেন। সগর বনেই জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি স্বভুজবিক্রমে হৈহয়দিগকে পরাজিত করিয়া পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন। তাহাদের সাহায্যকারী শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পল্হবদিগের সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সংগ্রামে তাহারা পরাজিত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য সগরের কুলগুরু বশিষ্ঠের

(৫০) অম্বরীষ
(৫১) সিন্ধুদ্বীপ
(৫২) অযুতাশ্ব
(৫৩) ঋতুপর্ণ
(৫৪) সর্ব্বকাম
(৫৫) সুদাস
(৫৬) মিত্রসহ (কল্মাষপাদ)
(৫৭) অশ্মক
(৫৮) মূলক (নারীকবচ)
(৫৯) দশরথ
(৬০) ইলিবিল
(৬১) বিশ্বসহ
(৬২) খট্বাঙ্গ (দিলীপ)
(৬৩) রঘু
(৬৪) অজ
(৬৫) দশরথ
(৬৬) রাম ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন
(৬৭) কুশ লব অঙ্গদ চন্দ্রকেতু
সুবাহু শূরসেন
(৬৮) অতিথি
(৬৯) নিষেধ
তক্ষ পুষ্কর
(৭০) নল
(৭১) নভস্

আশ্রয় লয়। গুরুর আদেশে সগর তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিলেন; কিন্তু যবনদিগকে মুণ্ডিত, শকদিগকে অর্দ্ধমুণ্ডিত, পারদদিগকে প্রলম্বিত-কেশ ও পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক একটা পার্থক্য করিয়া দিলেন ও তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়ায় তাহারাও ক্রমে ক্রমে ম্লেচ্ছ হইয়া গেল।

ভগীরথ (৪৭) গঙ্গা আনয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। ভগীরথের গঙ্গানয়নবৃত্তান্ত পাঠে মনে হয়, ভগীরথের সে কৃতিত্বের পূর্ব্বে মর্ত্ত্যভূমিতে গঙ্গা ছিলেন না। কিন্তু পাঠকগণ ভগীরথের উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ হরিশ্চন্দ্রের গল্পের বিষয় যদি স্মরণ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, হরিশ্চন্দ্র কাশীধামে গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে চণ্ডালের কার্য্য করিয়াছিলেন। এখন ভগীরথই যদি মর্ত্ত্যে গঙ্গানয়নের মূল পুরুষ হয়েন, তবে হরিশ্চন্দ্রের সময়ে গঙ্গা আসিলেন কোথা হইতে? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা মৎস্যপুরাণে ১১৫—১২১ অধ্যায়ের অন্তর্গত বৃত্তান্তের মধ্যে এই বৃত্তান্তটি পাই যে, পুরাণ-প্রসিদ্ধ আটটি মন্বন্তরের মধ্যে যখন ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরের অধিকার কাল ছিল, তৎকালের সূর্য্যবংশীয় ভগীরথই গঙ্গানয়ন করিতে তপস্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎপরবর্ত্তী বৈবস্বত মন্বন্তরের হরিশ্চন্দ্র বৈবস্বত মন্বন্তরেরই ভগীরথ হইতে উর্দ্ধতন পুরুষ হইলেও কাশীতে যে গঙ্গা দেখিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? গঙ্গা পৃথিবীতে পূর্ব্ব মন্বন্তর হইতেই অবস্থান করিতেছিলেন।

(৭২) পুণ্ডরীক
|
(৭৩) ক্ষেমধন্বা
|
(৭৪) দেবালীক
|
(৭৫) অহীনগু
|
(৭৬) রুরু
|
(৭৭) পারিযাত্র
|
(৭৮) দল
|
(৭৯) শল
|
(৮০) উক্থ
|
(৮১) বজ্রনাভ
|
(৮২) শঙ্খনাভ
|
(৮৩) ব্যুথিতাশ্ব
|
(৮৪) বিশ্বসহ
|
(৮৫) হিরণ্যনাভ
|
(৮৬) পুষ্প
|
(৮৭) ধ্রুবসন্ধি
|
(৮৮) সুদর্শন
|
(৮৯) অগ্নিবর্ণ
|
(৯০) শীঘ্র
|
(৯১) মরু
|
(৯২) প্রসুশ্রুত
|
(৯৩) সুগবি
|
(৯৪) অমর্ষ
|
(৯৫) মহাশ্বান্
|
৫
|
(৯৬) বিশ্রুতবান্
|
(৯৭) বৃহদ্বল
|
(৯৮) বৃহদ্ক্ষণ
|
(৯৯) গুরুক্ষেপ
|
(১০০) বৎস
|
(১০১) বৎসব্যূহ
|
(১০২) প্রতিব্যোম
|
(১০৩) দিবাকর
|
(১০৪) সহদেব
|
(১০৫) বৃহদশ্ব
|
(১০৬) ভানুরথ
|
(১০৭) সুপ্রতীক
|
(১০৮) মরুদেব
|
(১০৯) সুনক্ষত্র
|
(১১০) কিন্নর
|
(১১১) অন্তরীক্ষ
|
(১১২) সুবর্ণ
|
(১১৩) মিত্রজিৎ
|
(১১৪) বৃহদ্রাম
|
(১১৫) কৃতঞ্জয়
|
(১১৬) রনঞ্জয়
|
(১১৭) সঞ্জয়
|
(১১৮) শাক্য
|

(১১৯) শুদ্ধোদন
|
(১২০) রাতুল
|
(১২১) প্রসেনজিৎ
|
(১২২) ক্ষুদ্রক
|
(১২৩) কুণ্ডক
|
(১২৪) সুরথ
|
(১২৫) সুমিত্র

ইক্ষ্বাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি—বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ এই স্থানে ইক্ষ্বাকুবংশ শেষ করিয়াছেন।

জৈমিনীর শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য এই হিরণ্যনাভের (৮৫) নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই কলিশেষে যখন সত্যযুগের পুনরাগমন হইবে, তখন এই পৃথিবীর রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য মরু (৯১) নাকি আজও কোথাও গুপ্তভাবে কাল কাটাইতেছেন।

ভারতযুদ্ধে সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃহদ্‌বল (৯৭) অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হয়েন।

পাঠকগণ দেখুন, বিষ্ণুপুরাণে কেমন শুদ্ধোদনের (১১৯) পুত্র বুদ্ধ লিখিত না হইয়া রাতুল লিখা হইয়াছে। অথচ যেন মনে হয়, রাতুল নামটি বুদ্ধপুত্র রাহুলেরই মত। বুদ্ধপুত্র রাহুল কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করায় শুদ্ধোদনবংশ নির্ব্বংশ হইয়া যায়। এখানে রাতুল পুত্রবান্। এ সমস্যা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আর শাক্য বিষ্ণুপুরাণে এক ব্যক্তি; কিন্তু বৌদ্ধগণের বুদ্ধবৃত্তান্তসম্বলিত গ্রন্থে "সকাবত ভো রাজকুমার পরমা সকাবত ভো রাজকুমারায়ো" এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য অবলম্বনে শুদ্ধোদন বংশে শাক্যনামের ব্যবহার। ইহাও একটা বেশ রহস্যময় ব্যাপার।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

অদৃষ্টচক্র।

উপক্রমণিকা।

দর্শন।

কে সে?

ভাদ্রের গঙ্গা; অঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের ললিত লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে। নদীমধ্যে বালুকায় গঠিত চর ডুবিয়া গিয়াছে; দুই কূলে বিস্তৃত সৈকতের অর্দ্ধাংশের অধিক জলতলে। ভাগীরথী যেন পূর্ব্বের বিস্তৃতি ফিরিয়া পাইয়াছে। পূর্ব্বকূলে গ্রাম; এককালে জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল; এখন হৃতসম্পদ, গতগৌরব। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই পল্লীগ্রামের এই দশা; নগর-দানবের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য গ্রামবাসীরা সুখশান্তিময় পল্লীবাস ছাড়িয়া কর্ম্মকোলাহল-বহুল নগরে গিয়াছে। গ্রামের উচ্চ শৌধচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; গৃহাগ্রে কাশতৃণ জন্মিতেছে; জনহীন গৃহে শৃগাল-কুক্কুর-বিষধর আশ্রয় পাইয়াছে; পুণ্যকামীর পুণ্যকীর্ত্তি সরোবর শৈবালসমাচ্ছন্ন; দেবমন্দিরের জীর্ণসংস্কার হয় না; বাঁধা ঘাটে ইষ্টক খসিতেছে, ইষ্টকের মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ জন্মিতেছে। যাহারা ধনে, বিদ্যায়, গুণে প্রধান—তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গ্রামের উন্নতি হইবে কিরূপে? নদীপথে গতায়াতে নৌকা হইতে দেখিলে ইচ্ছাপুর পরিত্যক্ত পল্লী বলিয়াই মনে হয়; কেবল ঘনপল্লব বৃক্ষরাজির মধ্যে মধ্যে দুই একটি গৃহ ইহার পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের অবস্থা যেমন, নদীর অবস্থাও তেমনই। পূর্ব্বে গ্রাম নদীতীরে ছিল; এখন নদী বহুদূর সরিয়া গিয়াছে। বর্ষার পর হইতে জল সরিতে আরম্ভ হয়; তখন গ্রাম হইতে প্রায় এক পোয়া পথ বালুকাকীর্ণ তীরভূমি অতিক্রম করিয়া জলে আসিতে হয়, নদীর মধ্যভাগেও চড়া পড়িয়াছে।

এখন ভাদ্রের নদী; কূলে কূলে ভরা। তাই জল আবার গ্রামের নিকটে আসিয়াছে। শিবমন্দির হইতে যে সোপানশ্রেণী পূর্ব্বে জলে নামিয়া গিয়াছিল, এখন বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহার ও নদীর মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকে, এই সময় তাহা কমিয়া আসিয়াছে।

অপরাহ্ণ; কিন্তু সায়াহ্নের বিলম্ব আছে; তাই এখনও স্নানের ঘাটে জনতা নাই। নদীবক্ষে ধীবরগণ নৌকা বাহিয়া মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে; নৌকার

দাঁড়াইয়া জাল ছড়াইয়া ফেলিতেছে; যখন গুটাইয়া তুলিতেছে, তখন জালে রজতধবল মৎস্যগুলি মুক্তিলাভের চেষ্টায় দারুণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। সেগুলিকে নৌকার খোলে ফেলিয়া ধীবরগণ আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জাল ফেলিতেছে। আকাশে লঘু মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে; কেহ ধূসরাভ শ্বেত, কেহ কুন্দশুভ্র। দুই একটি মাছরাঙ্গা আহার সন্ধানে জলে ডুব দিতেছে, যে বার মৎস্য ধরিতে পারিতেছে সে বার উড়িয়া যাইয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া আহার্য্য আত্মসাৎ করিতেছে; তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্যমনোরম দেহ রবিকরে সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক দল জলচর বিহগ গগনে উড়িয়া যাইতেছে; রবিকরদীপ্ত নদীজলে তাহাদের ছায়া পড়িতেছে; পবনে তাহাদের পক্ষাঘাতশব্দ দূরাগত ঝটিকা-গর্জ্জনের মত শুনাইতেছে।

গ্রামের স্নানের ঘাটে জনতা নাই; এখনও ঘাট রমণীমণ্ডলীর কথায় ও কলহাস্যে গুঞ্জনমুখর মধুচক্রের মত হয় নাই। ঘাটে কেবল দুইজন রমণী। প্রথমা ষোড়শী, দ্বিতীয়ার বয়স দ্বাদশের অধিক হইবে না। প্রথমা ঘাটে স্নানার্থীদিগের সুবিধার জন্য রক্ষিত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের উপর অলক্তকরাগ-রেখাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ তুলিয়া গাত্রমার্জ্জনী দিয়া মার্জ্জিত করিতে ছিলেন। দ্বিতীয়া একটু অধিক জলে গিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ আগ্রীব জলমগ্ন থাকিয়া সন্তরণের আয়োজন করিতেছিল। সে কেবল জলের উপর পদ্মাভদেহ ভাসাইয়া প্রসারিত করে জল সঞ্চালিত করিয়াছে, এমন সময় প্রথমা বলিলেন "সরোজা, আবার সাঁতার দিতেছিস্?"

বালিকা বলিল, "দিদি, তোমার বড় ভয়।"

"তোর আর সাহস দেখাইয়া কায নাই। ভাদ্রের নদী। এই স্রোতের টানে কি কখনও সাঁতার দিতে আছে?"

বালিকা ফিরিয়া আসিল।

নদীর মধ্যভাগে একখানি লালডিঙ্গি উজান বাহিয়া যাইতেছিল। দাঁড়ীরা সবেগে দাঁড় টানিতেছিল; নৌকা নদীর উজান স্রোত অবহেলা করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল। নৌকার আরোহী চারিজন যুবক; তিন জন সমবয়স্ক—বয়স উনবিংশ হইতে একবিংশের মধ্যে, কেবল একজনের বয়স সপ্তবিংশ বা অষ্টাবিংশ হইবে। যাহার বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক সে কিছু গম্ভীর। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্য যে কৃত্রিম, তাহা একটু চেষ্টা করিলেই বুঝা যায়। সে সঙ্গীদিগের "মুরুব্বির" পদ লইতেছিল; অত্যন্ত চলিত কথা—অতি সাধারণ মত এমন গম্ভীর

ভাবে ব্যক্ত করিতেছিল, যে সহসা মনে হয়, যেন লোকটা প্রকৃতই সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণ-শক্তি-সম্পন্ন দার্শনিক; তাহার কথিত মত যেন একান্তই মৌলিক। সে আপনার অল্প বিদ্যাকে প্রচুর দেখাইবার কৌশলে অভ্যস্ত।

নৌকামধ্যে যুবকগণ ঘাটে রমণীদ্বয়কে দেখিল। একজন বলিল, "দেখ, কি সুন্দরী!"

আর এক জন দাঁড়ীদিগকে নৌকার বেগ হ্রাস করিতে বলিল। দ্রুতগতি নৌকা মন্দগতি হইল।

বালিকা পূর্ব্ব হইতেই নৌকা দেখিতেছিল। যুবতী চরণ-মার্জ্জন শেষ করিয়া ফিরিয়া নৌকা দেখিতে পাইলেন।

তিনি দেখিলেন, নৌকা হইতে যুবকগণ তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া আছে। তিনি একবার তাহাদিগের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখে বিরক্তি ও বিস্ময় সপ্রকাশ হইল। তখন দুই ভগিনীর মুখে অপরাহ্নের রবিকর পড়িয়াছে। নৌকাযাত্রী যুবকদিগের নয়নে উভয়ের মূর্ত্তি সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

যুবতী ত্রস্তে কবরীর উপর অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিলেন, বালিকাকে বলিলেন, "সরোজা, বাড়ী চল।"

বালিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল; রবিকরে তাহার প্রচুর কেশমধ্যস্থ স্বর্ণাম্বরাবৃত প্রসাধনী ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। সে বিস্মিত ভাবে জ্যেষ্ঠাকে বলিল, "সে কি? তুমি যে জলে নাম নাই!"

"দেখিতেছিস না, নৌকা হইতে কতকগুলি ছোক্‌রা আমাদিগকে দেখিতেছে?"

বালিকা সরল ভাবে বলিল, "দেখিলই বা?"

যুবতী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না।"

তিনি গৃহাভিমুখগামী হইলেন বালিকা তাহার অনুসরণ করিল। সিক্ত বসন তাহার অঙ্গে জড়াইয়া রহিল। তাহারা যখন সৈকত অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন নৌকামধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক যুবক বলিল, "এইরূপ চলন দেখিয়াই কালিদাস সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকার সহিত উমার তুলনা করিয়াছিলেন।"

যুবকদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "এই দুইজনের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী?"

আর এক জন বলিল, "বালিকা।"

"কেন ?'

"যে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার আর গৌরব কি ? যে ফুটিবে তাহারই আদর অধিক।'

"যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই গৌরব। যে ফুটিবে তাহার পথ ত বিঘ্নবহুল।"

"কিন্তু সে-ই ত স্পৃহণীয়।"

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক যুবক এতক্ষণ রমণীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। এখন গম্ভীরভাবে বলিল, কিন্তু বলিকার কথাতেই কালিদাস বলিয়াছেন, ঃ—

'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং কররুহৈ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতিবিধিঃ॥' *

কি বলেন যতীশ বাবু ?"

যে যুবক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইল, তাহার বয়স উনবিংশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। সে একটু হাসিল। তাহার ভাবে বোধ হয়, সে স্বভাবতঃ একটু লাজুক; এই সকল প্রগল্‌ভ ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকদিগের সংসর্গে পড়িয়াও এখনও স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

এক জন যুবক বলিল, "অমূল্য বাবুর সংস্কৃত সাহিত্যটি ভালরূপই পাঠ করা আছে।"

অমূল্যচরণের অভিমান তৃপ্ত হইল। সে বলিল, "এককালে কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেরই আলোচনা করিয়াছিলাম। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য আর নাই।" অমূল্যচরণ এমন ভাবে এ কথাটা বলিল যেন জগতের সকল সাহিত্যের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। বাস্তবিক তাহার পরিচয় আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ, সংস্কৃতের সহিত অল্প, ইংরাজীর সহিত নগণ্য। অন্য কোন সাহিত্যের সহিত তাহার কোনরূপ পরিচয়ই নাই। অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত মতকে মৌলিকতার আবরণ দিতে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

যে যুবক তর্কে যুবতীর সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছিল, সে বলিল, "কালিদাসের কথায় আমাদের কায কি ?" ভাবে বোধ হইল, সে শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে পারে নাই।

* এই অনবদ্যদেহ অনাঘ্রাত কুসুম, নখরে অচ্ছিন্ন কিশলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বাদিতরস নব মধু, পুণ্যের পূর্ণ পুরস্কার—জানি না কে ইহা ভোগ করিতে পাইবে ?

অমূল্যচরণ বলিল, "আমি বলিতেছি, জানি না, কে এই সৌন্দর্য্য ভোগ করিবে।"

যুবক বলিল, "যতীশের বিবাহের চেষ্টা হইতেছে। দেখ না?"

অমূল্য বলিল, "তাহা হইলে ত পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে আগতাকে দেখিয়া কালিদাসেরই মত বলিতে ইচ্ছা হইবে—যেন গুণানুরাগিণী লক্ষ্মী পুরাতন পদ্ম হইতে প্রস্ফুটিত উৎপলে আসিলেন।"

যতীশ বলিল, "এইবার নৌকা ফিরাইয়া গৃহে যাওয়া যাউক।"

নৌকা ফিরিল। যুবকগণ নানাকথার আলোচনা করিতে লাগিল।

প্রথম খণ্ড।

গ্রহণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

শানগর গ্রাম গঙ্গার পশ্চিম কূলে অবস্থিত। বহুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মুসলমানের শাসনকালে এই গ্রামে একজন সমৃদ্ধ মুসলমান বাস করিতেন। এখন লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত হইয়া শাহসাহেবের বংশধরগণ এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন। ধনবলে ও জনবলে প্রধানরূপে যে স্থানে বাস করা যায়, তথায় হীনবিত্ত হইয়া বাস করা বড় কষ্টের কারণ। তবে এখনও গ্রামস্থ মসজিদে, বারিশূন্য দীর্ঘিকায়, গৃহের ও গৃহবেষ্টন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষে এবং গ্রামের নামে শাহসাহেবের স্মৃতি রহিয়াছে। এখনও গ্রামের কোন কোন অধিবাসী গুপ্তধন পাইবার দুরাশায় শাহসাহেবের ভিটা খনন করিয়া থাকে। গ্রামখানি পুরাতন; সুতরাং গ্রামে সকল বর্ণের বাস। হিন্দু গ্রাম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ থাকিত; গ্রামেই গ্রামবাসীদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিবার উপায় থাকিত, তাহাদিগকে সেজন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইত না। আবার সমৃদ্ধ মুসলমানের বাসহেতু গ্রামে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাও অল্প নহে। পল্লী দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব নাই।

এই গ্রামে মাতুলালয়ে ধরণীধর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ধরণীধরের জন্মের দুই মাস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতামহ একমাত্র সন্তান

কন্যাকে ও দৌহিত্রকে স্বীয় গৃহেই রাখিয়াছিলেন। সুতরাং ধরণীধর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। মাতুলালয়েই তাঁহার বাস। মাতামহের মৃত্যুতে তিনিই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

ধরণীধরের মাতামহ বাঙ্গালী-গৃহস্থ ছিলেন। তখন "গৃহস্থ" বলিলে লোক বুঝিত, লোকটির অন্নসংস্থান আছে—দুই চারি বিঘা জমীও আছে। ঘরে শালগ্রামশিলা, গোশালায় গাভী ও গোলায় ধান্য তখন সকল গৃহস্থেরই ছিল। বাস্তবিক তখন লোকের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই পরিমাণ অল্প ছিল—উভয়েরই তৃপ্তি সহজসাধ্য ছিল। ধরণীধরের মাতামহ সাধারণ গৃহস্থ হইলেও দৌহিত্রের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহারই সাহায্যে ধরণীধর এঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পাঠ করিয়া পূর্ত্তবিভাগে চাকরী পাইয়াছিলেন।

ধরণীধরের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তিনি সহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন, কিন্তু প্রথম পরিচয়ে তাঁহাকে কঠোর বলিয়াই বোধ হইত। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট তিনি অল্পভাষী ছিলেন; তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যাও অধিক ছিল না; তাই লোক তাঁহাকে অসামাজিক মনে করিত। তিনি পঠদ্দশায় যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষীণস্বাস্থ্য লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হইত। তাহাতে তাঁহার ব্যায়ামাভ্যস্ত সুগঠিত দেহে অন্য কোনরূপ অপকার হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়াছিল; সেই জন্য তিনি গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না। পারিবারিক জীবনেও তিনি যে সুখী ছিলেন, এমন নহে। তাঁহার যৌবনে—প্রথম সন্তান যতীশচন্দ্রের জন্মের দুই বৎসর পরে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তিনি বিদেশে—কর্ম্মস্থানে ছিলেন। পত্নী গৃহে ছিলেন। এক দিন প্রত্যূষে তাঁহার পত্নীর বিসূচিকা দেখা দিল। তাঁহার জননী প্রথমে বধূর পীড়ায় বড় মনোযোগ দিলেন না; পরে—রোগ বাড়িয়া উঠিলে ডাক্তার ডাকাইলেন। এদিকে ধরণীধরের নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। টেলিগ্রাম পাইয়া ধরণীধর গৃহাভিমুখগামী হইলেন। তিনি তৃতীয় দিনে যখন গৃহে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পত্নীর অবস্থা শোচনীয়। স্বামীকে দেখিয়া পত্নীর নয়নদ্বয় একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট পতির গলদেশে দক্ষিণবাহু বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে আরও নিকটে আনিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। শেষ কথা আর বলা হইল না। সে কথা ধরণীধর ভুলিতে পারেন নাই; সে স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ছিল। জননীর ও মাতামহীর

অশ্রু, বন্ধুবান্ধবের উপদেশ, কন্যাদায়গ্রস্তদিগের অনুরোধ কিছুতেই তাঁহাকে আর বিবাহ করাইতে পারে নাই। তিনি বিদেশে চাকরী করিতেন, অবসরকালে গৃহে আসিতেন; আর পুত্রের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতেন, যেন তাহাকে অর্থের অভাবে একাকী বিদেশে থাকিতে না হয়।

ধরণীধরের ধনসঞ্চয়চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। আয়ের আতিশয্য অপেক্ষা ব্যয়ের অল্পতাতেই অধিক অর্থসঞ্চয় হইয়া থাকে। ধরণীধরের ব্যয়বাহুল্য ছিল না। তিনি স্বয়ং বিলাসবর্জ্জিত জীবন যাপন করিতেন। গৃহেও তাঁহার জননী ও মাতামহী কখন বিলাসে অভ্যস্তা ছিলেন না। কাযেই তিনি যথেষ্ট অর্থসঞ্চয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যতীশচন্দ্র ধরণীধরের মাতার ও মাতামহীর স্নেহে লালিত হইয়াছিল। ধরণীধরের মাতামহী তাহাকে কিছু অতিরিক্ত আদর দিতেন। সেই আদরে সে বাল্যকালে কিছু দুরন্ত হইয়াছিল, পাঠেও তাহার যথেষ্ট মনোযোগদান ঘটে নাই। কিন্তু যতীশচন্দ্রের সপ্তমবর্ষবয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতামহীরা স্বভাবতঃ পৌত্রপৌত্রীদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন। জগতে এমন লোক দেখা যায়, যাহারা আসল অপেক্ষা সুদ অধিক ভালবাসে; পিতামহীরা সেই শ্রেণীর লোক। যতীশচন্দ্রের পিতামহী যে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তিনি স্নেহাতিশয্যহেতু কখনও তাহাকে আবশ্যক শাসন করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। তাহাকে শাসন করিতে তাঁহার আপনার হৃদয় ব্যথিত হইত; কিন্তু পৌত্রের ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া তিনি সে কর্ত্তব্য পালন করিতেন। বরং তাঁহার জননীর শাসনহীন স্নেহে পৌত্রের যে অনিষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহার সংশোধনে সচেষ্ট ছিলেন।

এদিকে ধরণীধর পুত্রের সুশিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রামের নিকটে একটি বিদ্যালয় ছিল। যতীশচন্দ্র সেই বিদ্যালয়ে পাঠ করিত। ধরণীধর সেই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে আপনার গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিক্ষক গৃহে যতীশচন্দ্রকে পড়াইতেন; যতীশচন্দ্র তাঁহার সহিত বিদ্যালয়ে যাইত ও বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইত। এতদ্ব্যতীত গ্রামের টোলের অধিকারী পণ্ডিতমহাশয় যতীশচন্দ্রকে সংস্কৃত পড়াইতেন। সংস্কৃতের প্রতি ধরণীধরের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে, কার্য্য গ্রহণের পর, সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, সংস্কৃতসাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। পুত্রকে সংস্কৃতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ধরণী-

যত্নের এই ব্যবস্থায় সুফলও ফলিয়াছিল। তিনি যখনই গৃহে আসিতেন, পুত্রের পাঠে উন্নতি লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। সপ্তদশ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে যতীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলিলেই সব কথা বলা হইল না; কারণ, সে যে বিভাগ হইতে পরীক্ষা দিয়াছিল, সে বিভাগের উত্তীর্ণ বালকদিগের মধ্যে সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিল।

তাহার পর যতীশচন্দ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিল। তাহাকে প্রতি শনিবারে এবং অন্য সময় ছুটী পাইলেই বাড়ী আসিতে হইত। ধরণীধর সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

আশৈশব পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহগ যদি সহসা পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া দেখে যে, সে স্বাধীন, তবে সে যেমন সেই নূতন অবস্থা সম্যক উপভোগ করিবার জন্য মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান হয়—বিপদের আশঙ্কাকে মনে স্থানদান না করিয়া যথেচ্ছা বিচরণ করে—কলিকাতায় আসিয়া যতীশচন্দ্র তেমনই নব-প্রাপ্ত স্বাধীনতা সাগ্রহে উপভোগ করিতে লাগিল। পুত্র কখন বিদেশে যায় নাই; পাছে তাহার কোন অসুবিধা ঘটে এই আশঙ্কায় ধরণীধর স্বভাবতঃ মিতব্যয়ী হইয়াও পুত্রকে আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ দিতেন। বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সর্ব্ববিষয়ে সাবধান ধরণীধর স্নেহবশতঃ এই ভুল করিলেন। অর্থ সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ সমাজে ছাড়পত্রের কায করে। সভায়, সমিতিতে, সম্মিলনে যোগ দিয়া যতীশচন্দ্র ছাত্রদলে এবং ছাত্রদল হইতে ক্রমে অন্য দলেও পরিচিত ও সমাদৃত হইতে লাগিল। সে যখন বাটীতে যাইত তখন সময়ে সময়ে দুইচারিজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত। তাহার-পিতামহী তাহাদিগকে পরম সমাদরে সমাদৃত করিতেন। ধরণীধর এ সব কথা জানিতে পারিতেন না।

এবার বন্ধুদিগের সহিত গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র জলপথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এই ভ্রমণকালে ইচ্ছাপুরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনার পর যতীশচন্দ্রের বন্ধুবর্গের মধ্যে একজনকে আরও দুই দিন শানগরে দেখা গিয়াছিল।

যতীশচন্দ্রের বন্ধুও নানারূপ। পিতার ব্যবস্থাগুণে সে ইংরাজী ও সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল—সাহিত্যরসে রসিক হইয়াছিল। তাহার রচিত প্রবন্ধের খ্যাতি বিদ্যালয়ের তর্কসভা হইতে ক্রমে বাঙ্গালা মাসিক পত্রের কার্য্যালয়ে

পঁহুছিয়া ছিল। যশোলাভের স্পৃহাদমন পরিণতবয়স্কের পক্ষেও সহজ-সাধ্য নহে। অপরিণামদর্শী তরুণবয়স্ক যুবক যে সেই স্পৃহাহেতু আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলবিষয়ে অন্ধ হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কাযেই যতীশচন্দ্র দুর্ব্বোধ অঙ্কশাস্ত্রের ও নিরস ন্যায়ের চর্চ্চা ছাড়িয়া সাহিত্যচর্চ্চায় ও প্রবন্ধরচনায় অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে লাগিল।

এই কারণে তাহার কতকগুলি সাহিত্যিক বন্ধুও সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদিগের সংসর্গে যতীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ উপকারের সম্ভবনা ছিল কি না সন্দেহ;—কারণ অপরিণতবুদ্ধি, অল্পবিদ্য যুবকের সাহিত্যচর্চ্চা প্রায়ই স্থায়ী সুফল প্রদান করে না—তাহার সাহিত্যকীর্ত্তি একান্ত অপরিণত অবস্থায় সংগৃহীত ফলের মত বিস্বাদ ও অব্যবহার্য্য হয়। কিন্তু ইহাতে যে যতীশচন্দ্রের বর্ত্তমানে ক্ষতি হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কারণ, ইহাতে তাহার পাঠে অত্যন্ত অবহেলা হইতেছিল। এই অবহেলার অনিবার্য্য ফলের বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি কিছুই তাহার ছিল না।

তাহার সাহিত্যিক বন্ধুদিগের মধ্যে অমূল্যচরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীশ-চন্দ্রের তরুণ হৃদয়ে অমূল্যচরণের প্রভাবফলে তাহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল,—সেই প্রভাবফল তাহাকে অভিনব পথের পথিক করিয়াছিল।

কাল।

মধ্যাহ্নের শুভ্র—তীব্র রবিকর যথা
অপরাহ্নে শান্ত সৌম্য মনোরম হয়।
যৌবনের সে উদ্দাম বেগচঞ্চলতা
বার্দ্ধক্যে বিশুদ্ধ হ'য়ে হয় শুভময়।
কাল কভু চোর নহে কাল বড় দাতা
অপূর্ণতা হরি' দেয়—বিচার—বিজ্ঞতা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জাতিভেদে বিবাহের পদ্ধতিভেদ।

বিবাহ সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ; এইজন্য সকল দেশের সভ্য অসভ্য সমস্ত নরনারীই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ-পদ্ধতি, বিবাহের আচার অনুষ্ঠানাদি সকলের একরূপ নহে; পরন্তু জাতি ও সম্প্রদায় প্রভৃতি ভেদে সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। এই সকল বিবাহ-বিধি যেমন পরস্পর বিভিন্ন, তেমনই বিস্ময়োদ্দীপক। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, কতকগুলি পৃথক্ পরিণয় পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও সাঁওতালপরগণার এক শ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতির নাম 'মাহিলী'; (Mahili or Mahli) ইহাদের বিবাহ-নিয়ম অদ্ভুত। বিবাহ-সূত্রে সংবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, ইহারা বৃক্ষের সহিত পরিণীত হয়—পাত্রী নিজপল্লীস্থ একটি মহুয়া এবং পাত্র একটি আম্রবৃক্ষকে পতি-পত্নীত্বে বরণ করিয়া থাকে! বিবাহ-কালে পাত্র কিঞ্চিৎ সিন্দূর লইয়া পাত্রীর সীমন্তে লেপন করিয়া দেয় এবং পাত্রী আপনার বামহস্তে লৌহ-কঙ্কণ (নোয়া) পরিধান করে, ইহাতেই মাহিলীজাতির বিবাহ সম্পন্ন হয়।

চীনসাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশে কোরিয়া দেশ। এদেশের বিবাহ-পদ্ধতি অতীব বিচিত্র। এখানে 'চুংমাই' বা ঘটক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন; কিন্তু বিবাহ একটি হংসী ব্যতীত নিষ্পন্ন হয় না। বিবাহ আইনসঙ্গত এবং বরকন্যার প্রণয় প্রগাঢ় ও চিরস্থায়ী করাই উহার অভিপ্রায়। কোরিয়ার বর বিবাহদিনে ঘোটকে বা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া, মহাসমারোহে কন্যাগৃহে উপনীত হয়েন এবং দ্বারদেশে জানুযোগে উপবিষ্ট হইয়া একটি হংসী ছাড়িয়া দেন। হংসীটি গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে কন্যাকর্ত্তা বরের নিকটে আগমন করেন এবং তাঁহাকে মহাসমাদরে বিবাহস্থলে কন্যার নিকটে লইয়া যায়েন। তথায় 'হন্সেচী' বা চুক্তিপত্রে বরকন্যার নাম স্বাক্ষরিত হইলে বিবাহ সমাধা হইয়া যায়। বিবাহের পরে বরকে 'তায়াই' বা আইবড় কেশ অর্থাৎ পূর্ব্বের পৃষ্ঠলম্বিত 'বাবরীচুল' কর্ত্তন করিয়া, শিখাবন্ধন করিতে হয়। কোরিয়ায় অবিবাহিত ব্যক্তির কোনও সম্মান নাই। সে যুবক বা বৃদ্ধ হইলেও শিশু বলিয়া পরিগণিত হয় এবং শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিলেও নিন্দাভাজন হয় না। তথায় বিবাহকে এক

প্রধান ও সম্মানার্হ ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা হয়। কোরিয়ার বর প্রায়শঃই কন্যা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের এক শ্রেণীর হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত জাতিকে 'মাল' কহে। ইহাদের বিবাহ-সময়ে, কন্যা সাত-বার বরকে প্রদক্ষিণ করে এবং উভয়ে একদিকে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া উপবিষ্ট হয়। অতঃপর বরকন্যার মস্তকোপরি শান্তিজল বা ব্রাহ্মণস্পৃষ্ট বারি সেচন করা হয় এবং পুরোহিত মহাশয় যথারীতি মন্ত্রপাঠ শেষ করিয়া তাহাদিগের বস্ত্রে 'গাঁইটছড়া' বাধিয়া দেন। তখন উভয়ে পুষ্পমাল্য-বিনিময় করিয়া বিবাহ শেষ করে। বৃক্ষবিশেষের শাখানির্ম্মিত গৃহে রাত্রিশেষে ইহাদের উদ্বাহক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

উত্তর মেরুপ্রদেশের একটি স্থানের নাম লাপলণ্ড। এই স্থানের অধিবাসীরা 'লাপ' নামে অভিহিত। লাপদিগের বিবাহ প্রণালী কৌতুকাবহ। কন্যাকর্ত্তার সম্মতি ব্যতীত ইহাদের বিবাহ হয় না। এইজন্য বর, বধূ মনোনীত করিয়াই সম্মতিলাভের জন্য, তাহার পিতার অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়—বারবার সুরা উপহার দিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে থাকে। কন্যার পিতা যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হয় ও সম্মতিদান করে, তাহা হইলে বিবাহের আর কোনও প্রতিবন্ধক থাকে না। তখন বর, বধূদর্শনে—ভাবী পত্নীর সহিত প্রেমালাপে অধিকারী হয়, কিন্তু সে দর্শন—সে প্রেমালাপও উপহার ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত, প্রত্যেক সাক্ষাতে বরকে ভাবী শ্বশুরের পরিতুষ্টির জন্য এক এক বোতল মদ্য এবং ভাবীপত্নীর সন্তোষার্থ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য, মিঠাই প্রভৃতি উপহার দিতে হয়। কিন্তু বধূর উপহার প্রচ্ছন্নভাবে, অন্যের অগোচরে প্রদান করাই নিয়ম, নচেৎ বধূ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, প্রত্যর্পণ করিতেই বাধ্য হইয়া থাকে। অতঃপর কন্যাকর্ত্তার অভিপ্রায় অনুসারে বিবাহের দিন-লগ্নাদি ধার্য্য হয়। বর যথাশক্তি মূল্যবান বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া কন্যাভবনে গমন করে। কন্যা মুকুটের মত একটি বিচিত্র শিরোভূষণ ধারণ করিয়া নানাবর্ণের অসংখ্য ক্রীড়নক-নিবদ্ধ টোপর মাথায় দিয়া বিবাহস্থলে উপস্থিত হয়। পুরোহিত যথাবিধি মন্ত্রপাঠাদি সম্পন্ন করিয়া বিবাহকার্য্য শেষ করিয়া দেন। কিন্তু বিবাহ শেষ হইলেও বর, বধূসহ গৃহ-গমনে সমর্থ হয় না, অপিচ, গৃহজামাতৃরূপে, শ্বশুর ভবনে থাকিয়া শ্বশুরের সহায়তা করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বোপার্জ্জিত অর্থে আপনার ও আপন পত্নীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে চারিবর্ষ পূর্ণ হইলে তবে সে পত্নীর সহিত, গৃহগমনের অনুমতি লাভ করে।

তখন কন্যার পিতা, দুই একখানি পিত্তল কাঁসার বাসন, একটি জয়ঢাক ও কয়েকটা মেষ যৌতুক দিয়া কন্যাকে জামাতার সহিত পাঠাইয়া দেয়। লাপ জাতীয় বরকে সময়ে সময়ে দুই তিন বৎসর ভাবী শ্বশুরের তোষামোদ করিয়া বিবাহ করিতে হয়।

দক্ষিণাপথে 'যোগেরু' নামে এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রধানতঃ ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদের বরপাত্র, পাত্রীগৃহে সমাগত হইলে পাত্রীর পিতা বা কোনও নিকট আত্মীয় তাহাকে বিবাহস্থলে লইয়া যায় এবং পাত্র ও পাত্রীকে নূতন কাপড় পরাইয়া পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী দুইটি বড় ঝুড়ির মধ্যে দাঁড় করায়; ঝুড়ি দুইটি ধান্যাদি শস্যে পূর্ণ করা থাকে। পুরোহিত মহাশয়, একখণ্ড হলুদমাখান কাপড় উভয়ের মধ্যে ব্যবধানরূপে, স্থাপিত করিয়া মন্ত্রপাঠ ও সঙ্গে সঙ্গে পাত্রপাত্রীর মস্তকে ধান্যমুষ্টি বর্ষণ করিতে থাকেন, চারিজন সধবা নারী উভয়কে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান থাকে এবং এক একটি সূত্র আপনাপন দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলীতে পাঁচ পাক দিয়া জড়াইয়া রাখে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ শেষ করিলে তাহারা সেই সূত্রগুলিকে দুই দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং পাত্র-পাত্রীর হস্তে বন্ধন করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পরদিন প্রাতে বর বধূসহ গ্রামের দেবালয়ে গমন ও তথায় একটি নারিকেল ফল ছেদন করিয়া বিবাহের শেষ অঙ্গ সম্পূর্ণ করে। যোগেরুজাতির বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে, কন্যার বাটীতে বরকন্যার 'গাত্র-হরিদ্রা', একদিন পূর্ব্বে বরের বাটীতে 'বরভোজ' এবং বিবাহ-দিনে কন্যার বাটীতে 'কন্যাভোজ' সমাধা হয়।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ও কুচবিহারে 'গারো' নামে এক অসভ্য পার্ব্বত্যজাতির বাস। এই জাতির উদ্বাহ-পদ্ধতি অনেকাংশে আধুনিক "সভ্য" সম্প্রদায়ের অনুরূপ। ইহারা য়ুরোপীয়দিগের মত 'প্রেমপরিচয়' (Courtship) করিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহাদের পাত্রপাত্রী প্রথমে মনোনয়ন ও পরস্পর প্রীতির আদান-প্রদান সম্পন্ন করে; অবশেষে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা জন্মিলে পরিণয়পাশে সংবদ্ধ হইয়া পতিপত্নীরূপে বাস করিতে থাকে।

রাজপুতানার বণিক সম্প্রদায় 'মাড়োয়ারী' নামে পরিচিত। ইহাদের বিবাহোৎসব পাঁচদিনে সমাপ্ত হয়। ইহারা প্রথম দিনে 'গাত্রহরিদ্রা', দ্বিতীয় দিনে 'আয়ুর্ব্বৃদ্ধি', তৃতীয় দিনে 'বিবাহ', চতুর্থ দিনে 'ভোজ' এবং পঞ্চমদিনে 'কঙ্কণ-বিসর্জ্জন' ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাদের বর বিবাহদিবসে,

প্রথমে গর্দ্দভে ও তৎপরে ঘোটকে আরূঢ় হয়েন এবং তদবস্থায় মাতৃবক্ষে মস্তক স্থাপন করেন। অতঃপর দুইজন লোক ছত্র ও ব্যজনী লইয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং একজন তাহার মস্তকে ছত্রধারণ ও অন্যজন ব্যজনী ব্যজন করে। এই সময়ে বরের ভগিনী তাঁহার গমনপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়েন এবং তাঁহার নিকটে পুরস্কার প্রার্থনা করেন। বর যথারীতি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া যষ্টিহস্তে আত্মীয়স্বজনাদিসহ অগ্রসর হয়েন এবং কন্যাভবনে গমনপূর্ব্বক হস্তস্থ যষ্টির দ্বারা গৃহের সম্মুখবর্ত্তী 'বিবাহ-তোরণ' ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন, তখন কন্যার জননী 'বরণ-ডালা' হস্তে লইয়া কয়েকজন সধবা পুরমহিলার সহিত বরের সম্মুখে উপনীত হয়েন এবং তাঁহাকে বরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করেন। এদিকে কন্যা প্রথমে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে মিঠাই প্রদান এবং পরিশেষে গৌরীগণপতি ও কুলালচক্রের পূজা সমাপন করিয়া বিবাহস্থলে বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েন। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় বরকন্যার বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধন ও হোমাদি কর্ম্মসমূহ একে একে সমাধা করিলে বিবাহ শেষ হইয়া যায়। বিবাহের পরদিবস কন্যার পিতা যথাশক্তি যৌতুকাদি দ্বারা জামাতার এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্যপানীয়ে সমাগত বর ও কন্যাযাত্রিগণের সৎকার করেন। বর সেদিন শ্বশুরগৃহে অবস্থিতি করিয়া তৎপরদিন প্রাতে পত্নীসহ স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তাঁহাদিগের সম্মুখে একে একে সাতটি মৃণ্ময়পাত্র সংরক্ষিত হয়। বর পূর্ব্বোক্ত যষ্টির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সেগুলিকে অপসারিত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। অবশেষে কঙ্কণ-বিসর্জ্জন-ক্রিয়া সমাহিত হইলে বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইয়া যায়। এই বিবাহে, বিবাহের পূর্ব্ব হইতে গণদেবের পূজা আরব্ধ হয় এবং গঙ্গা ও শীতলাদেবীর পূজার দ্বারা সমস্ত কার্য্য শেষ করা হইয়া থাকে। মাড়োয়ারী কুলকামিনীরা বিবাহের দশ দিবস পূর্ব্বে 'জল সহিয়া' থাকেন।

মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রেণীবিশেষের নাম মাহেশ্বরী। ইঁহাদের বিবাহে পাত্রীর মাতুল পাত্রের সম্বর্দ্ধনা করেন এবং পাত্রীকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়।

প্যালেষ্টাইন এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দেশ। এই দেশের পূর্ব্বতন অধিবাসীদিগের নাম 'য়িহুদী'। য়িহুদীরা এখন পৃথিবীর নানাস্থানে বসবাস করিতেছেন। ইঁহাদিগের বিবাহ-বিধি অতি চমৎকার। ইঁহারা সর্ব্বাগ্রে 'স্বীকার-পত্র' লিখিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত করেন। অতঃপর পাত্রপাত্রী ও তাহাদিগের বহু আত্মীয় কুটুম্বাদি এক প্রকাণ্ড কক্ষে, কি কোনও পরিবেষ্টিত স্থানে সমবেত

হয়েন। বালকবালিকাগণ এক একটি ক্ষুদ্র মৃণ্ময়পাত্র বা ঘট হস্তে লইয়া সেই সঙ্গে মিলিত হয়। পুরোহিত বা কোনও প্রধান ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে বিবাহের স্বীকার পত্র পাঠ করেন এবং সমাগত নরনারীগণ পাত্রপাত্রীর প্রতি সম্ভ্রমপ্রদর্শন ও ঈশ্বরের নিকটে তাঁহাদিগের দীর্ঘজীবন ও কুশল প্রার্থনা করিতে থাকেন। তখন বালকবালিকাগণ হস্তস্থিত ঘটগুলিকে মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত ও চূর্ণ করিয়া ফেলে। পুরোহিত একপাত্র সুরা লইয়া মন্ত্রঃপূত ও তাহার কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিয়া, পাত্রপাত্রীকে পান করিতে দেন। প্রবেশপথে একব্যক্তি মদ্যপাত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। উপস্থিত জনগণ যখন একে একে স্থানত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি প্রত্যেককে এক এক গ্লাস মদ্যপান করিতে দেন। এই অনুষ্ঠানের অবসানে পাত্রপাত্রী আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত অষ্টাহকাল গৃহমধ্যে অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে তাঁহাদিগের সঙ্গীসঙ্গিনীরা নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন। বিবাহের একদিবস পূর্ব্বে পাত্রীকে নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে লইয়া স্নান করান হয়। স্নানের সময়ে স্ত্রীলোকরা উৎকৃষ্টরূপে তাঁহার গাত্রমার্জ্জনা করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও গান করিতে থাকে। ইহার পরে পরিকর-বিনিময় নির্ব্বাহিত হয় অর্থাৎ পাত্রপাত্রী পরস্পর কোমরবন্ধ (Belt) পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহের অপর অনুষ্ঠান সমাধা করেন। বিবাহ দিনে বরকন্যা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, বিবাহস্থলে—সাধারণ সভাগৃহে বা উদ্যানাদিতে উপস্থিত হয়েন। চারিজন যুবক একটি ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ, চারি কোণ ধরিয়া, তাঁহাদিগের মস্তকোপরি প্রসারিত করিয়া রাখে। সেই চন্দ্রাতপের নিম্নে, কন্যার দিকে কন্যাপক্ষ ও বরের দিকে বরপক্ষীয় লোকরা সমবেত হয়। কন্যা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। বর তিনবার তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার বামহস্ত গ্রহণ করেন এবং কন্যা দক্ষিণ হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া থাকেন। তখন উপস্থিত স্ত্রীপুরুষগণ বরকন্যার দীর্ঘ জীবন ও বংশবৃদ্ধির কামনা করিয়া তাঁহাদিগের মস্তকে মুষ্টিপূর্ণ শস্য বা মুদ্রামিশ্রিত যব-গমাদি নিক্ষেপ করেন। ইহার পরে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বরকন্যার মঙ্গলার্থ পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন এবং একটি ক্ষুদ্রপাত্র সুরায় পূর্ণ ও সেই সুরা কিঞ্চিৎ পান করিয়া, অবশিষ্ট উপস্থিত লোকদিগকে পান করিতে দেন। অতঃপর তিনি বরের অঙ্গুলি হইতে স্বর্ণাঙ্গুরী উন্মোচনপূর্ব্বক কন্যার অঙ্গুলিতে পরাইয়া বরের হস্তে এক গ্লাস মদ্য অর্পণ করেন। বর মদ্যপান করিয়া শূন্য আধারটি সভাভূমিতে

বা ভিত্তিগাত্রে সবলে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলেন। অবশেষে ভোজন ব্যাপার ও তদবসানে নৃত্য আরব্ধ হয়। সমাগত নরনারীগণ পৃথকভাবে পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক ক্রমাগত নৃত্য করিতে থাকে। বহুক্ষণেও সে নৃত্যের শেষ হয় না। সময়ে সময়ে আটদিন অবিরত নৃত্যকার্য্য চলিয়া থাকে। এই নৃত্যের সমাপ্তিতেই বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়।

বিহার অঞ্চলের 'মাল্লা' জাতি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা পাত্র পাত্রীর রাশি মিলাইয়া বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে এবং তত্ত্ব সামগ্রী পাঠাইয়া সেই সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত বা 'পাকা' করিয়া লয়। ইহাদের 'গাত্র-হরিদ্রা' নাই—হরিদ্রার পরিবর্ত্তে ইহারা বরকন্যার গাত্রে তৈল মাখাইয়া দেয়, ইহাদের বর, বিবাহ দিবসে কন্যার গ্রামে উপস্থিত হয় এবং কন্যার বাটীতে না গিয়া, পাড়ার কোনও স্বজাতীয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতে থাকে। বরের আগমন-সংবাদ রাষ্ট হইবামাত্রই গ্রামের নাপিত-বধূ, কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বরের নিকটে আগমন করে এবং উভয়ের পরিহিত বস্ত্রে 'গাঁইট ছড়া' বাধিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহারপর কন্যা পাঁচ বার বরকে প্রদক্ষিণ করে এবং বর কন্যার সীমন্তে সিন্দূর লেপন করিয়া দেয়। ইহাতেই উদ্বাহক্রিয়া শেষ হইয়া যায়। বিবাহান্তে বরবধূ বাসরঘরে নীত হয়। তথায় বরকে পরি-তোষ পূর্ব্বক 'দই সন্দেশ' ভোজন করান হয় এবং কুলাঙ্গনারা নানারূপ হাস্য কৌতুকে তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে আরম্ভ করে। রাত্রি প্রভাত হইলে, বর পত্নী সমভিব্যাহারে স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তথায় গঙ্গাদেবীর পূজা ও কঙ্কণ-বিসর্জ্জন বা হস্তস্থ সূত্রের জলসাৎক্রিয়া সমাহিত হইলে সমস্ত উৎসব শেষ হইয়া যায়।

চীন দেশের উদ্বাহ-বিধি সম্পূর্ণ অভিনব ও বিস্ময়জনক, এদেশের সব লোকই বিবাহ করে—বিবাহ করে না এমন লোক বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; হিন্দু জাতির যেমন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" চীনদিগেরও সেইরূপ পুত্রের জন্য পত্নীপরিণয়ের প্রয়োজন। পুত্রই তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ও পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রধান সাধন। এ জন্য পুত্রের নিমিত্ত—পিতৃপুরুষের উদ্ধারসাধনজন্য প্রত্যেক চীনাই বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের বিবাহে পাত্রপাত্রীর অভিমতের অপেক্ষা নাই, তাহাদিগের পিতামাতা বা অভিভাবকগণ যে সম্বন্ধ স্থির করেন তাহাই তাহাদিগকে নত মস্তকে মানিয়া লইতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রপাত্রীর পরস্পর আলাপ পরিচয়ের নিয়ম নাই—এমন কি কেহ কাহাকে দেখিতেও অধিকারী হয় না। চীনজাতির কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়, অগ্রে

কন্যার পিতা এক খানি ক্ষুদ্র কাগজে তুলির * দ্বারা কন্যার অষ্টাক্ষরী জন্মকোষ্ঠী-লিপিবদ্ধ করিয়া বরের পিতার নিকটে পাঠাইয়া দেন। শেষে বরের পিতা কোষ্ঠী প্রেরণ করেন। অতঃপর কোষ্ঠীবিচার ও সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় এবং দৈবজ্ঞ বা গ্রহাচার্য্যের সাহায্যে বিবাহের 'নির্ব্বন্ধপত্র' লিখিত বা দিনলগ্নাদি নিরূপিত হইয়া থাকে। বিবাহের এক মাস পূর্ব্বে অধিবাস দ্রব্যাদির আদান প্রদান নির্ব্বাহিত হয়। কন্যার পিতাই প্রথমে অধিবাসের তত্ত্বসামগ্রী পাঠাইয়া থাকেন। তাহার পর বিবাহ আরব্ধ হয়। এই বিবাহে বিবাহার্থীর কোনও প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ অপরাপর জাতীয় বরের ন্যায় চীনা বর কন্যাগৃহে গমন করিয়া বিবাহ করেন না, অপিচ বিবাহ দিনে যথাশক্তি সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিজ গৃহে, সুরম্য কক্ষবিশেষে উপবিষ্ট থাকেন। কন্যা যথারীতি বস্ত্রালঙ্কার ধারণ ও পাল্কী বা দোলায় আরোহণ করিয়া, মহাসমারোহে বরের গৃহে আগমন করেন। বরের গৃহদ্বারে কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার সঞ্চিত থাকে, কন্যা সেই অগ্নি উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। তখন বাটীর সধবাগণ উপস্থিত হইয়া কন্যাকে বরণ করেন এবং সম্বর্দ্ধনা সহকারে বিবাহকক্ষে বরের সমক্ষে লইয়া যায়েন। তথায় বর একটি চক্রবাক ও একটি চক্রবাকী লইয়া উপবিষ্ট থাকেন। কন্যা উপস্থিত হইলে, সেই চক্রবাকমিথুনের সম্মুখে তাঁহাদের 'শুভ-দৃষ্টি' সম্পন্ন হয়। চক্রবাকদম্পতীর ন্যায় পবিত্র দাম্পত্য প্রেম লাভ করাই উহার উদ্দেশ্য। অতঃপর কন্যা তিনবার বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হয়েন। বর কন্যার এবং কন্যা বরের বস্ত্রের উপরে বসিতে চেষ্টা করেন। চীনা লোকের সংস্কার বিবাহান্তে যিনি অন্যের বস্ত্রো-পরি উপবেশন করিবেন তিনিই সংসারে প্রতিপত্তি অর্জ্জনে সমর্থ হইবেন, ইহার পর বরবধূ একত্রে ঈশ্বরোপাসনা করেন এবং বধূ অন্তঃপুরে চলিয়া যায়েন। তখন বহির্ব্বাটীতে বর ও তাঁহার আত্মীয়বন্ধুগণ এবং অন্তঃপুরে বধূ ও অন্যান্য সধবা কুলকামিনীরা একত্র আহার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া উৎসব শেষ করেন। চীনা জাতির বিবাহ প্রধানতঃ দিবাভাগেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। চীনা কন্যা দিবা দ্বিপ্রহরে অগণ্য দীপালোকে রাজপথ সুশোভিত ও নানাবিধ বাদ্য শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বিবাহ করিতে গমন করেন। চীনা কন্যা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা

* চীন দেশে লেখনী বা কলমের প্রচলন নাই। তথায় তুলির দ্বারাই সমস্ত লিখনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

না হইলে বিবাহে অধিকারিণী হয়েন না। ইহাদিগের বিবাহে বিধবার যোগদান নিষিদ্ধ।

বাঙ্গালার হিন্দু 'ডোম' জাতির পুরোহিত নাই। ইহারা যোগীদিগের ন্যায় আপনারাই পুরোহিতের কার্য্য করে। বিবাহকালে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা যথাক্রমে বর ও কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, পরস্পর সম্মুখীন ভাবে উপবেশন করে। বরকন্যা গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘট স্পর্শ করিয়া থাকে। তখন মন্ত্র পাঠ হয়। বরকর্ত্তা, আপনার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের এবং কন্যাকর্ত্তা আপনার উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের নামোল্লেখ ও পরমেশ্বরকে সাক্ষ্যমান্য করিয়া, পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েন। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কেমন, তুমি তোমার মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়াছ ত?" কন্যাকর্ত্তা উত্তর দেন,—"হাঁ, দিয়াছি।" তখন বর সিন্দূরের ফোটা দিয়া বধূর ললাটদেশ রঞ্জিত করিয়া দেয় অথবা উভয়ে মাল্যবিনিময় করে—বর কন্যার ও কন্যা বরের কণ্ঠে ফুলের মালা পরাইয়া দেয়। এই সিন্দূরদান বা মাল্যপরিবর্ত্তনে বিবাহ সমাপ্ত হয় এবং উভয়ে স্বামীস্ত্রীরূপে জীবনযাপনের অধিকারী হয়। ডোম জাতির মধ্যে পণগ্রহণ প্রথা অ-প্রচলিত নহে, কিন্তু কেহই দশ টাকার অধিক কন্যাপণ লইতে কি দশ বর্ষের অধিক কন্যা অবিবাহিত রাখিতে সমর্থ হয় না।

জর্ম্মাণী দেশের বিবাহ প্রথা অভিনব। জর্ম্মাণ পাত্র প্রথমে পাত্রী মনোনীত করেন এবং পাত্রীর পিতার আদেশে লইয়া, তাঁহার বা অপর অভিভাবকের সমক্ষে 'প্রেম পরিচয়ে' প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, পাত্রপাত্রী যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের মিলন উভয়ের পক্ষেই সুখকর হইবে, তখন তাঁহারা পরস্পর বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়েন এবং অঙ্গুরীপরিবর্ত্তন করিয়া আপনাদিগের অভিমত সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া দেন। বিবাহের পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে পাত্রীর গৃহে উৎসব হয়। পাত্রপাত্রীর আত্মীয়বন্ধুরা গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদিতে আনন্দসম্ভোগ করেন এবং পাত্রীকে নানাবিধ যৌতুক দিয়া থাকেন। পরদিবস জনৈক রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিয়া উভয়কে উদ্বাহসূত্রে সম্মিলিত করিয়া দেন। অতঃপর নব দম্পতী ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজকের সমক্ষে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলে বিবাহ সমাধা হইয়া যায়। বিবাহ অন্তে বরবধূ পৃথক্ বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

বিহার ও ছোটনাগপুরের এক সম্প্রদায় কৃষকের নাম 'চেরো'; ইহারা হিন্দু। ইহাদের বিবাহ-রীতি বিস্ময়োদ্দীপক। চেরো বর কন্যাভবনে গমনোদ্যত হইলে,

তাহার জননী একটি আম্রপত্র মুখে রাখিয়া, তারস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন আর তাহার মাতুল সেই পত্রোপরি সলিল-সেচন করিতে আরম্ভ করেন। বর কন্যাগৃহে পঁহুছিলে কন্যার মাতা ও মাতুলও পূর্ব্বোক্তরূপ অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। অতঃপর বরকন্যা, বিবাহস্থলে, বৃক্ষশাখাদ্বারা রচিত আচ্ছাদননিম্নে সমবেত হয় এবং উভয়ে মধ্যস্থলে রক্ষিত মৃন্ময় পাত্রবিশেষকে পরিক্রমণ করিতে থাকে। ইতোমধ্যে বর অবনত হইয়া, হস্তের দ্বারা কন্যার পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে এবং চিরদিন ইহাকে সদাচরণে পরিতুষ্ট রাখিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইহার পরে কন্যার সীমন্তে সিন্দূরলেপন করা হয়, এবং কন্যার জ্যেষ্ঠ সহোদর, জল দিয়া বরের চরণযুগল ধৌত করিয়া অঞ্জলিযোগে যৌতুক দান করেন। অবশেষে কন্যার মস্তকে 'মৌড়' পরাইয়া দিলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল বুঝিতে হয়।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

—:*:—

বুলবুলের প্রতি।

ফুটিলে কুসুমকুল প্রফুল্ল কাননে,
ঢালিস্ উল্লাসে কোন্ সঙ্গীত-লহরী ?
রক্তিম উষার নব কনক কিরণে,
ভাসিস্ আনন্দে তুই শাখার উপরি।
তুই প্রকৃতির কবি বিহঙ্গ সুন্দর !
বিমল সুখেতে ভরা তোর ও পরাণ ;
চির অশান্তির তাপ এ ভবে প্রখর,
তুই না বুঝিয়া কিছু গাস্ শুধু গান।
তোর তরে শরতের জ্যোৎস্না সুশোভন,
তোর তরে ইন্দ্রধনু ফুটে বরিষায় ;
তোর তরে বসন্তের ফুলভরা বন,
তোর তরে হেমন্তের বহে মৃদু বায়।
তোর তরে বিশ্ববুকে সৌন্দর্য্য মহান্,
পাখি রে, ঢাল্ এ প্রাণে চির মধুতান !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

—:*:—

সিষ্টার নিবেদিতা— উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রাপ্ত চিত্র।)
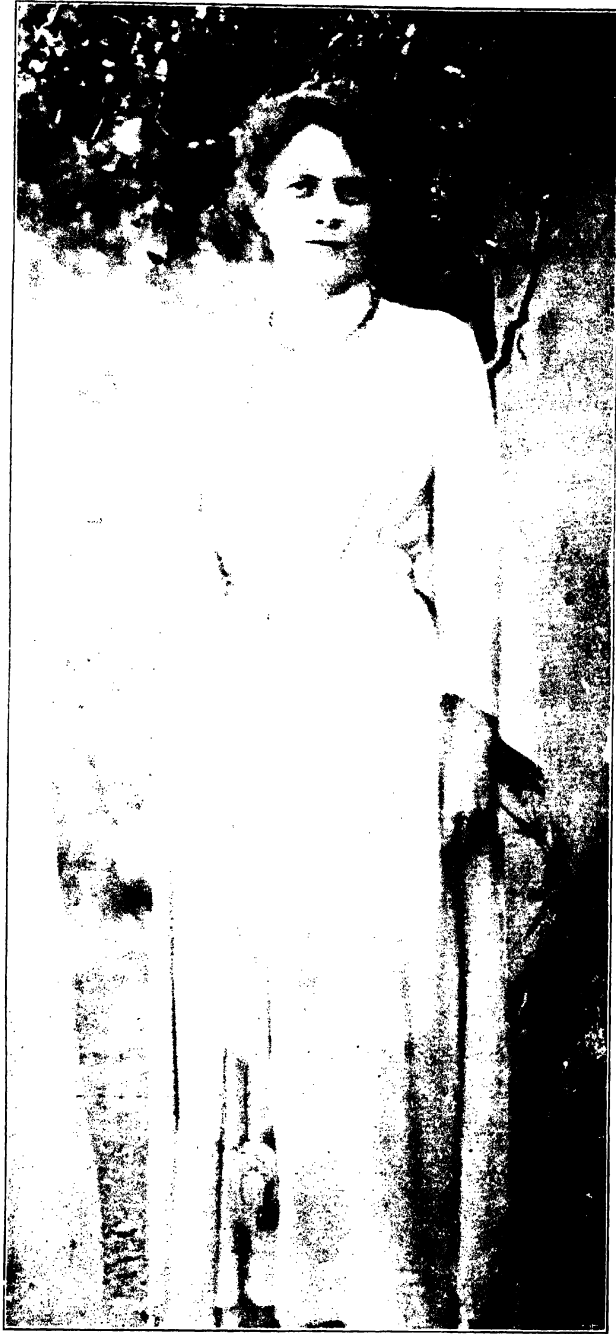
ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতার অকাল মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন প্রকৃত শ্রদ্ধাবতী হিতৈষিণী হারাইয়াছে। তিনি ভারতে না জন্মিয়াও যেরূপ ভাবে আপনাকে ভারতের অন্তরঙ্গরূপে পরিণত ও পরিচিত করিয়াছিলেন—তাহা প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণপ্রভাবে ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন—আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞানবশে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যদিগের মধ্যে জাতীয়ভাব তাঁহার হৃদয়ে যেমন পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তেমন আর কাহারও হৃদয়ে হয় নাই। তাঁহার জাতিগত জাতীয় ভাব বেদান্তের আলোকে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তিনি সাহিত্যিক ও শিল্পসমালোচক ছিলেন। আমি তাঁহার সাহিত্যসেবার বিষয় কিছু বলিব না। আমি তাঁহাকে যে করুণাময়ী মূর্ত্তিতে দেখিয়াছি, তাহারই কিছু পরিচয় দিব।

ভগিনী নিবেদিতার সহিত আমার প্রথম পরিচয় দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্লেগ কলিকাতায় সংহারকরূপে দেখা দেয়। পূর্ব্ববৎসর তাহার আবির্ভাব-সূচনায় বিধিব্যবস্থাবিভীষিকাভয়ে ভীত জনগণ সহর হইতে পলায়ন যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছিল। ফলে, ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এই বৎসর ছোটলাট সারজন উডবার্ণ আশ্বাস দেন,কোন রোগীকে বলপূর্ব্বক গৃহান্তরিত করা হইবে না। সরকারী হাঁসপাতালের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক ওয়ার্ডে দুঃস্থদিগের জন্য হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। কিন্তু চিকিৎসকের অভাবে সর্ব্বত্র এ উদ্যোগ সফল হইতেছিল না। তখন বহু চিকিৎসক প্লেগচিকিৎসা হইতে বিরত। সেই সময় একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগিপরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম—দ্বারপথে ধূলিধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা! তাঁহার পরিধানে গৈরিকবাস, গলদেশে রুদ্রাক্ষমাল্য, আননে দিব্যদীপ্তি। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা; একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমনপ্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেই দিন প্রাতে বাগবাজারে কোন বস্তীতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। নিষ্ঠুর ব্যাধি পূর্ব্বেই শিশুকে মাতৃহীন করিয়াছিল। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাগ্রহণের জন্যই সিষ্টার নিবেদিতার আগমন। তাঁহার প্রতি কথায় ব্যাকুল করুণা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

আমি বলিলাম, রোগীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন। বাগ্‌দীবস্তীতে কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্য্যা সম্ভব তাহার আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে—সেই আর্দ্র জীর্ণ কুটীরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস ত্যাগ করিয়া সেই কুটীরে রোগীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন। গৃহ পরিশোধিত করা প্রয়োজন—তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র মই লইয়া গৃহে "চূণকাম" করিতে লাগিলেন! ঔষধ পথ্য সবই তিনি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুই দিন পরে মাতৃহীন শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহতপ্ত অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

এই সঙ্কটসময়ে বাগবাজার পল্লীতে প্রতি বস্তীতে ভগিনী নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্ত্তি লক্ষিত হইত। আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও তিনি অপরকে সাহায্য করিতেন। একবার একজন রোগীর ঔষধপথ্যাদির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য দুগ্ধপান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন দুগ্ধ ও ফলমূলই তাঁহার আহার ছিল।

কুমারী মার্গারেট নোবল বিলাতে সম্ভ্রান্ত সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দীপ্ত প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল—তিনি অল্পকাল-মধ্যেই স্বদেশে সম্মান ও যশ লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি স্বদেশ ও স্বজন—স্বসমাজ ও স্বসম্পদ সবই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ভারতের সেবায় নিবেদিত করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে এমনই ভাবে ভারতের করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে যে পল্লীতে তিনি বাস করিতেন সে পল্লীতে প্রবীণা জপমালা হস্তে লইয়া ও নবীনা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আবাসে আসিতেন। তিনি যেন তাঁহাদেরই একজন। তিনি ভারতে হিতৈষিণী মূর্ত্তিতে দেখা দেন নাই—সেবিকারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি স্বাভাবিক দয়া-দানে ভারতকে হেয় ও লাঞ্ছিত করেন নাই—আন্তরিক শ্রদ্ধা সমর্পণ করিয়া তাহাতে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ কর।

বিদেশী গল্প।

অভিনয়।

(ইংরাজী হইতে)

"তবে শুনুন বলি"—এই বলিয়া কালীচরণ বাবু হুঁকার নলে একটা লম্বা টান দিয়া কিয়ৎকাল নিজ মুখোদ্গীর্ণ মণ্ডলাকার ধূমরাশির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যেন স্মৃতিপথ আলোকিত করিয়া লইলেন,—তাহার পর বলিলেন,—"থিয়েটারের অভিনয় নৈপুণ্যের কথা যখন তুলিলেন, তখন আমার একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল, শুনুন বলি।

"অমরবাবুর নাম আপনারা সকলেই জানেন। করুণ, রুদ্র, প্রভৃতি গভীর রসাত্মক নাটকের অভিনয়ে যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, একথা সকলেই স্বীকার করেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক যাত্রার দলে ছিলেন। তাহার পর থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া তিনি এক নাটকের অভিনয়ে কিরূপে প্রথম প্রসিদ্ধিলাভ করেন তাহার গল্প শুনুন।

"লোকটা অভিনয়ে নিপুণতা লাভ করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিত, শুনিলে অবাক হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী যুবকগণ কোথায় লাগে! খবরের কাগজে সমালোচকেরা তাহার অসাধারণ প্রতিভার কথা অনেক লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। লোকটা যে প্রতিভাবলে এত বড় হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে পরিশ্রমও অসাধারণ করিত; নাটকের যে অংশ অভিনয় করিতে হইবে, তাহা লইয়া রাত্রিদিন আলোচনা করিত। কোথায় কোন্ কথা কি ভাবে—কি সুরে বলিতে হইবে, কোথায় কিরূপ অঙ্গ ও মুখের ভঙ্গী ঠিক সাজিবে, কোথায় ভ্রূযুগল কিরূপে কুঞ্চিত করিলে ভাল হয়, কোথায় চিবুক সহসা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলে ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইবে, চক্ষু ও ওষ্ঠাধরের ভঙ্গী ও স্ফুরণ কিরূপ হইলে ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, সে এই সকল এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ও অভ্যাস করিত যে, সাধারণ অভিনেতার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সে যাত্রার দলে যখন ছিল তখনও ঐরূপ করিত, আবার যখন থিয়েটারে তাহার মাসিক ৩০০।৪০০ টাকা আয় হইল, তখনও ঐরূপ করিত। লোকটার প্রকৃতিও বড় মধুর; অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই।

"সে যখন 'সরস্বতী থিয়েটারে' প্রবেশ করিল সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা,—তখন সে থিয়েটারের নামও সকলে জানিত না। কিন্তু যেদিন মৃচ্ছকটিকের অভিনয়ে অমর আসিয়া চারুদত্ত সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইল, সেইদিন হইতে 'সরস্বতী থিয়েটার' রঙ্গভূমির শীর্ষস্থান অধিকার করিল ও অমরের নাম দেশব্যাপ্ত হইল।

"অমর যখন চারুদত্ত সাজিবে স্থির হইয়াছে, তখন আমি ও অমর এক বাসায় থাকি। আমিও তখন একজন অভিনেতা। অমর সাতদিন ধরিয়া আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, দিনরাত্রি নির্দ্দিষ্ট ভূমিকার আলোচনা করিতেছে। আমি এত বুঝাই 'ওহে কর কি? একেবারে পাগল হইলে না কি? অনাহারে মানুষ কি বাঁচে?' কিছুতেই তাহার কথা নাই। কখনও দুই গ্রাস মুখে উঠিল, কখন বা তাহাও নহে। অবশেষে একদিন রাত্রিতে সে আমার সম্মুখে একখানা চেয়ারের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'আমি আর পারি না! এ পেশা ছাড়িয়া পলায়ন করিব।'

"আমি বলিলাম, 'ব্যাপারখানা কি? এত পরিশ্রম করিলে, এখন ছাড়িয়া পলাইবে, বল কি?'

"সে বলিল 'পরিশ্রমে আর ফল কি? আমি যখন যাত্রার দলে ছিলাম পাড়াগাঁয়ে অভিনয় করিতাম, তখন আমার বুদ্ধি যোগাইত, আর এখানে সাতদিন ধরিয়া মাথা বকাইতেছি, হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার হইবার সময় চারুদত্তের মুখের ভঙ্গী কিরূপ হইবে, কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না। এই দেখ'—বলিয়া উঠিয়া একখানা আয়নার নিকট যাইয়া সে বলিল 'একজন নিরপরাধ ব্যক্তি সহসা স্ত্রীহত্যা অভিযোগে ধৃত হইলে তাহার চেহারা কি এইরূপ হয়? হাঃ হাঃ হাঃ!' এই বলিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সে আয়নার দিকে বিকট দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম 'কেন কি দোষ হইল?' আমার মনে হইল, লোকটা হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়াছে। অমর পুনরায় কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল 'কি দোষ হইয়াছে? কিছুই হয় নাই? একবারে কিছুই হয় নাই! একটা বানর হস্তস্খলিত কদলী খুঁজিয়া না পাইলে যেরূপ মুখভঙ্গী করে, আমার মুখভঙ্গী সেইরূপ হইতেছে। এ কি হত্যাপরাধে অভিযুক্ত নির্দ্দোষ ব্যক্তির মুখভঙ্গী? দূর কর ছাই! এ আমার কর্ম্ম নহে। অধ্যক্ষ আর কাহাকেও চারুদত্তের ভূমিকা অভিনয় করিতে দিলেন না কেন?' এই বলিয়া কিছুক্ষণ আরসীর দিকে মুখ বিকৃত করিয়া সে আমার কাছে আসিয়া বসিল।

"আমি বলিলাম, 'ওহে অনেক পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। বাতির দুই দিক জ্বালিলে কতক্ষণ যাইবে? এক ডোজ উত্তেজক সেবন করিয়া শয়ন কর।'

"সে বলিল, 'তাহাতে আর কি হইবে? নিদ্রা ত হইবে না।'

"আমি বলিলাম, 'আমি যদি পারিতাম, তোমায় সাহায্য করিতাম। তোমার ন্যায় আমার ক্ষমতা নাই। তবু দেখ দেখি, এরূপ ভঙ্গী করিলে কিরূপ হয়!'

"এই বলিয়া আমি দাঁড়াইয়া একরূপ মুখভঙ্গী করিলাম।

"অমর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'রস—রস, তুমি যেরূপ মুখ চোখ করিতেছ, ওরূপ করিতে দেখিলে শ্রোতৃবর্গ মনে করিবে, পেটে ব্যথা ধরিয়াছে।'

"দুইজনে খুব খানিক হাসিয়া লইলাম; তাহার পর বসিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। সহসা আমার মনে চকিতের ন্যায় এক বুদ্ধি আসিল। আমি লম্ফ দিয়া উঠিয়া অমরের পৃষ্ঠে এক চাপড় দিয়া বলিলাম 'ওঠ হে! পেয়েছি!'

"অমর চমকিত হইয়া আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, 'কি পাইয়াছ?'

"আমি বলিলাম, 'ভারি বুদ্ধি বাহির করিয়াছি, সহজেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে।'

"অমর বলিল, 'গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া দু'কথায় বল।'

"একটা দুরূহ ব্যাপারে অকস্মাৎ একটা সদুপায় উদ্ভাবিত হইলে মনে যে আনন্দ হয় তাহা দমন করা সহজ নহে। বহুকষ্টে আমি আত্মসংযম করিয়া বলিলাম, 'শুন! রাখাল ভড়ের কথা তোমাকে একবার বলিয়াছিলাম, মনে পড়ে?'

"হেদোর ধারে যাহাকে দেখিয়া তোমার দয়া হইয়াছিল?'

"হাঁ। আমি তাহাকে আমার খুড়ার কাছে চাকরী জুটাইয়া দিয়াছিলাম। সে লোকটা এখন জোড়াসাঁকোতে একখানা ঘরভাড়া করিয়া আছে। লোকটা দারুণ ভীতু, একটুতেই কাঁপিয়া অস্থির হয়। আমরা দুইজনে পাহারাওয়ালা সাজিয়া তাহার কাছে গিয়া যদি বলি 'তুই স্ত্রীহত্যা করিয়াছিস!'

"'বাহবা! বাহবা! এই বুদ্ধি ত?'

"আমি বলিলাম 'হাঁ'।

"'বেশ বেশ!' বলিয়া অমর লাফাইয়া উঠিল। 'আর বিলম্ব সহে না। এখনই যাইতে হইবে।'

"আমি বলিলাম, 'তাড়াতাড়ি কেন? কাল হইলে হয় না?'

"না, না, এখনই চল। যতক্ষণ না একটা হেস্তনেস্ত হয়, আমার ঘুম হইবে না। দেখ দেখি আমার দেরাজে একটা নীল কাগজ আছে কি না। একটা গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দেখাইতে হইবে ত। শীঘ্র প্রস্তুত হও। এখনি একটা গাড়ী ডাকাই, ১৫ মিনিটের মধ্যে জোড়াসাঁকো পঁহুছিবে।'

"আমি বলিলাম, 'একটু ভাবিয়া দেখ। একটা মানুষকে হঠাৎ হত্যাকারী বলিয়া ধরা, ব্যাপারটা কিছু গুরুতর বোধ হইতেছে। তাহাকে ভয়প্রদর্শনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।'

'ক্ষতিপূরণ! এখনি ৫০৲টাকা দিব, আর দুইখানা থিয়েটারের টিকিট দিব। আবার কি?'

"এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা করিয়া লইল। কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ প্রভৃতি লাগান হইল। আমার একটু কষ্ট হইতেছিল, কেন এ পরামর্শ দিলাম? কিন্তু অমর আমাকে আর চিন্তা করিবার অবসর দিল না। আমিও দাড়ী গোঁফ্ পরচুলা পরিলাম।

"অমর বলিল, "পুলিসের পোষাকের আবশ্যক নাই। ডিটেক্‌টিভরা সাধারণ পোষাকেই কায করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পুলিসের পোষাক দেখিলে বাড়ীওয়ালা গোলমাল করিতে পারে।'

"তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ীতে উঠিয়া উভয়ে জোড়াসাঁকোর দিকে চলিলাম। পথে স্থির হইল, আমি রাখালকে গ্রেপ্তার করিব ও অমর তাহার ভাবভঙ্গী উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লইবে ও রঙ্গমঞ্চে তাহার অবিকল অনুকরণ করিবে। গাড়ী শীঘ্রই রাখালের বাসার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি দশটা। বাড়ীওয়ালা বলিল, রাখাল বেড়াইতে গিয়াছিল—কিছু পূর্ব্বে ঘরে আসিয়াছে। সিঁড়ির উপর একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া সে বলিল 'শব্দ করিবেন না, অন্যান্য ভাড়াটেরা ঘুমাইতেছে, নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে।'

"আমরা নিঃশব্দে উপরে উঠিলাম। আমি আবার অমরকে বলিলাম 'ভাই কায নাই, এ বড় গুরুতর ব্যাপার।'

"সে আমার হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বলিল, 'তাহা হইবে না। তুমি যদি পশ্চাৎপদ হও, আমি হইব না। দুই মিনিটের মধ্যে কার্য্য উদ্ধার হইবে।' আমি আর কি করিব? যে ব্যক্তি নিজ প্রতিভাবলে অসংখ্য শ্রোতার মন ভুলাইতে পারে, সে যে আমার ন্যায় ব্যক্তিকে শিশুর মত বশীভূত করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? রাখালের ঘরের দ্বার বন্ধ। আমরা এক, দুই, তিনবার মৃদু মৃদু ঘা দিলাম। কোনও

উত্তর নাই। শেষে সবলে দ্বার ঠেলিলাম। তখন অনুচ্চৈঃস্বরে উত্তর হইল 'কে? কি চাও?'

"আমি বলিলাম 'দ্বার খোল, সরকারের লোক।'

"সে দ্বার খুলিয়া দিল। আমি সদর্পে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। লোকটা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিলাম, বিড়াল যেমন মূষিকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে, অমর তেমনই মনোযোগের সহিত রাখালের ভাবভঙ্গী দেখিতেছে। তাহার মুখে ভয় ও বিস্ময়ে যে তরঙ্গ খেলিতেছিল, অমর তাহার প্রত্যেকটি নিজের মনে আঁকিয়া লইতেছিল। রাখাল পুনরায় বলিল 'কে তোমরা? কি চাও?'

"আমি স্থিরভাবে বলিলাম 'আমরা পুলিসের কর্ম্মচারী'—এই বলিয়া কৃত্রিম পরওয়নাখানি বাহির করিয়া বলিলাম, 'রাখাল ভড়! তুমি তোমার প্রণয়িণীকে হত্যা করিয়াছ, এই অপরাধের জন্য তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।'

"এই কথা বলিবামাত্র তাহার পাংশুবর্ণ মুখে এক ভয়নক ভাব বিদ্যুদ্বেগে প্রকটিত হইল। তাহার দৃষ্টি চকিতের ন্যায় একবার দ্বারের দিকে একবার বাতায়নের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। কোন জন্তু সহসা ফাঁদে পড়িলে যেরূপ হয়, তাহার ভাব সেইরূপ হইল। অমর কিন্তু তখনও নির্ণিমেষ নয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে। যেন চিত্রকর চিত্রে প্রতিফলিত করিবার জন্য একমনে আলেখ্য বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছে।

"রাখাল যখন আবার কথা কহিল তখন আমার শোণিতে বিস্ময়ের তড়িত-প্রবাহ ছুটিল। সে বিকট চীৎকার করিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া কহিল 'খেলা সাঙ্গ হইল। ধরা পড়িয়াছি। আর গোপনে ফল কি? আমি দোষ স্বীকার করিতেছি। আমিই হত্যা করিয়াছি।' এই বলিয়া, সে আপনার কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ টানিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার চেহারা দেখিয়া চিনিলাম, রাসু ভট্ট নামক এক ব্যক্তি তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার প্রণয়িনীকে হত্যা করিয়াছিল—তাহার ছবি খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম এ সেই ব্যক্তি।

"সে আবার বলিল 'হাঁ আমিই রাসু ভট্ট। আমি কেন খুন করিয়াছি তোমরা জান না। সে আমাকে প্রতারিত করিয়াছিল: আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া অপর এক ব্যক্তির সহিত পলাইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে দৈবাৎ দর্শন পাইয়া কাল সর্পিনীর উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছি। আমাকে লইয়া চল। খেলা সাঙ্গ হইয়াছে! আর কেন? যত শীঘ্র চুকিয়া যায়, ততই ভাল।'

"আমি অমরের দিকে চাহিলাম। সে তখনও একদৃষ্টে লোকটাকে দেখিতেছে। তখনও ছবি তুলিতেছে!

"এই ঘটনার পর মৃচ্ছকটিকের অভিনয়ে অমর যে অদ্ভুত নাট্যকৌশল দেখাইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সমালোচক মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সকলে প্রশংসার স্রোতে অমরকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। সকলে একবাক্যে বলিয়া-ছিল, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত চারুদত্তের অভিনয় প্রকৃত ঘটনার ন্যায় স্বাভাবিক হইয়াছিল।

"সেই দিন হইতে পাঁচশত রাত্রি উপর্য্যুপরি মৃচ্ছকটিকের অভিনয় হয়। কিন্তু প্রথম অভিনয়ের পর এক মাসের মধ্যেই রাখাল ভড় ওরফে রামু ভট্ট কারা-গারে আত্মহত্যা করে।

"এ গল্প আমি ও অমর ভিন্ন আর কেহ জানে না।"

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

—:—

বীর ও গুণী।

সশস্ত্র দাম্ভিক বীর হুহুঙ্কার ছাড়ি
নিষ্পেষিত করিয়া দুর্ব্বলে,
দু'দিনের তরে করি অরাতি বিলয়
বৃথা কীর্ত্তি ঘোষে মহীতলে,
নিরস্ত্র বিনম্র গুণী মৌনমুগ্ধ-চিত
মুখে স্নিগ্ধ প্রীতি পুণ্যভার,
প্রেমে দ্রবীভূত করি মানব অন্তর
করে চির হৃদি অধিকার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।*

ললিতবাবু ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব।

সমালোচনা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। অথচ প্রতিদিন দেখিবেন, সাহিত্য পত্র-পত্রিকায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক খবরের কাগজে সমালোচনা নাম দিয়া কিম্ভূত-কিমাকার বিড়ম্বনা বাহির হইতেছে। পড়িলে সমালোচকের উপর কেবল অশ্রদ্ধা হয়, আর কিছুই হয় না। না, গ্রন্থখানি কিরূপ তাহা বুঝা যায়; না, সমালোচক কি বলিতেছেন, তাহা বুঝা যায়; যদি কখন বুঝা গেল, ত তিনটি কথা বুঝা যায়। (১) লেখক গ্রন্থকারকে সার্টিফিকেট দিতেছেন, আর আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আশীর্ব্বাদ করিতেছেন বলিয়া সমালোচক লেখকের গুরু, আর ক্রীতদাসের মত তোষামোদ করিতেছেন বলিয়া তিনি দাস। সুতরাং, কেহ রাগ না করিলে, এই সকল সমালোচনাকে গুরুদাসী বলা যাইতে পারে। (২) আর একটা কথা বুঝা যায় যে, লেখকে ও সমালোচকে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু কি কি বিষয়ে মতভেদ তাহা কিছুতেই জানা যায় না। মত-সামঞ্জস্য ত পরের কথা। ইহাকে মতভেদীই বলা যাউক। (৩) আর এক প্রকার—কণাধারী; বিমান অর্থে আকাশ হইতে পারে না; বিষণ্ণ শব্দের শেষের অক্ষরটি দুইটি ণত্ব নহে—একটি মূর্দ্ধণ্য একটি দন্ত্য; পিতামাতা ভুল—পিতৃমাতা বলিতে হইবে। প্রধানত এই তিনরূপ—গুরুদাসী, মতভেদী ও কণাধারী—সমালোচনা ছাড়া অন্যরূপ সমালোচনা আর প্রায়ই দেখা যায় না।

তাহাতেই বলিতেছি, প্রকৃত সমালোচনা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। যখন বয়স ছিল, সময়-সুযোগ ছিল, প্রবৃত্তি ছিল, তখন, পাপমুখে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, আমি প্রকৃত সমালোচনা করিবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিতাম। একখানি মাসিক, একখানি সাপ্তাহিক নিজের দুইখানি কাগজ ছিল; সেইজন্য কতকটা প্রথার দায়ে, আর মাতৃভাষা স্বর্গাদপি ভালবাসি—সেই মাতৃ-অঙ্কে আবর্জ্জনা না লাগে, এইরূপ একটা দুরাকাঙ্ক্ষার বশে, নিরপেক্ষ, নির্ভীক, প্রকৃত সমালোচনা করিবার নিয়মিতরূপে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু, তেহি নো দিবসা গতা। সে দিন আর নাই। সে দুরাকাঙ্ক্ষা ত নাই-ই, অধিকন্তু ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে, সমাজে হউক, সাহিত্যে হউক, চরিত্রে হউক, কেবল দোষদর্শন অভ্যাস করা একটা মহা

* ফোয়ারা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

পাপ। পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি, দুর্ব্বল বলিয়া পারি না। কম্‌লি ছোড়্‌তি নেহী।

সৌভাগ্যবলে, ২০।২৫ খানি পুস্তক উপহার পাইয়াছি। তাহার সকল-গুলিই যে সমালোচন করিতে হইবে, গ্রন্থকারদিগের এমন অনুরোধ নাই, তবে গ্রন্থকারদিগের আবার দালাল আছেন। কাজেই সৌভাগ্যবলে যাহা পাইয়াছি, দুর্ভাগ্যবশত তাহারই সমালোচনা করিতে হইবে। সুতরাং আমি বিপন্ন,—আপনারা হাসিতেছেন না ত? যদি হাসিয়া থাকেন, তবে মনে করিবেন, সকলকেই সময়ে সময়ে বলিতে হয়,—"আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা।"

তবে ললিতবাবু এবং তাঁহার পুস্তকের কথা স্বতন্ত্র। স্বচক্ষে * না দেখিলেও ভালবাসা জন্মে। রূপে নয়, গুণে। ১৯০৫ সালে আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ অজয়চন্দ্র "বঙ্গবাসী" কলেজে ললিতবাবুর পাদমূলে ইংরাজি পড়িত। তাহার নিকট ললিতবাবুর পাঠনার, ছাত্রগণের সঙ্গে ব্যবহারের, ভূয়সী প্রশংসা শুনিতাম। তোমরা হয়ত আবার হাসিবে,—আমি কিন্তু সেই অবধি লোকটিকে ভালবাসিয়াছি। তিনি যে বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন, তাহা আমি জানিতাম না। তাহার পর, তিনি লেখকরূপে ক্রমে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। আমি সন্তর্পণে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। ক্রমেই বুঝিলাম, তিনি 'রঙ্গ-রস' লিখিবার জন্য একটু অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন। আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। মনে হইল, একটি গুণবন্ত পুরুষ * এইবার বিপথগামী হইতে লাগিলেন।

সেই ভালবাসার সঙ্গে এই আশঙ্কা মিলিয়া আমাকে এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে।

ললিতবাবু সকলরূপ লেখা লিখিতেই অগ্রসর। গল্প, পদ্য, চটুকে, চুট্‌কি, কৃষ্ণকথা, পল্লীতত্ব, সমালোচনা, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকলরূপই তিনি লিখিতে-ছেন। এক 'ফোয়ারা' গ্রন্থ ধরিলেই প্রায় তাঁহার সকলরূপ রচনার নমুনা পাওয়া যায়। আমরা সেই খানিকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনা করিব।

আমার মত পণ্ডিতের পক্ষে 'প্রকৃতিবাদ'ই প্রধান সম্বল। 'প্রকৃতিবাদে'

---

* সম্পাদক, আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন,—আমি স্বচক্ষুঃতে লিখিতে পারিব না। গুণবৎপুরুষও লিখিতে পারিব না। অ, চ, স।

ফোয়ারা শব্দ নাই, ফুয়ারাও নাই। উৎস দেখিলাম—উৎস অর্থে ফোয়ারা। বড় বিড়ম্বনায় পড়িলাম। গ্রন্থকারের আশ্রয় লইলাম। "বালুকাময় মরুভূমিতেও স্থানে স্থানে ফোয়ারা আছে। শিক্ষকের শুষ্ক জীবনেও মাঝে মাঝে ভাবের ফোয়ারা খেলে।" শিক্ষকের শুষ্ক জীবন—স্বীকার করি না; তাহা হইলে শিক্ষককে না দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিলাম কি করিয়া? শিক্ষকের মত সরস জীবন আর হইতেই পারে না। শিক্ষক সমাজ-বিধাতা। এই ভারতবর্ষ রাজার দ্বারা গঠিত কোন কালে হয় নাই। ভারত ব্রাহ্মণ-গঠিত, অর্থাৎ শিক্ষক-গঠিত। জগতের সেই শিক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই শিক্ষাদানের অধিকারী হইয়া ললিত-বাবু আপনাকে কেন হীন মনে করেন, তাহা বুঝা যায় না। এটা তাঁহার একটা বিষম ভুল; মানসিক বল কেন্দ্রীভূত করিয়া মন হইতে এই ভুল তাঁহাকে দূর করিতে হইবে। যে নিজের শুষ্ক জীবন এই বিশ্বাসে লিখিতে আরম্ভ করে, সে বাহির হইতে যতই রস আনুক না কেন, সে সমস্ত রস শুকাইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত উৎসের রস ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে, তাহা ত কখন শুষ্ক হয় না।

ফুৎকার, ফুৎকারা, ফুয়ারা, ফোয়ারা। ফুৎকার নীরসও হয়, সরসও হয়। "ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি, পুনঃ কর বিশ্বসৃষ্টি"—সে জলভরা শুণ্ডের ফুৎকার। সুতরাং তাহাতে বিশ্ব আবার ফুটিয়া উঠে। আর শুষ্ক জীবনের ফুৎকার কেবল আবেগভরে বাহির হয়, একটু ফুর্ ফুর্ করে, আর কিঞ্চিৎ যেন অবহেলা এবং অবজ্ঞা দেখায়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ললিতবাবুর জীবন শুষ্ক জীবন নহে এবং দেখিতেছি তাঁহার এই ফোয়ারাও একটা ফুৎকারমাত্র নহে। তবে, কবি যে বলিয়াছেন,—

> "না হলে রসিকে বয়োধিকে রস জানে না,
> এ রস প্রবীণে বিনে নবীনে সম্ভবে না।"

—সে কথাটাও একেবারে তুচ্ছ করিবার মত নহে। ললিতবাবুর জীবনে যথেষ্ট রস আছে, কিন্তু সে রসের পরিপাক এখনও হয় নাই। রসে বড় বেশী তরলতা আছে। কাজেই চাঞ্চল্য আছে, চাপল্য আছে।

এই তারল্য আছে বলিয়া অনেক সময় তাঁহার রচনায় কেন্দ্র স্থির থাকে না। ফোয়ারার প্রথম প্রবন্ধ লইয়াই এই কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিব। গোরুর গাড়ী ভাল? না রেলগাড়ী ভাল? তুমি যদি আপনার সুখদুঃখকে কেন্দ্র করিয়া বল, দুই-ই কষ্টকর বা দুই-ই সুখকর, অথবা একটি সুখকর, অন্যটি কষ্টকর, তাহা হইলে, সে লেখা বুঝা যায়। তাহা না লিখিয়া, তুমি লিখিলে,—"বিলাতী সভ্যতার

হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লয় পাইতেছে; বহু-বিবাহ উঠিয়াছে, অবরোধ-প্রথা, জাতিভেদ-প্রথা, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা যায় যায় হইয়াছে, আমাদের সনাতন চকমকির স্থান 'বিলাতী অগ্নি, দেশালাই রূপী' দখল করিয়াছে, নবাবী আমলের অম্বুরী থাম্বিরা ছাড়িয়া আজি ভারতবাসী মার্কিণের বড্‌সাই ফুঁকিতেছে। আবার বুঝি বিধিবিড়ম্বনায় আমাদের সনাতন ঋষিদিগের উদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যান গোরুর গাড়ীও বিলয় প্রাপ্ত হয়।" এ লেখা বুঝা যায় না। বুঝা যায় না—তুমি জজ্ অথবা উকীল। জজ্ বিচার করেন, তুমি তাহা করিতেছ না। উকীল একটি পক্ষ সমর্থন করেন—তুমি ত তাহাও করিতেছ না। তোমার অপক্ষপাতিত্বও নাই, পক্ষপাতিত্বও নাই—তোমার কেন্দ্র স্থির নাই; সুতরাং তোমায় বুঝা যায় না। তুমি বলিবে, 'আমি রঙ্গ-রস লিখিতেছি, আমার আবার কেন্দ্র কেন?' এ একটা বিষম ভুল কথা; একথা থ্যাকারে বলিলে বলিতে পারেন, কিন্তু ডিকেন্স কখনই বলিবেন না। বিনয়ে বলি, তোমরা কেহ যেন থ্যাকারের শিষ্য হইও না। দুইদিকে চাবুক মারিতে চাও বেশ ত। নূতনকেও মার পুরাতনকেও মার—কিন্তু নিজের কেন্দ্র স্থির রাখিও। সকল বিষয়েই ঘোলষাঁড়ের আদর নাই—বিশেষ এই রস-রচনায়। কেন্দ্র না থাকিলে এলোপাথাড়ি মার-ধর করিলে প্রশংসা নাই, উহাতে জয়-বিজয়ও হয় না। আর কেন্দ্র স্থির রাখিয়া অস্ত্রচালনা করিলে, হারিলেও জিত আছে; লেখা খুব উজ্জ্বল না হইলেও কেন্দ্রাবলম্বী লেখার একটা নিজের স্থির প্রভা আছে।

পর প্রবন্ধ 'তীর্থ-দর্শনে'ও কেন্দ্র স্থির নাই। একটি পৃষ্ঠায় (২৬) উপর দিকে কেন্দ্র যেরূপ, নিম্নে তাহার বিপরীত ভাবে। "ঘাটের উপরি ভাগ ও সোপানশ্রেণী মনুষ্যমূত্রের গন্ধে ও কুক্কুরবিষ্ঠায়; ইহার মধ্যে মনুষ্য-কুক্কুরও আছে অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। * * * ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার বিষয়।" নিম্নদিকে,—"পতিতপাবনী সুরধুনীর ন্যায় বিশ্বনাথের পুরীও পাপীর সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, বরং পাপীদিগকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দিয়া তাহাদের পাপক্ষালনের পথ দেখাইতেছে।" এইরূপ কেন্দ্র-পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র। এই দোষে এমন সুন্দর লেখা অনেকটা ফলহীন হইয়াছে। আমরা গুণশালী লেখককে কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেন্দ্র স্থির রাখিতে পরামর্শ দিই।

তাহার পরে 'বারাণসীদর্শনে' ক্ষুদ্র কবিতাটিতে বেশ কেন্দ্র স্থির আছে। একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"জাহ্নবীর বারি
সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল; স্নানান্তে জুড়ায় দেহ,
আত্মার কলুষ কাটে, ভরে মনঃ প্রাণ
শান্তির বিমল রসে। প্রভাতে সন্ধ্যায়
তীরে বসি পূজে ভক্ত নিজ ইষ্টদেবে;
বসি সাধু দণ্ডি কাছে শুনে ধর্ম্ম-কথা
কেহ শুদ্ধচিতে। বিরাজিত শান্তি সদা
এ পবিত্র ধামে, ভুলে নর শোক-তাপ;
আত্মার পিপাসা মিটে শান্তি-সুধা পানে।
যুগে যুগে যোগী-ঋষি-সাধু-ভক্তগণ
পবিত্র করেছে পুরী চরণ-পরশে;
পুণ্য রজঃ-স্পর্শে প্রতি ধূলিকণা
পূরিত অধ্যাত্ম-বলে; তাই বুঝি প্রাণ
শান্তিরসে অভিষিক্ত, বৈরাগ্য-মণ্ডিত
হয় প্রতিক্ষণে; ছেড়ে যেতে আঁখি ভরে
অশ্রুনীরে, শূন্য ঠেকে হৃদয়-পঞ্জর—
বুঝি না অজ্ঞান মোরা কেন হেন ভাব?"

উপসংহারে কবি লিখিতেছেন—

"ইস্‌লাম মজিদ হোথা উচ্চ চূড়া তুলি,
বিরাজে তাহার পাশে শ্রীবিন্দুমাধব;
আদি-বিশ্বেশ্বর-স্থান হয়েছে মজিদ;
খৃষ্টান ভজনালয়, শিবের মন্দির
রহে পাশাপাশি, কি উদার ধর্ম্মভাব।
বহু ধর্ম্ম বহু যুগে উদিত ভারতে
সংঘর্ষণ-সমন্বয় বারাণসী ধামে।"

লক্ষ্য করিবেন, আরঙ্গজীবের মজিদ্ দেখিয়াও কবির মনে, ধর্ম্মবিদ্বেষের কথা উঠিল না। এ স্থলে তিনি কেন্দ্র স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার মনে কেবল ধর্ম্ম-সমন্বয়ের উদারতার কথা উঠিয়াছে। তাই ত চাই।

তাহার পর ললিতবাবু একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন 'সুখের প্রবাস'। প্রবন্ধের মুখবন্ধে ললিতবাবু বলিতেছেন, "এবার আর শীতলা ঘাড়ে করিয়া বাহির

হই নাই। 'একা আসা, একা যাওয়া, একের কর ভাবনা' মহাপ্রয়াণের এই সারতত্ত্ব বুঝিয়া একাই বাহির হইয়া পড়িয়াছি।" কিন্তু শীতলা-বিরহিতা অবস্থাকে 'সুখের প্রবাস' বলায় শীতলা মহা রৌদ্রা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য পর মাসের প্রবন্ধ 'বিরহ'—তাহার উপসংহার—বৈষ্ণবের সার কথা—

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

তাহার পর চুট্‌কি সাহিত্য। তাহার একটি ভূমিকা আছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্‌কা হইবে না, ভাবটি গভীর হইবে, অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য্য থাকিবে না, চাই কি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে, অথচ* করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এইরূপ উজ্জ্বল-মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়।" এই লক্ষণটি অতি সমীচীন। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার স্বয়ং নিজনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে নিবেদন করি, গ্রন্থকার যেন চুট্‌কি সাহিত্যে আর কখন হস্তার্পণ না করেন।

দুই একটি চুট্‌কির দৃষ্টান্ত দিব—

একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী বড় মানুষের বাড়ী সামিয়ানা চাহিতে গেলেন। সামিয়ানার চারি কোণে চামড়া দিয়া সেলাই করাইয়া মজবুত করা হয়। ব্রাহ্মণ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আপনার নূতন সামিয়ানাখানি দুইদিনের জন্য চাহিতেছি।" বড় মানুষ সহাস্য বদনে বলিলেন, "আপনাকে দিব কি, ঠাকুর! এখনও মুচির কর্ম্ম হয় নাই।" ব্রাহ্মণ সেইরূপ সহাস্যে বলিলেন, "না দিলেই হইল।" দেখুন কেমন তীব্র শ্লেষ, অথচ বিকট গাম্ভীর্য্য নাই; করুণায় অন্তঃসলিল প্রবাহের মধ্যে কেমন একটু বিদ্রূপ-কটাক্ষ। ললিতবাবুর লক্ষণের সঙ্গে কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিল।

সেকালে আর একরূপ চুট্‌কি ছিল; যাহার কথা একটু উলটিয়া বা বাড়াইয়া দিয়া তাহাকেই উত্তর দেওয়া। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উলার মুক্তিরাম মুখুয্যেকে বড় ভালবাসিতেন; বেহাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন; সেই সম্পর্কের দোহাই দিয়া, তাঁহাকে লইয়া নানা রঙ্গ-রস করিতেন। উলায় বহুতর কুলীন ব্রাহ্মণের বাস, সেই উপলক্ষ করিয়া রাজা মুখুয্যেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁ হে বেহাই!

---

* মূলে 'অথবা' ছিল, আমি 'অথচ' লিখিলাম; কেন না করুণার অন্তঃসলিল সকল সময়েই থাকা আবশ্যক। অ, চ, স।

তোমাদের গ্রামে নাকি বৌ বিক্রয় হয়!" এটা অবশ্য গালি। মুক্তিরাম কিন্তু গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে মহারাজ! নিয়ে যাবা মাত্রই।" মহারাজ নিস্তব্ধ।

এইরূপ রস-ভাষ বাঙ্গালার ভদ্র সমাজে সর্ব্বদাই শুনা যাইত। আমরা বহুতর শুনিয়াছি। আমাদের সময়ে যে তিন জন রস-রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন—শিশিরকুমার, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইন্দ্রনাথ—তাঁহারা তিনজনই বিশেষ হৃদয়বান্ ব্যক্তি। একথা বলাতে এমন বলা হয় না যে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ, তিনি একজন হৃদয়হীন লোক; তাহা যদি বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে ভালবাসি বলিয়া এই প্রবন্ধের সূচনা করিতাম না। আমার বিশ্বাস, ললিতবাবুও সহৃদয় ব্যক্তি; তবে বোধ করি, শিক্ষা-বিভ্রাটে, অথবা এখনকার কালের বিষম উৎসাহ-বাত্যায় হৃদয়ের ভাবের পরিপাক হয় নাই। চাঞ্চল্যবশে তাঁহার অপরিপক ভাব পাকাইয়া উঠে, আর বন্ধুবান্ধবদিগের উৎসাহ-দোষে তাহাই 'পয়সা পোয়া' বলিয়া বাজারে আনীত হয়। কাগজের সম্পাদকদিগকে আমি সেইরূপ বন্ধুবান্ধব বলিয়া অনুমান করিতেছি। অনুমান সমস্তই অমূলক হইতে পারে, হইলে আমাকে মার্জ্জনা করা ব্যতিরেকে আপনাদের আর কি গতি আছে?

বড়ই গুরুমহাশয়গিরি করিয়াছি, একটু অন্যদিকে যাই।

ললিতবাবু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতেও হাত দেখাইয়াছেন। রবিবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য, তস্য সমালোচনা, তস্যাঃ সমালোচনা এইগুলি পাঠ করিয়া তবে সেটি পড়িতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। এরূপ দারুণ অনুরোধ এ বয়সে রক্ষা করা কঠিন, কিন্তু তাহাও করিয়াছি। কিন্তু কোন ফলই পাই নাই। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিবার পক্ষে কোন ফলই পাই নাই। নতুবা রবিবাবুর কাব্যপাঠের ফল অবশ্য পাইয়াছি। এই কাব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলিয়াছেন, "ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্দ, ইহার উপমাছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।" শেষের দগ্ধ করা কথাটি ছাড়া আর সকল কথাই আমার শিরোধার্য্য। আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—সেটিও শিরোধার্য্য; "যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই। সব নায়ক আর নায়িকা।" চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই কথাটি আমি বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু শুনিবার লোক নাই। বিদেশের Love লইয়াই আমরা ব্যস্ত। আমাদের তপোবনের সীতা, মহাভারতের কুন্তী, বৈষ্ণবের যশোদা ও শাক্তের

[illegible] আমরা ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি। ভুলিয়া যাইতেছি কি না 'পাড়ারমুখী' [illegible] ও কলঙ্কিনী শৈবলিনী। মরি রে! স্বদেশী! তোর বালাই লয়ে মরি।

কাব্যে মাতা-কন্যা নাই বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের যে দুঃখ তাহা সহজ, স্বদেশী। [illegible] কাব্যে যে নৈতিক আক্রোশ—এটা সম্পূর্ণ বিদেশী বস্তু, কৃত্রিম কোপ। প্রথম বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলাম, "প্রেম যে কখন কলুষিত হইতে পারে, কলুষিত প্রেমরূপ যে কোন পদার্থ আছে, বৈষ্ণব কবিরা তাহা অনুভবও করিতে পারেন নাই।" তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব-কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।" তাহাই যদি হয়, সে কবিতা সদোষ হইল বটে, কিন্তু একেবারে দগ্ধ করিবার উপযুক্ত কি?

এ সকল কথা আমাদের প্রবন্ধের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য, তবে ললিতবাবু যে বলেন, আমাদের সমাজে দাম্পত্যপ্রণয়ের পূর্ণ পরিণতি এই কাব্যে দেখান হই-য়াছে, তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহা কিছুই বুঝা যায় না। বুঝা যায়, লেখক টেনেবুনে কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, এইমাত্র। তাহাতে কাব্য বুঝিবার বা সমাজ বুঝিবার কোন সুবিধা হয় নাই এবং দ্বিজেন্দ্রবাবু যে নৈতিক খটকা তুলিয়াছেন, তাহার কোন মীমাংসাও হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ললিতবাবু বঙ্গসাহিত্যের অনেক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। 'ফোয়ারা' অবলম্বন করিয়া তাহারই কতক কতক আলোচনা করিলাম। এইবার তাঁহার কাব্য-সমালোচনার কথা বলিব।

গত আশ্বিনের 'প্রবাসীতে' দুই কলমের আটচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক রবিবাবু নিজেই নামকরণ করিয়াছেন বলিয়া নাটক বলিতেছি। ২রা আশ্বিনে সেই 'অচলায়তনে'র সমালোচনা লিখিয়া ললিত বাবু 'আর্য্যাবর্ত্তে' ছাপিতে দিয়াছিলেন। এই ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারাই ললিতবাবুর উপর আমাদের আরোপিত চাপল্য প্রমাণীকৃত হইল। দেখা যাইতেছে, ললিত বাবু যেমন 'অচলায়তন' পাঠ করিলেন, অমনই বিষম চঞ্চল হইয়া সমালোচনা লিখিতে বসিয়া গেলেন। পড়ার পরই লেখা, লেখার পরই ছাপাইতে দেওয়া—তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। বাহাদুর পুরুষ বলিতে হয়। কিন্তু এই বাহাদুরি না কমাইলে রসের পরিপাক হয় না। যদি বা হয়, ত কেন্দ্র স্থির থাকে না। আবার চাপল্যের নানা বিষময় ফল আছে। এই দেখুন, সমালোচনার প্রথম পৃষ্ঠারই ছয়পংক্তি পরে ললিতবাবু লিখিতেছেন, "ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম মন্ত্রোচ্চারণ, বেদগান, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানবাহুল্যে সংহিতাব্রাহ্মণ-

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
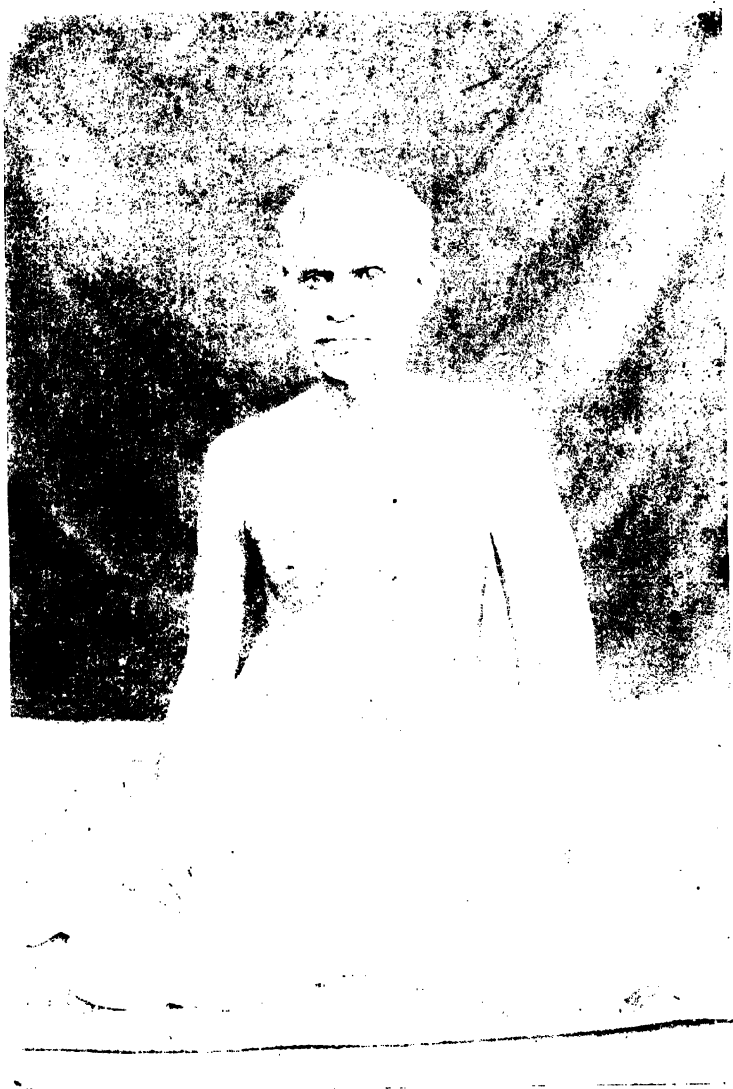
(মানসী কার্য্যালয় হইতে প্রাপ্ত)

আরণ্যকাদি প্রপীড়িত।” কে প্রপীড়িত? ভারতীয় আর্য্যধর্ম? না আরণ্যকাদি? না উভয়ই? আপাতত আমরাই প্রপীড়িত—যিনি ব্যাকরণবিড়ম্বনার কথা লইয়া বঙ্গসাহিত্য কিছুদিন যাবৎ আলোড়িত করিতেছেন, তিনি কি না নিজ ক্ষিপ্রকারিতাদোষে নিজেই বিড়ম্বিত হইলেন! এরূপ দেখিয়া কপালে ঘা মারিতে ইচ্ছা করে, আর বলিতে ইচ্ছা করে, ‘বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?’

এখন একবার সমালোচনাটি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

‘অচলায়তনের’ মূল কথার ললিতবাবু যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আমরা কণাধারী সাজিব না।

‘অচলায়তনের’ আসল জিনিষ পঞ্চকের গানগুলি। সেইগুলি সম্বন্ধে ললিতবাবু বলিয়াছেন—ঐ গুলিতে “সাধকের প্রেমময় হৃদয়ের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ভাষা যেমন সরল, তেমনই মধুর। গানের নূতন দোদুল ছন্দে ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আহ্বান শুনিয়া পাঠকের মনঃপ্রাণ ভরিয়া যায়।” বাস্তবিক পঞ্চককে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মনে হয়।

এই কথা লিখিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িল। অচলায়তনের সমালোচনার একটি ফুটনোটে ললিতবাবু লিখিয়াছেন, আমার ‘সনাতনী’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘অচলায়তন’ একই সময়ে প্রকাশিত হইল ইহা, Significant নহে কি? আমিও একটা Significant সমাবেশ পাইয়াছি, বলিতে দোষ কি?

আশ্বিনের ‘প্রবাসীতে’ ‘অচলায়তনের’ পরেই রবিবাবুর ‘জীবনস্মৃতি’তে “ভৃত্যরাজকতন্ত্র” বাহির হইয়াছে। পঞ্চককে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিতে গিয়াই আমার মনে হইল, এই ভৃত্যরাজকতন্ত্রই কি তবে অচলায়তন? তবে কি রবিবাবু আপনার জীবনস্মৃতি রূপকে ও স্বরূপে দুই ভাবেই লিখিতেছেন?

রূপকের অচলায়তন অবশ্য একটি সুবৃহৎ চত্বর, রবিবাবুর বাল্যজীবনের অচলায়তন একটি ঘর,—সেই ঘরের ভিতরে একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার বিচরণ-স্থান; * গুণের মধ্যে সেই ঘরের উত্তরদিকের জানালা খুলিলে প্রায়শ্চিত্তের বিধি ছিল না। সেই জানালাতে একাদিক্রমে ৬ ঘণ্টা ৮ ঘণ্টাকাল কেবল পাঁচ জনে কে কেমন করিয়া গা ধুইতেছে, মাথা রগড়াইতেছে দেখা, ইহা

---

* “বাহির বাড়িতে দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। আমাদের এক চাকর ছিল। * * * * সে আমাকে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত গণ্ডীর বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।” জীবন-স্মৃতি। প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩১৮।

পঞ্চকের 'তট তট তোটয় তোটয়' অপেক্ষা দশগুণ বেশী কষ্টকর, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষ রবিবাবু নিজেই ধরা দিয়াছেন :—তিনি অচলায়তনকে ঘর বলিয়াছেন—

'বেজে উঠে পঞ্চমে স্বর,
কেপে উঠে বন্ধ এ ঘর
বাহির হতে দুয়ারে কর,
কেউ ত হানে না!'

সুতরাং নিজের ঘরের কথাই রবিবাবু যে অচলায়তনে লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ত ঘর-প্রাচীরের কথা, তাহার পর শাসনের কথা শুনুন। রবিবাবু স্বরূপ বর্ণনায় লিখিতেছেন,—

"ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি, তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই সকল রাজাদের পরিবর্ত্তন বারম্বার ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল-তাতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।" এ সকল কি অচলায়তনের বর্ণনা নহে? রবিবাবুর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত জীবনস্মৃতির শেষ কথা—"আমরা যেমনই পড়া সুরু করিতাম, অমনই মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জল-সেক করিয়া বারান্দায় দৌড় করাইয়া কোন স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুল-ঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন, তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙ্গিতে আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হইত না।" জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এই 'বড়দাদা' অচলায়তনের 'আচার্য্য' নহেন কি?

'অচলায়তন' সম্পূর্ণ গ্রন্থ, 'জীবনস্মৃতি' ক্রমশ প্রকাশ্য। এই উভয়ের মধ্যে সমালোচনা এখন ভাল নয়। তবে ললিতবাবুর ফুটনোটের Significauce দেখিয়া এই Significance মনে উঠিল—তাই এত কথা বলিলাম।

এখন আসল কথা পঞ্চকের গানগুলি যেমন সুন্দর, প্রাণস্পর্শী হইয়াছে, পাত্রগণের কথাবার্ত্তা তেমনই নীরস, একঘেয়ে, ছড়ান—কোনরূপ কাব্যের অনুপযুক্ত হইয়াছে; ললিতবাবু যে তাহা একেবারে ধরিতে পারেন নাই তাহা নহে। তিনি বলিতেছেন, "আর্ট হিসাবে নাটকখানির একটি দোষ দেখা যায়, রচনাটি যেন অত্যন্ত diffuse; হিং টিং ছটের সে compactness ইহাতে নাই,

হেঁয়ালি নাট্যের সে খোলা প্রাণের (wit) রসিকতা যেন ঈষৎ অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" যদি মিষ্টে ঈষৎ অম্লত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহা নিছনি লইয়া বরণ করিয়া ঘরে তুলিতাম। তা' কোথায়? সেই ঈশ্বর গুপ্তের কথা—

"এখনকার নাটক,
না-মিষ্ট, না-টক।"

তাই কি ঝাল আছে গা? "বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ?" কি এইরূপ? কথায় বলে,

হাস্‌তে হাস্‌তে মার্‌বে ঠোনা,
লাগবে যেন বিদ্যুৎ ঝন্‌ঝনা।

তাহা কি অচলায়তনের কোথাও আছে? তাহা নাই—থাকিলে হৃদয়ে না রাখিতে পারি, মাথায় লইতাম। আছে কেবল—একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানির উপর নপুংসকের নৃত্য ও লাঞ্ছনা। গানগুলি ছাড়া সমস্ত পুস্তকখানি রবিবাবুর একেবারে অনুপযুক্ত।

ললিতবাবুকে ছাড়িয়া আমরা যেন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বাস্তবিক তাহাই কি? আমার বোধ হয় ঠিক তাহা নহে। এখনকার দিনে গুরুমহাশয়গিরি করা বড় শক্ত; যাহাকে দাঁড়ি ফেলিতে শিখাইতে হইবে, তাহাকে বলিতে হইবে, "ভাই রামকল্প! এই চণ্ডীমণ্ডপের জোড়া খুঁটি দুটা কি রকম—লেখ ত।" তবে সে পাত্‌তাড়িতে হাত দিবে। এখন সকল কথাই ঘুরাইয়া বলা চাই।

ললিতবাবুর মত শিক্ষিত লোককে উপদেশ দিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভালবাসার সঙ্গে আশঙ্কা যদি না আসিত ত, আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতাম না; তবে বলিতেছি বলিয়া শুষ্ক নীরসভাবে বলিব? একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতেছি।

'ফোয়ারা' একখানি পুস্তক নহে যে, সেইখানি লইয়া দু'চারি কথা বলিব! ছাপাকর বা দপ্তরি কতকগুলি প্রবন্ধ লইয়া যে ভাবে ছাপিয়াছে বা বাঁধিয়াছে, সেই ভাবেই একটা ভাবের তাড়া হইয়াছে। তাহার একটা কংপ্ত সমালোচনা হইতে পারে না। কণাধারী না হউক, খণ্ডধারী হইতেই হইবে।

সমালোচনা সাহিত্যের একটা অঙ্গ। সম্মুখস্থ কার্ত্তিকের আর্য্যাবর্ত্তে দেখিলাম ললিতবাবু সমালোচকরূপে অবতীর্ণ; কাজেই সেই সমালোচনা জড়াইয়া লইয়া আমার এই সমালোচনার অন্তর্গত করিলাম। কিন্তু করিয়া ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি না। রবিবাবুর 'অচলায়তন' নাটক-

অংশে বা কাব্যাংশে এমন কি রঙ্গাংশে কিছুই হয় নাই, এ কথা বলাতে রবিবাবুর কিছুই আসিয়া যাইবে না—কেন না রবির কলঙ্ক দ্বারা রবির প্রকৃতি বুঝা যায়, আকর্ষণের বা তেজের খর্ব্বতা হয় না। কিন্তু যে সময়ে আমাকে এই কথাটা বলিতে হইল, এটা নিশ্চয়ই অসময়। রবিবাবুকে লইয়া শীঘ্রই একটি বিশেষ উৎসব হইবে। আমি সেই উৎসবে যোগ দিতে পারি, আর নাই পারি, আমার এই লেখা দেখিয়া যদি কেহ সময়গুণে মনে করেন যে, আমি রবিবাবুর গুণগ্রাহী নহি, তাহা হইলে আমার উপর নিতান্ত অন্যায় করা হইবে। রবিবাবুর 'নৈবেদ্য' আমি মাথায় করিয়া লইয়া দেবী সরস্বতীর পাদপীঠ-সম্মুখে নৃত্য করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি।

এখন ললিতবাবুর কথা—ললিতবাবুর অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা বা চপলতাই যদি ললিতবাবুকে বুঝাইয়া থাকে যে, অনাটক—নাটক, অকাব্য—কাব্য, তাহা হইলে তিনি একটু ধীর স্থির হইয়া কার্য্য করিলেই চলিবে। আর কাহাকে বলে "বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ" কাহাকে বলে "শ্লেষ-বিষ" তিনি যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমরা সকলরূপ শ্লেষ রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে নির্ব্বন্ধসহকারে নিষেধ করি। চুট্‌কি লিখিতে নিবারণ করিয়াছিলাম, এখন বলি—সকলরূপ বিদ্রূপাত্মক রচনায় তিনি যেন হস্তক্ষেপ না করেন। ইন্দ্রনাথ কবুল জবাব দিয়াছেন যে, বিলাতী বিদ্রূপাত্মক লেখা বাঙ্গালায় চালাইতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিদেশী জিনিষ আমদানি করিতে না পারাই ভাল। ললিত-বাবু ফরাসী সাহিত্যের দোহাই দিয়াছেন—'সে রসে বঞ্চিত কবি রায়গুণাকর', কাজেই সে বিষয়ে কোন কিছু বলিতে পারিব না। তবে মোটের উপর বলিতে পারি, রহস্য রচনায় তাঁহার হাত না দেওয়াই ভাল। ইহাতে তিনি এখন মনে না করেন যে, সমগ্র রস-রচনা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতেছি। না, তা' কি হয়, সাহিত্যমাত্রেই রস-রচনা। সেই সাহিত্য হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলে আমরা আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিব যে।

ভাষা একটা অঙ্গচ্ছদ; তবে শম্বুকের শঙ্খের মত। শঙ্খ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে শম্বুকও নষ্টপ্রাণ হয়। তবে অঙ্গচ্ছদের আবার অঙ্গচ্ছদ লইয়া ললিতবাবু বড় খুটিনাটি করেন। ফোয়ারার মধ্যেও সেইরূপ আছে; সে গুলিতেও হস্তার্পণ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এই খুটিনাটিগুলি থাকিলে এবং টেনেবুনে রঙ্গরস লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিব, এ ভাবটি মন হইতে ললিতবাবু দূর করিতে পারিলে এবং বঙ্কনীর মায়া কাটাইতে পারিলে ললিতবাবু একজন ভাল লেখক

হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস তিনি পণ্ডিত লোক, লেখাপড়া জানেন; আমার বিশ্বাস তাঁহার প্রাণ আছে; আমার বিশ্বাস ছন্দের পারিপাট্যসাধনে তিনি সুপারগ; আমার বিশ্বাস অনেকের অপেক্ষা তিনি দেশের অবস্থা বা দুরবস্থা ভালরূপ জানেন; আমার বিশ্বাস তিনি কাঁদিতে জানেন—তবে তিনি সুপথে যাইতে শিখিলে ভাল হইবেন না কেন?

ললিতবাবুকে বিনয়ে বলি, তিনি সাময়িক সাহিত্যে খণ্ড লেখা লিখিয়া—সময়-প্রসঙ্গে যে কথাটা ভাসিয়া উঠে, সেই বিষয়ে দু'চারিকথা ভালমন্দ লিখিয়া—তাঁহার সাহিত্য-জীবন যেন নষ্ট না করেন। কোন একটি বিষয়ে নিজের মন, প্রাণ, আত্মা ভোরপুর করুন, করিয়া সেই বিষয়ে ক্রমশঃ লিখিতে আরম্ভ করুন। Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. এটি বড় পাকা কথা। যে প্রাণ ভরিয়া কোন বিষয়ের চর্চ্চা করিয়াছে, সে কখন না লিখিয়া থাকিতে পারে না। তবে কি যে কাঁদিতে পারে, সেই লিখিতে পারে, না তা' নয়; লেখার একটা অভ্যাস থাকা চাই। ললিতবাবুর সে অভ্যাস বেশ সুন্দর হইয়াছে, এখন কেবল স্থির হইয়া ভাবা চাই ও সংযত হইয়া ধীরে ধীরে লেখা চাই।

আর একটা কথা আবার বলি,—পেশাদারের মত রঙ্গ-রসের আড়ম্বর করিয়া দোকান সাজাইবেন না। আপনার বাড়ীতে গিয়া আপনার প্রাণের যৎকিঞ্চিৎ আয়োজনেও আমরা প্রসাদ পাইয়া প্রসন্ন হইব। আপনি হালুইকরের দোকান খুলিলে তাহার ত্রিসীমায় যাইব না। আমাদের দেশের কোন ভদ্রলোকই হোটেলে বা দোকানে খাইতে ভালবাসে না—পেশাদারিকে আমরা এমনই ভয় করি!

আর রস টানিয়া বুনিয়া হয় না। সেকেলে পাকা কথা আছে।—

কবিতা কোমলবনিতা
আয়াতা সুখ-দায়িকা,
বলাদানীয়মানা সা
সরসা বিরসা ভবেৎ।

তবে এই মধুরেণ সমাপয়েৎ। সকলে আমার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমি ইচ্ছা করিয়া এ বয়সে কাহারও মনে কষ্ট দিবার জন্য লেখনী ধারণ করিতেছি না।

২৯শে কার্ত্তিক,
কদমতলা, চুঁচুড়া। } শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

—০—

অচলায়তন।*

ওঁ

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর।

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

নিজের লেখাসম্বন্ধে কোন প্রকার ওকালতি করিতে যাওয়া ভদ্ররীতি নহে। সে রীতি আমি সাধারণত মানিয়া থাকি। কিন্তু আপনার মত বিচারক যখন আমার কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করেন, তখন প্রথার খাতিরে ঔদাসীন্যের ভান করা আমাদ্বারা হইয়া উঠে না।

সাহিত্যের দিক্ দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজু করিব না। আপনি যে ডিক্রি দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু ঐ যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মস্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চুপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারিব না। কেবল মাত্র ঝোঁক দিয়া পড়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ দুই তিন রকম হইতে পারে। কোনো কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্যটা সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক তাহাও কোনো কোনো স্থলে ঝোঁকের দ্বারা সংশয়াপন্ন হইতে পারে। পাখী পিঞ্জরের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে ইহা কাব্যের কথা—কিন্তু পিঞ্জরের নিন্দা করিয়া খাঁচাওয়ালার প্রতি খোঁচা দেওয়া হইতেছে এমনভাবে সুর করিয়াও হয়ত পড়া যাইতে পারে। মুক্তির জন্য পাখীর কাতরতাকে ব্যক্ত করিতে হইলে খাঁচার কথাটা একেবারেই বাদ দিলে চলে না। পাখীর বেদনাকে সত্য করিয়া দেখাইতে হইলে খাঁচার বদ্ধতা ও কঠিনতাকে পরিস্ফুট করিতেই হয়।

জগতের যেখানেই ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড় হইয়া উঠে, সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়—এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে শুষ্ক আচারের কদর্য্যতা স্বতই সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে।

---

* গত কার্ত্তিক মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'অচলায়তনের' যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশের জন্য ললিতবাবুকে এই পত্র লিখিয়াছেন।—সম্পাদক।

ধর্ম্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই আচারের সৃষ্টি—কিন্তু কালে কালে ধর্ম্ম যখন সেই সমস্ত আচারকে, নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড় হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম্ম যখন সচল নদীর মত আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্ব্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মত পড়িয়া থাকে,—বস্তুত তখন তাহা শুষ্ক মরুভূমি, তৃষাহারা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সম্মান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায়, তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসার্ত্ত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয়?

আপনি যাহা বলিয়াছেন সে কথা সত্য। সকল ধর্ম্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে, যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাসবশতঃ মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে, তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয় কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না—এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্ম্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে—একথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্ম্মই নহে, ধর্ম্মের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনামাত্র।

এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ না কেহ শুনাইয়াছে যে, আচারই ধর্ম্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে তাহা বন্ধন। অভ্যাসের প্রতি আসক্ত মানুষ কোনো দিন একথা শুনিয়া খুসি হয় নাই এবং যে এমন কথা বলে তাহাকে পুরস্কৃত করে নাই—কিন্তু ভাল লাগুক আর না লাগুক একথা তাহাকে বারম্বার শুনিতেই হইবে।

প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে—সেই অহংএর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকমাত্রের একটা ব্যগ্রতা আছে। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার আপনাকেই ব্যক্ত করিতে থাকে—আপনার চেয়ে বড়কে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। আপনার অহঙ্কার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বেষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তায় ও কর্ম্মে ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাঁহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকেন তখনই তাঁহার মানবজীবন সার্থক হয়।

ধর্ম্মসমাজেরও সেইরূপ একটা অহং আছে। তাহার অনেক রীতিপদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহঙ্কারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে সত্যধর্ম্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অনুভব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্ম্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোন গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন উপায় কি? "শুধু আলো, শুধু প্রীতি" লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে? অর্থাৎ আচার অনুষ্ঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্থ হইবে? তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন?

কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে? অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই—না তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে? গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড় করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য, ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। মানুষের স্থূল দেহ যখন মানুষের মনকে অভিভূত করে, তখন সেই দেহগত রিপুকে আমরা নিন্দা করি; কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয়, প্রেতত্বলাভই মানুষের পূর্ণতা? স্থূল দেহের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই দেহ মানুষের উচ্চতর সত্তার বিরোধী হইবে না, তাহার অনুগত হইবে একথা বলার দ্বারা দেহকে নষ্ট করিতে বলা হয় না।

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না—যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মনকে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই যে আশ্চর্য্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়—মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরমপদ অধিকার করিতে চায়

তখন তাহার মত মননের বাধা আর কি হইতে পারে? কতকগুলি বিশেষ শব্দ-সমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না—তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে; তখন, চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত, তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রুজয় করা ইত্যাদি নানা প্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্ক জিনিষ আর কি হইতে পারে? যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই সমস্ত কৃত্রিম বন্ধনজাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তি সজীবতা ও সরসতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—ইতিহাসে বারম্বার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরে, তখনি ত মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন—তিনি বলেন পাথরের টুক্‌রা দিয়া রুটির টুক্‌রার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অনুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া একথা কেহই বলে না যে, মন্ত্র যেখানে মননে সহায়, বাহিরের অনুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবস্ফূর্ত্তির অনুগত, সেখানে তাহা নিন্দনীয়। ভাবত রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায়—তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেননা সে যতদিন বাঁচিবে ততদিনই কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে প্রবল করিতে চাহিবে সেই খানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেন না, ভাব যে রূপকে টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান—রূপ যখন সেই ভাবকে চাপা দেয় তখন সে সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন করে—সেইজন্য যাহারা ভাবের ভক্ত তাহারা রূপের এইরূপ ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে তাহাদের পরমানন্দ যখন ভাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা

বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জানাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন—যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালুবিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। একথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে—ইহা সকল দেশেই সকল মানুষের কথা। অবশ্য এই সার্ব্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা যদি না করিত তবে ইহা অপাঠ্য হইত।

মনে করিয়াছিলাম সংক্ষেপে বলিব—কিন্তু "নিজের কথা পাঁচ কাহন" হইয়া পড়ে—বিশেষত শ্রোতা যদি সহৃদয় ও ক্ষমাপরায়ণ হন। ইতিপূর্ব্বেও আপনার প্রতি জুলুম করিয়া সাহস বাড়িয়া গেছে এবারেও প্রশ্রয় পাইব এ ভরসা মনে আছে। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গঙ্গার প্রতি হিমালয়।

"তৃষিত—বিশুষ্ক ধরা"—উঠিছে ক্রন্দন ;
তাই কি বিচ্ছিন্ন করি' সহস্র বন্ধন
স্নেহে-গড়া, অঙ্ক ত্যজি' পড়িলি ধরায়
করুণায় দ্রব হয়ে—আশীর্ব্বাদপ্রায় ?

তোরে কি পাষাণ-বক্ষে করিনি পালন
দুহিতার সম স্নেহে ? আমার নয়ন
করেছে কি অন্তরাল মুহূর্ত্তের তরে
কন্যার সপত্নী তোরে ? গাঢ় স্নেহভরে
তোরে কি রাখিনি বক্ষে। উপলে উপলে
ব্যথিত-চরণ হেরি' মোর হৃদি-তলে
বেজে কি উঠেনি ব্যথা ? শিলায় শিলায়
রাখিনি ফুটায়ে ফুল—সহস্র শোভায়
তোর তরে ? প্রভাতের সুস্নিগ্ধ সমীরে
বিটপীমর্ম্মররবে বর্ষি নাই শিরে
শুভ্র আশীর্ব্বাদরাশি ? সন্ধ্যার গগনে
ধরি নাই ইন্দ্রধনু বিচিত্র বরণে
ঊর্দ্ধবাহু, তোর তরে ? যে স্বপ্নে ব্যথিতা
রুদ্ধ পথ হেরি' যবে ফিরিতে কুপিতা
মোর স্নেহতপ্ত বক্ষে, আমি কি তখন
তোর সাথে বেদনায় করিনি রোদন ?
বিশীর্ণা হোরিয়া তোরে শিলাবক্ষ টুটি'
বহেনি কি স্নেহস্রোতঃ, উঠেনি কি ফুটি'
আশীর্ব্বাদ ?

অয়ি, কন্যার অধিক মোর,
ধরা কি আমার চেয়ে আপনার তোর—
শীর্ণ আর্ত্ত রবে তা'র আমারে ভুলিয়া
শুভ্র ফেন-হাস্য মুখে—চলিলি ছুটিয়া

তৃষিত—কাতর—তপ্ত বক্ষোপরে তা'র,
আপন সর্ব্বস্ব দিয়া করিতে সঞ্চার
ঊষরে উর্ব্বর শোভা ; স্নিগ্ধ শ্রীবসনে
শ্যাম শষ্প আস্তরণে, কুসুম-ভূষণে ;
নগ্ন শ্রীহীনতা তার করিতে শোভন ?
মুহূর্ত্তে করিলি ছিন্ন স্নেহের বন্ধন
আজন্মের ?

রাখি' তোরে স্নেহ-কারাঘরে
বন্দী মোর,—বুঝি নাই মোর বক্ষোপরে
উঠেছিস্ বিকশিয়া—কুসুমের প্রায়
জননী লতার বক্ষে। স্নেহান্ধ নয়ন
দেখেনি ধরার শুনি' কাতর ক্রন্দন
কি ব্যথাকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে অধর।

আজ শূন্য বক্ষ মোর, ব্যথিত অন্তর—
দেখিতেছি, শুভ্র আশীর্ব্বাদ দেবতার
মোর শিলাবক্ষ হ'তে ঝরে অনিবার
বিশুষ্ক ধরণী পরে। মুমূর্ষু জীবন
লভি'ছে চেতন তাহে, শ্রীহীন ভুবন
লভিতেছে স্নিগ্ধ শোভা, উঠিছে অম্বরে
করুণার পুণ্য গাথা তোর কলস্বরে।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্মমত।

গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে মিঃ খালিফা সুজাউদ্দীন মহাশয় "প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্মমত" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সন্দর্ভে লেখক মহাশয়ের মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও ইহাতে প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এক শ্রেণীর চিন্তাশীল লোকের মতামত জানিতে পারা যায়। সকল প্রাচীন জাতির মধ্যেই অনেক কিম্বদন্তীমূলক গল্প প্রচলিত ছিল। তাহার মধ্যে কেবল কতকগুলি গল্প বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কতকগুলি গল্পে রূপকচ্ছলে ধর্ম্মেরই তত্ত্ব বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত, আর কতকগুলিতে তদানীন্তন মানবজাতি অতীন্দ্রিয় ব্যাপারসম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিত, তাহাই অভিব্যক্ত। প্রাচীন গ্রীকদিগের এই সকল কল্পনামূলক গল্পগুলিতেই কেবল তাহাদের ধর্ম্মমত প্রতিফলিত হইয়াছিল—ইহা ভিন্ন তাহাদের আর উচ্চতর কোনও ধর্ম্মমত ছিল না, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। শ্রীযুক্ত খালিফা সুজাউদ্দীন মহাশয় প্রাচীন গ্রীক-দিগের পুরাতনী কিম্বদন্তীতেই তাহাদের ধর্ম্মমত প্রতিফলিত, এই সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহারই উপর আপনার যুক্তিজাল বিন্যস্ত করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।

মিঃ সুজাউদ্দীন মহাশয় বলেন, মানবই সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব এবং ব্যক্তিগত বিকাশই সামাজিক উন্নতির প্রতিচ্ছবি। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, বংশানুক্রমে উদ্ভূত মানব-প্রবাহকে একটি অমর মানব বলা যাইতে পারে; সেই অমর মানব চিরকালই শিক্ষা লাভ করিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ ক্রম অনুসারে দৈহিক ও আত্মিক শক্তি বিকাশের পারম্পর্য্য দৃষ্ট হয়, জাতীয় জীবনেও ঠিক সেইরূপ ক্রম অনুসারেই উহার বাহ্য ও আন্তরিক বিকাশ হইয়া থাকে। আদিম ও অসভ্য অবস্থায় মানুষ মনে করিয়া থাকে যে, পরিদৃশ্যমান সমস্ত ব্যাপারই কোনও অদৃশ্য, অতিশয় শক্তিশালী ব্যক্তির "খোসখেয়াল" অনুসারেই সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহা কিছু অজ্ঞাত, দুর্ব্বোধ্য বা মহত্তর শক্তি-সাধ্য, তাহাই আদিম মানবের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দেয়। তাহার পর যখন বিচারবুদ্ধির উন্মেষ হয়, তখন পারিপার্শ্বিক বস্তু সম্বন্ধে তাহার সেই ধারণা তিরোহিত হয় সত্য, কিন্তু দূরস্থ বস্তু ও গ্রহনক্ষত্রাদির গতি সম্বন্ধে তাহার সেই ধারণা থাকিয়া যায়, অর্থাৎ সে উহা অতিমানুষ কোনও জীবের কার্য্য বলিয়া মনে করে। ক্রমে বহুদর্শিতা বিচার-বুদ্ধির সহিত যোগদান করে। তখন এই উভয়ের যোগফলে মানব গ্রহের উপাসনা ক্রমে পরিহার করে সত্য, কিন্তু তখনও সে পূর্ব্বসংস্কার একেবারে পরিহার করিতে সমর্থ হয় না, জ্যোতিষ্কগণ জ্যোতির্ম্ময় জড়পিণ্ডমাত্র ইহাও যখন সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় তখনও সে ঐ সকল গ্রহনক্ষত্রকে দেবতা প্রেতাত্মা প্রভৃতির

ধর্ম্মমতের ক্রমবিকাশ।

বাসভূমি মনে করিতে থাকে। অবশেষে যখন সেই মানব যথাক্রমে প্রেতাত্মা ও দেবতার ভয় হইতে নিস্তার পায়, তখন তাহার মনে একেশ্বরবাদের মহামহিম মত সমুদিত হইয়া থাকে। মিঃ খালিফা সুজাউদ্দীনের মতে ধর্ম্মজ্ঞানের অভিব্যক্তির ইহাই সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব। বিবর্ত্তনবাদী য়ুরোপীয়গণেরও ঠিক এইরূপ ধারণা।

অসভ্য মানবের প্রাকৃতিক বস্তুসম্বন্ধে তথ্য জানিবার কৌতূহল স্বতঃই প্রবল। তাহার কৌতূহল থাকে সত্য, কিন্তু মনোযোগদানের ক্ষমতা থাকে না। ঘটনামাত্রেরই এক টা যে সে কারণ জানিলেই সে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কৌতূহল ও অতিমাত্র বিশ্বাসপ্রবণতাই অসভ্য মানবের দুইটি প্রধান বিশেষত্ব। কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিলেই অসভ্য মানব তাহার কারণ জানিবার জন্ম উৎসুক হয়, এবং তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে করে অথবা অন্সের রচিত যে কোনও গল্প শুনে, তাহাই উহার কারণ বলিয়া বিশ্বাস করে। এই প্রকারে অসভ্য সমাজে 'মাইথলজী' বা পুরাতনী কাহিনীর উদ্ভব হয়।

পুরাতন-কাহিনীর উৎপত্তি।

মানবের মনে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বীজ নিহিত আছে, অসভ্য মানবের মনে তাহা এই রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সে এইরূপেই তাহার পরিতৃপ্তিসাধন করিয়া লয়। সেই রচা গল্প তাহাদের ভ্রান্ত বস্তুতত্ত্বজ্ঞানের অনুরূপই হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীকগণ সভ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের Mythology বা পুরাতনী কাহিনীতে অসভ্য অবস্থার অনেক আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রচুর অবশেষ দেখা যায়। ইহার কারণ ম্যাক্সমুলার বলেন যে, "প্রাচীন যুগের মানবগণ আমরা যেরূপ চিন্তা করি সেরূপ চিন্তা করিত না; কেবল ইহাই নহে,—পরন্তু তাহাদের যেরূপ চিন্তা করা উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি, তাহারা সেরূপ চিন্তা করাও উচিত মনে করিত না।" তাহাদের প্রাকৃত বস্তুর ধারণার পদ্ধতির সহিত আমাদের প্রাকৃত বস্তুর ধারণা-পদ্ধতির পার্থক্য এই যে, তাহাদের সকল বিষয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আরোপের আবেগ অত্যন্ত অধিক ছিল। সেই জন্ম নিতান্ত প্রাকৃতিক জড় ব্যাপারকেও তাহারা চিচ্ছক্তিসম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বপ্রসূত বলিয়া মনে করিত। আদিম মানবে জড় পদার্থে এইরূপ চিন্ময় ব্যক্তিত্ব কল্পনার প্রাবল্য, অনেকটা পুরাতনী কাহিনীর প্রভাবসম্ভূত। সেইজন্ম তাহারা মেঘকে চেতন জীব মনে করিত, ঝটিকায় দেবত্বের কল্পনা করিত, পশ্চিমগগনে সূর্য্যাস্তের গৌরবচ্ছটা দেখিয়া ইটা পর্ব্বতে হার্কিউলিসের পার্থিবদেহ ভস্মকারী চিতানলের শিখা ভাবিত, উদিত বালভানুকিরণে উষার রক্তিমাভার বিলোপ দর্শনে তাহারা অর্ফিয়াস্ ও ইউরাইডিসের মনোহারিণী কাহিনী উদ্ভাবিত করিয়াছিল।

ইহার পর মিঃ খালিফা সুজাউদ্দীন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই প্রকারে গ্রীকদিগের সমস্ত পুরাতনী কাহিনী বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না। সৃষ্টি সম্বন্ধে মিল্টনের ধারণার ন্যায় গ্রীকদিগের দেবতার সৃষ্টি ও সম্বন্ধতত্ত্ব

কাহিনীতে নীতিউপদেশ।

আলোচনায় আদি বিশৃঙ্খলার অবস্থা ও দৈবশক্তি প্রভাবে সেই বিশৃঙ্খলাদমনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়; দেবতাদিগের সহিত টাইটান বা অসুরদিগের যুদ্ধ এবং টার্টারস পর্ব্বতে অসুরদিগের বন্দী করার কাহিনীতেই এই আদিম সংঘর্ষের কথা সপ্রকাশ। দেবতারা যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েন, এই ধারণা অসভ্যসমাজের রুচিবিগর্হিত নহে, কারণ উহা তাহাদেরই সমাজের প্রতিবিম্বমাত্র। আদিম অবস্থায় মানব সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকিত। সুতরাং তাহারা

স্বতঃই মনে করিত যে, দেবতারাও সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে রত। প্রকৃতপক্ষে অসভ্যদিগের কল্পিত দেব-সমাজে তাহাদের আপনাদের সমাজের অবস্থাই প্রতিফলিত। রাজ্যশাসন ব্যাপারেও ঐরূপ জিউস কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য ও পসিডন কর্ত্তৃক সমুদ্র শাসন, হেড্‌স্‌ কর্ত্তক রসাতল শাসন এবং পৃথিবীতে সকলের সাধারণ অধিকার প্রভৃতি ব্যবস্থাই উহার প্রমাণ। প্রোমিথিয়াস ও এপিমিথিয়াস প্রভৃতির কাহিনীতে নৈতিক ও ডিউকেলিয়নের জলপ্লাবনে ঐতিহাসিক ধারণার আভাস পাওয়া যায়; সেণ্টরাস্, হার্পি, গর্গণ ও সাইক্লোপদিগের কাহিনীতে অতিপ্রাকৃত কল্পনার আভাস বিদ্যমান।

ইহার পর উক্ত লেখক মহাশয় প্রাচীন গ্রীকদিগের পুরাতন কাহিনী হইতে তাহাদের বিশ্বাসের কথা আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য দেবতার কল্পনা করিয়া গ্রীকগণ দেবতার বাসস্থান কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন।

স্বর্গ, মর্ত্ত ও নরক।

সেকালের গ্রীকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, নীলাকাশই স্বর্গের অধোভাগ, ভূগর্ভে নিশার আবাসস্থান, মৃত্যুর পর জীবের প্রেতাত্মা তথায় গমন করিয়া থাকে। ইহাই গ্রীকদিগের নরক। হেড্‌স্‌ বা যম তথায় আবলুসের মুকুট মস্তকে পরিয়া ঘনীভূত তমিস্রায় সিংহাসনে আসীন; তিনি স্বয়ং অদৃশ্য। তবে তাঁহার করধৃত নৈশ অশনির ভীষণ নির্ঘোষে তাঁহার সত্তা জানিতে পারা যায়। কালান্তকের সিংহদ্বারে দুশ্চিন্তা, দুঃখ, জরা, রোগ, অভাব, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও মৃত্যু প্রভৃতি ভূতগণের অধিষ্ঠান। এই ছায়ারাজ্যে আভের্ণাস্ হ্রদ, ষ্টাইক্স ও আচেরণ কোইকটাস (?) ও ফেজসন নদী প্রভৃতি মর্ম্মন্তুদ হাহারবমুখরিত তরলিত অনলতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। সার্ব্বেরাস নামধেয় ত্রিমুখ সারমেয় নরকের দ্বারে দৌবারিকরূপে বিরাজিত। চারণ নামক নাবিক প্রেতাত্মাদিগকে নৌকাযোগে ষ্টাইক্স বা বৈতরণী পার করিয়া লইয়া যায়। ফেট্‌স্‌গণ পীতপ্রান্ত পাপের পরিচ্ছদ পরিয়া তথায় উপস্থিত। প্রতিহিংসাময়ী ইরিন্নাইস ও মিনো তথায় প্রেতাত্মার কৃতকর্ম্মের বিচারকার্য্যে মীমাংসক। পাপীরা তথায় ঘোর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহাদের দশা দেখিয়া আদিমযুগের মানব যাহাতে পাপের পথ হইতে দূরে থাকে, তাহার জন্য তাহাদের যন্ত্রণার কথা বিবদভাবে বর্ণিত আছে। ফ্লেজাইস্ নামক ডেল্‌ফাই দেবমন্দির-ধ্বংসকারী তথায় অবস্থিত, তাহার মস্তকোপরি একটি বিরাট ও বিশাল পাষাণ দোদুল্যমান, সে প্রতিপলে অনুপলে তাহার পতনশঙ্কায় অতিমাত্রশঙ্কিত। কিন্তু ঐ পাষাণ কখনই পড়িতেছে না। আইক্সিওন অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় লালসার জন্য ঘন ঘন ঘূর্ণ্যমানচক্রে বদ্ধ রহিয়াছে। সিসিফাস দেবরোষে পতিত হইয়া একটি সূচ্যগ্র পর্ব্বতোপরি এক উপলখণ্ড রাখিতে চেষ্টা করিতেছে,—শিলাখণ্ড গড়াইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া পড়িতেছে,—সে আবার অবিলম্বে তাহা সেই পর্ব্বতোপরি রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। যুগযুগান্তর ধরিয়াই এইরূপ বৃথা চেষ্টা চলিতেছে। প্রাণহারিণী পিপাসায় কাতর পাপাত্মা ট্যাণ্টেলাস আকণ্ঠ স্নিগ্ধ বারিতে নিমজ্জিত থাকিয়াও জল পান করিতে পারিতেছে না। সে যতই পানার্থ জলের দিকে মুখ লইয়া যাইতেছে, ততই জল সরিয়া যাইতেছে। ইহাই প্রাচীন গ্রীকদিগের নরকের চিত্র।

প্রাচীন গ্রীকদিগের নরকের চিত্র যেমন বিস্ময়জনক তাহার ভূপৃষ্ঠস্থ মানবজাতির ক্রিয়াকলাপও

সেইরূপ বিস্ময়জনকভাবে বর্ণিত করিয়াছিল। লেখক উদাহরণস্বরূপ হেলেনা হরণ ও ট্রয়ের পতন, আর্গো তরীতে জেসনের কল্‌চিসগমন প্রভৃতির কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতি জন্য তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। তবে তিনি গ্রীকদেবতার কার্য্যকলাপ হইতে দেখাইয়াছেন যে, পুরাকালে গ্রীকদিগের সমাজে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, যে সকল পাপ প্রবল ছিল তাহা তাহাদের দেবকার্য্যকল্পনাতেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। গ্রীকদেবগণ অনেক ঘৃণিত পাপের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা বাহুল্যভয়ে আর সে গুলির উল্লেখ করিলাম না।

দেবতা ও মানব।

অবশেষে এই লেখক বলিয়াছেন যে, ক্রমশঃ জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট হইতে আরব্ধ হয়। আদিম মানব সকল প্রাকৃতিক পদার্থকে চৈতন্যময় ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিতে চাহে। তাহার মনের সেই আবেগ তাহাদের পুরাতনী কাহিনীতে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। তাহার পর চিন্তাশীল দার্শনিকগণ আবির্ভূত হইয়া গ্রীকদেবগণ যে জড় প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা প্রতিপন্ন করিতে আরব্ধ করিলেন। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতামূলক কাহিনীতে ধীরে ধীরে লোকের বিশ্বাস লোপ পাইতে লাগিল। প্রথমে শিক্ষিত সমাজে অবিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু জনসাধারণ তখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। পক্ষান্তরে লোকে মনে মনে তদানিন্তন ধর্ম্মমতে অবিশ্বাস করিলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিত না। তাহারা ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান মানিয়া চলিত; শেষে যখন সেই অবিশ্বাস সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রবিষ্ট হইল, তখন ঐ ধর্ম্মের অধঃপতন ঘটিয়াছিল।

ধর্ম্মবিশ্বাস লোপের কারণ।

আমাদের ধারণা এই যে, লেখক মহাশয় প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন নাই। প্রাচীন জাতিমাত্রেই রূপকচ্ছলে অনেক ধর্ম্মতথ্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন। এই পদ্ধতি আমাদের মনের মত না হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা সঙ্গত নহে।

মন্তব্য

—•—

পৌষ, ১৩১৮ ।

আর্য্যাবর্ত্ত ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত ।

সূচী ।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু ।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা]

[বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

Printed by—R. C. MITRA, at the VISVAKOSHA PRESS.
21|9 Santiram Ghose's Street, Calcutta.

আর্য্যাবর্ত্ত--

নবীন চন্দ্র সেন।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

অল্‌বেরুণীর ভারতভ্রমণ।
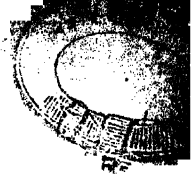
গজনীর প্রসিদ্ধ মামুদের ভারতাভিযানের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পরিব্রাজক অলবেরুণী ভারতবর্ষে আগমন করেন। হিন্দুস্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, একখানি পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অলবেরুণীর মতে ভারতবর্ষ একসময়ে সমুদ্রমগ্ন ছিল, কালে নদীসমূহের মৃত্তিকায় গঠিত হইয়াছে।

কণৌজের চতুষ্পার্শ্বস্থিত দেশই ভারতবর্ষের মধ্যস্থান। ইহাকে হিন্দুরা মধ্যদেশ কহে। ভৌগোলিক হিসাবে ইহা মধ্য বা কেন্দ্রস্থল, যেহেতু ইহা সমুদ্র ও পর্ব্বতসমূহের, গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশসমূহের এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা রাজনৈতিক কেন্দ্রও বটে, কারণ পুরাকালে ইহাই হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ বীর ও রাজন্যবর্গের আবাসভূমি ছিল।

সিন্ধুদেশ কণৌজের পশ্চিমে অবস্থিত। অলবেরুণী বলেন যে, তাঁহাদিগের দেশ হইতে সিন্ধুদেশে যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে নিমরোজ অর্থাৎ সিজস্থান হইতে যাত্রা করিতে হয়; কিন্তু হিন্দ বা প্রকৃত ভারতবর্ষে গমন করিতে হইলে কাবুলের পথে যাইতে হয়। ইহাই ভারতগমনের একমাত্র পথ নহে। সকল দিক হইতেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায়; তবে পথ বাধাবিপত্তিবহুল। ভারতের পশ্চিম সীমান্তের পর্ব্বতসমূহে হিন্দুদিগের একটি শাখা জাতি বাস করে। ইহারা অনেকাংশে হিন্দুদিগের ন্যায়; কিন্তু অত্যন্ত বিদ্রোহপরায়ণ ও অসভ্য।

কণৌজ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা বৃহৎ সহর। ইহার রাজধানী এই স্থান হইতে গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী বারীনগরে স্থানান্তরিত হইবার পর হইতে এই সহরের অধিকাংশই পরিত্যক্ত এবং ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই দুই নগরীর ব্যবধান তিন কি চারি দিনের পথ।

যেমন কণৌজ (কাণ্যকুব্জ) পাণ্ডুর সন্তানগণের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তেমনই মহুরা (মথুরা) নগরীও বাসুদেবের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা জোন (যমুনা) নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মহুরা ও কণৌজের ব্যবধান ২৮ ফারশাখ।*

---

* এক ফারশাখ ৪ মাইলের সমান।

টানেশ্বর (স্থানেশ্বর) কণৌজ এবং মহুরার উত্তরে উভয় নদীর (গঙ্গা ও যমুনা) মধ্যে, কণৌজ হইতে ৮০ ফারশাখ এবং মথুরা হইতে ৫০ ফারশাখ দূরে অবস্থিত।

কণৌজের দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ বর্ত্তমান আছে;—যজ্জমৌ, কণৌজ হইতে ১২ ফারশাখ; অভাপুরী (অভয়াপুরী) ৮ ফারশাখ; কুরাহা, ১২ ফারশাখ; বরহমশিল, ৮ ফারশাখ; প্রয়াগ ১২ ফারশাখ। এই প্রয়াগে জোন গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং এই স্থানে হিন্দুগণ ধর্ম্মপুস্তকে বর্ণিত নানাপ্রকার শাস্তিদ্বারা আপনাদিগকে নিপীড়িত করে। যে স্থানে গঙ্গা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের দূরত্ব প্রয়াগ হইতে প্রায় ১২ ফারশাখ।

নিম্নলিখিত প্রদেশ প্রয়াগ হইতে দক্ষিণদিকে সমুদ্রতীরাভিমুখে অবস্থিত:— অরকুতীর্থ, প্রয়াগ হইতে ১২ ফারশাখ; উবর্য্যাহার, ৪০ ফারশাখ; উর্দ্ধবিশ্ব (তীরস্থিত), ৫০ ফারশাখ।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে জলকূলে জোরের শাসনাধীনে এই সমস্ত দেশ আছে:— দারৌর, উর্দ্ধবিশ্ব হইতে ৪০ ফারশাখ; কাঞ্চী, ৩০ ফারশাখ; মলয়, ৪০ ফারশাখ; কূনক্, ৩০ ফারশাখ, এই দিকে ইহাই জোরের অধিকৃত শেষ স্থান।

বারী হইতে গঙ্গার পূর্ব্বপারের উপকূল বাহিয়া গমন করিলে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পাওয়া যাইবে:—অযোধ্যা, বারী হইতে ২৫ ফারশাখ; সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী, ২০ ফারশাখ।

তথা হইতে গতিপরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ দিকের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বদিকে গমন করিলে নিম্নলিখিত স্থানে উপনীত হওয়া যায়;—শারওয়ার, বারাণসী হইতে ৩৫ ফারশাখ, পার্টলিপুত্র, ২০ ফারশাখ; মুঙ্গিরি (মুঙ্গের) ১৫ ফারশাখ; জনপ, ৩০ ফারশাখ; দুগমপুর (দুর্গমপুর), ৫০ ফারশাখ; গঙ্গাসাগর, যেস্থানে গঙ্গা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, ৩০ ফারশাখ।

কণৌজ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নিম্নলিখিত স্থানগুলি অবস্থিত:—বারী, ১০ ফারশাখ; দুগম, ৪৫ ফারশাখ; শিলাহাট সাম্রাজ্য, ১০ ফারশাখ; বিহার নগর, ১২ ফারশাখ। আরও দূরে দক্ষিণ দিকে তিলবটদেশ অবস্থিত। ইহার অধিবাসীদিগকে তরু কহে। ইহারা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহাদের নাসিকা তুর্কীদিগের নাসিকার ন্যায় অনুন্নত। এই স্থান হইতে কামরূপ পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পর্ব্বত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বামপার্শ্বে তিলবটের বিপরীত মুখে নয়পাল রাজ্য (নেপাল) অবস্থিত। নয়পাল সম্বন্ধে অলবেরুণী একজন ভ্রমণকারীর নিকট হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। সেই ভ্রমণকারী তানবটে পূর্ব্বমুখীন গতি ত্যাগ করিয়া বামদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি নয়পালে গমন করিয়াছিলেন। ইহার দূরত্ব ২০ ফারশাখ। ইহার অধিকাংশই উন্নতভূমি। নয়পাল হইতে তিনি ৩০ দিনে ভোটেশ্বরে আসিয়াছিলেন; ইহা প্রায় ৮০ ফারশাখ পথ। এই স্থানে নত ভূমি অপেক্ষা উন্নত ভূমিই অধিক। এই স্থানে জলাভূমি বহুবার সেতুদ্বারা উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই সেতুগুলি পরস্পর রজ্জুদ্বারা সংযুক্ত কাষ্ঠফলকে নির্ম্মিত হইয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উভয় পারস্থিত মাইল ষ্টোনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ রহিয়াছে। লোকসমূহ এই সেতুর উপর দিয়া পৃষ্ঠে ভার বহন করিয়া গমন করে; সেতুর অপর পারে ভারগুলি ছাগের পৃষ্ঠে স্থানান্তরিত করা হয়। অলবেরুণীকে তাঁহার সংবাদদাতা বলিয়াছিলেন যে, তিনি চারি চক্ষুবিশিষ্ট হংস দেখিয়াছিলেন। ইহা আকস্মিক প্রাকৃতিক ব্যতিক্রম নহে; এই শ্রেণীর সকল হংসই এই প্রকার!

ভোটেশ্বর তিব্বতের প্রথম সীমান্ত। সেই স্থানে অধিবাসিবর্গের ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচারব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা ২০ ফারশাখ। পর্ব্বতের এই উচ্চ স্থান হইতে ভারতবর্ষ কুয়াসাচ্ছন্ন কৃষ্ণবর্ণ প্রান্তরের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং তিব্বত ও চীন রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হয়। তিব্বত ও চীনের দিকে অবতরণ করিতে ১ ফারশাখেরও কম পথ অতিক্রম করিতে হয়।

কণৌজ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে গঙ্গার পশ্চিমপার্শ্বস্থিত নিম্নলিখিত স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়:—জজাহুতীরাজ্য, কণৌজ হইতে ৩০ ফারশাখ। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম কজুরাহা। এই নগরী ও কণৌজের মধ্যে ভারতের অতি প্রসিদ্ধ দুইটি দুর্গ অবস্থিত; একটি গোয়ালির অপরটি কালনজর। দাহল প্রদেশের রাজধানী টীয়োরী। এই প্রদেশের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার নাম গাঙ্গেয়। কন্নকর রাজ্য ২০ ফারশাখ; অপস্থর, বনবাস এই দুইটি সমুদ্রোপকূলস্থিত।

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ কণৌজ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থিত:—আষী, কণৌজ হইতে ১৮ ফারশাখ; যহনা, ১৭ ফারশাখ; চন্দ্রা, ১৮ ফারশাখ; রাজৌরী,

১৫ ফারশাখ; বাজনা, গুজরাতের রাজধানী, ২০ ফারশাখ। শেষোক্ত নগরীকে লোকে নারায়ণ কহে। ইহার ধ্বংস হইলে নাগরিকগণ জত্রা নামক অন্য একটি স্থানে গমন করে।

কণৌজ মথুরা হইতে যত দূরে বাজনাও কণৌজ হইতে তত দূরে অর্থাৎ ২৮ ফারশাখ দূরে অবস্থিত। যদি কোন ব্যক্তি মথুরা হইতে উজ্জয়িনী গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে ৫ ফারশাখ দূরে দূরে অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করিতে হইবে। ৩৫ ফারশাখ অতিক্রম করিলে দূদাহী নামক একটি প্রকাণ্ড গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে বামহুর, দূদাহী হইতে ১৭ ফারশাখ; ও ভাইলষান ৫ ফারশাখ। এই স্থানটি হিন্দুদিগের নিকট অতি প্রসিদ্ধ। এইস্থানে যে মূর্ত্তির পূজা হয় সেই মূর্ত্তির নাম হইতে এই নগরীর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মূর্ত্তির নাম মহাকাল। তথা হইতে অরদীন ৯ ফারশাখ ও ধার ৭ ফারশাখ।

বাজনা হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিলে মৈত্তয়ারে উপনীত হওয়া যায়। ইহা বাজনা হইতে ২৫ ফারশাখ। এই রাজ্যের রাজধানী জট্টারৌর। এই নগর হইতে মালব ও তাহার রাজধানী ধার ২০ ফারশাখ। উজ্জয়িনী নগরী ধার হইতে ৭ ফারশাখ পূর্ব্বে অবস্থিত। উজ্জয়িনী হইতে ভাইলষান ১০ ফারশাখ। ইহাও মালবের অন্তর্গত।

ধারের দক্ষিণ দিকে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বর্ত্তমান আছে:—ভূমিহার, ধার হইতে ২০ ফারশাখ; কন্দ, ২০ ফারশাখ; নমাবুর, ১০ ফারশাখ (ইহা নর্ম্মদার তীরস্থিত); গোদাবরীতীরবর্ত্তী মন্দগিরি, ৬০ ফারশাখ; নমিষ্য উপত্যকা, ৭ ফারশাখ; মারহাট্টাদেশ, ১৮ ফারশাখ; কঙ্কণপ্রদেশ এবং ইহার সমুদ্রোপ-কূলস্থিত রাজধানী ঠানা, ২৫ ফারশাখ।

বাজনা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে উপনীত হওয়া যায়:—অন্হিলবার, বাজনা হইতে ৬০ ফারশাখ; সমুদ্রতীর-বর্ত্তী সোমনাথ, ৫০ ফারশাখ।

অন্হিলবারের ৪২ ফারশাখ দক্ষিণে লারদেশ অবস্থিত। ইহার দুই রাজধানী—বিহ্রোজ এবং বিহনজুর। উভয় নগরীই ঠানার পূর্ব্বদিকে সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত।

বাজনা হইতে পশ্চিমদিকে গমন করিলে মুটান ও ভাটীতে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহারা বাজনা হইতে যথাক্রমে ৫০ এবং ১৫ ফারশাখ দূরবর্ত্তী।

ভাটী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে গমন করিলে নিম্নলিখিত স্থানে পৌঁছান যায় :—আরোর, ভাটী হইতে ১৫ ফারশাখ ; এই নগর সিন্ধু নদের দুইটি শাখার মধ্যস্থলে অবস্থিত। বম্‌হন্বা অলমনসুর, ২০ ফারশাখ ও লোহারাণী (সিন্ধুর মোহানায় অবস্থিত) ৩০ ফারশাখ।

কণৌজ হইতে উত্তর-পশ্চিমদিকে নিম্নলিখিত স্থানগুলি অবস্থিত :—শির্ষাবহ, কণৌজ হইতে ৫০ ফারশাখ ; পিঞ্জোর, ১৮ ফারশাখ ; ইহা পর্ব্বতোপরি অবস্থিত (ইহার বিপরীত দিকের ভূমিখণ্ডে স্থানেশ্বর নগর বর্ত্তমান) ; জালন্ধরের রাজধানী দহ্‌মাল, ১৮ ফারশাখ, ইহা পর্ব্বত পাদমূলে অবস্থিত ; বল্লাবর, ১০ ফারশাখ। এইস্থান হইতে পশ্চিম দিকে লদদা, ১৩ ফারশাখ ; রাজগিরি দুর্গ, ৮ ফারশাখ ; তথা হইতে উত্তরাভিমুখে কাশ্মীর, ২৫ ফারশাখ।

কণৌজ হইতে পশ্চিমে :—দিয়ামৌ, কণৌজ হইতে ১০ ফারশাখ ; কুটী, ১০ ফারশাখ ; পানিপত, ১০ ফারশাখ (উল্লিখিত স্থানদ্বয়ের মধ্য দিয়া জৌন—যমুনা নদী—প্রবাহিত) ; কবিটল, ১০ ফারশাখ ; সুন্নাম, ১০ ফারশাখ।

তথা হইতে উত্তর পশ্চিমে আদিত্যাহোর, ৯ ফারশাখ ; জজ্জনীর, ৬ ফারশাখ ; মন্দহুকুর লোহাওয়ারের রাজধানী—ইহা ইরাব নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত—৮ ফারশাখ ; চন্দ্রাহনদী, ১২ ফারশাখ ; জৈলাম (ঝিলামবিয়াতা) নদীর পশ্চিমে ৮ ফারশাখ ; সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী ঐহিন্দ, গান্ধারের রাজধানী, ২০ ফারশাখ ; পুর্ষাত্তরায়, ১৪ ফারশাখ ; দুনপুর, ১৫ ফারশাখ ; কাবুল, ১২ ফারশাখ ; গজনা (গজনী) ১৭ ফারশাখ।

অলবেরুণী কাশ্মীরের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

দুর্গম পর্ব্বতরাজিবেষ্টিত উপত্যকায় কাশ্মীর অবস্থিত। এই দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশ হিন্দুদিগের অধিকৃত। পশ্চিমাংশ অন্যান্য রাজন্যবর্গের অধীন। উত্তর এবং পূর্ব্বের কিয়দংশ খোটান ও তিব্বতের তুরস্কগণের অধীন। ভোটেশ্বরের গিরিশৃঙ্গ হইতে তিব্বতের মধ্য দিয়া কাশ্মীর ৩০০ ফারশাখ দূরে অবস্থিত।

কাশ্মীরের অধিবাসিগণ পাদচারী, তাহাদের আরোহণের জন্য হস্তী বা অন্য কোন পশু ব্যবহৃত হয় না। তাহাদের মধ্যে যাহারা ভদ্র তাহারা মনুষ্যস্কন্ধ-বাহিত কট্ট নামক পাল্কীতে আরোহণ করে। দেশবাসিগণ দেশের স্বাভাবিক শক্তি রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যগ্র, সেইজন্য তাহারা কাশ্মীরের পথ ঘাট সুরক্ষিত রাখে। এই সকল কারণে তাহাদের সহিত কোন প্রকার বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন

করা অত্যন্ত কঠিন। পূর্ব্বে দুই এক জন বিদেশীয়কে বিশেষতঃ য়িহুদীদিগকে তাহাদের দেশের প্রবেশানুমতি প্রদত্ত হইত: কিন্তু এক্ষণে কোন অপরিচিত হিন্দুও প্রবেশলাভ করিতে-পারে না, অন্য লোকের ত কথাই নাই।

কাশ্মীরপ্রবেশের সুপরিচিত পথ সিন্ধু ও জৈলাম (ঝিলাম) নদীর মধ্যবর্ত্তী বরহান নগর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তথা হইতে যে স্থানে কুশনারী ও মহয়ী মিলিত হইয়াছে (এই উভয় নদীই শামীলান পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া জৈলামে পতিত হইয়াছে) সেই স্থানে মিলিত জলরাশির উপরিস্থিত সেতুর নিকট গমন করিতে হইবে—দূরত্ব ৮ ফারশাখ। সে স্থান হইতে পাঁচ দিনে গিরিশঙ্কটের মুখে উপনীত হওয়া যায়। (এই গিরিশঙ্কটের মধ্য দিয়া জৈলাম বহির্গত হইয়াছে)। এই শঙ্কটের অপর প্রান্তে জৈলাম নদীর উভয় তীরেই ঘাটী (দ্বার) আছে। গিরিশঙ্কট পরিত্যাগ করিলে সমতলভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও দুই দিনের পথে অধিত্যকার উভয় পার্শ্বস্থিত উশকারা গ্রাম অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরের রাজধানী আদিস্থানে (?) উপস্থিত হওয়া যায়।

কাশ্মীর নগরী জৈলামের উভয়তীরে নির্ম্মিত হইয়া চারি ফারশাখ বিস্তৃত ভূমির উপর দণ্ডায়মান। উভয় তীর সেতু ও খেয়া নৌকার দ্বারা সংযুক্ত। শীতল, দুর্গম, তুষারধবল হরমকোট পর্ব্বতশ্রেণী হইতে জৈলাম নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (গঙ্গার উৎপত্তিও এইস্থানে)! এই পর্ব্বতরাজির পশ্চাতে মহাচীন। জৈলাম নদী পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া দুই দিনের পথ প্রবাহিত হওয়ার পর আদিস্থান অতিক্রম করিয়া গমন করে। চারি ফারশাখ দূরে ইহা একটি ১ ফারশাখ—সমচতুষ্কোণ জলাভূমিতে প্রবেশ করে। এই জলাভূমির কূলে লোক কৃষিকার্য্য করে। জলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া জৈলাম উশকারা নগরী অতিক্রম করতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত গিরিশঙ্কটে উপনীত হয়।

সিন্ধুনদ তুরস্কদিগের দেশের উনাং পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে; নিম্নলিখিত উপায়ে তথায় উপস্থিত হওয়া যায়: -কাশ্মীরে প্রবেশপথের গিরিশঙ্কট পরিত্যাগ করতঃ অধিত্যকায় প্রবেশ করিয়া বামপার্শ্বে বোলর ও শামীলানদিগের (তুরস্কদিগের শাখাজাতি—ইহারা ভট্টবর্য্যান নামে অভিহিত) পর্ব্বতাভিমুখে আরও দুই দিন গমন করিতে হইবে। এই জাতিদিগের রাজার উপাধি ভট্ট-শাহ। ইহাদের গিলগিট অশ্বির ও শিলটাস নামে নগরত্রয় আছে এবং ইহাদের ভাষা তুরস্ক। ইহারা প্রায়ই কাশ্মীর আক্রমণ করে। নদীর বামতীরে গমন করিলে ক্ষেত্রসমূহের মধ্য দিয়া রাজধানীতে উপনীত হওয়া যায়; দক্ষিণ তীর বাহিয়া গমন

করিলে রাজধানীর দক্ষিণস্থিত পরস্পরসংলগ্ন গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া কুলারজক পর্ব্বতে পৌঁছান যায়। এই স্থানে বরফ কদাপি গলিত হয় না। এইস্থান সর্ব্ব সময়েই টাকেশ্বর ও লৌহাওয়ার (লাহোর) হইতে দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতচূড়া ও কাশ্মীরের অধিত্যকার মধ্যস্থিত ব্যবধান ২ ফারশাখ। রাজগিরি দুর্গ ইহার দক্ষিণে এবং লাহুর দুর্গ ইহার পশ্চিমে অবস্থিত। অলবেরুণী বলেন যে, তিনি যতগুলি দুর্গ দেখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এই দুইটিই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়। গিরিশৃঙ্গ হইতে রাজাওয়ারী নগর ৩ ফারশাখ দূরে অবস্থিত। ইহা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী পেডস্থানে অলবেরুণীর স্বদেশীয় বণিকগণ ব্যবসাবাণিজ্য করিত। ইহা ছাড়াইয়া তাহারা কখনও গমন করিত না। ইহা ভারতবর্ষের উত্তর দিকের সীমান্ত।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তপর্ব্বতে আফগানদিগের বিভিন্ন শাখাজাতি বাস করে।

ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্র। ভারতবর্ষের উপকূল মক্‌রাণের রাজধানী, টীজ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে আল্‌-দৈবালের রাজ্য পর্য্যন্ত ৪০ ফারশাখ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। এই দুই স্থানের মধ্যে তুরান উপসাগর।

পূর্ব্বোল্লিখিত উপসাগরের পরেই ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ মুনহা (মোহানা?)। তৎপরেই কচ্ছ ও সোমনাথের রেওয়ারিজ নামক জলদস্যুদিগের আবাসভূমি। ইহাদিগের এই নামে অভিহিত হইবার কারণ—ইহারা বীরা নামক জাহাজে সমুদ্রে ডাকাইতি করিয়া থাকে।

সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান সমুহের নাম :—তওয়ালেশ্বর, দৈবাল হইতে ৫০ ফারশাখ; লোহারাণী, ১২ ফারশাখ; কচ্ছ ও বারোই, ৬ ফারশাখ; সোমনাথ, ১৪ ফারশাখ; কনবায়ট, ৩০ ফারশাখ; অশয়িল, ২ দিনের পথ; বিহ্‌রোজ, ৩০ ফারশাখ; সন্দন, ৫০ ফারশাখ; সুবার, ৬ ফারশাখ; টানা (ঠানা) ৫ ফারশাখ।

তথা হইতে সমুদ্রতীর বাহিয়া লারান দেশে—যথায় জীমূর নগর আছে—উপস্থিত হওয়া যায়। তাহার পর বল্লভ, কাঞ্চী, দরবদ। ইহার পর একটি প্রকাণ্ড উপসাগর আছে। ইহাতে সিংহলদ্বীপ অর্থাৎ শরনদ্বীপ অবস্থিত। উপসাগরের তীরে পঞ্জয়াবর নগর বর্ত্তমান। এই নগরের ধ্বংসের পর রাজা জৌর ইহার পরিবর্ত্তে পশ্চিমদিকে সমুদ্রতীরে পদনার নামে নূতন নগর নির্ম্মাণ করেন।

তৎপরবর্ত্তী স্থান উম্মলনার; তৎপরে শরণদ্বীপের বিপরীত দিকে রামশের (রামেশ্বর); এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রের পরিসর ১২ ফারশাখ। পঞ্জয়ার

হইতে রামেশ্বর ৪০ ফারশাখ দূরে অবস্থিত। রামেশ্বর ও সেতুবন্ধের ব্যবধান ২ ফারশাখ। সেতুবন্ধের অর্থ সমুদ্রের সেতু। ইহা দশরথের পুত্র রামকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি মহাদেশ (ভারতবর্ষ) হইতে লঙ্কার দুর্গ পর্য্যন্ত ইহা নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই সেতু এক্ষণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতের সমষ্টিমাত্র। এই পর্ব্বতগুলির মধ্য দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত। সেতুবন্ধ হইতে ১৬ ফারশাখ পূর্ব্বে বানরগণের পর্ব্বত কিহ্‌কিন্দ (কিষ্কিন্ধ্যা)। প্রতিদিন বানরদিগের রাজা অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে কানন হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের জন্য নির্ম্মিত নির্দ্দিষ্ট আসনসমূহে উপবেশন করে। সেই প্রদেশের অধিবাসিগণ তাহাদের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করে এবং বৃক্ষপত্রের উপর স্থাপিত করিয়া তাহাদের নিকট আনয়ন করে। ভোজন সমাপ্ত হইলে তাহারা বনে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু যদি কখন তাহারা উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ। যেহেতু, বানরগুলি যে কেবল সংখ্যায় অধিক তাহা নহে, পরন্তু অত্যন্ত অসভ্য ও আক্রমণপটু। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ইহারা পূর্ব্বে মনুষ্য ছিল; কিন্তু রাক্ষসদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামের সহায়তা করায় বানরে পরিণত হইয়াছে। ইহারা এই গ্রামগুলি রামের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে ইহাই সাধারণ লোকের বিশ্বাস। ইহাদিগের কবলে পতিত কোন ব্যক্তি যদি রামসম্বন্ধীয় কবিতার আবৃত্তি এবং রামমন্ত্র উচ্চারণ করে তাহা হইলে ইহারা শান্তভাবে তাহা শ্রবণ করে, এমন কি সময়ে সময়ে পথভ্রষ্টকে প্রকৃত পথে লইয়া যায় এবং তাহাকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করে। সাধারণের বিশ্বাস এইরূপ। যদি ইহাতে সত্যের লেশ থাকে তাহা হইলে সুললিত তানেই এই সুফল ফলিয়া থাকে।

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল।

—*—

বাঁশী-চোর।

"হা, গোপাল, একি হ'ল? হায়, মহাপ্রভু, এ কি করিলে?"
বৃদ্ধ পুরোহিত দেউলের মধ্যে গরুড়স্তম্ভে মাথা ঠুকিয়া গোপালের দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া কেবল বলিতেছেন, "হায়, গোপাল, এ কি করিলে প্রভু?"

অন্যান্য সেবকরা মশাল ধরাইয়া, মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণে ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতেছে, মন্দিরের মধ্যে দশটির স্থলে আজ শত ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে; সকলে চিন্তাকুল ভাবে একই স্থান শতবার অন্বেষণ করিতেছে এবং তাহার পরক্ষণেই মনে করিতেছে, সেই স্থানটিই ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। কাহারও মুখে কথা নাই। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ঠাকুরের নটবরবেশ, রাখালবেশ, রাজবেশ, প্রভৃতি নানা বেশ রচনা করিয়া দেয়—সে বেদীর সম্মুখে দণ্ডবৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে কাতরস্বরে বলিতেছে "আ-হে মহাপ্রভু!"

রজনী প্রভাতকল্পা। প্রভাতের তারা দিবাকে স্বাগত জানাইবার জন্য শুভ্র পূতবেশে পূর্ব্ব গগনে প্রতীক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বদিক্ পাণ্ডুর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু দেউলে আজ 'মঙ্গল-ধূপে'র আরতি বাজিয়া উঠিল না। পল্লীবাসী কাঁসর ঘণ্টা না শুনিতে পাইয়া অভ্যস্ত সংস্কারবশে মনে করিল, এখনও প্রভাত হইতে বিলম্ব আছে। প্রতিদিন যে মঙ্গল-ধূপের বাদ্য শুনিয়া তাহাদের নিদ্রা বিদায় গ্রহণ করে।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে দুঃসংবাদ প্রচারিত হইল, "গোপালের বাঁশী চুরি গিয়াছে!" বৃদ্ধগণ কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন, অমঙ্গলাশঙ্কায় জননীগণ সন্তানকে বক্ষে টানিয়া লইলেন, অন্য সকলে বিস্ফারিত-বদনে শুধু চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে মন্দির জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। নিকটস্থ বকুলবন লোকের কোলাহলে তাহার বিজনশান্তি পরিহার করিল। অগণিত ভক্ত দেউলের অভ্যন্তরে, চত্বরে, সোপানোপরি করজোড়ে দাঁড়াইয়া দেবতার নিকট আকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেছে। সে জনতা কখনও মৌনভাবে দেবতার দিকে চাহিয়া মিনতি করিতেছে, কখনও বা শত শত কণ্ঠে "হা গোপাল, হা মহাপ্রভু, হা কেশব" শব্দে মন্দিরের গম্বুজে প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিয়া এক তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছে। আবার তখনই সব নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ পুরোহিত তখনও গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেবমূর্ত্তির দিকে

চাহিয়া আছেন। দীর্ঘ দিবসের অনশনক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তিনি দেবতার করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত হইয়াছে, ললাটে রক্তচিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে, কিন্তু দেবতার কৃপা হইতেছে না। সে পাষাণমূর্ত্তি তেমনই স্থির, তেমনই নিশ্চল! সেই বিস্ফারিত চক্ষুর্দ্বয় তেমনই উদাসীন; অধরোষ্ঠ তেমনই অপ্রকম্পিত!

বিহ্বল জনমণ্ডলী ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মন্দির ত্যাগ করিবার সময় তাহারা নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। তাহার সারাংশ এই যে, মন্দিরের সেবকদিগের বাড়ীতে অনুসন্ধান করিলে বাঁশী নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। বাঁশী যে সোণার!

শ্রীমতী ব্রাহ্মণবালা; মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কন্যা। এই কন্যা ব্যতীত সংসারে বৃদ্ধের আর কেহ ছিল না। কন্যাটি মাতৃহীনা বলিয়া পিতার সমস্ত হৃদয়ের স্নেহ মন্থন করিয়া লইয়াছিল। মাতৃহীনা হইলেও শ্রীমতী সুখে লালিতা। গোপালের কৃপায় পুরোহিতের কিছুরই অভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে অতি যত্নে লালনপালন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী তাঁহার অবসর-সঙ্গিনী ছিল। তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন, শ্রীমতী তাহা একাগ্রমনে শুনিত। শুনিতে শুনিতে তাহার রোমাঞ্চ হইত, চক্ষুতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিত, আর সমীরণতাড়িত লতিকার মত তাহার দেহযষ্টি কম্পিত হইয়া উঠিত। বৃদ্ধ পুরোহিত সযত্নে কন্যাকে ধরিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইয়া দিতেন, আর ভাবিতেন "ভগবান, এ কি লীলা তোমার!"

শ্রীমতী পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিলেও তাহার বিবাহ হয় নাই। ব্রাহ্মণ মনে করিতেন, "ব্যস্ততা কি? বিবাহ দিলেই ত মা আমার পরগৃহে যাইবে, আমার গৃহ যে শ্মশান হইয়া যাইবে। তখন থাকিব কি লইয়া?" পাড়ার লোক মনে করিত, "মেয়েটির যে মৃগীরোগ, হঠাৎ কখন কি হয়, বলা যায় না। বিবাহ হইয়া ফল কি?" বস্তুতঃ শ্রীমতীর অদ্ভুত ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত হইত। সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে; দূরে গগননীলিমার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকে, সময়ে সময়ে জ্ঞানহারা হইয়া পাষাণপ্রতিমার মত নিশ্চল হইয়া যায়। প্রতি-বেশীরা মনে করে, "এ আবার কি?"

শ্রীমতী রূপসী। তাহার রূপ ব্রাহ্মণের গৃহ আলো করিয়া থাকে। বকুলের মালা গাঁথিয়া যে দিন সন্ধ্যা আরতির সময় শ্রীমতী দেউলে আসিয়া গোপালের

গলে পরাইয়া দিয়া যাইত, সে দিন যাত্রীর দল অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহাদের মনে হইত যেন সে নগ্নপদে অসংখ্য নূপুর রুণু রুণু করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, যেন সে গতির ছন্দে অসংখ্য কাব্য মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে! তখন ফুলগন্ধে মন্দির আমোদিত হইত। আর দেবতার সহজ প্রফুল্লমুখ যেন আরও মধুর হাস্য বিকীরণ করিত। ভক্ত দ্বিগুণ প্রেমে মত্ত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিত। বৃদ্ধ পুরোহিত গদগদভাবে যুক্ত-করে কন্যার জন্য দেবতার করুণা ভিক্ষা করিতেন।

ব্রাহ্মণবালা সদ্যোভিন্ন যৌবনকুসুমের মদিরায় বিভোর হইয়া থাকিত। পিতৃ-গৃহের নির্জ্জনতার মধ্যেও তাহার রমণীসুলভ অশিক্ষিতপটুতা আত্মবিকাশ করিতে ছাড়ে নাই। পুষ্পধন্বা তাঁহার চারুচাপ এই বালিকার দিকে ঈষৎ বাঁকাইতে ভুলেন নাই। সুতরাং তাহার যৌবননদী প্রেমের চন্দ্রকিরণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল। সে সন্নিহিত বকুলবনে যাইয়া অপরাহ্নে ফুল কুড়াইয়া আনিত; মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া কুন্তলে পরিত, কর্ণে পরিত, সীঁথিতে দোলাইত, আর তাহার পালঙ্কে উপাধানের উপর রাখিয়া দিত। সন্ধ্যায় স্নান করিয়া শুচিস্মিতা হইয়া সে নীলবাসখানি সযত্নে ঘাঘরার মত করিয়া পরিত, দীপ জ্বালিত এবং শয্যার নিকটে গিয়া সেই দীপে কাহার আরতি করিত। চন্দনের ফোঁটা পরিয়া, বক্ষে কণ্ঠে চন্দনানুলেপন করিয়া সে দেবতাকে প্রণাম করিত। তাহার পর বালিকা পিতার আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। ব্রাহ্মণ আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেন, তাহার পর তাহার কেশে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, মনে করিতেন, "বালিকার অবসরবিনোদনের ত আর কিছুই নাই, তাই সে বেশবিন্যাস করিয়া সময় কাটাইয়া দেয়।" বৃদ্ধের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিত।

শ্রীমতীর আর একটি কায ছিল—শয্যা রচনা। তাহার কক্ষটি সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত এবং কুসুম ও চন্দনের গন্ধে দেব-মন্দিরের ন্যায় আমোদিত থাকিত। শ্রীমতীর শয্যা বহুমূল্য না হইলেও পরিপাটী। প্রতিদিন অতি যত্নে সে তাহার শয্যা-রচনা করিত, যেন প্রেমমুগ্ধা বালিকা পতির আগমনোদ্দেশে সমস্ত শক্তি ও কল্পনা দিয়া তাহার বাসরসজ্জা সাজাইয়া রাখিতেছে। তাহার মনোচোর আসিবে কি? নিশীথে যখন পল্লী নিষুপ্ত, তখনও শ্রীমতী জাগিয়া থাকিত; বকুলফুলের মালা, শেফালির মালা, রজনীগন্ধার মালা হাতে লইয়া সাশ্রুনয়নে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত। জাগরণে যখন তাহার চক্ষু অলস হইয়া আসিত, অধীর প্রতীক্ষায় দেহ অবসন্ন হইয়া আসিত, তখন তাহার শরীর শয্যায় লুণ্ঠিত

হইত। দিব্যগন্ধে তখন তাহার ঘর পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। দূর হইতে বাঁশী মোহন স্বরে বাজিয়া বাজিয়া নিকটে আসিত। যমুনার উচ্ছলিত কলগীতি সমীরণের অলস পক্ষে ভাসিয়া আসিত। নূপুরের মধুরধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া তাহার কর্ণে অমৃতের ধারা বর্ষণ করিত। আর তাহার বাহুলতানিবদ্ধ কৃষ্ণমুর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িত। এমনই মধুর স্বপ্নে তাহার রজনী পোহাইত। প্রভাতে সে দেখিত, শয্যাপার্শ্বে অলক্তকচিহ্ন, আর তাহার বক্ষ কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত!

গোপালের বাঁশী চুরি হইবার পরে দুই একদিনের মধ্যেই রাজার লোক প্রধান পুরোহিতের দ্বারদেশে আসিয়া দেখা দিল। প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ মঙ্গল ধূপের আরতি সমাপন করিয়া গৃহে আসিয়া দেখেন, তাঁহার প্রাঙ্গণে সশস্ত্র রাজভৃত্যগণ কোলাহল করিতেছে। তাঁহার গৃহ অনুসন্ধান করিবে। শ্রীমতী তখনও স্বপ্নের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। প্রতিবেশীরা ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ অবিচলিত, ধীর কিন্তু গৃহানুসন্ধানের গ্লানি-নিবন্ধন ম্রিয়মান।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী উঠিয়া আসিয়া গবাক্ষে দর্শন দিল, প্রাঙ্গণের কোলাহল অকস্মাৎ থামিয়া গেল। গত রজনীর স্বর্গীয় সুখস্মৃতি তাহার মুখকমলে এমন একটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে যে, তাহার নিকট সমস্ত সংশয় সন্দেহ তর্কজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক থাকিয়া কর্ম্মচারী প্রহরিগণকে গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাকে বক্ষে লইয়া প্রাঙ্গণপার্শ্বে তমালের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীমতী পিতাকে সযত্নে ধরিয়া বসাইয়া দিল। তাঁহার দেহযষ্টি অভিমানভরে কাঁপিতেছিল। অকস্মাৎ শ্রীমতীর শয়ন-কক্ষে প্রহরীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একবার শ্রীমতীর দিকে চাহিলেন ও পরক্ষণেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকর্ম্মচারী ব্রাহ্মণকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার কন্যার উপাধানের নিম্নে বাশী পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার অনুচররা বাঁশী লইয়া আসিল। গোপালের বাঁশী পাওয়া গিয়াছে, এই উল্লাসে ব্রাহ্মণ বাঁশী লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন; তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, এই বাঁশী অব্যক্ত স্বরে তাঁহারই কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। কর্ম্মচারী কঠোর হস্তে প্রহরীর নিকট হইতে বাঁশী লইলেন এবং কর্কশ স্বরে পুরোহিতকে বলিলেন, "আপনি বৃদ্ধ আপনাকে বন্ধন করিব না, আমাদের সঙ্গে চলুন।"

তাঁহার ইঙ্গিতে দুইজন প্রহরী ব্রাহ্মণের দুই হস্ত গ্রহণ করিল। এইবার ব্রাহ্মণের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন "মা, এ কি এ?"

শ্রীমতী গগনের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখমণ্ডলে, অলকদামে প্রভাত রবির কিরণ প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার সে প্রশান্ত স্থির মূর্ত্তির দিকে জনতা নিস্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়া ছিল। আনন্দে তাহার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। প্রতিদিন সে ত শয্যারচনা করে, বাঁশী ত কখনও দেখে নাই! মুগ্ধা পিতার বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। পিপীলিকার সারির মত জনতা যখন আঙ্গিনা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন বালিকা শয্যার পার্শ্বে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুরোহিত নির্জ্জন কারাগৃহে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, "হে আমার গোপাল, এ কি করিলে, প্রভু? কন্যা ত আমার অপাপবিদ্ধা। তবে তাহার এ কলঙ্ক করিলে কেন? রমণীর কলঙ্ক করিয়াই কি তোমার আনন্দ, প্রভু? হায় হায়, এমন করিয়া কি আমার ননীর পুতুলের সর্ব্বনাশ করিতে হয়? সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে?"

হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে কারাগারের অর্গল মুক্ত হইল। অদূরবর্ত্তিনী ঊষার বায়ু ব্রাহ্মণের শরীরে স্নিগ্ধ কর বুলাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, রাজা স্বয়ং তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত। পুরোহিত দক্ষিণ হস্তে তাঁহার শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিলেন। প্রহরীরা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল।

রাজা ব্রাহ্মণকে লইয়া তাঁহার পুষ্পবাটিকায় আসিলেন এবং তথায় তাঁহার গৃহদেবতার মন্দিরের শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত অলিন্দে উপবেশন করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, স্বপ্নে তাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীরূপিণী। তাঁহার শয়নকক্ষে যে বাঁশী পাওয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তিনি বা তাঁহার কন্যা কেহই দায়ী নহেন। গোপালই স্বয়ং দায়ী।

ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার অঙ্গে শীতল স্বেদবিন্দু দেখা দিতে লাগিল। তিনি অপগত-চেতন হইয়া মর্ম্মরহর্ম্ম্যতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। রাজার আদেশে অনুচরবৃন্দ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইল। তখন তিনি অস্ফুট-স্বরে বলিতে লাগিলেন "হে মহাপ্রভু, তুমি ধন্য; হে গোপাল, তোমার জয় হউক; মা আমার, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল!"

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দৃঢ়স্বরে বলিলেন "আমাকে তবে গৃহে যাইবার অনুমতি হউক।"

রাজা বলিলেন, "আপনি স্বাধীন, আপনার জন্য যান প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছি। কিন্তু একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, স্বপ্নে আমার প্রতি ভগবান যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা পালন করিবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি আপনার নিকট সেই অবসর ভিক্ষা করিতেছি। আমি রাজোচিত উৎসবে লক্ষ্মীদেবীকে গোপালের পার্শ্বে রাখিয়া আসিব, ইহাই আমার প্রতি আদেশ।"

যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের বিপরীত আকর্ষণে বৃদ্ধের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তিনি সমস্ত শক্তি দিয়া রাজাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন। তাহা না হইলে,তিনি ভূতলে পতিত হইতেন।

বিপুল সাজ-সজ্জা করিতে রাজার অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বৃদ্ধ পুরোহিত গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া রাজা তাঁহাকে সমাদরে পূর্ব্বেই রওনা করিয়া দিলেন। রাজা স্বয়ং অগণিত অনুচর সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে শোভা-যাত্রা করিলেন। সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে রাজা স্বয়ং আসীন হইলেন। তাঁহার পুরোভাগে বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত সুবর্ণ চতুর্দ্দোলা স্নানপূত বাহকগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইল, তাহার উপরিভাগে রৌপ্যদণ্ড-বিলগ্ন সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ আস্তৃত ছিল। বস্তুতঃ সেই বহুদূরবিস্তৃত শোভাযাত্রায় রাজপ্রাসাদের শ্রেষ্ঠ বিভব সকল আহরিত হইয়াছিল। আজ যে শ্রীরাধিকার বিবাহোৎসব!

প্রদোষে যখন গোপালের আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন সেই বিপুল রাজসনাথ শোভাযাত্রা মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। জনমণ্ডলী বাহিরের প্রাঙ্গণে অরুণস্তম্ভ বেষ্টিত করিয়া ও রাজপথে বহুদূর ব্যাপিয়া প্রকাণ্ড অজগরের ন্যায় রহিল। বাদকদল বাদ্যোদ্যমে সে পল্লীকে বধির করিয়া তুলিল। রাজা হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া পার্শ্বরক্ষিগণসহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সশস্ত্র প্রহরীরা জনতার প্রবাহ প্রতিহত করিয়া দ্বার দেশে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইল।

রাজা সাষ্টাঙ্গে দেবতার সম্মুখে প্রণত হইলেন। বেদী হইতে পুরোহিত নামিয়া আসিয়া রাজাকে চন্দন তুলসী ও নির্ম্মাল্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজা যখন মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "আপনি ধন্য, আপনার কুল পবিত্র হইল।"

পুরোহিত আনন্দে গদগদস্বরে বলিলেন "মহারাজ, মা আমার আজ পুলকে অধীরা হইয়াছেন। আজ সে সুন্দর মুখে স্বর্গের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কখনও দেখি নাই। মানুষের চক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, আমি আজ তাহাই দেখিয়াছি। মহারাজ, আমার ভব-বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে।" বৃদ্ধ আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বৃদ্ধপুরোহিতকে পুরোভাগে লইয়া, চতুর্দ্দোলা সঙ্গে করিয়া রাজা বকুল-কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজার ইঙ্গিতে জনসঙ্ঘ প্রতিরুদ্ধ হইল। বাদকদল কেবল অনুবর্ত্তী হইল।

রাসপূর্ণিমার রজনী। মেঘমুক্ত নীল গগনে শারদজ্যোৎস্না রজত বন্যা বহাইতেছে। বকুলকুঞ্জ কুসুমগন্ধে বিভোর। যেন আনন্দের এক মহাপ্লাবন দিগদিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। উল্লাসদৃপ্ত রাজার কর্ণে গৌরবের দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছিল। আর ভববন্ধনমুক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আত্মা যেন উল্লাসের গীত গাহিয়া গাহিয়া পিঞ্জরগাত্রে পথের অন্বেষণ করিতেছিল।

ব্রাহ্মণের আঙ্গিনা শুভ্র চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। চন্দন গুগ্‌গুল-ধূপ গন্ধে সে স্থানের পবন সুরভিত, পবিত্র, স্নিগ্ধ। ব্রাহ্মণ অতিথির সৎকার ভুলিয়া গেলেন, তিনি একেবারে তাঁহার কন্যার শয়ন-কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন কক্ষ শূন্য—দীপাধারে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণ ত্রস্তব্যস্ত ভাবে ডাকিলেন, "শ্রীমতী।"

তমাল-তল হইতে উত্তর আসিল "যাই, বাবা।"

ব্রাহ্মণ আবার ডাকিলেন "শীঘ্র এস, মা, রাজা তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। আজ যে তোমার বিবাহ।"

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "স্বয়ং গোপাল আমাকে লইতে আসিয়াছেন, বাবা যা—ই।"

ঠিক সেই সময় বিনা আদেশে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হইল। সানাইএর মধুর তান দিগ্‌দিগন্তে এই চিরপ্রেম-মিলন প্রচারিত করিল। অগুরু-

গন্ধে দেশ ভরিয়া গেল। জ্যোৎস্না শতগুণ উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। বকুলকুঞ্জের অপর দিক হইতে অসংখ্য কণ্ঠে যুগপৎ জয়ধ্বনি উঠিয়া গগনে মিশাইয়া গেল।

রাজা যুক্তকরে তমালতলে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, অপার্থিব রূপ-রাশি ধরার বক্ষ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। শ্রীমতীর প্রাণশূন্য দেহের উপর তমালপত্রের ছায়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া অপূর্ব্ব আস্তরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। তাহার বিস্রস্ত কৃষ্ণ কেশরাশিতে অজস্র শুভ্র কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে। আর তাহার অধরে চিরমধুর হাস্য মুদ্রিত হইয়া আছে। *

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

—ঃ—

কবি।

১

বিপুল ধরণীতল ব্যাপি' কত কোলাহল
কলরব দিবসযামিনী,
শুধু তা'র চিত্তমাঝে মোহিনী বীণায় বাজে
অবিচ্ছেদে মধুর রাগিণী,
ফিরে সে মলিন সাজে, তবুও হৃদয়ে রাজে
অপার্থিব সৌন্দর্য্যের ছবি।
সে যে এক কবি।

* সাক্ষিগোপালের আখ্যায়িকা অবলম্বনে এই গল্পটি লিখিত। যাঁহারা সাক্ষিগোপালের বিগ্রহ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, গোপালের রাধিকা উৎকল-রমণী। প্রবাদ এই যে, কৃষ্ণপ্রণয়িনী উৎকল-বাসিনীর দেহত্যাগের পর রাজা দৈববাণীর নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার অষ্ট-ধাতুনির্ম্মিত প্রতিকৃতি গোপালের বামে স্থাপিত করেন।

২

লোকালয়ে এক কোণে সে থাকে আপন মনে
উপেক্ষিত মানবসভায়।
ছুটে আসি' সমীরণ করে তা'রে আলিঙ্গন,
মেঘ আসি' মুখে তা'র চায়,
লতিকা সোহাগভরে নুয়ে পড়ে দেহপরে
ছড়াইয়া কুসুম সুরভি
সে যে এক কবি।

৩

কা'র এত লাগে ভাল ঊষার সোণার আলো
জননীর স্নেহের মতন ;
সূর্য্যাস্তের বর্ণস্তরে কে নিত্য সৃজন করে,
স্বপ্নময় বিচিত্র ভুবন।
শান্ত সন্ধ্যা বধূবেশে কাছে আসে ভালবেসে,
সখা তা'র শশি তারা রবি ;
সে যে এক কবি।

৪

হিংসা দ্বেষ কপটতা প্রাণে বড় দেয় ব্যথা
করুণায় আকুল অন্তর,
দুঃখে তা'র নাহি ভয় সে গাহে প্রেমের জয়,
প্রেমপরে অটল নির্ভর।
চাহে না ঐশ্বর্য্যপানে উচ্চপদ তুচ্ছ মানে,
ভাব-মুগ্ধ, দারিদ্র্য-গরবী
সে যে এক কবি।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ ও মহাভারতের কালনির্ণয় সম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সে সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিয়াছি।

প্রথম কথা, আমি লিখিয়াছিলাম, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। এস্থানে আমার একটু ভুল হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ বৎসর, ইহা মহাভারতেই লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবয়স্ক ছিলেন। অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্য অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট ছিলেন ইহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। পণ্ডিতপ্রবর সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমাকে এই ভুলটি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। দীননাথ জ্যোতিষী শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কোষ্ঠীবিচার করিয়া গণিতজ্যোতিষের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ খৃঃ পূঃ ৩১৮৫ অব্দে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে কলির আবির্ভাব হয়। সুতরাং ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন। ইহার বার অথবা চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং সে সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম সত্তর বাহাত্তর বৎসর হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরও শ্রীকৃষ্ণ কিছু দিন জীবিত ছিলেন।

দ্বিতীয় কথা, পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আমার প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমি আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছি। মনস্বী ত্রিবেদী মহাশয় খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে ও বৈদিক সাহিত্যে পূজ্যপাদ ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ জ্ঞান। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার মতের যথেষ্ট মূল্য আছে। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই—এখন বেদের ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৈদিক কালে সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বিষুবসংক্রমণ বা বৎসর আরম্ভ হইত। এখন গণনা করিলে দেখা যাইবে যে খৃঃ পূঃ আড়াই হাজার বৎসর বা তাহার কিছু পূর্ব্বে কৃত্তিকায়, বিষুবসংক্রমণ ঘটিত। কাযেই ঐ সময়কে আমরা বেদের ব্রাহ্মণ-যুগের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতে

পারি। বেদের মন্ত্রযুগ তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।" (আর্য্যাবর্ত্ত, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৫৩২ পৃষ্ঠা)

ত্রিবেদী মহাশয় এই প্রবন্ধে দুইটি কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ বৈদিক কালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবন ছিল। ঐ নক্ষত্রেই বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ধরা হইত। দ্বিতীয়তঃ বেদের মন্ত্রযুগ ও ব্রাহ্মণযুগ স্বতন্ত্র। মন্ত্রযুগের অবসানে বা শেষভাগে ব্রাহ্মণযুগ আরব্ধ হইয়াছে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, বৈদিক যুগে কি সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত? ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন, বেদের ব্রাহ্মণে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় তাঁহার প্রণীত Orion নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ মন্ত্রগুলি যখন দৃষ্ট হইয়াছিল, তখন পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সে আজ ৭ হাজার ৬ শত বর্ষের কথা। তাহার পর আর্দ্রা, মৃগশিরা, রোহিণী ও কৃত্তিকায় মহাবিষুব সংক্রান্তি হইয়াছে। অয়ন চলনের (precession of the Equinoxes) ফলে বিষুবন পরবর্ত্তী নক্ষত্রে সরিয়া গিয়াছে। যখন বিষুবন কৃত্তিকানক্ষত্রে সরিয়া গিয়াছিল, তখন যাজ্ঞিক ঋষিরা কৃত্তিকাকেই প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ও শতপথব্রাহ্মণে কৃত্তিকাই আদি নক্ষত্র বলিয়া গণিত। এখন উত্তরভাদ্রপদে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয়। সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিকাতে বিষুবন ছিল। সুতরাং বৈদিক যুগের পরিমাণ প্রায় তিন হাজার বৎসর।

মন্ত্রযুগ হইতে ব্রাহ্মণযুগের স্বাতন্ত্র্য কল্পনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। উহার কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ নাই। আমাদের বিশ্বাস কর্ম্মকাণ্ডসম্পর্কিত বেদের দুইটি ভাগ। একটির নাম সংহিতা; অপরটির নাম ব্রাহ্মণ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়াই কর্ম্মকাণ্ড। যজ্ঞই কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম ও প্রধান সাধন। সংহিতা ভাগে কেবল বৈদিক মন্ত্রগুলি আছে। উহা যজ্ঞেই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কি প্রণালীতে যজ্ঞ করিতে হইবে, কি ভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে, যজ্ঞের পদ্ধতি কি, যজ্ঞের উপকরণই বা কি, তাহা গদ্যে ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। যজ্ঞ করিতে হইলে উভয়েরই প্রয়োজন। একের অভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং অন্যটিও নিষ্ফল হয়। অতএব সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন যুগের হইতেই পারে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বৈদিক মন্ত্রগুলি প্রকৃতির অনন্ত-গৌরবস্তম্ভিত চাষার গান। গানগুলি যখন পুরাতন হইয়া আসিল, জনসাধারণ সেই লাঙ্গলধারী মূর্খ চাষাদের কথা ভুলিয়া গেল, তখন জনকয়েক বিট্‌লে বামুন জুটিয়া বেদী গড়িয়া, আগুণ জ্বালাইয়া, সেই মন্ত্রগুলি নানারূপ স্বরে উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ নামক ব্যাপারের সৃষ্টি করিল এবং সাধারণ লোকের মনে ভক্তির উদ্রেক করিয়া দক্ষিণা আদায় করিবার জন্য সেই যজ্ঞের জটিল পদ্ধতি ও প্রণালী এবং নানা উপকরণের তালিকা উদ্ভাবিত করিল। যে সময়ে এই ব্যাপার ঘটে তাহাই ব্রাহ্মণ-যুগ। সুতরাং সংহিতা প্রাচীন, ব্রাহ্মণ অর্ব্বাচীন। যাঁহারা সূর্য্য কোন্ নক্ষত্রে যাইলে মহাবিষুব সংক্রান্তি ঘটিবে, অয়ন-চলনের ফলে কতদিন পরে বিষুবন পরবর্ত্তী নক্ষত্রে সংক্রমিত হইবে, পৃথিবীর গতিপ্রভাবে দিবারাত্রি কিরূপে ঘটে, ইত্যাদি তথ্য আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে একদিন আচম্বিতে উদীয়মান সূর্য্য দেখিয়া অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্ত অন্ধের উহা দর্শনের ন্যায় বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছিলেন এবং 'ওঁ ভূ ভুঁব স্বঃ' বলিয়া ধেই ধেই নাচিয়া উঠিয়াছিলেন ইহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না। কিন্তু এরূপ একটা theory খাড়া না করিলেও বেদের ব্রাহ্মণভাগকে অর্ব্বাচীন বলা যায় না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিও এই থিওরীটাকে অনায়াসে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

যাহা হউক, যদি তর্কের অনুরোধেও স্বীকার করা যায় যে, ব্রাহ্মণযুগ স্বতন্ত্র ও পরবর্ত্তী, তাহা হইলেও ত্রিবেদী মহাশয় যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে বা তাহার কিছুকাল পূর্ব্বেই যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবাপি ঋগ্বেদসংহিতায় একটি সূক্তের ঋষি। যুধিষ্ঠিরের প্রপিতামহ শান্তনুর এক ভ্রাতার নাম ছিল দেবাপি। তিনি বাল্যকালেই বনে গমন করিয়াছিলেন, মহাভারতে এইটুকুই উক্ত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ২২শ অধ্যায়েই কেবল শান্তনুর রাজত্বকালে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টির ও দেবাপি কর্ত্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। মহাভারতে নাই। মহাভারতে বরং শান্তনুর রাজত্বকালে কোন-রূপ ঈতি ভয় ছিল না এইরূপই ইঙ্গিত আছে। ভাগবত মহাভারতের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ উত্তরকালে এই গ্রন্থে অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা দেবাপি

ও শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। আর যদি শান্তনুভ্রাতা দেবাপি ও ঐ ঋক্‌দ্রষ্টা দেবাপি এক ব্যক্তিই হয়েন, তাহা হইলে তিনি খৃঃ পূঃ ৫৬০০ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ২৫০০ পর্য্যন্ত এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই সপ্রমাণ হয়। খৃঃ পূঃ ৩২০০ অব্দে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এ কথা বলিলে কোনও দোষই হইতে পারে না। ঐরূপ বশিষ্ঠ * ও তাঁহার পুত্র শক্তি, ঋগ্বেদসংহিতায় বহু মন্ত্রের ঋষি হইলেও তাঁহারা যে তথাকথিত ব্রাহ্মণ যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয় না; বরং মন্ত্রযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহাই সপ্রমাণ হয়।

যে শতপথব্রাহ্মণে কৃত্তিকানক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাতের কথা আছে সেই শতপথ ব্রাহ্মণে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয় ভীমসেন, উগ্রসেন ও শ্রুতসেনের কথাও আছে। যে ভাবে তাঁহাদের কথা তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা তখন সকলেই ইহধাম হইতে বিদায় লইয়াছেন। সুতরাং যে শতপথ ব্রাহ্মণ খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে, তাহা অন্ততঃ যুধিষ্ঠিরের বৃদ্ধ প্রপৌত্রের আমলের, বরং তাহারও পরবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে পরীক্ষিত, জনমেজয়, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উহা যে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ইহা অনুমান করা যায় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যজ্ঞের প্রণালী প্রভৃতির নিয়মাদি ব্রাহ্মণে লিখিত আছে। যে সময় বিষুবন কৃত্তিকায় ছিল, সে সময়েই ঐ গ্রন্থে যজ্ঞসম্পাদনসৌকর্য্যার্থ স্থানে স্থানে ঐ নক্ষত্রের কথা লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল মন্ত্রের বিবৃতি ও যজ্ঞপদ্ধতি যে তাহার পূর্ব্বেও ছিল, ইহা নিশ্চয়। ইহার দ্বারা এইটুকুমাত্র সপ্রমাণ হয় যে, খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বেও ভারতে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। সেই জন্য ম্যাক্সমূলারও † বলিয়াছেন, "যাজ্ঞবল্ক্য বাজসেনেয় সংহিতা ও শতপথব্রাহ্মণের রচয়িতা নহেন।

---

* মহাভারতাদিগ্রন্থে একাধিক বশিষ্ঠের উল্লেখ দেখা যায়। একজন ব্রহ্মার মানসপুত্র, আর একজন বরুণনন্দন। ইহা ভিন্ন অন্য বশিষ্ঠেরও কথা আছে।

† History of Ancient Sanscrit Literature.

তিনি প্রাচীন মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলিকে বর্ত্তমান আকারে সংগৃহীত করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" সুতরাং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলিকে সংগ্রহ ও বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিবার সময় তিনি উহা তৎকালের উপযুক্ত করিবার জন্যই উহাতে রোহিণী বা মৃগশিরার স্থানে কৃত্তিকা বসাইয়াছিলেন, তাহা মনে করাই সঙ্গত।

আমার শেষ কথা, সমস্ত ইতিহাসে ও পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পরই কলির আবির্ভাব হইয়াছিল, এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত আছে। যে বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে পরীক্ষিতের জন্মসময় হইতে নন্দের অভিষেককাল সহস্র বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক কাল ব্যবহিত বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতেও বহু স্থানে স্পষ্টই লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনই কলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উক্ত। সে মত পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত কোনও হেতু দেখা যায় না। সুতরাং দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালেই যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব হইয়াছিল আমি এই মতই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্রতিভা।

(১)

মেঘ বুঝি বিজলীরে চাহে বক্ষে আবদ্ধ রাখিতে,
সৌদামিনী না মানে বারণ ;—
আলোকে উজলি' ধরা, জ্যোতির্ম্ময়ী আপনা' প্রকাশে,
ঘন-বক্ষ করি বিদারণ।

(২)

মানব প্রতিভাশালী চাহিলেও লুকাতে আপনা,
প্রতিভা সে বাধা নাহি মানে ;—
মস্তিষ্ক ত্যজিয়া তা'র বাহিরিয়া উদ্ভাসে অবনী
সুবিমল জ্ঞানালোকদানে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

অদৃষ্টচক্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

সরোজাকে সঙ্গে লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা গৃহে ফিরিলেন। গৃহখানি নাতিবৃহৎ—সুসংস্কৃত। গৃহের তিনদিকে ফলতরুর বাহুল্যে গৃহে আলোকের গমনপথ বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়াছে। গৃহের কতক অংশ দ্বিতল—কতক অংশ একতল। গৃহের পশ্চাৎভাগে রন্ধনগৃহ, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি। সে অংশ একতল। সেই দিকে গৃহের "খিড়কীদ্বার" ও "খিড়কীর বাগান"। সেই বাগানে একটি সরোবর। যুবতী গৃহে ফিরিয়া সরোবরে গাত্রধৌত করিবেন, স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া যখন পুনরায় উদ্যানে আসিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন হারার মা—দাসী তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ওকি, দিদিমণি! ঘাটে গিয়াছিলে কাপড় ভিজে নাই!"

হারার মা'র কণ্ঠস্বর কখন মৃদু হইত না; সে যখনই কথা বলিত, তখনই পাড়া জানাইয়া বলিত। সে বিষয়ে কেহ কিছু বলিলে সে আরও উচ্চ স্বরে বলিত, "বলি, আমি কি কাহারও ধার করিয়া খাইয়াছি যে, চোরের মত কথা কহিব?" আজ বিরজার প্রতি তাহার প্রশ্নে ভাণ্ডার ঘর হইতে ও অন্যান্য কক্ষ হইতে বিরজার পিতৃব্যপত্নী ও তিন ভ্রাতৃবধূ আসিয়া রোয়াকে উপনীত হইলেন। প্রথমেই পিতৃব্যপত্নী প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, বিরজা?"

যুবতী বলিলেন, "বাগানের পুষ্করিণীতে যাইতেছি।"

যুবতীর উত্তর শেষ হইতে না হইতে তিনি বিপুল দেহভার লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদিন হইতে তিনি বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। স্বামীর দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার সময় রোগের সূত্রপাত। এখন রোগ আরও বাড়িয়াছে। সময় সময় রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না, আবার সময় সময় রোগিণীর বুদ্ধির বিকার দেখা যায়। এই সময় সেইরূপ বিকার দেখা যাইতেছিল।

কাকীমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে বধূরা ননন্দাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "কি ঠাকুরঝি, বরের কথা ভাবিতে ভাবিতে কি জলে নামিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে?"

মধ্যমা বলিলেন, "তাহাতে আর বিস্ময় কি আছে? ঠাকুর জামাই তিন মাস এদিকে আইসেন নাই; ঠাকুরঝিকেও পরীক্ষা শেষ না হইলে লইয়া যাইবেন না। আর কেহ কি পরীক্ষা দেয় না?"

যুবতী বলিলেন, "মেজ বৌদিদি, তোমার যে মাস দিন সব মুখস্থ দেখিতেছি। তিথি নক্ষত্র ঠিক আছে ত?"

মধ্যমা উত্তর করিলেন, "তিথির জন্য ভাবনা কি? ঠাকুর জামাই যে দিন আসিবেন, সেই দিনই ত তোমার পূর্ণিমা। চন্দ্রের উদয় না হইলে ত কেবলই অমাবস্যা। কি হইয়াছে, ঠাকুরঝি?"

যুবতী বলিলেন, "এখন তোমরা—অমাবস্যার চাঁদরা একটু অপেক্ষা কর—আমি আসিয়া সব বলিতেছি।"

তৃতীয়া এতক্ষণ কিছু বলে নাই, সে বলিল,—'ঠাকুরঝি, তুমি শুষ্ক বস্ত্রে ঘাট হইতে ফিরিলে, ব্যাপারটা কি?"

যুবতী বলিলেন, "তোমাদের আর বিলম্ব সহিবে না, তবে শুন।"—যুবতী ঘাটের ঘটনা বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া প্রথমা বলিলেন, "কি লজ্জা!"

দ্বিতীয়া বলিলেন, "তাহারা কি ভদ্রলোক?"

যুবতী বলিলেন, 'এখন ত ধোপ কাপড় হইলেই ভদ্রলোক। আবার তাহাদের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা বড় সে দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিতেছিল—সেই, সেবার কলিকাতায় থিয়েটারে কয়জন যুবককে যেমন যন্ত্র দিয়া দেখিতে দেখিয়াছিলাম।"

প্রথমা দশনে ঈষৎ প্রসারিত জিহ্বা দংশন করিলেন।

যুবতী বলিলেন, "এখন আমাকে ছুটি দাও; আমি পুষ্করিণীতে যাই।"

দ্বিতীয়া বলিলেন, "তুমি যাও। আমিও যাইতেছি। বেলা গেল—বাবার খাবার সাজাইতে হইবে।"

যুবতী চলিয়া যাইলেন।

সেই সময় একজন যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া বোধ হয়, যুবক কিছু পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু, জুতায় ধূলি। তাহাকে দেখিয়া প্রথমার ও দ্বিতীয়ার মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। তাহার পর প্রথমা তৃতীয়াকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে, ঠাকুরপো, তোমার সাত রাজার ধন—এক মাণিক।"

যুবক ও তৃতীয়া উভয়েই কিছু লজ্জা বোধ করিল।

তৃতীয়ার কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল; সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। যুবক বিদ্রূপবাণে বিদ্রূপবাণ ব্যর্থ করিবার প্রয়াসে বলিল, "তোমাদের অধিকারে আসিলে আর নিস্তার নাই। স্বয়ং অর্জ্জুন যখন নারীরাজ্যে আসিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, তখন অন্যের কথা ত ছার।"

প্রথমা বলিলেন, "আচ্ছা, ঠাকুরপো, সত্য সত্য বল দেখি—সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এ কয়দিন তুমি কেমন করিয়া কলিকাতায় থাক? শনিবারে না হয় দড়ি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া আস।"

যুবক বলিল, "আমিই দড়ি ছিঁড়ি বটে; দাদারা সব ভাল মানুষ! মেজদাদা ত আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই আসিয়াছেন। বড়দাদাও বোধ হয় সন্ধ্যার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

যুবক চলিয়া গেল।

তৃতীয়াও কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পর প্রথমা ও দ্বিতীয়া পুষ্করিণীতে চলিলেন। পথে প্রথমা দ্বিতীয়াকে বলিলেন, "যাহাই বল, ভাই, সেজ ঠাকুরপোর মত বেহায়া আর দ্বিতীয় নাই। বাড়ী আসিয়াছ; কাপড় ছাড়া নাই, মুখে জল দেওয়া নাই—ছুটিয়া স্ত্রীকে দেখিতে আসিয়াছ! আমাদের না হয় লজ্জা না করিলে,—কাকীমা, পাগল হউন আর যাহাই হউন, তিনি ত রহিয়াছেন। সুন্দরী স্ত্রী কি আর কাহারও হয় না?"

দ্বিতীয়া বলিলেন, "যাহাই বল, ভাই সেজ বৌয়ের খুব জোর কপাল।"

"লোকে যাহাতে নিন্দা করে, সে কপালে লাভ?"

"লাভ যাহার তাহার। লোকের কথায় তাহার কি আইসে যায়?"

"লোকের কথার জন্যই সব।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে উভয়ে পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। যুবতী তখন আকর্ণ জলমগ্না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, বড় বৌদিদি, কাহার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছ?"

বড় বৌ বলিলেন, "তোমারই ভ্রাতার গুণের কথা বলিতেছি।"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ভ্রাতার—জ্যেষ্ঠের না মধ্যমের?"

"যাহাদের তিন কাল যাইয়া এক কালে ঠেকিয়াছে, তাহাদের কথা কেই বা বলে, আর কেই বা শুনে? এখন যাহারা নিত্য নূতন দেখাইতেছে, তাহাদের কথাই বলিতেছি।"

"কে নিত্য নূতন দেখাইতেছে?"

"কেন, তোমার সেজদাদা।"

"সেজদাদা আসিয়াছে ?"

"তোমার সেজ বৌদিদির আঁচল খুঁজিয়া দেখ। সপ্তাহ পরে বাড়ী আসিলেন; কাহারও সঙ্গে দুইটা কথা বলা নাই, মুখে হস্তে জল দিবার বিলম্বও সহে নাই, একেবারে গৃহিণীর কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত! এমন ত কখনও দেখি নাই!"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "যাহা দেখ নাই, তাহা কি কখন দেখিবে না। জানইত, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।"

প্রথমা বলিলেন, "তোমরা অনেকই দেখাইলে, অনেকই শিখাইলে।"

"তোমাকে শিখাই এমন সাধ্য কি আমাদের আছে? বরং তুমিই আমাদের কত শিখাইতে পার।"

"তোমার শিখাইবার লোকের অভাব কি? তবে ঠাকুর জামাই পড়া লইয়া কিছু অতিরিক্ত ব্যস্ত। তা, ঠাকুরঝি সবুরে মেওয়া ফলে।"

"সেজদাদা একটু 'বৌ পাগলা' বটে।"

"একটু! আপনার ভাই বলিয়া কি রাত্রিকে দিন করা চলে?"

"ও সব থাকিবে না।"

"তাহা কি বলা যায়? মুড়কীর রস মরে বটে, কিন্তু আবার মোয়াও ত পাকায়! আর একটা কথা বলি, ঠাকুরঝি, তোমার ও ভাইটির লিখাপড়া কিছুই হইবে না।"

"কেন?"

"সেজ ঠাকুরপো যে কয়দিন কলিকাতায় থাকে, সে কয়দিন উহার মন সেজবৌএর খাটের খুরায় বাঁধা থাকে। ঠাকুরপো বইএর পাতায় বৌএর ছবি দেখে। বরং এবার সেজবৌকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা কর।"

এই সময় একটি সপ্তম বা অষ্টমবর্ষ বয়স্কা বালিকা ঘাটে আসিল, যুবতীকে বলিল, "দিদি বড়দাদা আসিয়াছেন—আর তাঁহার সঙ্গে মেজ-জামাই বাবু।"

মধ্যমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য?"

বালিকা বলিল, "হাঁ।"

তখন প্রথমা একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া ননন্দাকে বলিলেন "চল, ঠাকুরঝি, বাড়ী যাই—

'সইলো—সই
তোমার মদনমোহন এল অই।'

কি ভাগ্য যে, ঠাকুরজামাই আসিয়াছেন!"

মধ্যমা বলিলেন, "চল, দিদি, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

তখন সূর্য্য পশ্চিম দিকচক্রবালসমীপস্থ। দিনান্তের লোহিতাভ কিরণ উদ্যানের বৃক্ষচূড়ায় পড়িয়াছে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘে নানা বর্ণের বিকাশ। সরোবরতীরে বিকশিত কুসুমসৌরভে সুরভিত কেতকীকুঞ্জে ডাহুক ডাকিয়া সন্ধ্যার সূচনা সূচিত করিতেছে।

সকলে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেন। পবনে কেতকী কুসুমের সৌরভ। মধ্যমা প্রথমাকে বলিলেন, "দিদি, কেতকীফুল ফুটিয়াছে। এই সময় খদিরে মিশাইয়া লইলে হয়। ঠাকুর বড় ভালবাসেন।"

বড় বৌ বলিলেন, "ভালকথা মনে করিয়াছ। গতবৎসর কলিকাতা হইতে ফুল আনাইতে হইয়াছিল। চল, বাড়ী যাইয়া শিবুকে পাঠাইয়া দিব—তুলিয়া লইয়া যাইবে।"

সকলে গৃহাভিমুখগামী হইলেন। পথে বড় বৌ ননন্দাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "চল ঠাকুরঝি, দ্রুত চল। মন চলে ত চরণ চলে না।"

যুবতী বলিলেন, "কেন বড় বৌদিদি, একা কি আমারই দ্রুত যাইবার কথা? তোমার গতিওত বড় মন্থর দেখিতেছি না।"

"আজ ঠাকুরঝির মুখ ফুটিয়াছে।'

"কেন—ইটটি মারিবে আর পাটকেলটি সহিবে না? এ কেমন বিচার?"

সকলে গৃহে উপনীত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জামাতা।

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে জামাতার আগমন সত্য সত্যই কিছু অসাধারণ ঘটনা। কারণ, জামাতা ব্রজেন্দ্র প্রায়ই শ্বশুরালয়ে আসিত না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও জামাতাকে আনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না,। তাঁহার পত্নী জীবিতা থাকিতে তিনি সময় সময় পতির ও বৈবাহিকার মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, "তোমাদের সবই সৃষ্টিছাড়া। মেয়েও

শ্বশুরবাড়ী যাইবে না, জামাতাও শ্বশুরালয়ে আসিবে না। কেন আর কাহারও ছেলে কি জামাতা কি লিখাপড়া করে না?” দুইবৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আর সেই সময় হইতে ব্রজেন্দ্রের শ্বশুরালয়ে আগমন আরও বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে কাব্য ও স্মৃতি অধ্যয়নের পর পিতার মৃত্যুতে কুলক্রিয়ায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পিতা বহু ধনী পরিবারের কুলগুরু ছিলেন। তিনি সেই কার্য্যে ব্রতী হয়েন। সে আজ বিংশ বর্ষের কথা। তথন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়স ত্রিশ বৎসরমাত্র। তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা তথন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন শিষ্যের চেষ্টায় তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কিন্তু পর পর কয়টি অস্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া ও শরীরের প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েন ও দীর্ঘ সপ্তবর্ষকাল জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর জীবদ্দশায়—পীড়ার সময় হইতে তাঁহার পত্নীর বায়ুরোগের সূচনা হয়। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র রাধাচরণ কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। পুষ্করিণীতে যুবতীরা তাহারই স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। কন্যা শৈলজা স্বামীর ঘর করিতেছে; মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আসিয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রকন্যাদিগের অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অধিক স্নেহ করেন। ইহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু অসন্তুষ্ট। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় থাকেন।

পুত্রদিগের জন্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় একটি বাসা রাখিয়াছেন। তথায় তাঁহার বিধবা ভগিনীর কর্ত্তৃত্ব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও প্রায়ই কলিকাতায় যাইতে হয়; কারণ, তাঁহার অধিকাংশ শিষ্যের বাস কলিকাতায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় একখানি দোকান খুলিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহু ধনী শিষ্যের কৃপায় দোকান ভালই চলিতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বামাচরণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না; ভয়—পাছে তাঁহাকে সংসারে কিছু দিতে হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে বিরক্তি প্রকাশ করেন না। বামাচরণের উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহারই থাকিতেছে। বামাচরণের ব্যবহারে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে মনে ব্যথিত। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে।

তিনি তাহার জন্য গোপনে আবশ্যক ব্যবস্থাও করিয়াছেন। মধ্যম পুত্র পার্ব্বতী-চরণ সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর এখন পিতার কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। কনিষ্ঠ দেবীচরণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাধাচরণ অধ্যয়ন করি-তেছে। পুত্রবধূদিগের মধ্যে মধ্যমা বাড়ীতেই অবস্থান করেন। জ্যেষ্ঠা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাচরণ পিতামহের অত্যন্ত আদরের, পিতামহ তাহাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারেন না। সেই জন্য তাঁহাকে সময় সময় বাড়ীতেও থাকিতে হয়। মধ্যমার সন্তান জন্মে নাই। দুই বৎসর হইল রাধাচরণের বিবাহ হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধিক বয়সে বিবাহের বিরোধী। তিনি দেবীচরণেরও বিবাহ দিবেন, স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কন্যা সরোজার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে করিতে কন্যা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার বিবাহের জন্য কিছু ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, অগ্রহায়ণ মাসে কন্যার বিবাহ দিবেন; তাহার পর মাঘ বা ফাল্গুন মাসে দেবীচরণেরও বিবাহ দিবেন। এখন পাত্রপাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। ভ্রাতুষ্পুত্রী শৈলজা ও পুত্রী বিরজা উভয়েরই বিবাহে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক পাত্র বাছিয়াছিলেন। শৈলজার স্বামী মথুরা-নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন শিষ্যের সুপারিসে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। বিরজার স্বামী ব্রজেন্দ্র প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এম. এ. পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এবার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভের জন্য পরীক্ষা দিবে। ব্রজেন্দ্রের পিতা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাল্যবন্ধু ছিলেন। দুই পরিবারে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্য উভয়েই লালায়িত ছিলেন। স্থির ছিল ব্রজেন্দ্রের সহিত বিরজার বিবাহ হইবে। কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার মৃত্যুতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সে পরিবারের ঘনিষ্ঠতা যেন আরও বর্দ্ধিত হইল; তিনি সর্ব্বদাই বন্ধুপুত্রের ও বন্ধুপত্নীর সংবাদ লইতেন। ব্রজেন্দ্রের জননীও বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহারই পরামর্শ লইতেন। বন্ধুর মৃত্যুর পর কিছুদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন না, পাছে এমন সন্দেহের অবকাশ হয় যে, তিনি ব্রজেন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহের চেষ্টাতেই বন্ধুপরিবারের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। বিরজা একাদশ হইতে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্য

পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন কথায় কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রজেন্দ্রের জননীকে বলিলেন, তিনি বিরজার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন; কন্যা বড় হইয়াছে, আর বিলম্ব করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। শুনিয়া ব্রজেন্দ্রের জননী বলিলেন, "কর্ত্তার বড় ইচ্ছা ছিল, বিরজাকে পুত্রবধূ করেন। আমার অদৃষ্ট মন্দ। আমি আর সে কথা কেমন করিয়া বলিব?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, 'আমি সেই আশায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আর তাহা বলিতে সাহস করি নাই। আজ আপনি সে কথা তুলিয়াছেন, তাই আমি আবার সেই প্রস্তাব করিতে সাহস করিতেছি। আমরা দুইজন বহুদিন হইতেই এ সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলাম।" বন্ধুর কথা স্মরণ করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। ব্রজেন্দ্রের সহিত বিরজার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র এ কথা শুনিল। পিতামাতার কথার প্রতিবাদ করা ব্রজেন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সে কেবল বলিল, "মা, তুমি এখন এ ব্যবস্থা করিলে কেন?"

মা বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত হিতার্থী আমাদের আর নাই। এ বিবাহ হইলে তিনি তোমার ইষ্ট চেষ্টা করিবেন। আমি নিশ্চিন্ত হইব।"

"মা, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথার্থই আমাদের হিতার্থী। তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের মঙ্গল সাধন করেন ও করিবেন।"

"কর্ত্তা বহুদিন পূর্ব্বে এ বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমিই উদ্যোগী হইয়া এ কথা বলিয়াছি।"

ব্রজেন্দ্র আর কোন আপত্তি করিল না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহে তোর আপত্তি কেন?"

ব্রজেন্দ্র বলিল, "আমার ইচ্ছা ছিল, পাঠ শেষ করিয়া তবে সংসারে প্রবেশ করিব।"

"বাবা, ভগবান যে ইহারই মধ্যে তোর স্কন্ধে সংসারের ভার দিয়াছেন! যত দিন তোর পাঠ শেষ না হয়, আমি বধূকে আনিব না।"

ব্রজেন্দ্র আর কিছু বলিল না; বরং মনে করিল, যাহাতে পিতার ইচ্ছা ছিল, মাতার আগ্রহ আছে—তাহাতে আপত্তি জানাইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

শুভ দিনে বিরজার সহিত ব্রজেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহে ব্রজেন্দ্রের জননীও যেমন সুখী হইলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তেমনই সুখী হইলেন।

বিবাহের প্রস্তাবকালে বধূকে আনিবার সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রের জননী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই; চার বৎসরে বিরজা মধ্যে মধ্যে পতি গৃহে গিয়াছে,—ব্রজেন্দ্রও কয়বার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে।

তবে দুই-হ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে—অল্প দিনের জন্য। এখন পতি পত্নী—যুবক যুবতী। ইহার হৃদয় স্বতঃই উহার জন্য ব্যাকুল হইত। বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইবার বাসনা যৌবনে স্বাভাবিক; যৌবনে হৃদয় যখন প্রেমপুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে—আপনার প্রেম দিবার জন্য ও অপরের প্রেম পাইবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন—সেই অনাবিল সুখের সময় বাঞ্ছিতকে বক্ষে রাখিয়াও তৃপ্তি হয় না—যেন তবুও ব্যবধান রহিল—মনে হয়। যৌবনে—স্বার্থের আবর্জ্জনায় হৃদয় কলুষিত হইবার পূর্ব্বে—বিষয়বুদ্ধি প্রবল হইবার পূর্ব্বে প্রেমতৃষ্ণা যেমন প্রবল থাকে, প্রেমপুলক উপভোগ করিবার শক্তিও তেমনই প্রবল থাকে। তখন হৃদয় প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেয়। যে যৌবনে প্রেমপুলকে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিল না, সে দুর্ভাগা। এই যৌবনে ব্রজেন্দ্রের ও বিরজার হৃদয় স্বভাবতঃই পরস্পরকে নিকটে চাহিত। ব্রজেন্দ্র সে বাসনা সংযত করিত; সে ভাবিত, অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রেমসুখে হৃদয় পূর্ণ ও প্রফুল্ল করিবে। সে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকের আশায় দ্বাদশীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীর সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ হইতে স্বেচ্ছায় আপনাকে বঞ্চিত করিত। বিরজার সেরূপ আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না; তাই সে মধ্যে মধ্যে স্বামীর উপর অভিমান করিত। কিন্তু তাহার সে অভিমান স্থায়ী হইত না। সে যখন সকলের মুখে, বিশেষ তাহার পিতার মুখে, স্বামীর অধ্যয়ন-স্পৃহার প্রশংসা শুনিত—তখন সেই প্রশংসার রবিকরে তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত অভিমানের তুষাররাশি বিগলিত হইয়া যাইত—আনন্দে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। বিশেষ স্বামীর সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ হইত তখন তাহার পিপাসিত দৃষ্টি স্বামীকে দেখিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না। সে মুগ্ধ নেত্রে স্বামীকে দেখিত—স্বামীকে সর্ব্ব সুখের নিলয় বলিয়া মনে করিত; তাহার অভিমান কোথায় মিলাইয়া যাইত।

আজ প্রায় তিন মাস পরে বিরজার সহিত ব্রজেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। আজও বিরজার হৃদয়ের এক কোণে—সূর্য্যকরোজ্জ্বল শারদঅম্বরের দূর পার্শ্বে স্বচ্ছ—শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় একটু অভিমান লাগিয়া ছিল। সে অভিমান তাহার মুখে ও নয়নে সপ্রকাশ আনন্দকিরণ নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহা

ব্রজেন্দ্রের প্রেমতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতেও পারে নাই। বিরজাকে দেখিয়াই ব্রজেন্দ্র বলিল, "বিরজা, আমার পরীক্ষার আর ছয় মাসমাত্র বিলম্ব আছে।"

বিরজা বুঝিল, যে মিলনতৃষ্ণা তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল—তাহা স্বামীর হৃদয়ও জুড়িয়া রহিয়াছে। রবিকরে কুজ্‌ঝটিকার মত তাহার অভিমান দূর হইয়া গেল—মিলনানন্দে যুবতী-হৃদয়পূর্ণ হইয়া গেল।

তাহার পর স্বামীস্ত্রীতে কত কথা হইতে লাগিল। প্রায় তিন মাস পরে স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ। মিলনব্যাকুল যুবকযুবতীর কথা কি ফুরায়? যখন কথা কহিতেই আনন্দ—কথা কহাইতেই আনন্দ, তখন কথা প্রত্যক্ষআগতপ্রায় আপনি আইসে। তখন কথার স্রোতে ভরা জুয়ার, তাহাতে ভাঁটা পড়ে না। যখন নিমেষালসপক্ষ্ম-পংক্তি পত্নী পতির মুখে চাহিয়া আর সব ভুলিয়া যায়েন,—যখন পতির পিপাসিত নয়ন প্রিয়ার আননে সর্ব্বসুষমাসমন্বয় দেখিয়া বিপুল পুলকে আকুল হইয়া উঠেন, তখন দীর্ঘযামা যামিনী যেন ক্ষণমাত্রে অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু যখন মিলনে কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যখন নয়নের তৃষ্ণা মিটিয়া যায় তখন জানিবে প্রেমের পূর্ণ প্রবাহ মন্দীভূতবেগ হইয়াছে, সুখলতা এ জীবনে আর সুমনস-সুষমায় শোভাময়ী হইবে না। তখন জীবন মৃত্যুর নামান্তরমাত্র।

বিরজা ও ব্রজেন্দ্র কত কথা কহিতে লাগিল, উভয়ে সেই কথায়—মিলনা-নন্দে এমনই তন্ময় যে বাতায়নপার্শ্বে তাহাদের প্রেমালাপশ্রবণলোলুপা প্রথমা ও দ্বিতীয়া বধূর অলঙ্কার শিঞ্জিত বা মৃদুস্বরে কথোপকথন কাহারও কর্ণগোচর হইল না।

কথায় কথায় ব্রজেন্দ্র বলিল, "মা আজ কাল আমার উপর প্রায়ই রাগ করেন।"

বিরজা বিস্মিতা হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" সে তাহার শ্বাশুড়ীকে যাহা জানিত তাহাতে তাঁহার পক্ষে পুত্রের উপর ক্রদ্ধ হওয়া সে অসম্ভব বলিয়াই বিবেচনা করিত।

ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তোমাকে লইয়া যাইতে পারিতেছেন না বলিয়া।"

বিরজার মনে হইল বলে, "সে দোষ কাহার?" কিন্তু সে কথা বলিতে তাহার লজ্জা হইল। সে নীরব রহিল।

ব্রজেন্দ্র বলিল, "মা বলেন, 'আমি আর কত দিন একাকী থাকিব?' আমি যদি উত্তরে বলি, 'মা এত দিন ত আমাকে লইয়া সন্তুষ্ট ছিলে'—

তবে মা বলেন, 'এতদিন আমার একটি ভিন্ন সন্তান ছিল না—এখন যে দুইটি।'

বিরজা যখনই স্বামিগৃহে গিয়াছে, তখনই শাশুড়ীর যে যত্নের ও স্নেহের পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে সে আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছে। আজ এই কথায় তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সে তাহার স্বামি-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিল, শাশুড়ীর স্নেহের কথা মনে করিল;—তাহার মনে হইল, তাহার মত সৌভাগ্য কয় জনের আছে? তাহার পক্ষে জগৎ মধুময়। মানুষের মনের এই দুর্ল্লভ অবস্থা যদি স্থায়ী হইত, তবে সংসার সত্য সত্যই নন্দনে পরিণত হইত।

এদিকে স্বামিস্ত্রীর মৃদুস্বরে পরিচালিত কথোপকথন শ্রবণের আশায় হতাশ হইয়া বধূদ্বয় যে যাহার কক্ষে চলিলেন। মধ্যমা জ্যেষ্ঠাকে বলিলেন, "দিদি তোমার চুড়ীর শব্দ শুনিয়াই ঠাকুরঝি সাবধান হইয়াছিল।" জ্যেষ্ঠা বলিলেন,—"কখনই নহে। ঠাকুরঝি কি কম চালাক! ঠাকুরঝি সন্দেহ করিয়াছিল, আমরা 'আড়ি পাতিব', ঠাকুর জামাইও কম নহেন; দেখিতে ভাল মানুষটি, যেন ভাজা মাছটি উল্‌টাইয়া খাইতে জানেন না। ও যেমন হাঁড়ি তেমনই সরা।"

——:——

ঊর্ম্মিলা।

এঁকেছিলা দক্ষ শিল্পী তব চিত্রখানি
কোন্ উপাদান দিয়া কেমনে না জানি!
ভূতলে অপূর্ব্ব সৃষ্টি! মৌন ভাষা তব
মণ্ডিত করিয়া, দেবি, সুষমায় নব
করিয়াছে বিকশিত হৃদয় তোমার
অমল কমল সম। সৌরভে তাহার
বিমুগ্ধ জগৎবাসী। তব প্রেম-স্নেহ
ফল্গুর স্রোতের মত; দেখে নাই কেহ
সে নির্ম্মল তটিনীতে উচ্ছ্বাস উদ্দাম।
বীরশ্রেষ্ঠ পতি তব ত্যাগ মূর্ত্তিমান,
তুমি বুঝি মূর্ত্তিমতী তাঁহার মহিমা,
বুঝি তা'র কমনীয় স্নিগ্ধ মধুরিমা।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সার জন সোর লিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ নাচ, অশ্বারোহণ ও শীকার লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। আফিসের নকল প্রভৃতি কার্য্যাদি প্রায়ই ভারতবর্ষীয় কেরাণীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। মোটামাহিনার ইংরাজ কর্ম্মচারীরা প্রায় নাম সহি করিয়া খালাস হইতেন।

সেকালে ভারতীয় ইংরাজ সমাজে জুয়াখেলার যথেষ্ট চলন ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ইহার দমন করেন। ঘোড়দৌড় তখনও প্রচলন ছিল এবং ধনীরা ও সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাতে যোগ দিতেন। প্রথমে চৌরঙ্গীসংলগ্ন ধান্যক্ষেত্রে ও পরে মুচীখোলার নিকটস্থ আখড়ায় ঘোড়দৌড় হইত।

সে কালে ভারতপ্রবাসী ইংরাজগণ ফরসীতে ধূমপান করিতেন। ভোজের পর অম্বুরী তামাকের ধূমে গল্পগুজব জমাট বাঁধিত। বড় বড় ভোজে নিমন্ত্রিতগণের হুকাবরদারগণ তাঁহাদিগের হুকা লইয়া যাইত। তখন ইংরাজগণ বাইনাচের আসরে বসিতেন ও হোলিখেলায় যোগ দিতেন। এখন ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীরাও এসব আমোদে যোগ দিতে লজ্জা বোধ করেন! ব্যারিষ্টার মণ্টি ও সেদিনও হাইকোর্টের খাসকামরায় হুকায় তামাক টানিতেন।

সেকালে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন অতি সামান্য ছিল। সারজন সোর (পরে লর্ড টেনমাউথ) যখন প্রথম কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তখন তাঁহার মাসিক বেতন ৮৲ টাকা! পরে যখন তাঁহার বেতন বর্দ্ধিত হইয়া ৯৬ টাকা হয়, তখন তিনি মাসিক ১২৫৲ টাকা বাড়ীভাড়া দিতেন! মাদ্রাজের গবর্ণর সার টমাস মনরো লিখিয়াছেন, প্রথমে তাঁহার মাসিক বেতন সরকারী বাসা লইলে ৫ প্যাগোডা ও সে বাসা না লইলে ১০ প্যাগোডা ছিল। এখনকার হিসাবে ১ প্যাগোডা প্রায় ৩।৷০ টাকা। এই ৫ প্যাগোডার মধ্যে তিনি দোভাষীকে ২টি ও বাসার ভৃত্যকে ১টি দিতেন। ধোপানাপিতের ব্যয়ে ১টি যাইত। অবশিষ্ট ১টিতে আহার্য্য হইতে বেশ পর্য্যন্ত সব চালাইতে হইত! তবে মনরোর অতিরঞ্জনপ্রিয়তা প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহার কথায় ছুট বাদ দিতে হয়। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, ভারতে আসিবার পূর্ব্বে ক্ষুধা তৃষ্ণা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না; ভারতে প্রথম তিন বৎসর মাথায় বালিস দিতে

পারেন নাই, একখানি পুস্তক বা টোটার থলি মাথায় দিয়া কাটাইয়াছেন; কয়েক খানি চটার উপর চট বিছাইয়া শয্যা করিতে হইয়াছিল, শীতে গাত্রে দিবার কিছু না থাকায় বড় কোটের হাতায় পা দিয়া কাটাইয়াছিলেন; পা ঢাকিতে মাথায় কুলাইত না—মাথা ঢাকিতে পায় কুলাইত না; বহুকষ্টে একটি ওয়েষ্টকোট পাইয়া তাহা পরিবার জন্য কোট খুলিতে কোটের হাতা প্রায় খসিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য কর্ম্মচারীদিগকে ব্যবসা করিয়া আবশ্যক ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে হইত।

কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশ ছিল, কর্ম্মচারীরা বিদেশী বা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমতাবলম্বী মহিলার সহিত বিবাহে বদ্ধ হইতে পারিবেন না। কিন্তু এ আদেশ পালিত হইত কি না সন্দেহ। ওয়ারেন হেষ্টিংস দ্বিতীয় পক্ষে একজন জর্ম্মাণ মহিলাকে ও গ্র্যাণ্ড চন্দননগরনিবাসী একজন ফরাসীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই গ্র্যাণ্ডপত্নীকে বিপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিয়া ফিলিপ ফ্রান্সিস জরিমানা দেন। এই মাদাম গ্র্যাণ্ডই পরিত্যক্তা হইয়া প্রসিদ্ধ ফরাসী রাজনৈতিক তালেরাণ্ডের প্রণয়িণী ও পরে পত্নী হয়েন।

সেকালে নিম্নপদস্থ স্বল্প বেতনভোগী ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের ব্যয়বাহুল্য নিবারণোদ্দেশে আদেশ হয় যে, তাঁহারা ছাতাবরদার বা পাল্কী রাখিতে পারিবেন না। ছাতা গোলাকার বলিয়া তখন ছাতার নাম Roundel ও ছাতা-বরদারের নাম Roundol Boy ছিল। একজন কর্ম্মচারী চতুষ্কোণ ছাতা প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন—বলিলেন—তাহা Roundel নহে Square-del, তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। তখন জরী দেওয়া পোশাক ব্যবহার রেওয়াজ ছিল। ব্যয়সঙ্কোচমানসে তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে একজন জরী দিয়া পোশাক শেলাই করাইয়া বলেন—Though lace is prohibited the order is not binding.

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বিলাতীপণ্যবর্জ্জন চেষ্টার ফলে বঙ্গদেশে 'বয়কট' কথাটা পরিচিত ও চলিত হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে ল্যাণ্ড লীগ আন্দোলনের সময় এক জন ইংরাজ ভূস্বামীর কর্ম্মচারী ক্যাপ্টেন বয়কটকে প্রজাবর্গ "একঘরে" করিয়াছিল। সেই হইতে কথাটার প্রচলন। এদেশে ইংরাজসমাজে সেকালে এক বার বয়কট হইয়াছিল। গভর্ণর হইয়া ক্লাইভ শাসনসংস্কারের চেষ্টা

কয়ায় তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা আত্মসঙ্কোচহেতু তাঁহাকে "একঘরে" করিয়াছিলেন। কর্ণেল চ্যাম্পিয়ন ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন তারিখে লিখিয়াছিলেন যে, ক্লাইভ কর্ম্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা বর্ত্তমান বেলভেডিয়ার গৃহে সমবেত হইয়া স্থির করেন যে, সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বর্দ্ধমান এক সময় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত কৃষ্ণনগরও এক সময় স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহের নিকটে সার উইলিয়ম জোন্সের গৃহের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। সম্ভবতঃ সংস্কৃতচর্চ্চানিরত সার উইলিয়ম বাঙ্গালায় সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃত আলোচনার সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগরে যাইতেন। কলিকাতার নিকটে বারাসত এক্ষণে ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন প্রায়, প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ার জন্যই চব্বিশ পরগণা জিলার সদর বারাসত হইতে আলিপুরে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্বে এই বারাসত বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল বলিয়াই অনেক ইংরাজ বারাসতে উদ্যানগৃহে অবকাশকালে বিশ্রামভোগ করিতেন। তখন সুখচর, সুখসাগর, গরুটী প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে যুরোপীয়দিগের উদ্যানবাটিকা ছিল। তখনও দার্জ্জিলিং অনাবিষ্কৃত। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যুরোপীয়দিগকে এই সকল স্থানেই যাইতে হইত। এখন এ সকল স্থান ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্তপ্রায়। তখন কলিকাতায় ব্যাধির প্রকোপ প্রবল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেন্সিয়া বলিয়াছিলেন, ডোবা বুঁজাইয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ও মদ্যপান কমাইয়া কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল।

তখন ইংরাজ মহিলারা বড় এ দেশে আসিতেন না। ইংরাজগণ প্রায় ভারতবর্ষীয় রমণী লইয়া ঘরকন্না করিতেন। কেহ কেহ আবার মুসলমানদিগের ন্যায় একাধিক পত্নীতে অনুরক্ত হইতেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লং বলিয়াছিলেন, তখনও 'মফঃস্বলে কোন কোন ইংরাজ হারেম বা বহুপত্নীপূর্ণ শুদ্ধান্ত রাখিতেন। এই সকল পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ অনেক স্থলেই বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রসিদ্ধ কর্ণেল স্কিনার এইরূপ বিবাহের সন্তান। তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে কোম্পানীর দুইজন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী বিবাহ করেন। কর্ণেল গার্ড-

নার ক্যাম্বের নবাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই এক বংশধর এখন লর্ড গার্ডনার।' ওয়ারেন হেষ্টিংসের জনৈক বন্ধু তাঁহার টোকচায় লিখিয়াছেন যে, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট তারিখে তাঁহার পুত্র জর্জ্জ আলেকজাণ্ডার জন্মগ্রহণ করে। পরবৎসর তাহার নামকরণকালে সুপ্রিম কোর্টের জজ হাইডের পত্নী তাহার Godmother হয়েন। এই বৎসর তাঁহার কন্যা ম্যাটিলডার জন্ম হয়। তিনি বলেন, ইহারা উভয়েই সাহেবজান নাম্নী সুন্দরী ও সুশীলা মোগলানীর গর্ভজাত। এরূপ বিবাহ সমাজে বৈধ বলিয়া পরিগণিত না হইলে হাইডপত্নী কখনই জর্জ্জের Godmother হইতেন না। এই সকল প্রণয়িনী লইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধও ঘটিত।

সেকালে ইংরাজ সমাজে দ্বৈরথযুদ্ধের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের যুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা। সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং সহযোগী বারওয়েলকে অসাধু বলেন। তিনি তদুত্তরে ক্লেভারিংকে মিথ্যাবাদী বলেন। ফলে দ্বৈরথ যুদ্ধ ঘটে। তবে কেহ আহত হয়েন নাই। ক্লাইভও দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রধান কর্ম্মচারীদিগের এইরূপ দৃষ্টান্তের ফলে নিম্ন কর্ম্মচারী মহলে কি হইত তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীঅরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

অজ্ঞাত।

(Browningএর অনুকরণে।)

দেবতা করেন বাস আকাশের পরে,
শুনেছি সকলে বলে। চাহি' নীলাম্বরে
তুমি কিন্তু দেখা তাঁর পাবে না কখন,
কেন যে এমন হয় কে জানে কারণ ?

খনির অতলতলে পশিয়া বিজনে
দেখিতে পাবে না তাঁরে রতন-কিরণে,
তবু জেনো মনে শুধু তাঁহারই আলোকে
নিখিল উজলি উঠে আমাদের চোখে।

করুণানিদান তিনি, কল্যাণ আনিয়া
রয়েছেন অন্তরাল রচনা করিয়া,
অশুভ বারতা যথা মঙ্গলকারণ
লুকায়ে রাখিয়া দেয় আপনার জন।

পুলক উথলি' তবু উঠে হিয়াতলে
আশীষ তাঁহার যবে নিতি শত ছলে
মরম পরশ করে মলয়-বীজনে
শেফালি-সৌরভে আর বিহগ-কূজনে।

মা যেন আদর করে ঘুমন্ত অধরে
সোহাগ করেন ধীরে গাঢ় স্নেহভরে
আধজাগা কাণে যেন শুধান যতনে
বল্ দেখি কে চুমেছে বুঝে মনে মনে ?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

প্লিনির ভারতবর্ষ।

(ভূমিকা)

অতি প্রাচীন কালে যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন প্লিনি (Caius Plinius Secundus) তাঁহাদিগের অন্যতম। প্লিনির কথা মনে করিলে বেদব্যাস ও গণেশের কথা আমাদের মনে উপস্থিত হয়। মহাভারতের কথক বেদব্যাস ও লেখক গণপতি এইরূপ প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্লিনি একাধারে বেদব্যাস ও গণপতি ছিলেন। প্লিনির জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়; তিনি অসী ও মসী এতদুভয়ের ব্যবহারেই পটু ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস অত্যন্ত শোকাবহ ও বিস্ময়কর। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক কালে তৎপ্রণীত একখানিমাত্র পুস্তক আমাদের অধিগম্য। তাঁহার অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার যে গ্রন্থখানি আমরা দেখিতে পাই সেখানির নাম Naturalis Historia।

প্লিনি ২৩ খৃষ্টাব্দে কমুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পম্পোনিয়াস নামে তাঁহার পিতার একজন বন্ধু একাধারে কবি ও সৈনিক ছিলেন। তিনিই প্লিনির প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটেই প্লিনির মনে জ্ঞানলাভস্পৃহার বীজ সর্ব্বপ্রথমে অঙ্কুরিত হয়। তিনি ভাষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, উদ্ভিদবিদ্যা, দর্শন ও অলঙ্কার পাঠ সমাপন করিয়া প্রথমতঃ ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময়ে রোমকদিগের সহিত দক্ষিণ জর্ম্মাণদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। প্লিনি সৈনিকরূপে এই যুদ্ধে যোগদান করেন ও জর্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধাবসানে রোমকদিগের এই যুদ্ধের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাস ২০ ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। প্লিনি অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধেও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কিছুদিন স্পেনে বাস করিতে হয় ও সেই সময়ে তিনি কৃষিবিদ্যা ও খনিজবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন। স্পেনে অবস্থানকালে স্পেন হইতে তিনি একবার আফ্রিকা মহাদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। স্পেন হইতে ইতালিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সম্রাট্ ভেসপেসিয়নের (Vespasian) অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন ও

সম্রাটের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলি শেষ করিয়া দিবসের অবশিষ্ট কাল অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন।

এই সময়ে তিনি সমসাময়িক কালের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাস ২১ ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছিল ও ইহাতে নিরো (Nero) হইতে আরম্ভ করিয়া ভেসপেসিয়ানের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার সমাবেশ ছিল। এই সময়েই প্লিনি তাঁহার Naturalis Historia নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। সম্রাট নিরোর সময়ে এই গ্রন্থপ্রণয়ন আরব্ধ হইয়াছিল ও ৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্লিনি ভেসপেসিয়ানের পুত্র সম্রাট্ টাইটাসের নামে এই পুস্তক উৎসর্গ করেন। এই পুস্তক উৎসর্গের অল্পদিন পরেই প্লিনি মিসেমুমে (Misemum) অবস্থিত অর্ণবপোতে অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন। তাঁহার এইস্থানে অবস্থানের সময় ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের বিসুবিয়াসের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অগ্ন্যুদ্গম ঘটে। অগ্ন্যুদ্গম দেখিতে ও অগ্ন্যুদ্গমে ভীত নরনারীর জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া প্লিনির জীবনান্ত হয়। এই দুর্ঘটনার সময় তাঁহার ভাগিনেয় তাহার সহিত বাস করিতেন। মাতুল ভাগিনেয়কে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন ও তাঁহাকে আপনা উত্তরাধিকারী করিয়া যায়েন।* এই ভাগিনেয় (Gaius Plinius Cœcilius Secundus) পরিশেষে মাতুলের ন্যায় যশস্বী হইয়াছিলেন।

ভাগিনেয়ের প্রকাশিত পত্রাবলি হইতে আমরা মাতুলের জীবনকথা ও মৃত্যুর বিষয় অতি বিশদরূপে জানিতে পারি। বিনা অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত হইলে প্লিনি তাহা অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন যে, প্রায় সমস্ত পুস্তক হইতেই আমরা অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তিনি যখনই যে কোনও পুস্তক পাঠ করিতেন তখনই সেই পুস্তক হইতে জ্ঞাতব্য নূতন তত্ত্বাদি খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

প্লিনির Naturalis Historia পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

Philemon Holland ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় এই সুবৃহৎ পুস্তকের একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ লণ্ডনে মুদ্রিত হয় ও অনুবাদক Right Honourable Sir Robert Cecil Knight এর নামে এই অনুবাদ উৎসর্গ করেন। এই অনুবাদখানি অতি বৃহদায়তন ও দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের একত্র পত্রসমষ্টি ৮২৩ ও প্রত্যেক পত্রের আকার ডবল অক্টেভো

* Letters of the younger Pliny.

অপেক্ষাও কিছু বড়। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ৩৭ খণ্ডে ও প্রথম খণ্ড ব্যতীত আর সকল খণ্ড বহু অধ্যায়ে বিভক্ত। মোট অধ্যায়ের সংখ্যা ১০৭৪। এই ৩৭ খণ্ডের প্রথম খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে (১০৯ অধ্যায়) পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ুমণ্ডল, দিবা, রাত্রি, বৃষ্টি, বাতাস, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, প্রতিধ্বনি, ঝটিকা, শিলা-বৃষ্টি, রামধনু, হিমপাত, তুষারপাত, সমুদ্র, নদী, ভূকম্প, দ্বীপাভ্যুদয় প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৃতীয় খণ্ডে (২৬ অধ্যায়) য়ুরোপ, স্পেন, ইটালি, কর্সিকা, সার্ডিনিসান, সিসিলি, লেপারি, আল্পস পর্ব্বতমালা প্রভৃতির ও চতুর্থ খণ্ডে (২৩ অধ্যায়) য়ুরোপের কতিপয় স্থানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। পঞ্চম খণ্ডে (৩২ অধ্যায়) আফ্রিকা ও এসিয়ার কথা সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ও ষষ্ঠ খণ্ডে (৩৪ অধ্যায়) ১৯৫টি নগর, ৫৬৬টি বিভিন্ন জাতি, ১৮০টি বিখ্যাত নদী ও নদ, ৩৮টি পর্ব্বত,১০৮টি দ্বীপ ও ১৯৫টি লুপ্ত নগর ও জাতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তম খণ্ডে (৬০ অধ্যায়) বিভিন্ন দেশীয় নানা প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মানবের জন্ম ও বর্ণনা, মানুষের নৈতিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়, মানুষের মৃত্যু, প্রেতাত্মা, সময়নিরূপক যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। অষ্টম খণ্ডে (৫৯ অধ্যায়) হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, গণ্ডার, সর্প, কুম্ভীর, কচ্ছপ, সজারু, ভেক, মৃগ, মূষিক, কুক্কুর, গর্দ্দভ, বানর, খরগোস প্রভৃতির এবং নবম খণ্ডে (৬২ অধ্যায়) নানা প্রকার মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তুর বর্ণনা আছে। দশম খণ্ডে (৭৫ অধ্যায়) নানা প্রকার পক্ষীর, একাদশ খণ্ডে (৫৪ অধ্যায়) নানা প্রকার পতঙ্গের, ও দ্বাদশ খণ্ডে (২৮ অধ্যায়) নানা প্রকার বৃক্ষের বর্ণনা আছে। ত্রয়োদশ খণ্ডে (২৫ অধ্যায়) প্রলেপ সমুদ্রতীরস্থিত নানা প্রকার বৃক্ষের, চতুর্দ্দশ খণ্ডে (২২ অধ্যায়) দ্রাক্ষাফল ও মদ্যপ্রস্তুত করণ প্রণালীর, পঞ্চদশ খণ্ডে (৩০ অধ্যায়) নানা প্রকার ফলের বর্ণনা ও ষোড়শ খণ্ডে (৪৪ অধ্যায়) নানা প্রকার বন্যবৃক্ষের বিষয় কথিত হইয়াছে। সপ্তদশ খণ্ডে (২৮ অধ্যায়) বৃক্ষের ব্যাধি ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে, অষ্টাদশ খণ্ডে (৩৫ অধ্যায়) কৃষিকার্য্য ও শস্যাদি সম্বন্ধে এবং উনবিংশ খণ্ডে (২২ অধ্যায়) তুলা, গঞ্জিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্যানজাত বৃক্ষাদির ভৈষজ্যগুণ বিংশ খণ্ডে (২৪ অধ্যায়) ও একবিংশ খণ্ডে (৩৪ অধ্যায়) নানা প্রকার পুষ্প, ভ্রমর, মধু প্রভৃতির বিষয়ের বর্ণনা আছে। দ্বাবিংশ খণ্ডে (২৫ অধ্যায়) ভৈষজ্যগুণবিশিষ্ট ও খাদ্যোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের, ত্রয়োবিংশ খণ্ডে (৩৯ অধ্যায়) কৃষিজাত বৃক্ষাদির ভৈষজ্যগুণ ও চতুর্ব্বিংশ খণ্ডে

(১৯ অধ্যায়) বনজাত বৃক্ষাদির ভৈষজ্যগুণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পঞ্চবিংশ খণ্ডে (১৩ অধ্যায়) ষষ্ঠবিংশ খণ্ডে (১৫ অধ্যায়) ও সপ্তবিংশ খণ্ডে (১৩ অধ্যায়) উদ্ভিজ্জাদির সম্বন্ধে নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। অষ্টবিংশ খণ্ডে (২০ অধ্যায়) ঊনত্রিংশ খণ্ডে (৬ অধ্যায়) ও ত্রিংশখণ্ডে (১৬ অধ্যায়) ভৈষজ্যগুণবিশিষ্ট নানা প্রকার জন্তুর উল্লেখ আছে। একত্রিংশ খণ্ডে (১১ অধ্যায়) ও দ্বাত্রিংশ খণ্ডে (১১ অধ্যায়) ভৈষজ্যগুণবিশিষ্ট নানা প্রকার মৎস্যের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রয়ত্রিংশ খণ্ডে (১৩ অধ্যায়) স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং চতুস্ত্রিংশ খণ্ডে (১৮ অধ্যায়) পিত্তল, তাম্র, লৌহ, সীস, রঙ্গ, হরিতাল সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। পঞ্চত্রিংশ খণ্ডে (১৯ অধ্যায়) চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে, ষষ্ঠ ত্রিংশ খণ্ডে (২৭ অধ্যায়) নানা প্রকার প্রস্তর সম্বন্ধে ও সপ্তত্রিংশ খণ্ডে (১৩ অধ্যায়) হীরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মণির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্লিনি তদীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তদানীন্তন অনেক মত যে আজকাল ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। এই বিরাট গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু তত্ত্বও সঙ্কলিত আছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে য়ুরোপীয়গণ কি প্রকার সংবাদ রাখিতেন আমরা এই সুবৃহৎ পুস্তকে তাহার আভাস পাই এবং সাধারণ পাঠকের সমক্ষে সেই সমস্ত বিষয়ের অবতারণার ভূমিকা স্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পাষাণের কথা।

(১০)

স্কন্দগুপ্ত যখন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর সিংহাসন স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ধীরে ধীরে আমাদিগের ধ্বংসাবশেষের উপর নবীন তৃণরাজি অধিকার-বিস্তার করিতেছিল। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে নব দূর্ব্বাদল আমাদিগের ধ্বংসাবশেষের উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিতেছে, দেখিতে পাইলাম; কারণ, সুবৃহৎ স্তূপ ধ্বস্ত হইলেও আমি তখনও উচ্চশীর্ষ ছিলাম। বর্ষা অতীত হইলে দেখিলাম, স্তূপ ও বেষ্টনী নব-দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত হইয়াছে; বিশাল স্তূপের অস্তিত্বের সামান্য চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান, স্থানে স্থানে কেবল মাংসবিহীন কঙ্কালের ন্যায় বেষ্টনীর স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান। যত দূর দৃষ্ট হয়, তত দূর শ্যামল তৃণক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হইতেছিল না; বোধ হইল, আটবিক প্রদেশ পুনরায় জনশূন্য হইয়াছে। দূরে উচ্চ মৃৎপিণ্ড লক্ষিত হইতেছিল; অনুমানে বুঝিলাম, তাহাই অগরাজুর নগর। নগরের সম্মুখে মৃৎপিণ্ডের উপর দুইটি ক্ষুদ্রতর মৃৎপিণ্ড প্রাচীন নগর-তোরণের অবস্থানের পরিচয় দিতেছিল। হেমন্তের মধ্যভাগে একদিন প্রভাতে আমাদিগের উত্তরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল, যেন কে ধীরে ধীরে স্তূপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্তূপের দিকেই বলিলাম; তুমি হয়ত বলিবে, স্তূপের অস্তিত্বলোপ হইয়াছে, কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে আমি অত্যন্ত বেদনা অনুভব করি; আমি বলিব, স্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে—অশোকের ন্যায় বা কণিষ্কের ন্যায় সদ্ধর্ম্মানুরাগী কোন সম্রাট্ আসিয়া ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে প্রাচীন স্তূপের সংস্কার করিবেন। সহস্র বৎসর আমি সেই ভরসায় দণ্ডায়মান ছিলাম। আমি দেখিতাম, ধ্বংসাব-শেষের মধ্য হইতে নূতন স্তূপ উত্থিত হইয়াছে, পুরাতন সংস্কৃত হইয়াছে, জীর্ণ পাষাণের পরিবর্ত্তে নূতন পাষাণ আনীত হইয়াছে, পত্রপুষ্পমাল্যচন্দনে স্তূপ আবার সুশোভিত হইয়াছে। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দেখিতাম, সায়ংকালীন স্নান ও প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া প্রজ্জ্বলিত মধুজবর্ত্তিকাহস্তে নাগরিক ও নাগরিকা-গণ তোরণপথে বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, দলে দলে ভিক্ষুগণ স্তূপ প্রদক্ষিণ করিয়া তথাগতের পূজা করিতেছেন, সশব্দে গর্ভগৃহের পাষাণময় দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে, শিলানির্ম্মিত আধারে রক্ষিত তথাগতের শরীরী দপালোকে

অর্চ্চিত হইতেছে, গন্ধে ও পুষ্পে গর্ভগৃহের পথ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উষাকালে পক্ষিগণের শব্দে সে সমস্ত চিন্তা দূর হইয়া যাইত, অল্পক্ষণ পরেই নিষ্ঠুর আলোক আসিয়া আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিত; দেখিতাম, স্তূপের পরিবর্ত্তে শিশিরসিক্ত তৃণদল বন্ধুর মৃৎপিণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে মাংসবিহীন নরদেহপঞ্জরের ন্যায় কয়েকখণ্ড পাষাণ মস্তক উত্থিত করিয়া আছে।

মনে হইল, দূরে কে যেন বহুকষ্টে পাদচারণা করিতেছে, তাহার চরণদ্বয় আর যেন তাহাকে বহন করিতে অক্ষম;—দেহভারক্লিষ্ট হইয়া সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিতেছে, ও পরক্ষণেই আবার যেন কোন আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে নিকটে আসিলে দেখিলাম, জীর্ণবাসপরিহিত দশনহীন, শুক্লকেশ, লোলচর্ম্মা জনৈক মনুষ্য স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। স্তূপের মৃৎপিণ্ডের সন্নিধানে আসিয়া সে সর্ব্বপ্রথমেই আমাকে দেখিতে পাইল; কারণ, আমার মস্তক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ছিল। আমার নিকটে আসিয়া বৃদ্ধ যেন যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল, সে পাষাণে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বহুক্ষণ বিশ্রাম করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে স্তূপ ও বেষ্টনী পরিক্রমণের পথ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিল ও আমার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া উপবেশন করিল। সমস্ত দিন বৃদ্ধ ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিল। কোন স্থানে স্থানচ্যুত স্তম্ভ অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে, কোন স্থানে ভগ্ন সূচীর আশ্রয়ে মণ্ডুককুল আশ্রয়লাভ করিয়াছে, ভগ্নশীর্ষতোরণস্তম্ভের শীর্ষদেশে বিহঙ্গম নীড় রচনা করিয়াছে, যে স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান আছে তাহাদিগের বিকল অঙ্গ অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপ ও দাহিকাশক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে, সূচীতে ও স্তম্ভে ক্ষোদিত চিত্রগুলি হূণের অস্ত্র ও অগ্নির আক্রমণে বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে; আলেখ্যগুলিতে ভগ্নশির বা ছিন্ননাসা মনুষ্যমূর্ত্তিনিচয় স্তূপের ও বেষ্টনীর বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। অর্দ্ধভগ্ন কোন স্তম্ভদ্বয়ের শীর্ষদেশে বৃক্ষশাখা স্থাপিত করিয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডের সাহায্যে ও বন হইতে কুশ সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃদ্ধ এক অপূর্ব্ব কুটীর রচনা করিল এবং সূর্য্যালোক বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে তন্মধ্যে শুষ্ক দর্ভের শয্যারচনা করিয়া বিশ্রামলাভ করিল। তদবধি বৃদ্ধ আমাদিগের নিত্যসহচর হইল। সে প্রভাতে উঠিয়া প্রাচীন নগরের প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র নদীতে স্নান করিয়া আসিত ও বন্যপুষ্প সংগ্রহ করিয়া মৃৎপিণ্ডের অর্চ্চনা করিত, তাহার পর দিবা দ্বিপ্রহর অবধি আমার ছায়ায় বসিয়া আপন মনে কি বলিত, প্রতিদিন "বিমলা-কীর্ত্তি ভট্টারিকানিষ্পাদিতা"

এই কথা বলিয়া মৃৎপিণ্ডকে নমস্কার করিত, এতদ্ব্যতীত তাহার আর কোন কথাই বুঝিতাম না। অপরাহ্নে বৃদ্ধ আহার্য্যসংগ্রহের চেষ্টায় বনমধ্যে প্রবেশ করিত, বনজাত ফলেই তাহার আহার নিষ্পন্ন হইত, কিন্তু কখনও কখনও সে পত্রনির্ম্মিত আধারে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া আনিত। বোধ হয়, দুগ্ধসংগ্রহের জন্য সে বনপথ অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিত। এইরূপে শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা অতীত হইয়া গেল, ক্রমে ক্ষুদ্র বট ও পিপ্পল বৃক্ষগুলি নাতিবৃহৎ ছায়াপ্রদ তরু হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ আমাদিগের সহিত শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

তোরমাণের পুত্র মিহিরকুলের অধীনে হূণগণ দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইতেছিল। গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অবিরাম গতিতে হূণগণ আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিতেছিল, তোরমাণের মৃত্যুর পর হইতে হূণ জউলগুলি উপযুক্ত নেতার অভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। মিহিরকুলের চেষ্টায় তাহার অধিকাংশ পুনরায় একত্রিত হইল। হূণবাহিনী মগধাভিমুখে অগ্রসর হইল। দ্বিতীয় বাহিনী মিহিরকুলের কনিষ্ঠ খিঙ্গিলের অধীনে জনহীন মরু অতিক্রম করিয়া সৌরাষ্ট্রাভিমুখে ধাবিত হইল; বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় নগরশীর্ষের গরুড়ধ্বজ ধরাশায়ী হইল। কালিন্দী অতিক্রম করিয়া মিহিরকুল ব্রহ্মাবর্ত্তে শিবির স্থাপিত করিলেন। বৃদ্ধ সম্রাট্ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াও বারাণসী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মাবর্ত্তে তনুদত্ত ও প্রতিষ্ঠানে নাগদত্ত সীমান্তরক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। সিংহবিক্রম স্থাণুদত্তের পুত্র ভাগীরথীর তীর্থরক্ষা করিতেছিলেন; জলধিতুল্য হূণ সৈন্যের পরপারে পদার্পণ করিবার সাহস হইতেছিল না। আর প্রতিষ্ঠানে নাগদত্ত নৌবাটক লইয়া বেণীত্রয় রক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট্ চরণাদ্রিদুর্গে সৌরাষ্ট্রের পতনসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন; আরও শুনিলেন, আনর্ত্তের সহিত মালবও সাম্রাজ্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। শুনিয়া বৃদ্ধের শির নত হইল। চরণাদ্রিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া জাহ্নবীকে সাক্ষী করিয়া তরবারি স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ শপথ করিলেন, মালব ও আনর্ত্ত, মৎস্য ও মরু পুনরধিকার না করিয়া পাটালিপুত্রে প্রত্যাগমন করিবেন না। শপথ শ্রবণে বিজ্ঞ সেনানীগণেরও হৃদয় কম্পিত হইল। স্কন্দগুপ্ত আর একবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেম। চরণাদ্রিদুর্গে খুল্লতাত গোবিন্দগুপ্তের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া যুবক সম্রাট্ শপথ করিয়াছিলেম যে, তাঁহার বংশে কেহ কখনও মগধের সিংহাসন রক্ষার জন্য বিবাদ করিবে না। শান্তনুপুত্রের ন্যায় ভীষণ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সম্রাট্ দারপরিগ্রহ করেন নাই।

উদ্দণ্ডপুরদুর্গে অবরুদ্ধ হৃতসিংহাসন পুরগুপ্ত মগধসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। চরণাদ্রি হইতে সৌরাষ্ট্র বহুদিনের পথ, মগধে যাহারা স্ত্রীপুত্র রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের আশা পরিত্যাগ করিল। সম্রাট্ চরণাদ্রি হইতে প্রতিষ্ঠানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মিহিরকুলের আহ্বানে প্রতিদিন শত শত হূণ আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিতেছিল। তাহাদিগের আক্রমণে গান্ধারে শতশত বর্ষব্যাপী কুশানাধিকার লুপ্ত হইল, কণিষ্কের সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। গঙ্গাতীরে প্রতিদিন হূণগণের বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া মিহিরকুল পুনরায় নদী পার হইবার আদেশ দিলেন; বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তনুদত্ত সে ভীষণ আক্রমণ রোধ করিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের দ্বিতীয় যুদ্ধে তনুদত্তের পরাভববার্ত্তা জ্ঞাত হইলেন। প্রতিষ্ঠানের ভীষণ দুর্গ তুমি বোধ হয় দেখিয়াছ, সেরূপ সুদৃঢ় দুর্গ তৎকালে মধ্যদেশে আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে দুর্গটি অবস্থিত ছিল ও উহা অধিকার না করিয়া পূর্ব্বে বারাণসী বা পশ্চিমে অন্তর্ব্বেদী অধিকার করা অসম্ভব ছিল। গুপ্তসাম্রাজ্য অতীত হইবার শত শত বর্ষ পরেও প্রতিষ্ঠান আর্য্যাবর্ত্তে রাজশক্তির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; বহুশতাব্দী পরে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট সৈনিকগণ আমার ছায়ায় বসিয়া প্রতিষ্ঠানের ভীষণ দুর্গের বর্ণনা করিত। ধীরে ধীরে স্থানুদত্তের পুত্র মিহিরকুলকে সম্মুখে রাখিয়া বেণীতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন তনুদত্ত ও নাগদত্ত দুর্গরক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন; দেখিতে দেখিতে পবিত্র প্রতিষ্ঠানপুর অস্পৃশ্য হূণগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। বৃদ্ধ সম্রাট্ দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া সাম্রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছিলেন, সৌরাষ্ট্রে পর্ণদত্ত তখনও গুপ্তাধিকার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানদুর্গ অবরোধকালেও মিহিরকুলের বলবৃদ্ধি হইতেছিল; সুতরাং স্বীয় বলবৃদ্ধির জন্য স্কন্দগুপ্তকেও বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইয়াছিল। অবসর পাইলেই সম্রাট দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী নগরগুলি হইতে সৈন্যদল পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন; এইরূপে প্রতিষ্ঠান অবরোধে হূণরাজের বর্ষত্রয় অতিবাহিত হইল। উভয় পক্ষেই সৈন্যসংগ্রহ হওয়ায় কোন পক্ষেরই আশু জয়লাভের আশা রহিল না। তরুণবয়স্ক মিহিরকুল বিলম্বে বিচলিত হইলেন ও সে সংবাদ স্কন্দগুপ্তের কর্ণগোচর হইল। প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের তখন অন্তিম দশা, স্কন্দগুপ্তের বহু

চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের উদ্ধার হইল না, অর্দ্ধ সৈন্য অবরুদ্ধ দুর্গের পরিখাপার্শ্বে রাখিয়া মিহিরকুল অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইতেন ও বর্ষাসমাগমে পুনরায় পরিখাপার্শ্বে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে বারাণসী হইতে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তর তীরস্থিত ভূখণ্ড জনমানবশূন্য হইল। ক্রমে প্রতিষ্ঠানদুর্গে আহার্য্যের অভাব অনুভূত হইল। সম্রাট বুঝিলেন, আর অধিকদিন দুর্গরক্ষা সম্ভব হইবে না।

সেই সময় হইতে সম্রাট প্রতিদিন যথাসাধ্য নাগরিকগণকে নগর হইতে দূরে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সুস্থ, সবলকায়, অস্ত্রধারণক্ষম ব্যক্তিগণকে নগর হইতে দুর্গমধ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নগর জনশূন্য হইল ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে দুর্গবাসিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শত্রুসৈন্যের অধিকারে আসিল। লোক বলিত, অধিষ্ঠান অবরোধের শেষবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মাধিক্য বহুকালযাবং আর্য্যাবর্ত্তে অনুভূত হয় নাই। বহু কষ্টে, বহু অর্থ-ব্যয়ে বুভুক্ষিত পাষাণরাশির মধ্যে রচিত প্রতিষ্ঠানদুর্গের কূপগুলিতে অধিক জল থাকিত না ও গ্রীষ্মকাল অতীত হইবার পূর্ব্বেই সেগুলি প্রায় শুষ্ক হইয়া যাইত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বহুঅর্থব্যয়ে গঙ্গাজল আনয়ন করিবার জন্য যে পয়ঃপ্রণালী খনন করাইয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠানযুদ্ধের প্রারম্ভে তাহা হূণগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে দুর্গমধ্যে নদীর জলই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু অবরোধের প্রারম্ভে পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হওয়ায় উষ্ট্রবাহনে যমুনা-সঙ্গম হইতে জল আসিত ও যথাসম্ভব কূপোদক ব্যবহৃত হইত। নগর হূণসৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে জল আনয়নের পথ রুদ্ধ হইল। তখন কূপোদকই অবরুদ্ধ সৈনিকমণ্ডলীর একমাত্র ভরসাস্থল হইল। নগর পরি-ত্যাগকালে সম্রাট অনুমান করিয়াছিলেন যে, দুর্গ নগর অপেক্ষাও সামান্য লোকবলে রক্ষিত হইতে পারে; সুতরাং, নগর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করিলে আহার্য্যদ্রব্য অল্পলোকে অধিক দিন ব্যবহার করিতে পারিবে। তিনি জানিতেন যে, নগর পরিত্যাগ করিলে দুর্গমধ্যে জলের অভাব হইবে; কিন্তু তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, অল্পসংখ্যক সৈন্য কূপো-দকপানে জীবন রক্ষা করিয়া বর্ষাগম পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিবে এবং তাঁহার ভরসা ছিল যে, ততদিন কোনও না কোন প্রদেশ হইতে সাহায্য আসিবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পতনসময় সে বৎসর যে গ্রীষ্মাধিক্যহেতু বৈশাখের প্রারম্ভে দুর্গমধ্যে জলাভাব হইবে তাহা তিনি কখনও অনুমান করেন নাই।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন প্রভাতে সম্রাট্ সংবাদ পাইলেন যে, কূপগুলিতে দুই দিনের অধিক সময়ের উপযোগী পানীয় জল নাই। তখন তিনি দুর্গ-প্রাকারে আরোহণ করিয়া যমুনা-সঙ্গমের শুষ্ক বালুকারাশির উপর শত্রু-শিবির পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দিন দ্বিপ্রহরে মন্ত্রণাগৃহে সম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও সেনাপতিগণ স্থির করিলেন যে, তৃতীয়দিবসের পর দুর্গরক্ষা সম্ভবপর নহে। অর্দ্ধাহারে বা অনশনে সৈনিকগণ যুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু জলাভাব হইলে অবরুদ্ধ সেনাদলকে শান্ত করা কঠিন। মন্ত্রণায় স্থির হইল, রাত্রিকালে সম্রাট্ স্বয়ং কালিন্দী হইতে জল-সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন; কিন্তু যে দিন জল সংগৃহীত না হইবে তাহার পরদিন দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দুর্গপরিত্যাগের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সম্রাট্ ঈষৎ হাস্য করিলেন। যাহারা প্রথম হূণযুদ্ধে স্কন্দগুপ্তকে দেখিয়াছিল তাহারা সে হাস্যের অর্থবোধ করিয়া শিহরিল। রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে যমুনাসৈকত উভয় পক্ষীয় সৈন্যের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। জলবাহী উষ্ট্রসমূহ কালিন্দীতীর হইতে দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমনকালে হূণগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, বহু চেষ্টাসত্ত্বেও সম্রাটের সৈনিকগণ উষ্ট্রগুলির উদ্ধার করিতে পারিল না। সম্রাট্ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। হূণগণ তখন দুর্গ ও কালিন্দীতীরে মধ্যভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। সম্রাট কিছুতেই শত্রুদল ভেদ করিতে পারিলেন না। বহুশ্রমে ও অনাহারে ক্লিষ্ট সৈনিকগণ বৃথাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে স্বয়ং মিহিরকুল দুর্গ প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাম গুপ্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত লৌহদ্বার অনায়াসে তাঁহার গতিরোধ করিল। সম্রাটের সেনাদল নির্ব্বিঘ্নে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। বৈশাখী কৃষ্ণ প্রতিপদের প্রত্যূষে বৃদ্ধ সম্রাট্ দুর্গপ্রাঙ্গণে অবশিষ্ট সেনা সমবেত করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন যে, জলাভাবে দুর্গরক্ষা অসম্ভব, কিন্তু তিনিও প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া পশ্চাদ্-পদ হইতে অসম্মত, প্রতিষ্ঠান হস্তচ্যুত হইলে রেবা হইতে জাহ্নবী পর্য্যন্ত ও জাহ্নবী হইতে হিমবান পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড হূণগণের করতলগত হইবে, পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী লুণ্ঠিত হইবে ও পাটলিপুত্র ব্যতীত সংরক্ষণের দ্বিতীয় স্থান থাকিবে না। বৃদ্ধ কহিলেন, পঞ্চবিংশবর্ষ পূর্ব্বে আটবিক প্রদেশে বনদুর্গ অব-রোধকারী হূণমণ্ডল ভেদ করিয়া পঞ্চশত সৈনিক প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিল; সুতরাং, পঞ্চসহস্রের পক্ষে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া চরণাদ্রিদুর্গে

আশ্রয় গ্রহণ করা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যদি প্রত্যাগমন করিতে হয় তাহা হইলে কালিন্দীর মলিন জল পান করিয়া যাইতে হইবে, নতুবা আর্য্যাবর্ত্তের বিশাল বক্ষে তাহাদিগের আর স্থান হইবে না। সেনাপতি ও সৈন্যগণ নীরবে এ কথা শ্রবণ করিলেন। অবশিষ্ট কূপোদক স্নানে ও পানে ব্যয়িত হইল। সন্ধ্যার প্রাকালে দুর্গের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইল, বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে হূণগণ দেখিল, উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য কালিন্দী-সৈকতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে চলিতেছে। ধীরে ধীরে খুঙ্খান ও মিহিরকুলের অধীনে লক্ষ লক্ষ হূণসৈন্য পঞ্চ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। হস্তিপৃষ্ঠ হইতে তোরমান দেখিলেন, শুভ্রকেশ শুভ্রবসনপরিহিত বৃদ্ধ সম্রাট্ স্বহস্তে হৈম গরুড়ধ্বজ ধারণ করিয়া শ্বেতাশ্বারোহণে তির্য্যকব্যূহের পুরোদেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। হূণসৈন্যের অধিকাংশ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠনে মনোযোগ দিয়াছে, কেহ কেহ শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। স্কন্দগুপ্তের রণকৌশলের কথা তিনি বহুদিন হইতে শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন। শত শত হূণ ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রথম যুদ্ধের বিবরণ দেশে দেশে প্রচারিত করিয়াছিল। তরুণ হূণরাজ ভাবিলেন, ভয়ে বৃদ্ধের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। সম্মুখে যমুনা, উভয় পার্শ্বে অপরিমিত শত্রুসৈন্য, পশ্চাতে শত্রুহস্তগত ভীষণ দুর্গ, এইরূপ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃথিবীতে কয়জন সৈনিক প্রত্যাগমনের আশা করিয়া থাকে? ধীরে ধীরে হূণসৈন্য মুষ্টিমেয় বিপক্ষদলকে পেষণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখিল, সংখ্যায় হীন হইলেও সে তির্য্যক্‌ব্যূহ যেন বজ্রনির্ম্মিত। ব্যূহের পূর্ব্বকোণে স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন; ক্রমে ক্রমে ব্যূহের পূর্ব্বকোণ কালিন্দীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিহিরকুল ভাবিলেন, শত্রু স্বেচ্ছায় কালিন্দীর জলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে যাইতেছে। তখন তিনি হূণসৈন্যের গতিপরিবর্ত্তন করিলেন। নদীতীর পরিত্যাগ করিয়া হূণগণ শত্রুব্যূহের উভয়পার্শ্বে ও দুর্গের সম্মুখে আক্রমণ করিল; ব্যূহ দ্রুতবেগে নদীর জল স্পর্শ করিতে ধাবিত হইল। সর্ব্বাগ্রে রক্তাক্ত অশ্বে রক্তার্দ্রপরিচ্ছদ বৃদ্ধ স্কন্দগুপ্ত। যমুনাগর্ভে দণ্ডায়মান হইয়া অল্পসংখ্যক সৈন্য হূণগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু দ্বিসহস্রের অধিক সৈন্য অবলীলাক্রমে সন্তরণে নদীপার হইয়া গেল। মিহিরকুল ভাবেন নাই যে, অবশিষ্ট শত্রুসৈন্য তাঁহার গ্রাস অতিক্রম করিবে। রোষে উন্মত্ত হইয়া তিনি স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্যগণের প্রতি সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। তখন মরণোন্মুখ অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পরমগু

হস্তে স্কন্দগুপ্ত যমুনার আর্দ্রসৈকতে হূণরাজের সম্মুখীন হইলেন। দুর্গাকার হইতে ত্রিহস্ত পরিমিত শর আসিয়া বৃদ্ধের দক্ষিণ চক্ষু ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে উত্তোলিত দীর্ঘ পরশু সেই সময়ে হূণরাজের অশ্বের মস্তক ছেদন করিল। অশ্বহীন মিহিরকুল ও সম্রাট স্কন্দগুপ্তের প্রাণহীন দেহ একত্র বালুকাময় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল। সম্রাটের অবশিষ্ট সৈনিকগণ ভট্টারকের দেহরক্ষার্থ একত্রিত হইল, তখন অবশিষ্ট সেনাদল পরপারে উপস্থিত হইয়াছে। হূণগণ প্রচণ্ড বিক্রমে মিহিরকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য শত্রুসেনা আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রভুভক্ত সৈন্যদল সম্রাটের দেহ আচ্ছন্ন করিয়া ভূপতিত হইল, দূরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনেত্রে তোরমানের পুত্র প্রতিষ্ঠানের শেষ যুদ্ধ অবলোকন করিলেন। সম্রাটের একজনমাত্র সৈনিক অবশেষে মৃত সম্রাটের হস্ত হইতে সুবর্ণ নির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ গ্রহণ করিয়া জলে ঝম্প-প্রদান করিল। হস্তোত্তোলন করিয়া হূণরাজ তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে তাহার নাম সুপরিচিত। সেই ব্যক্তি আর্য্যাবর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা—যশোধর্ম্মদেব।

বৃদ্ধ প্রভাতে বনমধ্যে পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছিলেন; দেখিলেন, ক্ষত-বিক্ষত দেহে মলিনবেশপরিহিত দীর্ঘাকার এক যোদ্ধা বৃক্ষতলে অচেতন অবস্থায় পতিত। তাহার পার্শ্বে বৃহৎ লৌহনির্ম্মিত শূল কিন্তু তাহার দক্ষিণহস্তে গরুড়শীর্ষ সুবর্ণদণ্ড দৃঢ়মুষ্টিনিবদ্ধ রহিয়াছে, চেতনা অপহৃত হইলেও যোদ্ধৃবর দণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। জলসেচনে বৃদ্ধ সৈনিকের মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না, তখন ধীরে ধীরে বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় বৃদ্ধ অস্ত্রক্ষতগুলি ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরীক্ষা-কালে বৃদ্ধ দেখিলেন যে, যোদ্ধার বক্ষোদেশে গভীর ক্ষত হইতে তখনও সামান্য শোণিতস্রাব হইতেছে। জলসেচনেও রক্তনির্গম স্থগিত হইল না। বৃদ্ধ ঔষধসংগ্রহার্থ নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অল্পক্ষণ পরেই চর্ব্বিত-পত্রের সাহায্যে রক্তস্রাব স্থগিত করিলেন। বৃদ্ধের পুষ্পচয়ন স্থগিত রহিল। বিমলাকৃতি সূত্র বিস্মৃত হইয়া বৃদ্ধ নবাগতের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সদ্ধর্ম্মীর ধর্ম্মই এইরূপ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবীন-প্রসঙ্গ।

কবিবর নবীনচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় রাণাঘাটে ; সে আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন তিনি রাজ-কার্য্যে রাণাঘাট মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় নূতন আসিয়াছেন।

আমি তখন কলেজের ছাত্র। কবিতা-লিখা রোগ ছেলেবেলা হইতেই আমাকে ধরিয়াছিল। মাঝে মাঝে কোন সাময়িক পত্রে এক আধটা কবিতা লিখিতাম। আমি বরাবর নবীনচন্দ্রের ভক্ত। 'পলাসীর যুদ্ধ' আদ্যোপান্ত প্রায় আমার কণ্ঠস্থ ছিল। আমি তখনও সে মোহ কাটাইতে পারি নাই। সুতরাং নবীনচন্দ্র রাণাঘাটে আমাদেরই কাছে আসিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা করিবার এবং 'পলাসীর যুদ্ধের' কবির সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছাও মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

গ্রীষ্মাবকাশে কলেজের ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছি। কবি-সম্ভাষণে যাইবার পূর্ব্বে একটা কবিতা লিখিয়া বাড়ীর প্রেসে সুন্দর করিয়া ৫০ খানি ছাপাইলাম। পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে মনের অভিপ্রায় নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি আগামী কল্য প্রাতঃকালের গাড়ীতে রাণাঘাটে যাইব। এক সঙ্গে যাওয়া যাইবে।" তাঁহার অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম।

নবীনচন্দ্রের মত মহাকবিকে উপহার দিবার মত কবিতা লিখিবার যোগ্যতা আমার নাই বলিয়া মনে মনে একটা দুর্ভাবনাও না হইয়াছিল, এমন নহে। যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার শেষ শ্লোক এই—

ধর দীন উপহার নির্গন্ধ কুসুম-হার
হৃদয়ের পাশে।
স্নেহের নয়নে, কবি, অসুন্দরও লাগে ভাল,
দিনু এ বিশ্বাসে।

মনে মনে একটু ভরসা বাঁধিয়া লইলাম। তিনি মহৎ আমি ক্ষুদ্র। তথাপি তিনি কবি, ক্ষুদ্রের দুঃসাহস তিনি ক্ষমা করিবেন, এইরূপ একটা আশ্বাসও মনে মনে পাইলাম। যাহা হউক, পরদিন সকালের ট্রেণে পিতৃদেবের সঙ্গে রাণাঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমাদের গাড়ী ষ্টেশনে থামিবার একটু পরেই কলিকাতাগামী

বগুলা লোক্যাল ট্রেণের ঘণ্টা পড়িল। আমরা তখন প্লাটফর্ম্মে নামিয়াছি; ওভার ব্রীজ পার হইবার উদ্যোগ করিতেছি। সে দিন শনিবার।

ষ্টেশনে জানিলাম, নবীন বাবু এই ট্রেণে কলিকাতায় যাইতেছেন। শুনিয়া একটু নিরাশ হইলাম। তবে ত আশা পূর্ণ হইল না—খেয়া ঘাটে আসিয়া শেষে গড়াগড়িই সার হইল! ততক্ষণ বগুলা লোক্যাল ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে পরপারের প্লাটফর্ম্ম হইতে কোটপ্যাণ্টপরা প্রৌঢ়বয়স্ক একজন পুরুষকে ওভার ব্রীজের শিঁড়ি দ্রুতপদে আরোহণ করিতে দেখিলাম। সাধারণ লোক হইতে তাঁহার যেন একটু বিশেষত্বও লক্ষ্য করিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তিনিই 'পলাসীর যুদ্ধের' কবি নবীন-চন্দ্র সেন।

নবীনচন্দ্র এ পারে আসিয়া ত্বরিতপদে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া নতকন্ধরে হস্তস্থিত কবিতাগুলি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি আগ্রহপূর্ব্বক একখানি কবিতার কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি পাঠসাঙ্গ করিয়া সহাস্যে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এ কবিতা আপনি লিখিয়াছেন? বড় সুন্দর হইয়াছে। কলিকাতাস্থ বন্ধুবান্ধবকে দিবার জন্য আরও কতকগুলি দরকার। আমাকে আর দিতে পারিবেন কি?" আমি অবনত মস্তকে উত্তর করিলাম, "উপস্থিত সঙ্গে আর নাই। যদি প্রয়োজন বোধ করেন, আমি আর কতকগুলি আপনাকে পাঠাইয়া দিব।" গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। তিনি করপ্রসারণ করিয়া সাগ্রহে আমার হাত ধরিয়া সেক্‌হেণ্ড করিলেন; বলিলেন, "আমি রাণাঘাটে ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে পত্র লিখিব।" গাড়ী ছাড়িল। আমি সতৃষ্ণ নয়নে কবিবরকে আর একবার দেখিয়া লইলাম। গাড়ী দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

কবিকে দেখিলাম। সে কেবল দেখা মাত্র। কবির হৃদয়ের পরিচয় পাইবার অবসর ত হইল না। দুইদিন পরে কবিবরের লিখিত ইংরাজি পত্র পাইলাম। আমার অকিঞ্চিৎকর কবিতা পড়িয়া কবিবর লিখিয়াছেন I have had many such presents in my life, but none so good, so sweet and so poetical." বড় আহ্লাদ হইল। আপনার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে এমন অকাট্য certificate পাইয়া একটু অহঙ্কারও হইল। পত্রে রাণাঘাটে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমন্ত্রণও ছিল। কবিকে ভাল করিয়া দেখিবার—ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

যথাসময়ে রাণাঘাট রাজবাগানে তাঁহার কুঠিতে উপস্থিত হইলাম। তখন নবীনবাবু বাসায় ছিলেন। বোধ হয় সেদিন রবিবার বা কোন ছুটীর দিন। তিনি সাদর-সম্ভাষণে আমাকে তাঁহার কবিজনোচিত সুসজ্জিত গৃহে কেদারায় বসাইলেন। গৃহের সাজসজ্জা সুন্দর—গৃহের দেওয়ালে অনেকগুলি চিত্র; সেগুলি সুরুচি-সঙ্গত—অধিকাংশই নদ নদী পর্ব্বত প্রস্রবণের চিত্র। অনেকক্ষণ ধরিয়া চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ সহকারে দেখিলাম।

তাহার পর নবীনচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরব্ধ হইল। প্রথমতঃ আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পরিচয় পাইয়া তিনি বলিলেন,—"ধাত্রী-শিক্ষা' লিখিয়া আপনার পিতা অমর হইয়াছেন। তিনি আমার প্রণম্য। আপনি দেশবিখ্যাত ব্যক্তির পুত্র। আপনার কবিতা লিখায় বেশ স্বাভাবিকতা আছে। আপনি কবিতা-লিখার অভ্যাস ছাড়িবেন না।" আমি সলজ্জভাবে বলিলাম, "আমি যাহা লিখি, তাহা কোন অংশে সুখ্যাতির যোগ্য বলিয়া মনে করি না। তবে আপনার মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।" নবীনবাবু বলিলেন, "আপনার কবিতাটি পড়িয়া মনে হইল আপনি বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রভাব হইতে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র আছেন। You belong to my school of poetry আপনার কবিতায় আমার কবিতার সুর আছে।" মনে মনে ভাবিলাম, থাকিবারই কথা। আমি যে হেম-নবীনেরই শিষ্য। হেম-নবীনের কাব্যই যে আমার কৈশোরের এবং যৌবনের পাঠ্য ছিল। প্রকাশ্যে বলিলাম, "হাঁ আপনার এবং হেমবাবুর কবিতাই আমি পাঠ করিয়াছি। রবিবাবুর দুই একটি কবিতা পড়িয়াছি মাত্র।" বাস্তবিক তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-রবি চক্রবালের বহু ঊর্দ্ধে উঠে নাই। প্রশ্ন হইল, "আপনি রবিবাবুর কবিতা পড়িয়াছেন? আপনার কেমন লাগে?"

আমি বলিলাম, "রবিবাবুর কবিতা নূতন ধরণের। একটু বেশী মোলায়েম এবং মধুর। আপনার বা হেমবাবুর লিখার উদ্দীপনা রবিবাবুর লিখায় নাই।" নবীনবাবু হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, রবির কবিতা মেরুদণ্ডহীন। রবিবাবুর কবিতা দিয়াই তাঁহার কবিতার পরিচয় দিতেছি:—

ও সে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল না।
ও সে ব'য়ে গেল, কয়ে গেল না।

কেমন ঠিক্ কি না?" আমি কোন প্রতিবাদ করিলাম না। নবীনবাবু খুব হাসিলেন।

এমন সময়ে তাঁহার পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র—তখন বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে—বিনীত ভাবে আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। নবীনবাবু তাহাকে আমার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন—"এইটি আমার পুত্র।" তিনি তাহাকে বলিলেন, "নির্ম্মল তোমার কাকাকে প্রণাম কর।" সে অভিবাদন করিল। আমি তাহাকে সস্নেহে কাছে ডাকিলাম। এখন নির্ম্মল রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টার।

নির্ম্মলের সঙ্গে পরিচিত হইয়া যথাসময়ে তিনজনে একত্র আহারে বসিলাম। আহারান্তে আমি পার্শ্বের ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলাম।

অপরাহ্ণে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলে নবীনবাবু বলিলেন "সন্ধ্যার সময় নির্ম্মলের হার্ম্মোনিয়ম বাজান ও গান শুনিবেন না?—কাল ভোরের ট্রেণে না হয় বাড়ী যাইবেন।" অনুরোধ ঠেলিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় নবীনবাবু আবার আমাকে লইয়া বসিলেন। সেদিন সাহিত্যসম্বন্ধে বিশেষ আর কোনও কথা হইল না। নবীন বাবু হার্ম্মোনিয়ম লইয়া বাজাইতে বসিলেন, পুত্র নির্ম্মল গান করিতে লাগিল। গান কয়টি রবি বাবুর। বালকের কোমল কণ্ঠে গানগুলি বড়ই মিষ্ট লাগিল। গান শেষ হইলে নবীনবাবু বলিলেন, "দেখুন রবির কবিতা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তাঁহার গানগুলি বড় মধুর। বাঙ্গালা সাহিত্যে রবির আর কিছু স্থায়ী হউক বা না হউক তাঁহার গানগুলি survive করিবে।"

সে দিন ঐ পর্য্যন্ত। ভোরের ট্রেণে বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

নিরবচ্ছিন্নতা।

যে ধনুতে থাকে সদা গুণ আরোপিত,
সে ধনু হারায়ে ফেলে আপনার বল;
যে মন সতত থাকে চিন্তা নিয়োজিত,
সে মন হইয়া পড়ে একান্ত দুর্ব্বল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস। *

অনেক দেশ ঘুরিয়া, অনেক দ্বারে লাঞ্ছনা সহিয়া, উদাসীন, অনুতপ্ত হতভাগ্য ভারত-সন্তান—ম্লানমুখে শ্রান্তদেহে আজ আবার মাতৃমন্দিরের সিংহ-দ্বারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ আর তাহাদের জন্য পুরদ্বারে তূর্য্যধ্বনি হইবে না, আজ আর বিচিত্র-বেশধারিণী পুরবধূগণ "জলের ঝারি" দিয়া তাহা-দিগকে বরণ করিতে আসিবেন না। যে ভারত 'অনন্তকোটি জীবের বিচরণ-স্থল—বিংশতি কোটি মানবের আবাসভূমি'-সেই ভারতের কক্ষে কক্ষে আজ অন্ধকার ও বিজনতা উভয়ে মিলিয়া মরণের ধ্যান করিতেছে।—কিন্তু ঋষি-প্রতিভার আলোকে আমাদের সেই পথভ্রান্ত ভ্রাতৃগণ দেখিবেন, যে মা'র কোল ছাড়িয়া এতদিন তাঁহারা নামহীন নির্দ্দেশহীন শত শত প্রলোভনের আহ্বানে অনির্দ্দিষ্ট পথে দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই মা—জরাজীর্ণ অবসন্ন-দেহে বুকভরা মাতৃস্নেহ লইয়া এখনও তাঁহাদেরই প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন! তাঁহারা দেখিবেন,—তাঁহাদের সদাব্রত ভাণ্ডারে তাঁহাদের সেই রত্নাগারে এখনও

---

* আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস 'পূর্ণিমা' নাম্নী মাসিকপত্রিকায় আরম্ভ করিয়াছিলাম। পূর্ণিমার অকাল-তিরোধানে প্রবন্ধ শেষ হয় নাই, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময় আশানুরূপ অনুসন্ধানও করিতে পারি নাই। আচার্য্যযুগ, বৌদ্ধযুগ ও তান্ত্রিক যুগে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের চরমোন্নতি হইয়াছিল। এই তিন যুগের প্রায় ২০০ শত হস্তলিখিত কীটদষ্ট পুঁথি আমার কাছে আছে। স্বর্গীয় পিতৃদেব কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় পূর্ব্বপুরুষের উত্তরাধিকারসূত্রে—পুঁথিগুলি প্রাপ্ত হয়েন। কতকগুলি তিনি স্বয়ং নানাদেশ হইতে সংগ্রহ করেন। এই সকল সংহিতার অধিকাংশই এখনও মুদ্রিত হয় নাই। সংহিতা-গুলি পাঠ করিলে আর্য্য ঋষির অমানুষিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়; মনে হয়, বিংশ শতাব্দীর এই প্রতীচ্য সভ্যতার যুগে এই জীর্ণ গলিতপত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি লইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এখনও আমরা আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে পারি।

আর্য্য ঋষিগণের অতুলনীয় মহাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ—কথঞ্চিৎ রক্ষা করিবার জন্য, সেই সকল কীটদষ্ট পুঁথি অবলম্বনে আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস সঙ্কলিত হইল।

আর্য্য রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত, আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশ, উন্নতি ও অবনতির কথা—এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।—লেখক।

রত্নরাজি রহিয়াছে। এখনও শত শত কীটদষ্ট অতিজীর্ণ তালপত্রের পুঁথি "যকের' মত তাঁহাদের অমূল্য সম্পদ রক্ষা করিতেছে। এখনও সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অবিকৃত, কেবল অনেক দিনের অনাদরে বিশৃঙ্খল। এখনও সকল ভ্রাতায় মিলিয়া পরিত্যক্ত ভদ্রাসনের পুরাতন ঘরকান্না আবার আমরা গুছাইয়া লইতে পারি। তাহা হইলে আমাদের 'রত্নমালিনী রাজপুরী'—আমাদেরই আনন্দ উৎসবে "অহল্যা পাষাণীর মত আবার প্রাণময়ী হইয়া উঠিবে।

স্বদেশীকে পূর্ব্বতন মহত্ত্বের কথা বুঝাইতে গেলে, আয়ুর্ব্বেদের কথা পাড়িতে হয়। কেন না, আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস আমাদের উন্নতি ও সভ্যতার ইতিহাস। আয়ুর্ব্বেদ শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র নহে, পরন্তু আয়ুর্ব্বেদে জড় ও জীব-শক্তির সামঞ্জস্য। জীবন-মরণের ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতার নামই আয়ুর্ব্বেদ। জীবন যজ্ঞ। বিসর্জ্জনে সে যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা, বলিদানে তাহার সাধনা, মরণে তাহার পূর্ণাহুতি। এ বলিদানে প্রাণ-বলি নাই, প্রাণ-রক্ষা আছে। আমরা সে যজ্ঞ, সে মন্ত্র, সে ছন্দ, ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের স্রষ্টা নাই, ব্রাহ্মণ নাই, ব্রহ্মজ্ঞান নাই। দেবতার আবাহনী ঋক্ আর আমরা উচ্চারণ করিতে পরি না।

আমাদের বেদের ধর্ম্মের নামই গার্হস্থ্যধর্ম্ম। স্থালী চুল্লী লইয়া ভারতে প্রথম ধর্ম্ম স্থাপিত হয়। ভারতের গৃহ—দেবমন্দির; স্বামী হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক। গৃহধর্ম্ম পালন করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদকে উপেক্ষা করা চলে না। আর্ত্ত-পীড়িতের সেবা—ভগবানের সেবা। ভারতে পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, আমাদের পূর্ণ সুখ, পূর্ণ স্বাস্থ্য, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বিজ্ঞান আর আমরা ফিরিয়া পাইব না। জীবন অর্থে চিন্তা, তাই "নিশ্চিন্তপুর" বলিলে মানবের মহাসমাধিক্ষেত্র যমালয়ের কথাই আমাদের মনে পড়ে। জীবন মরণের সহায়; মরণ জীবনের স্রষ্টা। দুইটি সীমান্ত মরণের ব্যবধানই জীবন। এই ব্যবধান লইয়াই মনুষ্যজন্ম। আয়ুর্ব্বেদ—জন্ম মৃত্যুর "বর্ণপরিচয়," এ শাস্ত্রের প্রণেতা স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যাসাগর। ভারতে যে এত রোগ-শোক এ কেবল আয়ুর্ব্বেদের উপাসনা ছাড়িয়া। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের বেদ। আয়ুর্ব্বেদের বৈদিক যজ্ঞে পরবর্ত্তীকালে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দক্ষিণালালসায় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। যজমানের অদৃষ্টদোষে যজ্ঞোৎপন্ন নির্ম্মাল্য—আজ পরের হাতে গিয়াছে। নহিলে ব্যবসায়বাণিজ্যে, জ্ঞানে শিল্পে, ঋদ্ধি বুদ্ধিতে যে জাতি এক

সময় সম্মানিত হইয়াছিল সেই জাতির গৃহকোণে এখনও ১৫৩ খানি আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা বর্ত্তমান থাকিতেও বিদেশীয় ঔষধ ও পথ্য আসিবে কেন?

যে দিন হিমালয়ের আশ্রমনির্জ্জনতায় কল্লোলমুখরা সরস্বতীর কূলে সূর্য্য-করোজ্জ্বল পুণ্যপ্রভাতে জীবনের প্রেম ও পূর্ণতার জন্য স্বামিস্ত্রী মিলিয়া হোমাগ্নির পবিত্র শিখায় "হৈয়ঙ্গবীন" হবির প্রথম আহুতি দিয়াছিলেন, সেই দিন ভারতে আয়ুর্ব্বেদের জন্মের দিন। সে দিন ও এ দিনে অনেক প্রভেদ। রোগের কঠোর যন্ত্রণায় যখন অন্যান্য দেশের নিরুপায় অধিবাসিগণ পৃথিবীর বুকে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া শমনের আতিথ্য স্বীকার করিত, সেই স্মরণাতীত কালেও—ভারতের আয়ুর্ব্বেদ সংসারের দৈন্য হাহাকারের মধ্যে, বিধাতার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ বহিয়া আনিত।

বৈদিক, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক, আয়ুর্ব্বেদের এই পাঁচটি যুগ। আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিব; কোন্ যুগে কোন্ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় দিব। বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতার যে দুইটি বিভাগ আছে, এখনও সেই উভয় বিভাগের কতগুলি সংহিতার অস্তিত্ব আছে, প্রচলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতগুলি গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অতীতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে—আমরা তাহারও উল্লেখ করিব; সাধ্যমত প্রত্যেক গ্রন্থের সমালোচনা করিব।

বৈদিক যুগ।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদকে জগতের প্রথম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। এই ঋগ্বেদের সময়কে আমরা বৈদিক যুগ বলিব। ভাব মিশ্রের 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—জগতের ব্যাধি-ব্যাপন্ন অবস্থায় স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে এক খানি সংহিতার রচনা করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ প্রাচীন ঋষির মতে লোক-পিতামহ ব্রহ্মাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ভাবক। প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। দক্ষ আবার "স্বর্গ-বৈদ্যোপাধিক" অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন।

দক্ষও একখানি সংহিতার রচনা করেন, তাহার নাম 'দক্ষ দীধিতি'। অগ্নিবেশরচিত 'অঞ্জন'-নিদানের টীকাকার মিশ্রকেশ স্বকৃত টীকায় দক্ষদীধিতির ২১৪ টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মিশ্রকেশ পৌরাণিক ঋষি নহেন। রামায়ণ-মহাভারতে, কোনও পুরাণে বা কোনও কাব্যে "মিশ্রকেশের" নাম

পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইনি ঐতিহাসিক। 'ব্রহ্মসংহিতার' কেবল মাত্র নাম এবং 'দক্ষদীধিতির' ২।৪টি শ্লোক ব্যতীত বৈদিকযুগের আর কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে বৈদিকযুগের চিকিৎসাপ্রণালী অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ঋগ্বেদে আমরা "হৃদ্রোগ', "হরিমাণরোগ" "রাজযক্ষ্মা" ও "শ্বেতিরোগের" পরিচয় পাই। সুতরাং ঋগ্বেদের সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সূচনা হইয়াছিল।

আমরা সকলেই শুনিয়াছি, ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতির একটি শাখা মধ্যএসিয়া হইতে আসিয়া হিমালয়ের সানুদেশে ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশস্থাপন করেন। তাঁহারা অত্যন্ত শৌর্য্যশালী বলিয়া "সুর" বা "দেব" নামে অভিহিত হইতেন। ভারতের আদিম অধিবাসিগণ এই দেবগণকে আপনাদের বাসস্থানের দখলীসত্ব ছাড়িয়া দেয় নাই। এই ঘটনা লইয়া উভয় দলে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের নাম "দেবাসুরের যুদ্ধ।" এই যুদ্ধ বহুদিনব্যাপী হইয়াছিল। "আর্য্যদস্যুর" বিরোধে, গৌর ও ত্বচম্ কৃষ্ণম পক্ষীয় বহু সৈন্যই হতাহত হয়। আহতগণের রক্ষাকল্পে, এই সময়েই "শল্যতন্ত্রের" (Surgery) প্রথম উৎপত্তি। মহর্ষি সুশ্রুত বলেন, "দেবাসুরের যুদ্ধে অশ্বিনী কুমারদ্বয় অস্ত্রচিকিৎসা-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন।"

এক সময় ভগবান্ শূলপাণি, ক্রোধবশে ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের কৌশলে সেই ছিন্ন মস্তক পুনঃ সংযোজিত হয়। এই অসাধারণ চিকিৎসানৈপুণ্য দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসানৈপুণ্যের অনেক গল্প আছে। সেই সকল গল্প পাঠ করিলে আমরা তিনটি বিষয় বুঝিতে পারি। প্রথম—ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ অত্যন্ত প্রাচীন। দ্বিতীয়—শাস্ত্রকর্ত্তার উৎকর্ষে শাস্ত্রেরও উৎকর্ষ, অতএব আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মানব মস্তিষ্কের অসার কল্পনা নহে। তৃতীয়—তৎকালে রাজা বা দেবতারাও প্রজা-গণের মঙ্গলের জন্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন।

বৈদিক যুগের বৈদ্যগণ অশ্মরী (পাথুরী) কাটিয়া বাহির করিতেন; এক দেহের শিরা হইতে অন্যদেহের শিরায় রক্ত চালনা করিতে পারিতেন; অকর্ম্মণ্য ভগ্নপদ কাটিয়া ফেলিয়া রোগীকে "লৌহময়ী জঙ্ঘা" (লোহার পা) পরাইয়া দিতেন; কাহারও চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইলে তাঁহারা সেই বিনষ্ট চক্ষু নির্ব্বিঘ্নে উৎপাটিত করিতেন; মাথার খর্পর খুলিয়া মস্তিষ্ক-পীড়ার নিদান স্থির করিতেন;

জরাজীর্ণ শরীরে নবযৌবনের শক্তি আনিয়া দিতেন। ঋগ্বেদে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

শারীর বিদ্যা—শল্যতন্ত্র জানিতে হইলে, শারীর বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। শরীরস্থ যন্ত্রাদির গঠন বুঝিতে না পারিলে রোগীর দেহে অস্ত্র-প্রয়োগ করা যায় না। বৈদিক যুগের বৈদ্যগণ শারীর তত্ত্বে (Physiology) কৃতবিদ্য ছিলেন। যজ্ঞ-বহুল বৈদিক যুগে পশুবলি হইত, সেই সকল হত পশুর অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাঁহারা শারীর যন্ত্রের আকৃতি বুঝিতেন। ঋগ্বেদে—চচুবক, মস্তিষ্ক, অন্ত্র, কীকসা, যকৃৎ, হৃদয়, কুক্ষি, উদর, জঠর (অন্ননালি) প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে "রাজযক্ষ্মার" একটি স্বতন্ত্র ঋক্ আছে। যে হৃদ্‌পিণ্ডের গঠন দেখে নাই সে কখনও উক্ত ঋক্ রচনা করিতে পারিত না। জীবদেহ পাঞ্চভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত। বৈদিক আর্য্য বহু পূর্ব্বেই ইহা জানিতেন। * অস্থি, মাংস, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতির কার্য্য, ধমনীর স্পন্দনই জীবনী-শক্তি, তাঁহারা এসকল তত্ত্বও বুঝিতেন।

রোগ ও চিকিৎসা।—ক্রমে আর্য্য ও অনার্য্য বিবাদ বিসম্বাদ কমিয়া যায়। তখন "শল্যতন্ত্রের" কার্য্যও অনেকটা কমিয়া যায়; আর্য্যগণ কতকটা বিলাসী হইয়া পড়েন। বিলাসীর শরীর রোগের আশ্রয়স্থান। এই সময়ে আরও অনেকগুলি নূতন রোগ (জ্বর, অজীর্ণ, ধাতুদৌর্ব্বল্য) দেখা দেয়। কাযেই তখন "কায় চিকিৎসকের" প্রয়োজন হইল, রোগনাশক "ভিষক্ অথর্ব্বণের" আদরও বর্দ্ধিত হইল।

বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীর চিকিৎসক ছিলেন। এক শ্রেণীর নাম "শল্য বৈদ্য" ইঁহারা অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। আর এক শ্রেণীর নাম "ভিষক-অথর্ব্বণ" জ্বরাদি কায়রোগের চিকিৎসা করাই ইঁহাদের কার্য্য ছিল। বেদ লইয়া "বৈদ্য"। বৈদিক যুগে বৈদ্যই ছিলেন, ভিজিটসংগ্রহকারী, "কবিরাজ" ছিল না। তাঁহারা পথে পথে ডাকিয়া বেড়াইতেন।† তাঁহাদের গৃহপার্শ্বে ঔষধের উদ্যান থাকিত। শারীরজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহারা তুল্য পদার্থ ভাবিতেন।

নিদান।—রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, রোগের নিদান (কারণ) জানিতে হইবে। বৈদিক যুগের বৈদ্যেরা নিদান আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

* ঋক্‌সংহিতায় ১০ম ১৬শ ৩।৪।৫।৬।৭ শবদাহের মন্ত্র দেখুন।

† রুতং ভিষক—ঋ বে ৯ম ১১২।

তাঁহারা বহির্জ্জগতের সহিত মানবদেহের সম্বন্ধ বুঝিতেন ; সূর্য্যোদয় হইলে উত্তাপে ও আলোকে পৃথিবী হাসিয়া উঠে ; বায়ুর সাহায্যে সেই উত্তাপ ছড়াইয়া পড়ে ; জলের শৈত্যগুণে আবার তাহা শীতল হইয়া যায় ; এই প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিয়া, তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন—জীবদেহেও তাপের অস্তিত্ব আছে, সেই তাপে খাদ্য পরিপাক হয়। শরীরে এমন একটি শক্তি আছে—যে তাহার সাহায্যে রস রক্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। বৈদিক আর্য্য বুঝিয়াছিলেন—ত্রিধাতু শর্ম্মং বহতং। যে শক্তি বহির্জ্জগতে বায়ু, তাপ, জল,—শারীরক্ষেত্রে তাহাই বাত, পিত্ত, কফ। এই ত্রিধাতু প্রকৃতিস্থ থাকিলে দেহ সুস্থ থাকে, ইহাদের বিকৃতির নাম—ব্যাধি। এইরূপে পৃথিবীতে রোগের নিদান প্রথম আবিষ্কৃত হইল। ঋগ্বেদ যত দিনের, এ নিদানও তত দিনের।

ঔষধ।—ঋগ্বেদের সময় আর্য্য ঋষিগণ এক সহস্র একশত ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। পশুরা বিষাক্ত দ্রব্যে প্রায়ই মুখ দেয় না। বৈদিক আর্য্য পশুদিগের প্রতি খাদ্যনির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন। বৈদিকযুগের সোম-প্রস্তুত-প্রণালী—রসায়ন শাস্ত্রের সূতিকাগৃহ।

ভ্রূণতত্ত্ব।—জীবন যে কি পদার্থ বৈদিক ঋষি তাহা বুঝিয়াছিলেন ও জীবনের প্রথম অবস্থা জানিবার জন্য ভ্রূণতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সেই—বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু শ্লোকটি পড়িলেই আপনারা বৈদিক যুগের গর্ভতত্ত্ব যে কতদূর অনুসন্ধানের ফল—তাহা বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক Embryologyতে তদপেক্ষা নূতন কথা অধিক নাই।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব।—বৈদিক আর্য্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আজকাল ডাক্তারদিগের মুখে শুনিতে পাই, বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল ও আলোক—স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান। পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক আর্য্যও ইহা জানিতেন। "অবাতবাহি ভেষজম্, ত্বংহি বিশ্বে ভেষজঃ" "আপো যাচামি ভেষজম্" প্রভৃতি পড়িলে বুঝা যায়, তাঁহারা বায়ু, জল ও আলোককে অমৃতের সহোদর বলিয়া স্তব করিতেন। এখনও যে "আপোহিষ্টেতি" মন্ত্র ভাগীরথীর কূলে কূলে ধ্বনিত হয়—সে পবিত্র মন্ত্র আর কিছুই নহে—কেবল সূর্য্যরশ্মি ও বিশুদ্ধ সলিলের আবাহন। যে সকল বৃক্ষের বাতাস ভাল, তাঁহাদের নিকট সে সকল বৃক্ষ দেবসদৃশ পূজ্য ছিল।

ধাত্রী-বিদ্যা।—বৈদিক বৈদ্য মূঢ়গর্ভে প্রসূতির কুক্ষিভেদ করিয়া, যন্ত্রের সাহায্যে সন্তান আহরণ করিতেন।

বৈদিকযুগে "শল্যতন্ত্র" যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু শল্য-বৈদ্যের (অস্ত্র চিকিৎসক) ততটা আদর ছিল না। তাঁহারা ভদ্রসমাজে পতিত ছিলেন।* অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ইন্দ্রাদি দেবতার গুরু হইয়াও—বহুদিন যজ্ঞভাগে বঞ্চিত ছিলেন; বহুকাল পরে, যজ্ঞের ছিন্ন মস্তক সন্ধান করিয়া দিয়া যজ্ঞাংশভাগী হইয়া তাঁহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।[১]

বৈদিক যুগে "দৈবব্যাপাশ্রয়" চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। মন্ত্র, মণি, মঙ্গল, বলি, উপহার, হোম, উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি—এ চিকিৎসার অঙ্গ। কোন ঔষধই রোগীকে সেবন করান হইত না। ঔষধের কেবল বাহ্যিক প্রয়োগ হইত। মন্ত্রবলেই অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা হইত। বৈদিক ঋষিদিগের বিশ্বাস ছিল, ভূত, প্রেত, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির কোপেই লোকের রোগ হয়। ঋগ্বেদের নিঋতি—পাপদেবতা। এই পাপদেবতার অনুচরগণ, অসৃক, বসা ও রক্তমাংসাদির লোভে—জীবদেহে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। বোধ হয়, এই জন্যই রোগনিবারণের জন্য বৈদিক যুগের মন্ত্রাবলী সূচিত হইয়া থাকিবে। বৈদিক যুগের চিকিৎসা মন্ত্রপ্রধান হইবার আরও একটি কারণ—তৎকালীন চিকিৎসকগণ সকলেই ঋষি। "ঋষি" শব্দের অর্থ মন্ত্রদেষ্টা। মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়াই চিকিৎসা-বিজ্ঞান জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মন্ত্রই রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদাতা, এ কথা তান্ত্রিকযুগে বিশেষ করিয়া বুঝাইব।

বৈদিক আর্য্য জ্যোতিষ জানিতেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বুঝিতেন, তাঁহারা পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বও অবগত ছিলেন। কোন জ্ঞানই তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। সমগ্র মানব সমাজের স্থায়ী কল্যাণকল্পে—পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা জড়জগৎ ও জীবজগৎ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

---

* অস্ত্রচিকিৎসককে শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, এই জন্যই লোক অস্ত্রচিকিৎসককে অশুচি মনে করে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র ৺ মধুসূদন গুপ্ত শবচ্ছেদ করিলে, তৎকালে সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়।

১। সুশ্রুত, সূত্র ১অ, তৈত্তিরীয় সং।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

ইংলণ্ড

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতবর্ষীয়ের পক্ষে পার্লেমেণ্ট গৃহ দেখিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই প্রবল হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যে সময়ে ইংলণ্ডে ছিলাম সে সময় মহাসভার অধিবেশন বন্ধ ছিল, তাই আমার সভা দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু আমি দুই দিন ভিতরে যাইয়া সভাগৃহ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সেই কথা কিছু লিখিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে ট্রেণ ঢুকিবার পূর্ব্বেই সেতুর উপর হইতে নদীতীরস্থ পার্লামেণ্ট গৃহ দৃষ্টিগোচর হয়। নদীর তীরেই পার্লামেণ্টের প্রকাণ্ড বারাণ্ডা বা Terrace, প্রায় ৪০০ গজ লম্বা। ইহাই সভ্যদিগের এবং Seasonএর সময়ে Fashionable মহিলাদিগের বৈকালিক মিলনস্থান। আমি অবশ্য সে দৃশ্য দেখি নাই। রাজা যখন মহাসভায় আইসেন, তখন তাঁহার জন্ম যে প্রবেশদ্বার আছে, সাধারণের প্রবেশদ্বার তাহার পার্শ্বেই। এই দ্বার দিয়া ঢুকিয়া Royal Gallery, Prince's Chamber, হাউস অব লর্ডস্, লবি, সেণ্ট্রাল হল, হাউস অব কমন্স্, সেণ্ট ষ্টিফেন্স্ হল ও ওয়েষ্টমিনষ্টার হল, মাত্র এই কয়টি ঘর সাধারণে দেখিতে পায়। হাউস অব লর্ডস ও হাউস অব কমন্স্ ভিন্ন প্রত্যেক ঘরেই দেওয়ালে ও ছাতে অতি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। অনেকগুলি মর্ম্মর মূর্ত্তিও এই সব ঘরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

Royal Galleryতে প্রকাণ্ড দুইখানি ছবি—নেলসনের মৃত্যু ও ওয়াটার্লু-যুদ্ধের পর ওয়েলিংটন ও ব্লুচারের সাক্ষাৎ। এই দুইখানিই খুব প্রসিদ্ধ চিত্র। মুমূর্ষু নেলসনের মুখের ভাব অতি নিপুণতাসহকারে চিত্রিত। ইহার পরে Prince's Chamber। তথায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি। তাহার পরেই হাউস অব লর্ডস, প্রথমে দুই খানি রাজসিংহাসন—সম্মুখে সুপ্রসিদ্ধ Woolsack এবং তাহার পর আভিজাতদিগের আসন। সমস্ত আসন লাল মরক্কো-চর্ম্মে আবৃত, দেখিতে বাস্তবিকই খুব মহিমামণ্ডিত। উলস্যকটিতে বসিলে আরামের অত্যন্ত অভাব হয় বলিয়া মনে হইল। একটা উচ্চ বৃহৎ জলচৌকির ন্তায় আসন, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একটা চতুষ্কোণ তাকিয়ার ন্তায়

ঢিবি। ইহার উপর বসিলে কিছুমাত্র আরাম পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। চৌকিটা দেখিলে মনে হয় যে, উহাতে বসিলে পা মাটিতে ঠেকে না, ঝুলিয়া থাকে।

রাজসিংহাসন ছুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত এবং চন্দ্রাতপযুক্ত। গুটিকতক ধাপের উপর সিংহাসন স্থাপিত, এই সব ধাপে সভাধিবেশনের সময় যে সব Privy Councillor লর্ড নহেন, তাঁহারা বসিতে পান।

লর্ডদিগের আসনের পর একটা ছোট খোয়াড়ের বা আসামীর কাঠগড়ার মত রেলিং দেওয়া স্থান। কমন্‌স্ সভার বক্তা (Speaker) এবং সভ্যেরা এই স্থানে দাঁড়াইয়া রাজাদেশ এবং রাজার বক্তৃতা শুনেন। স্থানটি অতি সঙ্কীর্ণ; বোধ হয় কষ্টে ৮।১০ জনের স্থান হয়। কাযেই বিশেষ বিশেষ আবশ্যক অধিবেশনের সময় ভদ্রলোকের নিগ্রহের সীমা থাকে না। হাউস্ অব লর্ডসের পরেই Peers' lobby বা antechamber তথায় লর্ডরা তাঁহাদের ওভার কোট এবং টুপি রাখেন, প্রত্যেকের কার্ডসংযুক্ত একটি করিয়া খোঁটা আছে। তাহার পর সরু পথকক্ষ। ইহার ছুই পার্শ্বে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছবি। তাহার পরে মধ্যস্থ হল অতি সুন্দর ও শুভ্র। এই হলে গ্ল্যাডষ্টোন, সার উইলিয়ম হারকোর্ট, লর্ড জন রাসেল প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। কয়েকটি স্থান এখনও অনধিকৃত; ভবিষ্যতে বোধ হয় অ্যাসকুইথ, ব্যালফোর প্রভৃতির মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে। ইহার পর আর একটি সরু পথকক্ষ; এই স্থানেও খানকতক সুন্দর ছবি আছে, তাহার মধ্যে The Last Sleep Argyll সুপ্রসিদ্ধ। অতঃপর Commons লবি এবং তৎপরেই House of Commons; প্রথম দেখিলে মনে একটা প্রকাণ্ড হতাশার ভাব আইসে। এই ক্ষুদ্র স্বল্পালোকিত কক্ষ এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধানতম শাসন ও অধিবেশনের স্থান! বাস্তবিকই ঘরটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন। এক ধারে ও মধ্যে স্পিকারের চন্দ্রাতপমণ্ডিত আসন, সম্মুখে কেরাণীদিগের টেবল্, এবং ছুইপার্শ্বে চারিখানি করিয়া বেঞ্চ। বেঞ্চগুলি অবশ্য সবুজবর্ণ চামড়ায় মণ্ডিত; Green benches of Westminster সকলেই জানেন। বেঞ্চগুলি ঘরে লম্বা লম্বি সাজান, মধ্যে একটা রাস্তা, তাহারই নাম gangway ঘরে আন্দাজ ৪৫০ জন সভ্যের অতি কষ্টে স্থান হয়, অথচ সভ্যের সংখ্যা ৬৭০। উপরে গ্যালারি, পুরুষ ও স্ত্রীলোক দর্শকদিগের স্থান। স্ত্রীদর্শকের নির্দ্দিষ্ট স্থানের সম্মুখে অতি অস্বচ্ছ আবরণ। য়ুরোপের মধ্যে এই একস্থানে মাত্র পর্দ্দা আছে বলিয়াই

বোধ হয় এই স্থানে পর্দার এত বেশী কড়াকড়ি। ঘরে ঢুকিবার দরজার উপরেই একটি ঘড়ি এবং এই ঘড়ির উপরে যুবরাজের আসন। ছাতে প্রকাণ্ড আলোকাধার—স্ফটিকনির্ম্মিত। রক্ষীর নিকট শুনিলাম, এই আলোক প্রজ্জ্বালিত হইলে ঘরের শোভা খুব মনোরম হয়।

St. Stephen's Hall অতি সুন্দর—প্রশস্ত—শুভ্রমর্ম্মরনির্ম্মিত দীর্ঘ কক্ষ। দুইধারে অনেক রাজা রাণী ও হ্যাম্পডেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জনগণের মর্ম্মরমূর্ত্তি। তৎপরে গুটিকতক সিঁড়ি দিয়া দর্শক ওয়েষ্টমিনষ্টার হলে পৌছিবেন—হলটি অতি প্রকাণ্ড এবং স্তম্ভশূন্য। পৃথিবীতে এত বড় স্তম্ভবিহীন হল আর আছে কি না সন্দেহ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫০ ফুট এবং উচ্চে ৯০ফুট। ছাতের খিলান ওককাষ্ঠমণ্ডিত। হলের এক পার্শ্ব বেদীর ন্যায় একটু উচ্চ। হলে ঢুকিলেই একটা গাম্ভীর্য্য অনুভূত হয় এবং মেকলের সেই প্রসিদ্ধ বিবরণ মনে পড়ে। কত প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনা এই হলে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম চার্লস, সার টমাস মুর, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি কত সম্ভ্রান্ত লোকের বিচার এই স্থানে হইয়াছে। হলের দুই পার্শ্বে ইংলণ্ডের জনকতক রাজা রাণীর মর্ম্মরমূর্ত্তি। হলের হর্ম্ম্যতলোপরি খানকতক ক্ষোদিত ফলক; যে স্থানে বিচারের সময় রাজা প্রথম চার্লস দাঁড়াইয়াছিলেন, গ্ল্যাডষ্টোনের এবং রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের শবদেহ যে যে স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল এবং আর্ল অব ষ্ট্রাফোর্ডের বিচারের সময় তিনি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে এই সকল ফলক প্রোথিত। হল হইতে বাহির হইয়া প্রকাণ্ড উঠান New Palace Yard এবং সম্মুখে উত্তরের কোণে প্রসিদ্ধ Clock Tower এবং Big ben নামক ঘণ্টা। ঘড়িটি অতি উচ্চে বসান; স্তম্ভটি বোধ হয় ৩০০ ফুট উচ্চ। একদিন দেখিলাম, কতকগুলি মিস্ত্রি স্তম্ভগাত্রে ভারা বাঁধিয়া মেরামত করিতেছে। নিম্ন হইতে লোকগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

বলিতে ভুলিয়াছি, Westminster Hall এর সম্মুখেই অলিভার ক্রমওয়েলের প্রস্তরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

New Palace Yard এর পার্শ্বেই সুবিখ্যাত ওয়েষ্টমিনষ্টারের সেতু এবং এই স্থান হইতে Victoria Embankment নামক সুবিশাল নূতন রাস্তা টেম্‌স নদীর ধার দিয়া প্রায় ১॥ মাইল চলিয়া গিয়াছে। প্রথমেই ইংলণ্ডের কাহিনী-প্রসিদ্ধ রাণী বোডিসিয়ার রথে দণ্ডায়মান প্রতিমূর্ত্তি।

পার্লামেণ্টের পরেই ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবির কথা মনে হয়। অনেকের ধারণা আছে—অন্ততঃ আমার ছিল—যে, আমাদের দেশে যেমন গির্জ্জার সন্নিকটস্থ ভূমিতে মুক্ত আকাশতলে মৃতের কবর থাকে অ্যাবিতেও বুঝি সেইরূপ। কিন্তু দেখিলাম, তাহা নহে। এই অ্যাবিতে এবং য়ুরোপের সমস্ত প্রধান ভজনালয়ে—ঘরের ভিতর হর্ম্ম্যতলে মৃতের সমাধি; দর্শক ও জনসাধারণ সেই সব সমাধির উপর দিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করেন। প্রধান প্রধান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের সমাধির উপর দিয়া পদক্ষেপ করিতে কাহাকেও কুণ্ঠিত হইতে দেখি নাই। কিন্তু আমার বাস্তবিকই অত্যন্ত দ্বিধা বোধ হইত। অ্যাবির স্তম্ভের ও দেওয়ালের গাত্রে প্রসিদ্ধ লোকদিগের স্মৃতিফলক, কাহারও কাহারও প্রতিমূর্ত্তি। সমব্যবসায়ীলোকদিগের স্মৃতিফলক যথাসম্ভব একই স্থানে সংরক্ষিত এবং সেই অনুসারে অ্যাবির অংশবিশেষের নাম Poets' Corner, Little Poets' Corner, Statesmens' Aisle প্রভৃতি। হয় ত মৃতদেহ যেস্থানে সমাহিত আছে, স্মৃতিফলক তথা হইতে দূরে স্থাপিত।

অ্যাবির অংশবিশেষ, যথায় রাজা রাণীদিগের শব সমাহিত, তাহার নাম Chapel of Henry vii (সপ্তম হেনরীর চ্যাপেল)। এই অংশ দেখিতে সোম ও মঙ্গলবার ভিন্ন প্রত্যহ ৬ পেনি দর্শনী দিতে হয় ও একজন পাদ্রী দর্শকদিগকে লইয়া সমস্ত অংশ বেশ করিয়া দেখাইয়া ও তাহার ইতিহাস বুঝাইয়া দেন। ইহার এক পার্শ্বে প্রসিদ্ধ অভিষেকের আসন; একটি অতি সামান্য ভগ্নপ্রায় জরাজীর্ণ কাষ্ঠাসন, তাহার নিম্নে একখানা প্রকাণ্ড ময়লা পাতর। এই চেয়ারে প্রথম এডওয়ার্ড হইতে পঞ্চম জর্জ্জ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সমস্ত রাজারাণীর অভিষেক হইয়াছে। চেয়ারখানি পূর্ব্বে খোলা থাকিত কিন্তু অনেকে তাহার গাত্রে নাম ক্ষোদিত করায় এক্ষণে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সাধারণে তাহা স্পর্শ করিতে পায় না।

ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবিতে কত প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি! এই স্থানে কিছুক্ষণ থাকিলে মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। রাজা রাণীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এইস্থানে চসার, মিল্টন, বেন্‌জনসন, সেকস্‌পীয়ার, ডিকেন্স, থ্যাকারে, মেকলে, স্কট, টেনিসন, বার্ণস, ব্রাউনিং, রাস্কিন, প্রভৃতি সাহিত্যিক; ষ্টিফেন্‌সন, ক্রনেল, কেলভিন, নিউটন, হার্শেল, ডারউইন, প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্য; পিট্‌, পীল, কবডেন, বার্ক, গ্ল্যাডষ্টোন, ডিসরেলি প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ ও ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ওয়ারেন হেষ্টিংস, আউটর‍্যাম, লরেন্স প্রভৃতির মৃতদেহ

সমাহিত বা স্মৃতিফলক স্থাপিত। বাস্তবিকই ইহা ঐতিহাসিক ছাত্রের পক্ষে এক মহাপীঠস্থান।

লণ্ডনের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিশদ বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম, বা ন্যাশনাল গ্যালারি বা টেট গ্যালারির বর্ণনা করিয়া তাহাদের চিত্র পাঠকের সম্মুখে স্থাপিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। বিশেষ চিত্রশালাগুলির বর্ণনা লিখিয়া কোনও লাভ নাই। যদি চিত্রের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বরং পাঠকের ধৈর্য্য থাকিত। তবে ম্যুজিয়মগুলির মধ্যে South Kensington ম্যুজিয়মের কথা কিছু বলিতে হয়। তথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশের খনিজ কৃষিজ প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যের নমুনা সংরক্ষিত। ভারতবর্ষীয় বিভাগে ভারতের যাবতীয় খনিজ পদার্থের নমুনা আছে। বঙ্গদেশের পাটের গাছ হইতে দাড়ী পর্য্যন্ত আছে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আছে। আর আছে, আমাদের রাজা ও তাঁহার পিতা যখন ভারতবর্ষে আইসেন তখন যে সকল অভিনন্দনপত্র পাইয়াছিলেন সেই সমস্ত অভিনন্দনপত্র। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সিংহাসন প্রভৃতি যাহা তাঁহারা উপহার পাইয়াছিলেন, তাহাও এই স্থানে সংরক্ষিত। এস্থলে বলা উচিত যে, বিটিশ ম্যুজিয়মে একখানি প্রকাণ্ড রথ আছে।

লণ্ডনের প্রধান রাজাবাস বকিংহাম প্রাসাদে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তবে রাজা বৎসরের অধিকাংশ সময় যে স্থানে থাকেন সেই উইণ্ডসর প্রাসাদ রাজা অনুপস্থিত থাকিলে সাধারণে দেখিতে পায়, দর্শনী সাধারণতঃ এক শিলিং, বুধবারে দর্শনী লাগে না। আমি অবশ্য একটা বুধবারেই গিয়াছিলাম।

লণ্ডন হইতে রেলে বাইশ মাইল যাইয়া প্রাসাদের অতি নিকটেই ষ্টেশনে নামিতে হয়। প্রবেশদ্বার দিয়া ঢুকিয়া প্রথমেই St. George's Chapel দেখা যায়। ইহার ভিতর যত Knights of the Garterএর পতাকা দোদুল্যমান এবং চতুষ্পার্শ্বে অ্যালবার্ট ভিক্টর প্রভৃতির সমাধি। চ্যাপেল হইতে বহির্গত হইয়া লর্ড চেম্বারলেনের আপিশে টিকিট লইতে হয়। তাহার পর দ্বারদেশে টিকিট দেখাইলে জন কুড়িক দর্শককে লইয়া এক এক জন রাজভৃত্য ঘরগুলি দেখায়। ঘরগুলি অবশ্য মহামূল্য আসবাবে ও চিত্রে পরিপূর্ণ। দেখিলে মনে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতির যোগ্য আবাস বটে। একটা ঘর ওয়েলিংটন ও তাঁহার সমসাময়িক লোকের ও ঘটনার চিত্র সম্বলিত; আর এক ঘরে যুদ্ধে জিত অনেক পতাকা লম্বমান, তাহার মধ্যে সিপাহিবিদ্রোহে জিত কতকগুলি

পতাকাও আছে। ভারতবর্ষ হইতে নীত অনেক মহামূল্য দ্রব্যসামগ্রী এই প্রাসাদে স্থান পাইয়াছে।

প্রাসাদের পার্শ্বে প্রকাণ্ড পার্ক, প্রায় পাঁচ মাইল লম্বা। দূরে তৃতীয় জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তি। এক কোনে ফ্রগমোর স্মৃতিমন্দির। তথায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ সমাহিত। আমি যে দিন গিয়াছিলাম সে দিন তথায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

উইণ্ডসরের নিকটে টেম্‌স নদীর অপর পারে ইটন কলেজ। বলিয়া রাখা উচিত যে, এইস্থানে টেম্‌স সামান্য খালের মত। এই ইটন বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডের অভিজাত বংশীয় অনেকেই পাঠাভ্যাস করেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; কাযেই বহুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রবেশের আবেদন পাঠাইতে হয়। শুনিলাম, দশ বার বৎসর পরে যে সকল বালক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবে তাহাদের নামেও এখন হইতে আবেদন করা হইতেছে। একটি ঘরে ছাত্ররা নিজ নিজ নাম ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের নাম দেখা যায়; ২।১টি ভারতবর্ষীয় রাজপুত্রের নামও আছে।

বিদ্যালয়ের সম্মুখেই একটি নূতন শ্বেত বর্ণের বাটী। এইটি এই বিদ্যালয়ের যে সকল ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বোয়ার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন।

লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে Hampton Court অন্যতম। এই প্রাসাদে অবশ্য রাজা অধুনা বাস করেন না; কিন্তু রাজকীয় কক্ষগুলি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। অনেকগুলি বহুমূল্য চিত্রে এই প্রাসাদ সুশোভিত। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে একটি দেড়শত বৎসরের পুরাতন দ্রাক্ষা লতা আছে। আমি যে দিন দেখিয়াছিলাম সে দিনও তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ফলিয়াছিল। সমস্ত গাছটি একটি কাচের ঘরে স্থাপিত। উদ্যানে আর একটি কৌতুকজনক ব্যাপার আছে—সেটি গোলক ধাঁধাঁ। অনেকে বর্দ্ধমানের গোলাপ বাগে গোলক ধাঁধাঁ দেখিয়া থাকিবেন। ইহাও সেই জাতীয়। প্রবেশ অতি সহজ, নিগম বড় কঠিন। আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ঘুরপাক খাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, নাকালের একশেষ। একজন রক্ষী দ্বারের নিকট মঞ্চে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে খুব নিকটেই দেখিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার নিকট পৌছিতে পারিতেছিলাম না; বড় মজা। প্রাসাদের একটি গেটের উপর একটি প্রকাণ্ড জ্যোতিষিক ক্লকঘড়ি আছে।

আর একটি বর্ণনীয় স্থান Crystal Palace বা স্ফটিক প্রাসাদ। সকলেই

জানেন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম লণ্ডন প্রদর্শনী হয় তখন ইহা নির্ম্মিত হয়। প্রকাণ্ড লম্বা একটি হল (প্রায় ১৬০০ ফুট) ছাত ও দেওয়াল সমস্তই কাচনির্ম্মিত। ধূমে ও লণ্ডনের কুজ্ঝটিকায় কাচ খুব মলিন হইয়াছে; কিন্তু এখনও ইহার শোভা অতুলনীয়। হলের ভিতর অনেকরূপ ক্রীড়াকৌতুকের স্থান আছে। একটি প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ আছে, আর আছে একটি অতি বৃহৎ অর্গান বাদ্যযন্ত্র—তাহাতে প্রায় ৪৫০০ পাইপ। হলের বাহিরে দুইটি বড় বড় মিনার। ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসের প্রাঙ্গণ বড় সুশোভন। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাগান, কোথাও ক্রীকেট ফুটবল খেলার স্থান, কোথায়ও উড়িবার কল বেলুন প্রভৃতি উড়িবার স্থান, কোথাও সন্তরণাগার; সবই বৃহৎ ও সুরক্ষিত। একটি রেলেওয়ে ষ্টেশন নিম্নতলের নিকটে এবং আর একটি হলের সমতল; তাহাদের নাম যথাক্রমে Lowlevel ও Highlevel ষ্টেশন।

একদিন লণ্ডনের হাইকোর্ট দেখিতে গিয়াছিলাম। বাটীটি খুব প্রকাণ্ড বটে; কিন্তু আদালতকক্ষগুলি আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের কক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বোধ হইল। তদ্ভিন্ন আলোকও কম বোধ হইল। সুবিধার মধ্যে দেখিলাম, সাধারণ দর্শকের স্থান উচ্চে গ্যালারিতে; কাযেই ব্যবহারজীবদিগের গতিবিধির অসুবিধা তত হয় না। কিন্তু বিস্ময়কর দেখিলাম, কৌন্সলিদিগের আসন। চেয়ার নাই, সরু সরু বেঞ্চ ও সরু সরু টেবল, ইস্কুলের Forms এর ন্যায়। সম্মুখের সারি K. C. দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। পশ্চাতে আর সব ব্যারিষ্টারদিগের বসিবার ব্যবস্থা। নথিপত্র ও নজিরের পুস্তকাদি রাখার অত্যন্ত অসুবিধা। আমি যে দিন গিয়াছিলাম তিনটি আদালতে বিষয় ঘটিত একটি মোকদ্দমা চলিতেছিল।

লণ্ডন টাওয়ার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া লণ্ডনের প্রসঙ্গ শেষ করিব। সকলেই জানেন, টাওয়ার একটি দুর্গ এবং পুরাকালে রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে এই স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তথাকথিত গোখাদক Beefeater নামক টাওয়াররক্ষীদের এবং তাহাদের বিচিত্র পোষাকের কথাও অনেকে শুনিয়াছেন। এই দুর্গের দক্ষিণে টেম্‌স নদী ও অন্য তিন দিকে পরিখা। টেম্‌সের দিকে একটি সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গের লৌহময় কবাট আছে, এই দরজার নাম Traitors' Gate বা রাজদ্রোহীর কবাট। এই দ্বার দিয়া জলপথে অপরাধীদিগকে টাওয়ারে আনয়ন করিত। সম্মুখেই Bloody Tower ইহার এক কক্ষে তৃতীয় রিচার্ড তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের প্রাণসংহার করেন। সেই জন্য ইহার এই নামকরণ।

দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি বাটী আছে; কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য তিনটি—হোয়াইট

টাওয়ার, ওয়েকফিল্ড টাওয়ার ও বিচাম টাওয়ার। প্রথমোক্তটির মধ্যে অস্ত্রাগার স্থাপিত। এই স্থানে বহুপুরাকালীন হইতে আধুনিক পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্মাদি রক্ষিত, তদ্ভিন্ন সপ্তম এডওয়ার্ড ও তাঁহার মহিষীর অভিষেক-সজ্জাও আছে। ওয়েকফিল্ড টাওয়ারের সম্মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শবাধারবাহী কামানের গাড়ীখানি দেখা যায়। ভিতরে রাজার মণিমুক্তাদি আছে। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা দেখা হয় নাই। সংস্কার উপলক্ষে সে গৃহ তখন বন্ধ।

বিচাম টাওয়ারের সন্নিকটে অল্প একটু স্থান বাধান রহিয়াছে। সেই ভীষণ স্থানে পূর্ব্বে অপরাধীদিগের মস্তকচ্ছেদন হইত। এলিজাবেথের মাতা এন বোলিনের মস্তক এই স্থলেই স্কন্ধচ্যুত হইয়াছিল। এই টাওয়ারের ঘরেই অপরাধীদিগের কারাকক্ষ ছিল। অনেক হতভাগার হস্তলিপি প্রাচীরগাত্রে বিদ্যমান। স্যর ওয়া-ল্টার র‍্যালে—ধূমপায়ীদের partou saint—তন্মধ্যে একজন। লিখা প্রায়ই খুব অস্পষ্ট; তবে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা অনেক পাঠ উদ্ধার (বা আবিষ্কার) করিয়াছেন।

লণ্ডনে অবস্থান কালে দুই দিন জাপান ব্রিটিশ প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। অতি প্রকাণ্ড প্রদর্শনী; কয়েক ঘণ্টায় তাহার কিছুই দেখা হয় না। এক স্থানে কতকগুলি (বোধ হয় ১৬টি) মোম নির্ম্মিত পুত্তলিকার দ্বারা অতি পুরাকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত জাপানের বেশভূষা ও হাব ভাব চিত্রিত ছিল। আর এক স্থলে কিছুদূর পর্য্যন্ত জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অঙ্কিত। রজনীতে এরূপ ভাবে সেই স্থান আলোকিত থাকিত যে, দেখিলে ভ্রম হইত যেন বাস্তবিকই জাপানে আছি। এই দুইটি চিত্র আমার নিকট বড় ভাল লাগিয়াছিল। আর এক ঘরে কি করিয়া কাচ প্রস্তুত হয় এবং এক দলা গলান কাচ হইতে কিরূপে সুন্দর বোতল, গ্লাস, ফুলদানি প্রভৃতি হয় প্রত্যক্ষ দেখাইতেছিল, সে গৃহও বড় কৌতুহলোদ্দীপক।

এক দিন ট্রেণে গুটিকতক জুয়াচোর উঠিয়া তেতাস খেলিতে আরম্ভ করে এবং আমাদিগকেও যোগ দিতে বলে। আমার সঙ্গী একটি যুবক তাহাদের প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ হইয়া খেলিতে চাহেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহাকে খেলিতে দিলাম না। ইহা দেখিয়া জুয়াচোররা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ব্যাপার কত দুর গড়াইত জানি না, ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া পড়াতে তাহারা পলায়ন করিল।

ম্যাডাম টুসো (Tussaud's)র প্রদর্শনী একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এই স্থানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নরনারীর মোমে গঠিত মূর্ত্তিআছে। অনেক পাপী ও নরহত্যা-

কারীর মূর্ত্তিও আছে। তদ্ভিন্ন আছে জুয়াড়ির দৃশ্য, আত্মঘাতীর দৃশ্য, জাল মুদ্রা প্রণেতার কর্ম্মস্থলের দৃশ্য, ফ্রান্সের গিলোটিনের দৃশ্য ও একটি টুকরা, ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লবে হত রাজা রাণীর কাটা মুণ্ডের cast প্রভৃতি অনেক বীভৎস জিনিষ।

আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন অনেকগুলি ভারতবাসী অল্পদিনের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। তাই বিজয়ার দিন লণ্ডনপ্রবাসী ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের সম্মানার্থ এক ভোজের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে আমিও ছিলাম। স্যর হেনরি কটন সভাপতি ছিলেন, কারণ, তাঁহার সে দিনকার উক্তিতে, তিনি ভারতবর্ষের দত্তক পুত্র।

এই ভোজের পরদিন আমি লণ্ডন ত্যাগ করি।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু

পুরস্কার।

(হায়েন)

যেখানে ঝরিয়া পড়ে মোর আঁখি জল,
সেখানে বিকশি' উঠে ফুল শত শত ;
তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস উঠে ভেদি' হৃদিতল,
কোকিলের কাকলিতে হয় পরিণত।

আমারে বাসিলে ভাল হ'বে লো তোমার
মধুর—মধুরতম ফুটে যত ফুল ;
বাতায়নপথে তব গা'বে অনিবার
সুমধুর কলকণ্ঠ কোকিলের কুল।

সমালোচনা।

গোধূলি।*

ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় কাবতা-লেখকের সংখ্যা, পাঠকের সংখ্যা অতিক্রম করিয়াছে বলিলে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু, দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, কবিতার এই অতি-প্লাবনের দিনেও, পাঠযোগ্য, উপভোগযোগ্য, সমাদরযোগ্য কবিতা অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা কবিতার এই শোচনীয় দুর্দ্দিনে 'গোধূলি' কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। কাব্যামোদী পাঠকবৃন্দের নিকট এই নব-প্রকাশিত কাব্যখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ভুজঙ্গধর বাবু ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গভারতীর চরণে 'মঞ্জীর' উপহার দিয়া কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। 'গোধূলি' তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। ইহার অধিকাংশ কবিতাই আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত। ইহাতে প্রথম যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য ও বাসনার তীব্র জ্বালা নাই। সেই হিসাবে ইহার নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

'গোধূলি' বলিলেই, একটি শান্তি, সংযম ও বিরামের ভাব মনে উদিত হয়। গোধূলিচিত্রের বিশেষত্ব—কর্ম্মক্ষেত্র হইতে জীবগণের গৃহাভিমুখিতা। গোধূলি-বেলায়, শ্রান্ত—ক্লান্ত মানব দিবসের কর্ম্ম সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে, ধেনুদল গোষ্ঠ হইতে লোকালয়ে ফিরিয়া আইসে, বিহঙ্গকুল বিশ্রামের আশায় কুলায়ে ফিরিয়া যায়। 'গোধূলি'-কাব্যের বিশেষত্বও ইহার অন্তর্মুখিতা। ইহাতে বৈচিত্র্যময় বহির্জগৎ হইতে ধ্যানপরায়ণ কবির নিগূঢ় অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ লাভের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। কাব্য ও কবিত্বের সর্ব্ববাদি-সম্মত সংজ্ঞা নির্দ্দেশের নিষ্ফল প্রয়াস না করিয়া আমরা একেবারে 'গোধূলি' কাব্যখানি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। প্রারম্ভেই গোধূলি ছায়ায় ভুজঙ্গ দেখিয়া, আশা করি, কেহ ভীত হইবেন না।

---

* শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম্, এ, বি, এল প্রণীত। শ্রীদুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

'গোধূলি'র কবিতাগুলি 'চিন্ময়ী' 'সিন্ধু-সংবাদ' 'ঋতুমঙ্গল' 'ঐকতান' ও 'অরণি' এই পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কবিতাগুলির শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বত্র কবির সহিত একমত হইতে পারি নাই। ভাবের স্বচ্ছতা ও ভাষার প্রবাহে 'চিন্ময়ী' অধ্যায়ের কবিতা কয়টিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। এগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত মুক্ত পয়ার ছন্দে রচিত। 'ঋতু-সম্মিলন' পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে রবীন্দ্র বাবুর 'মানস-সুন্দরী' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতা মনে পড়ে। ভূমিকায় প্রকাশক লিখিয়াছেন, "চিন্ময়ী অধ্যায়ে আদ্যাশক্তি-রূপিণী প্রকৃতি মানবী মূর্ত্তিতে কবির চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়রাজ্যে নিজের বিশ্বরূপ বিস্তার করিতেছেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার মর্ম্মকন্দরে চিদ্-বহ্নিনীরূপে প্রবাহিত হইয়া আপনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যামূর্ত্তি প্রকটিত করিতেছেন।"—লেখকের ভাষা, বক্তব্য বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিতে পারে নাই।—'কে তুমি' এবং 'বিশ্বরূপা' এই কবিতা দুইটি অন্তর্গূঢ় বিয়োগ-ব্যথায় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। 'বিশ্বরূপা'—আদ্যাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি সন্দেহ নাই। কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, "সঙ্গমে নৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।" এই কবিতাটির শেষাংশে যে "ষট্‌চক্রভেদ" বর্ণিত হইয়াছে পাদটীকা সত্ত্বেও তাহা তান্ত্রিক সাধক ব্যতীত সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে।

'সিন্ধু-সংবাদ' অধ্যায়ের কবিতাগুলি পুরীতে সমুদ্রতীরে রচিত। 'সিন্ধু' কবিতায় কবি অনন্ত আকাশতলে অনন্ত অম্বুনিধির সম্মুখে দাঁড়াইয়াও ক্ষুদ্র মানবের মহত্ত্ব এবং সনাতনত্ব উপলব্ধি করিতেছেন—

ওহে নীল পারাবার যদি ও এ দেহ ছার
অতি ক্ষুদ্রতম,
তথাপি এ তনু-কূলে যে অকূল হৃদি দুলে
সে যে সিন্ধু সম!

* * *

তব জন্ম, রত্নাকর! নহে জ্ঞান-অগোচর,
জানে ইতিহাস;
কিন্তু কেহ নাহি জানে কোথা কবে কোন্‌খানে
আমার বিকাশ।

* * *

হয়ত আসিবে কাল তুমি যাবে অন্তরাল
শুকাইবে নীর,
আমি কিন্তু কতবার ধরিব বাসনাগার
কামনা-শরীর।

সিন্ধুর উপরিভাগে তরঙ্গভঙ্গ, নিত্য চাঞ্চল্য ও বিক্ষুব্ধ গর্জ্জন, কিন্তু তল-দেশে কোন আলোড়ন নাই, তথায় কেবল শান্তি ও নিরবতা। কবি বলিতেছেন :—

এ চিত্ত-পয়োধি মোর তেমনি গর্জ্জে ঘোর
বাহিরে কেবল
মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় তরঙ্গ তার
করে কোলাহল।
কিন্তু সে সবার তলে সুষুপ্তির স্থির জলে
শান্তি অচঞ্চল
ঘুমায় আনন্দ-কন্দ নির্ব্বিকার নিরদ্বন্দ্ব
আত্মা নিরমল।

উপনিষদের একটি মন্ত্রেও এই তত্ত্বেরই আভাস আছে,—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

সংসারের সুখঃদুঃখ, জন্মমৃত্যু বৈচিত্র্যচাঞ্চল্য প্রবাহের অন্তরালে এক অর্থাৎ আত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন।—

কবি বলিতেছেন :—

পাইলে সন্ধান তার আসা যাওয়া অনিবার
থেমে যাবে মোর।
না রহিবে তুমি আমি না র'বে দিবস-যামী
কেটে যাবে ঘোর।

সিন্ধুসংবাদ অধ্যায়ের 'সিন্ধু ও শম্ভু' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। কবি সিন্ধুকে সতীহারা ভোলানাথ কল্পনা করিয়া বলিতেছেন :—

ভোলারে ভুলায়ে সতীরে লুকায়ে
কোথায় রেখেছ হরি?
তাই তব দ্বারে যাচে সে তাহারে
কিবা দিবা বিভাবরী।
হাঁকিছে ঈশান ডাকিছে বিষাণ
"দেহ, দেহ জগন্নাথ!"—

'ঋতুমঙ্গল' অধ্যায়ের প্রথম তিনটি ভিন্ন সমস্ত কবিতাই কালিদাসের ঋতুসংহার ও মেঘদূত হইতে রূপান্তরিত। প্রকাশক লিখিয়াছেন, এগুলি কবির বহু পূর্ব্বের রচনা; এবং "এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাবসূত্রে গ্রন্থনযোগ্য নহে।" তাহা না হউক, এই কবিতা কয়টি ছন্দের বৈচিত্র্যে এবং গীতি কবিতার ঝঙ্কারে সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই অনুবাদে পাঠক কালিদাসের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকের স্বীয় সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী শক্তির পরিচয়ও প্রাপ্ত হইবেন। মেঘদূতে যেস্থানে বিরহী যক্ষ মেঘের নিকট বিরহ-শয়নে সন্নিষণ্ণা প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রা সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি প্রাণস্বরূপিণী প্রিয়তমার বর্ণনা করিতেছেন, সেই মনোজ্ঞ শ্লোক কয়টিই ভুজঙ্গ বাবুর অনুবাদের বিষয়ীভূত। অনুবাদ-নৈপুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ সুপরিচিত প্রথম শ্লোকটি এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যেক্ষীণা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥

অনুবাদ:—

"হেরিবে সে গৃহমাঝে রমণী-রতন রাজে
পক্ক-বিম্বাধরা শ্যামা শিখরি-দশনা;
বহিয়া নিতম্বভার মন্থর গমন তা'র
ক্ষীণ কটি, নিম্ননাভি, কুরঙ্গ-নয়না।
পীন পয়োধর ধরি' তনু মন্দ নত, মরি,
প্রথম যুবতী করি' শিল্প রচনার
বিরলে গড়িলা বিধি প্রেয়সী আমার।"

ঋতুসংহার অবলম্বনে ষড়-ঋতু বর্ণনায় কবি আধুনিক রুচির অনুরোধে সর্ব্বত্র মূলের অনুসরণ করেন নাই। আমাদের মতে ইহা ভালই হইয়াছে। এই কবিতাগুলি সংস্কৃত কাব্য-কুসুমের সৌরভে সুরভিত।

'ঋতুমঙ্গল' অধ্যায়ের কবিতাগুলি যেরূপ সংস্কৃত কাব্যের, 'ঐকতান' অধ্যায়ের কবিতাগুলি সেইরূপ ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের ছায়াবলম্বনে রচিত। 'পাপিয়ার প্রতি' কীট্‌সের 'নাইটিঙ্গেল পাখীর প্রতি' অবলম্বনে, এবং 'আক্‌বরের স্বপ্ন' টেনিসের উক্ত নামা খণ্ড-কাব্যের ভাব অবলম্বনে রচিত। 'কোকিলের প্রতি' কবিতাটি কোন বিশেষ ইংরাজী কবিতা অবলম্বনে

লিখিত বলিয়া উল্লিখিত না হইলেও, উহার মর্ম্ম স্পষ্টতঃই ইংরাজী কাব্য হইতে গৃহীত। শেলীর 'স্কাই লার্কের প্রতি' কবিতার ভাবে এই কবিতাটি অনুপ্রাণিত। "সঞ্চারিণী শরীরিণী গীত" ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "A wandering voice."

"কম্পিত তৃণের মুখে বরষার প্রথম চুম্বন
কিংবা নব বারি পাতে কুসুমের মৃদু জাগরণ"

শেলী লিখিয়াছেন :—

Sound of vernal showers
On the twinkling grass,
Rain-awakened flowers;

"হরিৎপল্লবে ঢাকা গোলাপের স্নিগ্ধপরিমল" শেলীর "Like a rose embowered in its own green leaves." ইত্যাদি।

অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক।

"প্রকাশকের নিবেদনে" লিখিত হইয়াছে, "ঐকতান অধ্যায়ে এই বিশ্ব ও বিশ্বাত্মার একতানতা বহুতার বহুরূপ ও বহুব্যথার মধ্যে এক ধর্ম্ম—এক মর্ম্ম—এক কর্ম্ম—এক মন্ত্রতা প্রতিপাদিত হইতেছে।"—কবির উদ্দেশ্য ও সহৃদয়তা প্রশংসনীয়; তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়—মহান্; কিন্তু এই কবিতা কয়টিতে সেই একত্ব কতদূর প্রতিপাদিত হইয়াছে, সন্দেহ-স্থল।

কবি কোকিলের উদ্দেশে বলিতেছেন :—

শুনি ও সঙ্গীত তব মনে হয় অতীতের মত
আবার এ অবনীতে সত্যলোক হবে সমাগত,
দ্বেষ হিংসা পাইবে বিলয়;—

ধরাতলে একদা প্রীতির রাজ্য স্থাপিত হইবে, Millenium অথবা সত্য-যুগের পুনরাবির্ভাব হইবে, অনেক কবিঋষি এই আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। টেনিসন লিখিয়াছেন—

One God, one law, one element,
And one far-off divine event,
To which the whole creation moves.

স্কচ্ কবি বার্ণস্ গাহিয়াছেন :—

For a' that, and a' that,
It's coming yet, for a' that;

That man to man, the world o'er,
Shall brothers be for a' that.

কিন্তু মানব একদিন

এক ধর্ম্ম, এক মর্ম্ম, এক কর্ম্ম, এক মন্ত্র ধরি'
বহুতার বহুরূপ বহু ব্যথা যাবে সে পাশরি
বিশ্বাত্মারে করিবে আরতি।—

এই কবিজনোচিত স্বপ্ন, আশা অথবা কামনা কি বর্ত্তমানে মানবের একধর্ম্মিতা একপ্রাণতা সপ্রমাণ করে? আমরা তত্ত্বজ্ঞান-আলোচনার অধিকারী নহি। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, বহুতার বহুরূপ সেই লীলাময়েরই লীলার পরিচয়। সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়ী। বহু কর্ম্ম বহু ধর্ম্ম বহুরূপ বহু শক্তির অন্তরে, তিনিই পরম ঐক্য।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ
বর্ণাননেকা ন্নিহিতার্থোদধাতি।

যিনি বহুধা শক্তি দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন সাধন করিতেছেন, সেই পরম দেবতা। 'পাপিয়ার প্রতি' কবিতাটির শেষ ভাগে সহসা "এক জাতি, এক ধর্ম্ম" প্রচার করিতে যাওয়ায় কীট্সের 'নাইটিংগেল' কবিতার ভাব-সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় নাই। এই কবিতার ৭ম ও ৮ম শ্লোকে, শেলীর কবিতা হইতে কয়েকটি পদ গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে মনে হয়।

'আক্বরের স্বপ্ন'—টেনিসনের রচিত শেষ কাব্য। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের স্বর্গীয় রাজকবির এই একটিমাত্র খণ্ড কাব্যের উপাদান ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে গৃহীত। উদারমতি মোগল-সম্রাট্ আক্বর, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মবিদ্বেষের প্রভাব দর্শনে ব্যথিত হইয়া, এক সার্ব্বভৌমিক প্রেমের ধর্ম্ম স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাই এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বহুকাল পূর্ব্বে ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত 'আক্বরের স্বপ্নে'র মর্ম্মানুবাদ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে ভুজঙ্গধর বাবু কবিতায় ইহার ভাবানুবাদ করিয়া টেনিসনের রচনার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয়ের পথ সুগমন করিয়া দিলেন। স্থানাভাবে আমরা এই আলোচনাযোগ্য কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারিলাম না।

'গোধূলি'র শেষ অধ্যায় 'অরণি'। এই অধ্যায়ের কবিতাগুলি আত্মজ্ঞান-বিষয়ক—কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। ষড়-রিপুর মূর্ত্তি ও প্রকৃতি, রিপুদমনের

উপায়, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রকার ভেদ, মায়া, লয়, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় এক একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতাতে বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বপিপাসু পাঠক এইগুলি পাঠ করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্মুখিতা সাধন করিতে পারিবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, চতুর্দ্দশপদীর ক্ষুদ্র পরিসরে নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না। এই অধ্যায়ের প্রথম কবিতা (অথবা গান ?) 'শূন্য' বর্জ্জন করিলেই ভাল হইত। 'এই পথ দিয়ে' কবিতাটিতে ব্রাউনিংএর One Way of Love কবিতার ভাবানুকরণে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত 'এই পথ দিয়ে গেছে' কবিতার ছায়া দৃষ্ট হইল। ভুজঙ্গবাবু লিখিয়াছেন :—

তোমারে মাথায় করি' পাগল শঙ্কর
আমারি এ মনোপথে গিয়াছিল চ'লে'।
* * *
তাই তোর তনুগন্ধে মোদিত সোপান।
ওখানে আফোটা মোর কতগুলি ফুল
অকস্মাৎ ফুটিয়াছে পদ-পরশনে,
ওখানে জড়ায়ে গেছে এক গাছি চুল
রাঙা পা'র মোছা দাগ ওই দীঘি কোণে।

বড়াল কবি লিখিয়াছেন—

"এই পথ দিয়া গেছে, এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা
* * * *
এই পথ দিয়ে গেছে, বসে গেছে নদীকূলে
গেঁথে গেছে ফুলমালা পরে যেতে গেছে ভুলে।"—ইত্যাদি।

মনে হয়, ভুজঙ্গ বাবু কেবল 'অরণি'-পর্য্যায় ভুক্ত করিবার জন্যই এই কবিতায় শঙ্কর ও সতীদেহের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে কাব্য হিসাবে কবিতাটি ব্যর্থ হইয়াছে। সতী যখন 'শিবশিরে' নিদ্রিতা ছিলেন, তখন তাঁহার পদস্পর্শে ফুল ফোটা ও দীঘিকোণে রাঙা পায়ের মোছা দাগ থাকা কিরূপে ঘটিতে পারে, নূপুরের রোলই বা কিরূপে সম্ভবে ? 'তাণ্ডব' কবিতাটির ভাষা ও ছন্দঃ বিষয়ের গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই।

পুস্তকের ভাষা মার্জ্জিত। ছন্দঃ ও মিল সম্বন্ধে দুই এক স্থলে যে অনবধানতার চিহ্ন দৃষ্ট হইল, তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে। উপসংহারে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, ভুজঙ্গধর বাবুর কবিজীবনের গোধূলি সুদূরবর্ত্তী হউক।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বিদায়।

আজ মনে হয় যেন স্বপন অসার
জীবন দোঁহার ;
পরাণের শত আশা,
হৃদয়ের ভালবাসা
সকলি অসার যেন স্বপন নিশার,
জীবনের শত সুখ,
বিষাদ-কাতর মুখ,
সকলি স্বপন যেন তোমার আমার !
সকলি অসার !

আজি এ প্রেমের ভাষা অসার কাহিনী,
অয়ি, সুহাসিনী !
শুধু শ্রান্ত আঁখি'পরে
বেদনা পড়িছে ঝরে'
মরমে হতাশ জাগে দুরন্ত ফণিনী,
নিরাশা গরল দিয়া
ভরিয়াছে শ্রান্ত হিয়া
প্রাণের বেদনা স্রোত উজান-বাহিনী—
অয়ি, সুহাসিনী !

আজি এই বাহু-পাশ প্রেমের ছলনা,
অয়ি সুনয়না !
অধরে হাসির পাশে,
বেদনা লুকায়ে আসে,
চুম্বনে কাঁপে না আর প্রাণের বাসনা ;
আর সে নয়নতারা
চাহে না নিমেষহারা
ওই মুখ-শশী পানে আলোক-বসনা—
অয়ি, সুনয়না

ফুলের সৌরভ গেছে, আছে ম্লান দল,
গৌরবের ছল।
বসন্ত সে নাহি আর
শুধু এক এক বার
পরাণে আসিছে ভাসি' কোকিলের কল,

সঙ্গীহারা কোন্ পাখী
ডাকিতেছে থাকি' থাকি'
ফেলিয়া বিজন বনে নয়নের জল—
বিরহ-সম্বল !

মূর্চ্ছাতুর প্রেম-নিশা দিবসের দ্বারে,
ফিরাও না তা'রে।
যেতেছে জ্যোছনা-রাতি,
নিবিছে তারকা-ভাতি,
নিবিছে সুখের আলো দুখসিন্ধুপারে,
নবীন-জীবন-ভরা
এখনি হাসিবে ধরা
এ নিশি লুকাবে কোথা দিবার আগারে
ফিরাও না তা'রে।

যেতেছে যে কেন মিছে তা'র অন্বেষণ !
সে আজ স্বপন।
নয়নে সরম টুটি'
প্রেমালোক উঠে ফুটি ;
অধরে কাঁপিয়া উঠে সরস চুম্বন,
লাজ প্রেম খেলা করে
ব্যাকুল নয়ন'পরে
আনন্দহিল্লোলভরা সুখের জীবন—
সকলি স্বপন।

প্রেম নিশি শেষে আজ লইব বিদায় ;
রজনী পোহায়—
এ হৃদয়ে মূর্ত্তি যা'র
পূজিয়াছি অনিবার
কেমনে দেখিব তা'রে লুটিতে ধূলায়
নিবিলে প্রেমের আলো
কিছুই র'বেনা ভাল
তা চেয়ে বিরহজ্বালা তবু সহা যায়—
বিদায়,—বিদায় !

—:—

সংগ্রহ।

ইতিহাস।

দিল্লী।

গত কার্ত্তিক মাসে 'আর্য্যাবর্ত্তে' যখন দিল্লীর কথা লিখিত হইয়াছিল, তখন দিল্লী ভারতের প্রাচীন রাজধানী—হিন্দু ও মুসলমান শাসনের স্মৃতিক্ষেত্র, ঐতিহাসিক উপাদানের আকর, ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সাক্ষ্য। আর আজ ইংরাজাধিকৃত ভারতের রাজধানী আবার দিল্লীতে স্থানান্তরিত। জলা ভূমিতে মৃত্তিকা তুলিয়া জব চার্ণক যে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সার্দ্ধশতাব্দীর চেষ্টায় যে কলিকাতা এখন প্রাচ্য নগরীর শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছে, ভারতে ইংরাজের কীর্ত্তিস্মৃতি যে কলিকাতার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত ভারতের রাজধানী আজ সেই কলিকাতা হইতে আবার প্রাচীন ভারতের পরিচিত রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত। রাজাদেশে এই পরিবর্ত্তন। ইহাতে স্মৃতিপটে স্বতঃই দিল্লীর বিচিত্র ইতিহাসের চিত্রাবলী ফুটিয়া উঠে। সম্প্রতি 'অ্যাকাডেমী' পত্রে দিল্লীর ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, দিল্লী পরিত্যক্ত নগরীর ও ধ্বংসাবশিষ্ট সমাধির সমষ্টি। কথায় বলে, দিল্লীর সিংহাসনে না বসিলে কোন রাজাকে ভারতের রাজা বলিয়া গণ্য করা হইত না। দিল্লীর দক্ষিণে ৪৫ বর্গ মাইল ব্যাপী ধ্বংসাবশেষ—সে সকল দুর্গের ও নগরের সংস্থাপকদিগের নামও আজ বিস্মৃতিগর্ভগত। হিন্দু-শাসন কালের সৌধাদির মধ্যে লালকোট বা লোহিতদুর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেহ বলেন ইহা তোমর বংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপালের কীর্ত্তি—আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। এই দুর্গ ও কুতবমিনারের সন্নিকটে মসজেদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত বিষ্ণুদেবতাকে উৎসৃষ্ট লৌহস্তম্ভই হিন্দু প্রাধান্যের নিদর্শন। স্তম্ভগাত্রে লিখিত লিপির অক্ষর বিচার করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর। ফার্গুসন বলেন, ইহা ৪০০ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত। ফ্যানশ বলেন, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কনৌজ হইতে লোক আসিয়া দিল্লীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। লৌহস্তম্ভ সেই সময়ের। প্রথম অনঙ্গপাল ৭৩০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন ও দ্বিতীয় অনঙ্গপাল ১০৫২খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে পুনরায় বসতি করান। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইতিহাসে দিল্লীর পরিচয়। তাঁহার মতে ১০৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল সম্ভবতঃ মথুরা হইতে এই আয়সস্তম্ভ আনয়ন করিয়া মন্দিরমালামধ্যে সংস্থাপিত করেন। এই সকল মন্দির ভাঙ্গিয়া মুসলমানগণ মসজেদ নির্ম্মিত করে। স্তম্ভগাত্রে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের গুণ কীর্ত্তিত।

পুরাতন কথা

এই আয়সস্তম্ভ জয়স্তম্ভ। অনঙ্গপাল ও তদীয় বংশধরগণ স্বল্পায়তন রাজ্য শাসন করিতেন। ১১৫১ খৃষ্টাব্দে আজমীরের চৌহান বংশীয় বিশালদেব অনঙ্গপালের বংশধরদিগের নিকট হইতে দিল্লী জয় করেন। পৃথ্বীরাজ

রাজপুত বীর।

বিশাল দেবের আত্মীয়। পৃথ্বীরাজ ক্ষত্রিয় বীরের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত ও পরিকীর্ত্তিত। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত দুর্গ ও মুসলমানকর্ত্তৃক আক্রান্ত দিল্লী তঁাহারই প্রতিষ্ঠিত। কুতব মিনারের নিকটে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও লক্ষিত হয়। তাঁহার সময় পর্য্যন্ত বিজয়োদ্যোগী মুসলমানগণ দিল্লীতে আসিতে পারে নাই। ৭১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা প্রথম ভারতে আইসে। কিন্তু কাশেম সিন্ধুদেশ বিজয় করিয়াই নিবৃত্ত হয়েন। গজনীর সুলতান মামুদের আগমনের পূর্ব্বে মুসলমানগণ ভারতে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব সংস্থাপিত করিতে পারে নাই। তিনি ১০০১ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারে রাজপুতদিগকে পরাজিত করেন ও সোমনাথ মন্দিরের দ্বার গজনীতে লইয়া যায়েন। তিনি দ্বাদশবার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি লাহোর জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দিল্লীতে আসিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহার পর মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করিলে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে পরাজিত করেন। পরাজিত মহম্মদ সিন্ধুপারে পলায়ন করেন ও পরবৎসর বহুসেনাসংগ্রহ করিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে হিন্দু প্রাধান্যের অবসান। তখন দিল্লীতে ২৭টি মন্দির ছিল।

ঘোরী।

মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর প্রথম মুসলমান রাজা। মহম্মদের সেনাপতি কুতবুদ্দিন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রভুর পক্ষ হইতে দিল্লী শাসন করিতে থাকেন ও ১২০৬ খৃষ্টাব্দে আততায়ীর অস্ত্রে মহম্মদ নিহত হইলে স্বয়ং দিল্লীতে রাজা হইয়া বসেন ও ১২১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কুতব মিনার তাঁহারই কীর্ত্তি। তিনি ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ মসজেদ নির্ম্মিত করাইতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসরে মসজেদ নির্ম্মাণ শেষ হয়। পরে তাঁহার দাস ও জামাতা আল্‌তামাস উহার বিস্তার বৃদ্ধি করান। আল্‌তামাস ১২১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মসজেদের উপাদান হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে জমাট দিয়া প্রস্তরে হিন্দু শিল্পনিদর্শন আবৃত ছিল। এক্ষণে জমাট খসিয়া যাওয়ায় নিপুণ হিন্দু শিল্পীর ক্ষোদিত চিত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ইবন বাতুতা এই মসজেদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কুতব মিনার ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া ২৩৮ ফিট উচ্চে উঠিয়াছে; ইহা পঞ্চতলবিশিষ্ট। ইহার শিরোভাগ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পনে স্বস্থানচ্যুত হয়। বলা বাহুল্য ইহা মুয়াজিনের স্তম্ভরূপে—প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনার সময়জ্ঞাপক আজানের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। আল্‌তামাস এই স্তম্ভ সম্পূর্ণ করেন। স্তম্ভের চারিদিকে ভগ্নস্তূপ; তন্মধ্যে আল্‌তামাসের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দাসবংশ।

দাসবংশে আল্‌তামাসের দুহিতা রেজিয়া বেগমের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্যতীত আর কোন মহিলা দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত করেন নাই। রেজিয়া বেগম সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি পুরুষের বেশে স্বয়ং বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তুর্ক আলটুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলে তিনি তাহার হৃদয় জয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু পারিষদবর্গ তাঁহাদিগকে নিহত করে।

ইহার পর খিলিজিবংশের ও তৎপরে তোগলকবংশের হস্তে দিল্লীর ভাগ্যপরিবর্ত্তন ঘটে।

Printed by—R. C. MITRA, at the VISVAKOSHA PRESS.
21|9 Santiram Ghose's Street, Calcutta.

বারানসী।

বারাণসী।

"পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত,
আনন্দকানন নাম কেবল কৈবল্যধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত ॥"

হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান—হিন্দুসভ্যতার লীলাক্ষেত্র বারাণসী দেখিব—এ ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। কিন্তু আশা পূর্ণ হয় নাই—বারাণসীর মধ্য দিয়া একাধিক বার গিয়াছি—নামিয়া কাশী-দর্শনের সুবিধা হয় নাই। এবার সে সুযোগ উপস্থিত হইল। আর কালবিলম্ব না করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলাম। পথে গয়ায় কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য বোম্বাই ডাকগাড়ীতে যাত্রা করিলাম। ট্রেণে কামরায় দুই জনমাত্র সহযাত্রী—একজন য়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজক, আর একজন হিন্দুস্থানী জহরী। রাত্রিতে নিদ্রার কোন অসুবিধা বা অন্তরায় ঘটিল না।

প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি, বাঙ্গালার সমতল শ্যাম প্রান্তর ছাড়াইয়া আসিয়াছি—ভূমি প্রস্তরময়—কোথাও পথ পার্শ্বস্থিত প্রান্তর হইতে উচ্চে অবস্থিত, কোথাও অনতিগভীর খাতের মধ্যে পথ। এই পথে বহু সুরঙ্গ আছে, নিশায় নিদ্রিত অবস্থায় সেগুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। গয়ায় আত্মীয় আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত কথা শেষ করিলাম। গয়া ছাড়াইয়া ট্রেণ শোণ নদের উপরিস্থিত সেতু অতিক্রম করিল। এই সেতু ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর সকল সেতুর মধ্যে দ্বিতীয়। এই স্থানে শোণের বিস্তার এক ক্রোশের অধিক। শীতকাল—সোণের বিশাল বক্ষ বালুকাস্তৃত—সেই বালুকাবিস্তারমধ্যে স্থানে স্থানে শীর্ণ জলধারা ও জলজ বা জল-কূলজ গুল্ম। ইহার পর সাসারামে দূরে সরোবর-মধ্যস্থিত হুমায়ুনবিজয়ী শের সাহের সমাধি লক্ষিত হইল। মোগলসরাই ষ্টেশনে আমাদিগকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমাদিগের গাড়ীখানি বোম্বাই ডাকট্রেণের অঙ্গচ্যুত করিয়া অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড লাইনের ট্রেণে জুড়িয়া দেওয়া হইল। এই স্থানে মনে পড়িল, গতবার যখন এই পথে গিয়াছিলাম, তখন এই প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়

আমাদিগকে বারাণসীর কত কথা বলিয়াছিলেন—সংস্কৃত গ্রন্থের বচন হইতে বারাণসীর প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীভস যথার্থই বলিয়াছেন, যে জিজ্ঞাসা করিতে পারে—বারাণসীর প্রতিষ্ঠাতা কে? সে হিমালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে—এ প্রশ্নও করিতে পারে। সেরিং বলিয়াছেন,—বারাণসীর মত প্রাচীন নগর দুর্ল্ভ। পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বেও বারাণসী প্রসিদ্ধ ছিল। যখন ব্যাবিলন ও নাইনিভে প্রধান্যলাভলালসায় পরস্পরের প্রতিযোগী, যখন রোম ও গ্রীস প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই—তখনও বারাণসী প্রসিদ্ধ। তখন হয় ত বারাণসীর পণ্যে সলমনের রাজসম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বারাণসীর প্রাচীনত্ব যেমন বিস্ময়কর, ইহার শক্তিও তেমনই অসাধারণ। এই দীর্ঘকালে কত নগরের উত্থান ও পতন হইয়াছে—বারাণসীর গৌরবরবি অস্তমিত হয় নাই। অগ্নিদাহ, বিধর্ম্মী বিজেতার ধ্বংসচেষ্টা, কালের করাল স্পর্শ—এ সকল অবহেলা—উপহাস করিয়া বারাণসী আজও হিন্দুর হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহ সম্ভোগ করিতেছে। তাহার গৌরবশ্রী বিন্দুমাত্র মলিন হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএনত্থসাং বারাণসীর সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছিলেন। সে সমৃদ্ধি আজও অক্ষুণ্ণ। এমন সৌন্দর্য্যও জগতে কচিৎ দৃষ্ট হয়। অল্পক্ষণমধ্যেই দূরে বারাণসীর বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্ট হইল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—তাই পূর্ব্বে সূর্য্যকরোজ্জ্বল অম্বরতলে বারাণসীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম, আজ আর তাহা দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বারাণসীর যাহা বিশেষত্ব মেঘে বা রৌদ্রে তাহার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না—বারাণসীর নিম্নে গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তাই একেবারে বারাণসীর সমগ্র দৃশ্য নয়নসমক্ষে সপ্রকাশ হয়। হিন্দুর এই প্রধান তীর্থে হর্ম্ম্যমালার সর্ব্বোচ্চ চূড়া আরঙ্গজেবের মসজেদের—ইহাই আরঙ্গজেবের ভ্রান্ত রাজনীতির সুস্পষ্ট নিদর্শন।

বারাণসী নয়নপথের পথিক হইবামাত্র ট্রেণ হইতে শতকণ্ঠোত্থিত বিশ্বনাথের ও অন্নপূর্ণার জয়ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। যেন ভক্তির উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইল। সে ভাব বুঝাইবার নহে—বুঝিবার। খৃষ্টধর্ম্মযাজক পার্কার তদীয় গ্রন্থে * বলিয়াছেন, বারাণসীতে হিন্দু যাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু এই বৃদ্ধিতে ধ্বংসের চিহ্ন সুস্পষ্ট—ইহা ধ্বংসের পূর্ব্বগামী চাঞ্চল্যমাত্র। এই কথার উত্তরে মার্ক টোয়েন ছদ্মনাম-

* Guide to Benares.

ধারী সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক লিখিয়াছেন (১) কোন ধর্ম্মের মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই অনিশ্চিত। প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ক্যাথলিক মতের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সে মতের মৃত্যু হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, পার্কার খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক—এক্ষেত্রে তাঁহার উক্তিতে তাঁহার বাসনাই ব্যক্ত হইয়াছে।

বড়ই দুঃখের বিষয়, হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান তীর্থ-সম্বন্ধে কোন হিন্দু একখানি পুস্তক লিখেন নাই। বারাণসীসম্বন্ধীয় সকল পুস্তকই ইংরাজের রচনা। তন্মধ্যে সেরিংএর (২) পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ। তবে তিনি খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন—তাঁহার গ্রন্থ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি উপহাসে কলুষিত। পার্কার ও কেপ (৩) উভয়েই খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক। তাঁহাদিগের পুস্তকের পরিচয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রিন্সেপের রচনা (৪) প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক। ইহা এক্ষণে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। দর্শকের পক্ষে গ্রীভ্সের পুস্তকই (৫) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গ্রীভ্স স্বয়ং খৃষ্টধর্ম্মযাজক হইলেও তাঁহার পুস্তকে অন্যধর্ম্মবিদ্বেষের বিশেষ চিহ্ন নাই। আর উপাদেয় পুস্তক—কলানিপুণ হ্যাভেলের নবপ্রকাশিত পুস্তক। (৬) ইহাতে শিল্পীর তুলিকায় বারাণসীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত।

বারাণসীতে আমি নবাগত; আত্মীয়ের বাসা খুঁজিয়া লইতে কিছু কষ্ট পাইলাম। বাসায় যাইয়া আহারাদির পরই বারাণসী দেখিতে বাহির হইলাম। পথে জনতা; মন্দিরের দ্বারে জনতায় পথ দুর্গম; পথিপার্শ্বে সন্ন্যাসীর বাহুল্য। বিপণীতে নানা দেবমূর্ত্তি। চারিদিকে ম্লান কুসুমের গন্ধ। গৃহপ্রাচীরে পৌরাণিক চিত্র। কোন ফরাসী গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বারাণসীতে বিগ্রহের সংখ্যা মানবের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। (৭) বারাণসীতে পথে ফুল পদদলিত হয়—তাই ট্রিভস্ বারাণসীকে বিদলিত কুসুমের নগর বলিয়াছেন। (৮)

---

(১) More Tramps Abroad.
(২) The Sacred City of the Hindus.
(৩) Benares.
(৪) Views of Benares.
(৫) Kashi the City Illustrious.
(৬) Benares the Sacred City.
(৭) Romantic India—Andre Chevrillon.
(৮) The Other Side of the Lantern.

প্রথমেই দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইলাম। পথে বাঙ্গালীর সংখ্যা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। জানিতাম, কাশীতে বাঙ্গালী যথেষ্ট—কিন্তু বাঙ্গালীর সংখ্যা যে এত অধিক তাহা জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল, প্রাচীন-মতাবলম্বী প্রবীণগণই কাশীবাস করেন,—এখন দেখিলাম, বহু ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও জীবনের সায়াহ্নে বারাণসীর বক্ষে শান্তির সন্ধান করিতেছেন। বারাণসীতে চিকিৎসকেরও বাহুল্য। বারাণসীতে অল্প ব্যয়ে বাস করা যায়। এত তরকারীর আমদানি আর কোথাও হয় কি না সন্দেহ; রামনগরের বার্ত্তাকু আকারে ও সুস্বাদে অতুলনীয়। বারাণসীতে কুসুমের বাহুল্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিপণীতে দেব-পূজার জন্য স্তূপাকার গাঁদা, জবা ও কাটমল্লিকা; গৃহস্থের উদ্যানে গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকার আকার ও সংখ্যা দেখিবার মত বটে। আবার বারাণসীতে সন্তানদিগের শিক্ষার সুবিধাও বারাণসী-বাসের অন্যতম প্রলোভন। সরকারী কুইন্‌স কলেজ ও সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ব্যতীতও অনেকগুলি ইংরাজী বিদ্যালয় কাশীতে আছে। কুইন্‌স কলেজের গৃহ নয়নাভিরাম। প্রাচীন গথিক্ স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মেজর কীটোর রচিত আদর্শে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই গৃহ নির্ম্মিত হয়। কাহারও কাহারও মতে ভারতে ইংরাজ আর এরূপ গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক গৃহ নির্ম্মিত করান নাই। কলেজের প্রাঙ্গণ বহুদূরবিস্তৃত—ইহাতে গৃহের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। একই গৃহে চেয়ার-বেঞ্চে ইংরাজী শিক্ষা ও ফরাসে সংস্কৃত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন। কলেজের নিকটেই অধ্যক্ষের ও একজন অধ্যাপকের বাসগৃহ। উত্তরদিকে পাঠাগার নির্ম্মিত হইতেছে। এই গৃহে বহুমূল্য পুস্তক ও পুঁথিগুলি রক্ষিত হইবে। ইহাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠার্থীদিগের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। গ্রীভ্‌স দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—গৃহটিতে স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই। ইহা এ দেশে ইংরাজের অধিকাংশ গৃহের সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। কলেজের পশ্চাতে একটি ভগ্নশীর্ষ প্রস্তর স্তম্ভ। গাজীপুরের সন্নিকটে ইহা আবিষ্কৃত হয়। বর্ত্তমানে ইহার উচ্চতা প্রায় ২১ হস্ত। স্তম্ভগাত্রে গুপ্ত অক্ষরে যে লিপি ক্ষোদিত তাহাও অনেকটা ক্ষয়িত হইয়াছে। ইহার পাদদেশে ইহার আবিষ্কারের ও আনয়নের বিবরণ ক্ষোদিত হইয়াছে। কলেজের চূড়া-গৃহ হইতে দূরে সারনাথ দৃষ্ট হয়।

সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ মিসেস্ অ্যানি বেসান্তের অক্ষয় কীর্ত্তি। কলেজের

জন্য কাশীনরেশ বহুমূল্য অট্টালিকা ও বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিদ্যালয়সংস্পৃষ্ট নানা গৃহ নানা দাতার যশঘোষণা করিতেছে। প্রাঙ্গণে বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী নানা জাতীয় ছাত্র ক্রীড়া করিতেছে, একত্র পাঠাভ্যাস করিতেছে, ছাত্রাবাসে একত্র বাস করিতেছে —এ দৃশ্য বাস্তবিকই বড় আনন্দদায়ক। এই বিদ্যালয় যে ভারতে জাতি-সংগঠনে বিশেষ সহায়তা করিতেছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ কর্তৃক ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জয়নারায়ণ কলেজ এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের কর্তৃত্বাধীন।

ভিঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহ তদীয় পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুর পর সংসার-বিরাগী হইয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। তিনি প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০ লক্ষ টাকা, দুইটি গৃহ, ১৮০ বিঘা জমী ও গৃহ নির্ম্মানার্থ আরও ১৫০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। সরকারী কলেজে ও হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকায়, ভারতের নানা স্থানের বহু পণ্ডিত কাশীতে বাস করায় ও নানা ছত্রে বিদ্যার্থীদিগের আহারের ব্যবস্থা থাকায় বারাণসীতে সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বিশেষ সুবিধা হয়।

ভিঙ্গার রাজা হিন্দু কলেজের নিকট একটি আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভূকৈলাসের রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত কালীশঙ্কর আতুরাশ্রম বহু দিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমে কনখল, বৃন্দাবন প্রভৃতির মত কাশীতেও আতুরগণ আশ্রয় পাইয়া থাকে। বিজয়নগরাধিপের প্রাসাদ-সান্নিধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় বিদ্যমান। এইগুলি ব্যতীত কাশীতে সরকারী ও খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের বহু হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় আছে।

পবিত্র মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান সমাপন করিয়া তীর্থদর্শক দেব-দর্শন আরম্ভ করেন। এই মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানের সহিত পৌরাণিক দান-বীর হরিশ্চন্দ্রের পুণ্য নাম বিজড়িত। বুদ্ধ দেবও কাশীর উপকণ্ঠে সারনাথে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারিত করিয়াছিলেন। কারণ, তখনও বারাণসী হিন্দুর মহাতীর্থ। এই তীর্থে সর্ব্বদা ধর্ম্মপিপাসুর সমাগম হইত। ইহা হইতে বারাণসীর প্রাচীনত্বের কিছু আভাস পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস, কাশীর প্রতিষ্ঠা ভারতে আর্য্যনিবাসারম্ভেরই সমসাময়িক। কাশীতে তনুত্যাগ ও মণিকর্ণিকার চিতানলে

মৃতদেহ ভস্মসাৎ করা হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। বর্ষাবারিপাতে গঙ্গার জলধারা ২৫।৩০ হাত উচ্চ হয়। তখন তীরস্থ বহু ক্ষুদ্র মন্দির জলে ও কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া যায়। বর্ষার পর সেই সকল মন্দিরের কর্দ্দম দূর করিতে হয়। বর্ষাকালে শবদাহের অত্যন্ত অসুবিধা হইত বলিয়া প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ কুঠীয়াল শীতলপ্রসাদ খড়্গপ্রসাদের অংশী বাবু মতিচাঁদের যত্নে ও প্রায় লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে এক সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে। অন্য সময় নিম্নে গঙ্গার কূলে শবদাহ হয়, বর্ষায় উপরে চত্বরে গঙ্গাগর্ভে শবদাহ হইতে পারে।

দশাশ্বমেধ ঘাটকে ঘাটবহুল বারাণসীর মধ্যবর্ত্তী ঘাট বলা যাইতে পারে। দক্ষিণে অসিসঙ্গম হইতে উত্তরে বরুণা পর্য্যন্ত বারাণসীতে প্রায় পঞ্চাশটি ঘাট বিদ্যমান। তন্মধ্যে অনেকগুলির অসংস্কৃত অবস্থা প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের উত্তরাধিকারী-দিগের অমনোযোগ বা অবস্থাবিপর্য্যয়ের প্রমাণ দিতেছে। ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল এই সকল ঘাটের সংস্কারবিষয়ে মনোযোগী ও উদ্যোগী হইলে ভাল হয়। দশাশ্ব-মেধ ঘাটে এক অদ্ভুত ইস্তাহার আছে—ইহাই প্রকৃত দশাশ্বমেধ ঘাট—কেহ কাহাকেও অন্যরূপ বুঝাইয়া প্রবঞ্চিত করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে! পুণ্য তীর্থে সামান্য অর্থের জন্য প্রবঞ্চনা কি এতই সুলভ?

ঘাটের উপর একটি চুঙ্গী-মাশুল আদায়ের কার্য্যালয়। ইহার বামে আর একটি ঘাটে কাশীর গৃহনির্ম্মাণার্থ চুণার প্রস্তরের আমদানী হয়। নিকটে দক্ষিণে বাজারে মৎস ও তরকারী বিক্রীত হয়। কূলে জৈনমন্দির বিদ্যমান বলিয়া কাশীর নিম্নে গঙ্গার কতকাংশে মৎস্যাহরণ নিষিদ্ধ। স্নানের পক্ষে দশাশ্বমেধ ঘাটই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও সুরক্ষিত। কেবল এই ঘাটেই শকটারোহণে আগমন সম্ভব। এই রাস্তা কিছু দূর যাইয়া গোধূলীর নিকট তিন দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটের পরেই উত্তরে মানমন্দির ঘাট। এই মানমন্দির জয়পুর-প্রতিষ্ঠাতা জয়সিংহের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—কিন্তু বর্ত্তমানে ধ্বংসোন্মুখ। মহারাজ জয়সিংহ জ্যোতিষগণনার জন্য জয়পুরে, দিল্লীতে, উজ্জয়িনীতে, মথুরায় ও বারাণসীতে মানমন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীতে বর্ত্তমানে মান-মন্দিরের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে; অপর কয়স্থানে মন্দিরগুলি এখনও বিদ্যমান। এই মন্দিরে বহু সুবৃহৎ যন্ত্র রহিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, জয়পুরাধিপ স্বীয় জ্ঞানলিপ্সু বংশপতির এই কীর্ত্তি-সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়েন নাই। পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রিরচিত এই মন্দিরবিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মন্দিরেই বিক্রীত হয়।

ইহার পর মণিকর্ণিকাই প্রধান ঘাট। মধ্যে নেপালী মন্দির ও ক্ষুদ্র ঘাট। মন্দির ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালাও নেপালী প্রথায় কাষ্ঠে ও ইষ্টকে নির্ম্মিত। ইহা বারাণসীতে অসাধারণ বটে। মণিকর্ণিকার পর সিন্ধিয়ার ঘাট—এক বিশাল ধ্বংশাবশেষ। এই স্থানে ইন্দোর দরবার এক বিশাল ঘাট ও তদুপরি এক বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মিত করাইতেছিলেন। কিন্তু নিম্নে ভিত্তি সেই গুরুভার প্রস্তরের ভারসহনোপযোগী না হওয়ায় সমস্ত ঘাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভগ্ন প্রস্তরস্তূপ দেখিয়া প্রাসাদকল্পনার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। তাহার পর গোয়ালিয়র ঘাট উল্লেখযোগ্য। ঘাটের উপর অট্টালিকা প্রস্তরস্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার কিছু পরে ভোঁসলা ঘাট ও পেশওয়ের নিদর্শন—বাজীরাও ঘাট। মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিদর্শন এই সকল ঘাট পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত। কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় অধিবাসীও যথেষ্ট। ইহার পরই দ্রষ্টব্য—পঞ্চগঙ্গা ঘাট ও তদুপরি আরঙ্গজেবের মসজেদ। এই স্থানে নদীকূল অত্যন্ত উচ্চ—দ্বিতলবৎ। তদুপরি এই মসজেদের চূড়াদ্বয় ১৪০ ফিট উচ্চ। পূর্ব্বে চূড়া আরও উচ্চ ছিল কিন্তু জীর্ণ হওয়ায় ইহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। চূড়া হইতে বারাণসীর দৃশ্য অদ্ভুত; সমগ্র সহর পদপ্রান্তে প্রসারিত, অগণিত সৌধ ও মন্দির, নগরের অধিকাংশ রাজপথই সঙ্কীর্ণ, উচ্চ হইতে তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না—যেন সমস্তই সহর—সৌধের ও মন্দিরের সম্মিলন, কেবল মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের শ্যাম শোভা সে দৃশ্যে বৈচিত্র্য প্রদান করে। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে দূরে সারনাথও নাকি দৃষ্ট হয়।

দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণে প্রধান ঘাট—শিবালয় ঘাট ও কেদার ঘাট। এই কেদার ঘাট বাঙ্গালীটোলায় অবস্থিত ও প্রধানতঃ বাঙ্গালী কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত। শিবালয় ঘাট স্নানার্থ বড় ব্যবহৃত হয় না। ইহার সহিত বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত। ঘাটের উপর চেতসিংহের দুর্গপ্রাসাদ আজও বর্ত্তমান। এই স্থানে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে চেতসিংহকে ধরিতে যাইয়া ইংরাজ সেনাদল নিহত হয়। প্রাসাদের সন্নিকটে নিহত ইংরাজসেনাপতিত্রয়ের সমাধি। আর যে স্থানে তাহারা নিহত হইয়াছিল,সে স্থান হইতে বহু দূরে চেতগঞ্জে থানার নিকটে একটি প্রাচীর-বদ্ধ সমাধিক্ষেত্র নিহত সিপাহীগণের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছে। শিবালয়ঘাটের উপরিস্থিত প্রাসাদে লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশে নিবদ্ধ প্রস্তরফলকে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘোষিত হইতেছে। গঙ্গাতীরে কাশীধামে এই আধুনিক ঐতিহাসিক নিদর্শন কেমন আস্থানিক বলিয়া মনে হয়। এই প্রাসাদ বর্ত্তমানে ইংরাজের

বৃত্তিভোগী কয়জন দিল্লীর সম্রাটবংশীয় ব্যক্তির বাসস্থান। প্রাসাদ বিশেষ সুসংস্কৃত নহে।

বারাণসীতে আধুনিক ঐতিহাসিক নিদর্শন অধিক নাই। এই প্রাসাদ ব্যতীত আর দুইটি স্থান উল্লেখযোগ্য—নাদেশ্বরকুটী ও মধোদাসের বাগান। চেতসিংহের সহিত গোলযোগের সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস এই বাগানে ছিলেন। সাদত আলি অযোধ্যার নবাব হইলে রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজীর আলিকে এই উদ্যানগৃহে রক্ষা করা হয়। তাঁহার ব্যবহার সন্দেহোদ্দীপক বলিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রেসিডেণ্ট চেরী প্রভৃতিকে নৃসংশভাবে নিহত করেন। কালেক্টর ডেভিস তখন সপরিবারে নাদেশ্বরকুটীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি অসাধারণ সাহস সহকারে আত্মরক্ষা করেন। মাধোদাসের বাগানে এক্ষণে রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান আস্তানা। চেরীর বাসগৃহ এক্ষণে কালেক্টরের কাছারী। নাদেশ্বরকুটী কাশীনরেশের সম্পত্তি—অতিথিশালরূপে ব্যবহৃত। গৃহগাত্রে লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশে নিবদ্ধ প্রস্তরফলক পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় দিতেছে। ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে সহরে যাইতে সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বকথিত সমাধিক্ষেত্র। তাহার পর উল্লেখযোগ্য—রাজা মাধোলালের নূতন প্রাসাদ। শিবালয় ঘাট হইতে নিম্নে (কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী বলিয়া উত্তরে) জলের কলের জল-গ্রহণ স্থান। এই জল ভেলুপুরায় পরিস্কৃত করিয়া সহরে বণ্টন করা হয়। ইহার পর বারাণসীর উত্তরসীমা অসিসঙ্গম। নদী-গর্ভ পার্শ্বস্থ ভূমির সহিত প্রায় সমতল—কেবল বর্ষায় জলধারার অস্তিত্ব অনু-ভব করা যায়।

বলা বাহুল্য বারাণসীর সর্ব্বস্ব দেবালয়। বারাণসীতে দেবালয়ের সংখ্যা এত অধিক যে, যাঁহারা সমস্ত জীবন বারাণসীতে বাস করিয়াছেন—তাঁহাদের পক্ষেও সমস্ত দেবালয়ের বর্ণনা করা অসম্ভব। কাশীতে দেবালয়-প্রতিষ্ঠা হিন্দুর পরম আকাঙ্ক্ষিত কার্য্য—কাযেই দেবালয়ের অন্ত নাই। তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। উভয় মন্দিরই সঙ্কীর্ণ গলিরাস্তায় অব-স্থিত। বিশ্বেশ্বরের মন্দির বৃহৎ নহে; মন্দির গলিরাস্তায় অবস্থিত বলিয়া মহা-রাজ রণজিৎ সিংহের ব্যয়ে নির্ম্মিত স্বর্ণচূড়া নিকট হইতে দেখা যায় না। মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, ভারতের প্রায় সকল হিন্দু মন্দিরের মত ইহা একদ্বার নহে—তিন দিক হইতে মন্দির-গর্ভে প্রবেশ করা যায়। প্রাঙ্গণ কোন

BENARES.

সিন্ধিয়া ঘাট—বারাণসী ।
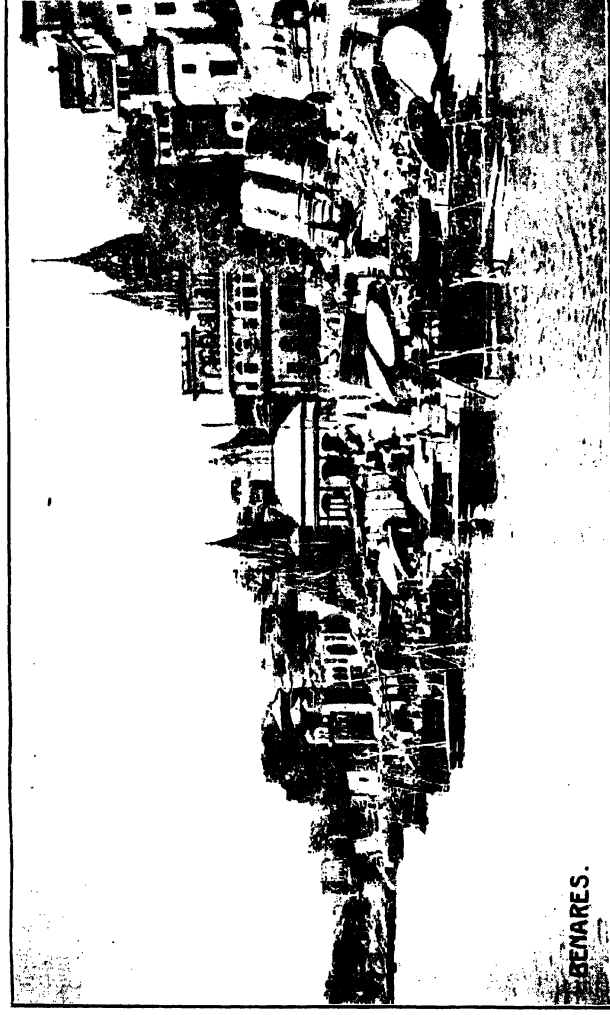
ভক্তের ব্যয়ে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মরে মণ্ডিত—প্রত্যেক মর্ম্মরখণ্ডের চারি কোণে একটি করিয়া রজতমুদ্রা নিবদ্ধ—বহু যাত্রীর পাদঘর্ষণে মুদ্রাগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত; মন্দিরে প্রস্তর-ক্ষোদিত শিল্পৈশ্বর্য্যও অধিক। বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির বহুদিনের নহে। পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর—হিন্দুর তীর্থের মধ্যস্থলে—আওরঙ্গজেবের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ মসজেদ। আওরঙ্গজেব মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজেদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মসজেদ মন্দিরের উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল—মসজেদের প্রাচীরে এখনও ক্ষোদিত প্রস্তরে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায়। মসজেদের পার্শ্বেই জ্ঞানবাপী। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসসময়ে দেব মন্দিরের পুরোহিতগণ বিশ্বেশ্বরকে এই কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। অহল্যাবাই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই কূপের উপর ও চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরদ্বারা একটি মনোরম আচ্ছাদন নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে কূপমধ্যে পুষ্পাদি নিক্ষিপ্ত হইত; বহু শতাব্দীর সঞ্চিত আবর্জ্জনায় কূপোদক পূতিগন্ধময় হইয়াছিল। মধ্যে ইহার সংস্কারের পর হইতে কূপমুখ বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অর্ঘ্যাদি বস্ত্রোপরি নিক্ষিপ্ত ও পরে স্থানান্তরিত হয়। পুরোহিত রজ্জুর সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া যাত্রীদিগকে দিয়া থাকেন। গ্রীভ্‌স বলিয়াছেন, হিন্দুরা ইহার জল পূত বলায় খৃষ্টানগণ বিদ্রূপ করেন; কিন্তু খৃষ্টান-দিগের নিকট কি পূত বারির কল্পনা অজ্ঞাত?

নিকটে কালভৈরব, সূর্য্য, শনি প্রভৃতির মন্দির। কালভৈরব কাশীর সহর-কোতয়াল। পূজা করিয়া তাঁহার অনুমতি না লইলে বিশ্বেশ্বরদর্শন নিষ্ফল হয়। তাঁহার দণ্ড গ্রহণ করিয়া পরে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে হয়। যাত্রীমাত্রেই শনির পূজা করিতে ব্যস্ত—কারণ নির্দ্দেশ বাহুল্যমাত্র। সূর্য্য-দেব সপ্তাশ্বরথে উপবিষ্ট। হিন্দুরা কি আলোকের সপ্তবর্ণসমন্বয়ের কথা অবগত ছিলেন? বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া সাক্ষী-বিনায়ক দর্শন করিতে হয়। তিনি বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শনের পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন। এই পথ হইতে কচুরী গলি দিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের পথে আসা যায়। দুই রাস্তার সংযোগ-স্থলে অনেকগুলি খাবারের দোকান আছে। বোধ হয় উহাই গলির এই নামকরণের কারণ। কাশীর মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাবার অতি উপাদেয়। পথের উভয় পার্শ্বে পূজার বাসন ও অন্যান্য পিত্তল দ্রব্যের দোকান। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট দিয়া—দক্ষিণা-মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া, চক্রতীর্থ ও মণিকর্ণিকা হইয়া, গঙ্গাতীর

বহিয়া, পঞ্চগঙ্গাঘাটের উপর বেণীমাধবের ধ্বজা দেখিয়া, ত্রৈলঙ্গস্বামীর স্মৃতি মন্দির হইয়া, জ্ঞানবাপী, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া, এই পথে পুনরায় দশাশ্বমেধের নিকট উপনীত হওয়াই প্রশস্ত।

'অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী' রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্ত্তিতে কাশীধামে বাঙ্গালীর নাম পরিচিত রহিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রথম কাশীর সীমানির্দ্ধারণ ও কাশী-প্রদক্ষিণের পঞ্চক্রোশব্যাপী পথের সংস্কার—দ্বিতীয় দুর্গা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। বানরের প্রাচুর্য্যহেতু দুর্গাবাড়ী বিদেশীয় দর্শকদিগের নিকট Monkey Temple বা বানরমন্দির নামে পরিচিত। কেহ মন্দিরে উপস্থিত হইলে চারিদিক হইতে বহু বানর আসিয়া আহার্য্যের জন্য তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলে। কখন কখন দুই এক জন বিধর্ম্মী বানরদিগকে আহার্য্য দিতে দিতে মন্দিরে প্রবেশ করায় মন্দির-দ্বারে বিধর্ম্মীর প্রবেশ-নিষেধ-জ্ঞাপক বিজ্ঞাপন। পার্শ্বে দুর্গাকুণ্ড নামক সরোবর। ইহার জল বড়ই অপরিষ্কার—সরোবরের সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন। নিকটে স্বামী ভাস্করানন্দের সমাধি ;—সুরক্ষিত উদ্যানমধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে স্বামীজির শ্বেতমর্ম্মর মূর্ত্তি। সম্মুখে মর্ম্মররচিত সমাধি।

হিন্দু কলেজ, ভিঙ্গা আতুরাশ্রম, জলের কল প্রভৃতি দেখিয়া রামনগরে যাওয়া যায়। রামনগর পরপারে—কাশীনরেশের রাজধানী। চেতসিংহ সিংহাসন-চ্যুত হইলে জ্ঞাতি মোহিত নারায়ণ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বর্ত্তমান রাজা তাঁহারই বংশধর। সূর্য্যাস্তকালে কাশী হইতে পরপারে ম্লানতেজ রবিকরে উদ্ভাসিত প্রাসাদের শোভা যেমন মনোরম—প্রভাতে রামনগর হইতে বারাণসীর বিচিত্র শোভা তেমনই চিত্তবিমোহন। তখন বারাণসী নিদ্রাবসানে জাগিয়াছে। ঘাটে বর্ণবৈচিত্র্যবহুলবেশধারী স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীর সমাগম। ঘাটে শতকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। গঙ্গার বারিপ্রবাহে নির্ম্মাল্য ভাসিয়া যাইতেছে। কাশীর পুণ্যক্ষেত্র তখন পূর্ণ মহিমায় সপ্রকাশ।

কাশীর সৌন্দর্য্য গঙ্গাতীরে। সার রিচার্ড টেম্পল যথার্থই বলিয়াছেন, জগতে আর কোন সহরের এরূপ নদীকূলসৌন্দর্য্য নাই। প্রায় অর্দ্ধশত ঘাট হইতে সোপানশ্রেণী গঙ্গাগর্ভে নামিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার সহরের বিকৃত ও শঙ্কর-স্থাপত্য নিদর্শনের পর কাশীর স্থাপত্য দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। বারাণসীর নূতন গৃহগুলিও প্রাচ্য স্থাপত্যাদর্শে

গঠিত। চকে থানা, প্রধান থানা, টেলিগ্রাফ আফিস, টাউন হল প্রভৃতি মনোরম। টাউন হল বিজয়নগরাধিপের ব্যয়ে নির্ম্মিত। পথের পরপারে নাগরী প্রচারিণী সভার কার্য্যালয়ও দ্রষ্টব্য। মিউনিসিপাল আফিস হাঁসপাতালের নিকটে অবস্থিত। একখণ্ড অস্বাস্থ্যকর ভূমিতে ভিক্টোরিয়া উদ্যান প্রতিষ্ঠিত করিয়া নগরের সে অংশের সৌন্দর্য্যের ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা হইয়াছে।

কাশীর অধিবাসীর একচতুর্থাংশ মুসলমান। কাশীতে মসজেদ অনেক। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটস্থ মসজেদের ও বেণীমাধবের ধ্বজা নামে খ্যাত মসজেদের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। প্রায় সকল প্রধান মসজেদেই বিনষ্ট হিন্দুমন্দিরের স্থাপত্যনিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীভ্‌সের পুস্তকে সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

বারাণসীর প্রধান শিল্প—রেশমী বস্ত্র, বেণারসী কাপড় নামে খ্যাত কিংখাব ও পিত্তল দ্রব্য। লোকের রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিংখাবের ব্যবহারের হ্রাস হইয়াছে—এ ব্যবসায়ের এখন আর উন্নতি নাই। পিত্তলের ও তাম্রের দ্রব্য প্রায়ই পূজার উপকরণরূপে গঠিত হইত। বর্ত্তমানে য়ুরোপীয় মহলে সমাদৃত হওয়ায় য়ুরোপীয় আদর্শেও বহুবিধ দ্রব্য গঠিত হয়। সম্ভবতঃ ইংরাজ রাজত্বে এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে। কাশীর আর এক শিল্প কাষ্ঠের রঞ্জিত খেলানা।

হিন্দুরা দেবকার্য্যে তাম্রপাত্র ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানাচার্য্যগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পানীয় জল একদিন তাম্রপাত্রে রাখিলে সর্ব্বদোষশূন্য হয়।

কাশীর দক্ষিণে পয়ঃপ্রণালীবাহিত আবর্জ্জনাদি গঙ্গায় নীত হয়। ইহাতে বহু বিদেশীয় পর্য্যাটক কাশীর নিম্নে গঙ্গার পূত বারির মলিনতার উল্লেখ করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু আগ্রার সরকারী রসায়নাগারের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ জীবাণুবিদ্ ডাক্তার হ্যানকিন বলিয়াছেন, গঙ্গার ও যমুনার জলে কলেরা জীবাণু থাকিতে পারে না।* সে যাহাই হউক, পয়ঃপ্রণালীর গতিপরিবর্ত্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

* "I have discovered that the water of the Ganges and the Jumna is hostile to the growth of the cholera microbe, not only

পর্ব্বোপলক্ষে মুসলমানের নমাজের জন্য কাশীনরেশ এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন। গ্রীভ্‌স ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাতে আধুনিককালে বারাণসীতে যে উদারতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। গ্রীভ্‌স বুঝিতে পারেন নাই, উদারতাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। হিন্দু কখনও প্রচারকনিয়োগাদিদ্বারা অন্য ধর্ম্মের ক্ষতি করিয়া শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করে নাই; পরন্তু সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া বিশ্বজনীন উদারতার আদর্শ সংস্থাপনই করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব বর্জ্জনে নহে—গ্রহণে, ঘৃণায় নহে—প্রেমে, সঙ্কীর্ণতায় নহে—উদারতায়।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আলোক।

(ইংরাজী হইতে)

রাত্রি হেরিছে অযুত নয়নে,
দিবসের শুধু একটি লোচন;
তবু জেনো, সেই একেরি বিহনে,
বিশ্ব আঁধারে হয় নিমগন।

মন চেয়ে দেখে লক্ষ নয়নে,
একটি লোচনে হৃদয় চায়;
তবু জেনো, সেই একেরি বিহনে,
জীবনের জ্যোতি ধীরে নিবে যায়।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

---

owing to the absence of food materials, but also owing to the actual presence of an antiseptic that has the power of destroying this microbe. At present I can make no suggestion as to the origin of this mysterious antiseptic,"—The Cause and Prevention of Cholera.

মালদহের পল্লী-কথা

রামাবতী ও গৌড়

(বিশেষ বিবরণ)

রামাবতীর

রাজমার্গ, হাটবাজার, অট্টালিকা, দেবালয়, অধিবাসী,
ধর্ম্মাচরণ, ব্যবহার ও দলুই জাতি।

রামাবতী নগরীর সংস্থানের কথা এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি উপনগরীর নামমাত্র পূর্ব্বপ্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে; উহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি মালদহের প্রাচীন রাজধানী, নগর, উপনগর, পল্লী প্রভৃতির ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। এই কার্য্যের সর্ব্বপ্রথম উৎসাহদাতা ও অনুষ্ঠাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, মহাশয়; তাঁহার ঐকান্তিক উৎসাহে ও চেষ্টায় মালদহের পল্লীকাহিনী প্রকাশিত হইতে চলিল। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি দেশের যে মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাহার বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে ইহা একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। 'মালদহের পল্লীকথায়' মালদহের প্রত্যেক ঐতিহাসিক প্রাচীন স্থানের সর্ব্বপ্রকার ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। উহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন সামাজিক চিত্রাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। অধ্যাপক সরকার মহাশয় এই মালদহের 'পল্লী-কথা' প্রকাশের মূল। তাঁহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী ছাত্রগণ মালদহের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ঐতিহাসিক কাহিনী সংগ্রহে ও প্রচারে নিযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অধ্যাপক সরকারের মালদহের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী ছাত্রগণের সমবেত শক্তিতে যাহা আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইবে বা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত হইবে।

রামাবতীর শোভা

রামাবতীর সংস্থান-বর্ণনা-কালে আরও কয়েকটি নগরউপনগরাদির নামোল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল স্থানাদির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিতে করিতে,

মালদহের সমগ্র প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি রামাবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবিশেষ বিবরণ-প্রদানের জন্য লিখিত হইল।

নগরের শোভা কিরূপ মনোহর ও সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিতে হয়, কবি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কবিগুরু বাল্মীকি অযোধ্যার শোভা যেরূপ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী কবিরাও সেই প্রকারে স্বস্ব বর্ণনীয় বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। কবিগণের বহু কল্পনা অসত্য হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের রাজধানীর শোভা-বর্ণনা বহু স্থানে বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়। ভাবময় বাল্মীকি অযোধ্যার শোভা-বর্ণনা করিয়া যাহা বিলাসিতার নিদর্শনচিহ্ন তাহাই লঙ্কার শোভাবর্ণনায় বিবৃত করিয়াছেন, তিনি "কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং" হইতে আরম্ভ করিয়া যে অতুলনীয় বিলাসিতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সেই সময়ের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার। যখন দেশের সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের বিবেচ্য বিষয়। লঙ্কার রাজপথে আলোক দিবার ব্যবস্থা ছিল; রাজ-গৃহে যন্ত্রযুক্ত বাজনীতে বায়ুসঞ্চালন হইত। রামের অযোধ্যায় সে সকল ছিল না।

রামাবতী পালরাজ রামের অযোধ্যা, সন্ধ্যাকর কলিকালের বাল্মীকি। তিনি রামাবতী দেখিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বড় উপাদেয়। রামাবতী-প্রবেশ-সীমা-ভূমি পুষ্পোদ্যান ও ফলোদ্যানে শোভিত ছিল। তথায় পবন কেতকী-কুসুম-সুবাসিত ও সরোবর প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলে শোভিত ছিল। উদ্যান ভ্রমরগুঞ্জন-মুখরিত ছিল। তথায় বহু দেবালয়ের উন্নত হেমচূড়া দূর হইতে রামাবতীর পরিচয় দিত। নগরী রাজপদোপজীবিগণের আবাস-ভবনে ও বিবিধ রাজভোগ্য গৃহে শোভিত ছিল। রামাবতীর পশ্চিম পার্শ্বে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। সে স্থান বানিজ্যার্থী সাধু বণিক্‌গণের সংঘ, ও তরণীসমূহে সমাকুল ছিল ও তথায় ধনকুবেরগণের বাসভবন শোভা পাইত। বন্দর, হাট, বাজার, বিপণিসমূহে রামাবতী শোভিত ছিল। রামপাল সস্ত্রীক এই রামাবতী নগরে সাধু জনগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকরের বর্ণনার বহুকাল পরে, আজ দুইশত এক বৎসর গত হইতে চলিল, ঘনরাম রামাবতীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যেন রামাবতীর পথ, ঘাট, উদ্যান ও শোভার পরিচয় নন্দী কবির বর্ণনীয় বিষয়েরই তুল্য বলিয়া মনে হয়।

ঘনরামের রামাবতীর শোভা

"দেখ ঐ সারি সারি গুয়া নারিকেল।
কদম্ব-কুসুম চাঁপা বকুল শ্রীফল ॥
আম জাম পলাশ পিপুল তরুবরে।
সারি সারি পুরীর প্রান্তরে শোভা করে ॥
হস্তীনানগর হেন হয় অনুমান।
পরিসর পাষাণে রচিত পুরিখান ॥
মঠ কোটা মন্দির সহর সৌধময়।
কত ঠাঁই দেউল দেহারা দেবালয় ॥
কত কাঁচা-কাঞ্চন-কলস শোভে তায়।
ঐ দেখ পতাকা উড়িছে মন্দ বায় ॥
মাতুল-মন্দির যেতে ডানি ভাগে পথ।
সেন কন কি কাজ উদ্দেশে দণ্ডবৎ ॥
* * * *
দেখা পাই ঈষৎ মেসোর বাটী আগে।
পাও কি না পাও দেখা চাও ডানি ভাগে ॥
বলিতে বলিতে বেলা হইল অবশেষ।
রমতি নগর এসে করিল প্রবেশ ॥" (১২-সর্গ)

দুইশত বৎসরের পুরাতন কথা

দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ঘনরাম রামাবতীর বর্ণনা করিয়াছেন। তখন হয় ত তিনি গৌড় উপনগরীর কিঞ্চিৎ সজীবতা দর্শন করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনা দেখিয়াছিলেন। সেই কারণে ঘনরাম নন্দী কবির—

"দরদলিতকনককেতককান্তিমপ্যশেষকুসুমহিতাম্।
অরবিন্দেন্দীবরময়সলিলসুরভিশীতলশ্বসনাম্ ॥" ২২ (রাম-৩ পরি)

এবং—

"অপি ধবলধামলেখা লক্ষ্মীভারাভিরামপুরলীলাম্।
নিরূপরি কনককলসসেনকায় পীবরপয়োধরাভোগায় ॥" ২৩ (ঐ)

এই প্রকার রচনার অনুকরণ করিয়াছিলেন। রামাবতীর বিবিধ বর্ণরাগ-রঞ্জিত মন্দির "কনকধামলেখা" সন্ধ্যাকর বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত বলিয়া বর্ণনার শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

ঘনরামের সময়ে মোসলমানরাজধানী জেন্নতাবাদও ছিল না, লক্ষ্মণের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীও ছিল না, রামাবতীও তখন রমতী হইয়া প্রাচীন সৌন্দর্য্য হারাইয়াছিল। কিন্তু এক ধর্ম্মসম্প্রদায় তখনও রমতী গৌড়নগর সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিত বলিয়া রমতী গৌড়ের প্রাচীন শোভার কথা গাহিয়া জনগণহৃদয়ে সেই প্রাচীন সৌন্দর্য্যের একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। কবিকঙ্কন, ঘনরামের পূর্ব্বে, চণ্ডীতে গৌড়নগরের চিত্র হৃদয়ে লইয়া কালকেতুর গুজরাটে বন কাটাইয়া গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। ঘনরামের রমতী ও গৌড়বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া স্বীকার করি। তিনি রমতী গৌড়ের যে সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই উপভোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

রামাবতীর পথ

সেকালে দক্ষিণ দেশ হইতে গৌড় রমতী আসিতে হইলে অধিকাংশ স্থলে "তরতীপুরের" নিকট বড়গঙ্গা পার হইয়া গৌড় উপনগরে প্রবেশ করিত হইত। রাজমহল ও অন্যান্য স্থানে পারাপারের ঘাট থাকিলেও সকল ঘাটগুলি সুরক্ষিত ছিল। এবং দক্ষিণ দেশ হইতে আগত পথিকের পক্ষে প্রথম পথই সরল ছিল। বর্ত্তমান মোসলমান গৌড়ের "কোতোয়ালী" দরজা তখন ছিল না, কিন্তু ঐ স্থান দিয়া উত্তর গৌড়ে আসিবার পথ ছিল এবং অন্য একটি পথ রামকেলীর পার্শ্ব দিয়া গঙ্গাতীরে উত্তর দিকে প্রসারিত ছিল। এই শেষোক্ত পথ দিয়া পাটল-চণ্ডীদেউলের পার্শ্ব হইয়া তখন বড় সাগর দীঘিতীরে আসা চলিত। পূর্ব্বে প্রাণ্ড নদী ছিল। রামাভিটা, ধর্ম্মপুর, চণ্ডীপুর কমলাবাড়ী তখন বর্দ্ধিষ্ট গ্রাম ছিল, তৎপরে ঢাকন, সোণাতলা (সুবর্ণ) ও কাঞ্চন সহর রামাবতীর অন্তর্গত ছিল। ইহারই পশ্চিমে আদিশূর-দত্ত ব্রাহ্মণভূমি "ব্রহ্মপুরী", পার্শ্বে "হরিকোটী" (হরিপুর) দিয়া অধিরথ গঙ্গারামপুর, কানাইপুর, পেশল, গঙ্গারামপুর, দৈবকীপুর, প্রভৃতি বাণিজ্য-বন্দরশোভিত উপনগরসমূহে প্রবেশ করিতে হইত।

ব্রহ্মপুরী ও হরিকোটী

সেই সময়ের রামাবতী এক্ষণকার রমতী বা অমৃতী ছিল না। এখন অমৃতী গঙ্গার দেয়াড়। প্রাচীন রামাবতীর দুই তৃতীয়াংশ গঙ্গাতেই চিরদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছে।

সেই সময়ে বড় সাগর দীঘির সন্নিকট হইতে অর্থাৎ রামাভিটা, ধর্ম্মপুর, চণ্ডীপুর, কমলাবাড়ী, ঢাকন, সোণাতলা, কাঞ্চনসহর, হরিপুর, অধিরথ,

গঙ্গারামপুর, পিছলী, দৈবকীপুর ইত্যাদি মহল্লা লইয়া রামাবতীনগর নির্দ্দিষ্ট হইত, ইহা সহজেই বিবেচনা করা চলে।

লক্ষ্মণাবতী

সেনবংশীয় শাসনকালে পাটনচণ্ডী ও লোহাগড় হইতে উত্তরে চণ্ডীপুর দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতী নগর ছিল, তন্মধ্যে সাগর দীঘির নিকট কোতোয়াল-দ্বার হইতে লোহাগড় পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর দক্ষিণস্থ উপনগর ছিল। বড় সাগর দীঘির সন্নিকটবর্ত্তী কোতোয়ালদ্বার হইতে চণ্ডীপুরের দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত খুব সম্ভব লক্ষ্মণাবতী নাম্নী সৌধমালা-সমাকীর্ণা নগরী ছিল এবং উত্তরে অর্দ্ধনারীশ্বর শিবদুর্গা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রামাবতীর সীমা

রামপালের সময় লক্ষ্মণাবতী* কতিপয় বর্দ্ধিষ্ণু উপনগরের সমষ্টি ছিল। রামাবতীর দক্ষিণস্থ উপনগর এবং বর্ত্তমান কাঞ্চনসহর হইতে গঙ্গারামপুর, পিছলী পর্য্যন্ত প্রকৃত রামাবতী; তৎপরে কিছু দূরে পালরাজধানী গৌড় নগর ছিল।

জেন্নতাবাদ

ঘনরাম জেন্নতাবাদ লক্ষ্মণাবতীর সহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু "ধর্ম্মগীত"-কারকেরা ঐ দুইটি নগরকে গৌড় বলিতেন না। তাঁহারা রামাবতীর উত্তরের যে গৌড় তাহাই প্রকৃত বৌদ্ধগৌড় বলিয়া জ্ঞাত ছিলেন। ধর্ম্মের গানে সেই গৌড়ের উল্লেখ করিতে হইত; ধর্ম্ম-পণ্ডিতগণ সেই গৌড়কে আজিও সম্মান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপূজায় গৌড়ের একাধিকবার উল্লেখ করিতে হয়। গৌড়ের রাজা যে ধর্ম্মপূজা করিতেন, ধর্ম্মপূজকগণ আজিও তাহা বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মমঙ্গলের গৌড় বৌদ্ধ গৌড়

রামাবতীর রাজমার্গ ও শাখাপথ

পথ-বর্ণনার সুবিধার জন্য জেন্নতাবাদ ও লক্ষ্মণাবতীর একটা স্থূল ধারণা করিয়া লইলাম। লক্ষ্মণাবতীর উত্তরাংশ হইতে দুইটি পথ উত্তরদিকাভিমুখে প্রসারিত ছিল। এই দুইটি পথের মধ্যে একটি পথ গঙ্গাতীর দিয়া উত্তরমুখে সরল রেখার ন্যায় রামাবতী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ঐ পথই পশ্চিমাংশ বেষ্টিত করিয়া গৌড়ে গিয়াছে এবং দক্ষিণ ভাগের (ডাহিনের) পথটি রামাবতীর পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া ধমু-

* তৎকালে লক্ষ্মণাবতী নাম প্রাপ্ত হয় নাই।

কের ন্যায় বক্রভাবে হরিপুর প্রভৃতির পূর্ব্বাংশ দিয়া বর্ত্তমান কাজল দীঘির পশ্চিম পাহাড় দিয়া উত্তর মুখে গৌড় নগর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই পথটির এই প্রকার বক্র হইবার কারণ, পূর্ব্বভাগে পদ্মা নদীর বিস্তীর্ণ বাঁক ছিল। তাহা বর্ত্তমান কালে গোঁদবাইল ও ভাতিয়ার বিল নামে খ্যাত রহিয়াছে। সুতরাং রামাবতীর পূর্ব্ব, পশ্চিম, ও উত্তরের কিয়দংশ জলময় দুর্গদ্বারা অভিরক্ষিত ছিল; এবং এই দুইটি পথ রামাবতীর পশ্চিম ও পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া প্রসারিত ছিল। উভয় পথেই গৌড় নগরে যাওয়া যাইত। রামাবতীর পূর্ব্বপার্শ্বে গৌড়-গমনের বক্র পথটি বর্ত্তমান পাথালে গড়ের পশ্চিমেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, একটি পূর্ব্বমুখে এবং অপরটি কাজল দীঘির নিকট দিয়া উত্তরমুখে প্রসারিত ছিল। এই উত্তর-প্রসারিত উন্নত পথটি কিয়দ্দূর যাইয়া আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি রাস্তা পশ্চিমমুখে গঙ্গারামপুরে প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই প্রকারের উন্নত রাস্তাগুলিকে "গড়" বা "আইল" বলে।

যে পথটি পূর্ব্বমুখে বিস্তীর্ণ ছিল উহা বক্রভাবে কোথাও ঠাকুর প্রসাদের গড়, কোথাও বুড়ুজ-গড় নামে খ্যাত হইয়া রাইপুর অর্থাৎ গিলাবাড়ীর কিছু পশ্চিমে যাইয়া মহানন্দার অনতিদূরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ঘনরাম ও রামাবতীর পথ

ঘনরাম এই উন্নত প্রাচীন পথটির সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"বাজে ঘোড়া কাড়া সিঙ্গা সদর নিশান।
লঘুগতি পশ্চাৎ রাখিল গৌড়খান॥ ১৫৯
বামে রাখে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ী।
মহানন্দা† পেরুতে বিলম্ব হইল বড়ি॥" ১৬০

(১৪ স্বর্গ)

মালদহ ও গিলাবাড়ী

এই স্থানেই ঘনরামের কাব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রকারের বর্ণনা দেখিয়া ঘনরামকে বলিতে ইচ্ছা করে, তিনি গৌড় রমতী ভ্রমণ করিয়া এ দেশের জনপ্রবাদাদি লইয়া 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।

রামাবতীর উত্তরস্থ গৌড় নগরী ত্যাগ করিয়া বামে মালদহ রাখিয়া পূর্ব্ববর্ণিত

† মহানন্দার প্রাচীন নাম মহানদ।

পথে গিলাবাড়ী দক্ষিণে রাখিয়া মহানদ (বর্ত্তমান মহানন্দা) পার হইয়া লাউসেন কাউর (কামরূপ) রাজা কর্পূর ধবলের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন ; খুব সম্ভব বানপুর বুনবুনচণ্ডী দিয়া কাঁওর গিয়াছিলেন। আজিও মালদহে গিলাজাতি বিদ্যমান রহিয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থান দুইটি প্রসিদ্ধ ছিল।

রামাবতী ও পালগণের বিস্তীর্ণ নগর

তাহার পরে এই পাল গৌড় বা বৌদ্ধ গৌড় হইতে রামাবতী (রমতী) কিছু দূরে থাকিলেও উভয় নগরীর মধ্যভাগে কোন প্রকার বিভাগ-সূচক উদ্যান, কানন বা প্রান্তর ছিল না। রামাবতী ও গৌড় যেন একই সহর ছিল বলিয়া মনে হয়। সুবিস্তীর্ণ গৌড় ও রামাবতী সৌধমালাকীর্ণা একটি নগরী বলিয়াই উপলব্ধি হইত। লাউসেনের মাতুল মহামদ‡ যখন গৌড়রাজদরবার হইতে নিজ বাসস্থান রামাবতীতে আগমন করিতেন, তখন—

"রাজ-সভা হতে পাত্র যায় নিজ ধামে।
সহর বাজার পাড়া রয় ডানি বামে॥" ২১ (১২ সর্গ)

সুতরাং গৌড় ও রমতী ঘনসন্নিবিষ্ট লোকাবাসে পূর্ণ ছিল। ঘনরামের কাব্য উপন্যাস নহে, উহার অধিকাংশ ব্যাপারই প্রকৃত। ঘটনা ও স্থানগুলিও প্রকৃত। এই কারণে উহা ঐতিহাসিকগণের আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে ধর্ম্মমঙ্গল জাতীয় পুস্তকগুলি একেবারে অসার বলিয়া উহার প্রতি দুই চারিজন ব্যতীত সকলেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে ঐতিহাসিকগণ ঐ প্রকারের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদানসংগ্রহে সমর্থ হইতেছেন। ধর্ম্মমঙ্গল বৌদ্ধ পালরাজগণের সময়ের একটি চিত্রপট অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই চিত্র হইতে আমরা বহু বিষয় জানিতে পারিয়াছি।

কবিকঙ্কণ ও ঘনরাম

কবিকঙ্কণ মোসলমান গৌড়ের চিত্র নিখুঁত ভাবে নকল করিয়াছেন। ঘনরাম পাল গৌড়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ঘনরামের সত্যপ্রিয়তার চিহ্ন ক্রমশঃ দেখাইব।

---

‡ মহামদের জীবনকালে রামাবতীনগরী প্রতিষ্ঠিত না হইলেও পরবর্ত্তীকালে যে স্থানে রামাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানের গৌড়োপকণ্ঠে তাঁহার বাসভবন ছিল। ধর্ম্মপূজকগণ বা ধর্ম্মমঙ্গল-কথকগণ সেই স্থানটির নাম রামাবতী বলিয়াই অবগত ছিলেন।

বন্দর, চাঁদনী, গোলাঘাট

বৈষ্ণব কবিগণ গৌড়ে বাইশ বাজার দেখিয়াছেন। ঘনরাম গৌড় রমতী এক করিয়া হাট বাজার পাড়ায় শ্রেণী বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কানাইপুর নামক স্থানে চাঁদনী, গোলাঘাট নামক প্রাচীন গঙ্গাতীরবর্ত্তী গঞ্জসমূহ (যাহা অতি প্রাচীনকালে গঙ্গাতীরে ছিল, বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গা সরিয়া যাওয়াতে অমৃতীনালা নামে রহিয়াছে) মহাজনের আড়তে জনপূর্ণ হইয়া থাকিত এবং নালাটি নৌকায় পূর্ণ থাকিত। ঠিক ঐ স্থানেই প্রাচীন রামাবতীর গঙ্গা-তীরবর্ত্তী বন্দর ছিল।

গঙ্গাস্নানের ঘাট

এই স্থানে বরেন্দ্রবাসী জনগণ গঙ্গাস্নান করিতে আসিত। "অমৃতী" নামক পিত্তলময় জলপাত্র এই স্থানের কংশবণিক্‌গণ নির্ম্মাণ করিত। আজিও প্রবাদ আছে, জলপথে বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা কাশী প্রভৃতি তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন কালে এই গঞ্জের ঘাটে নৌকা রাখিয়া গৌড়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, অমৃতীর কড়ির বিবিধ খেলানা, দৈবকীপুরের পিত্তলের খেলানা, কাঞ্চন-সহরের স্বর্ণ-রৌপ্যাদির অলঙ্কার ও মালদহী রেশমী কাপড় ক্রয় করিয়া দেশে লইয়া যাইতেন।

রামাবতীর বিভিন্ন পল্লী

সেই রামাবতীর প্রাচীন স্মৃতি আজিও গোলাঘাট, চাঁদনী নামে বর্ত্তমান রহি-য়াছে। আজিও কামারপাড়া, সোণারপাড়া, লাউয়াপাড়া (নাপিতপাড়া) ব্রাহ্মণ-গাঁ বা পাড়া, ঠাকুরবাড়ী ইত্যাদি বহু নামে বিস্তীর্ণ স্থান সূচিত হইতেছে। প্রাচীন পাষাণসেতু, ইষ্টক-গ্রথিত পথ; সহরের মধ্যে গড়, পরিখা, কৃত্রিম জলপ্রণালী, দেবালয়ের উন্নত স্তূপ আজিও অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঘনরাম যে কামারপাড়ার কথা বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই কামারপাড়া আজিও "লোহার-পাড়া" হইয়া বনভূমিতে রহিয়াছে; যেন জীবন্ত রামাবতীর স্মৃতি জাগাইবার জন্য তাহার শ্মশানভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রামাবতীর সহিত ধর্ম্মপূজকগণের সম্বন্ধ

এই রামাবতী নগরে ধর্ম্মপূজা প্রচারার্থ রঞ্জাবতীর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্ম-পূজক পণ্ডিতগণ রমতীর সম্মান করেন এবং ইহা তাঁহাদের তীর্থস্থানের মধ্যে অন্যতম। এই সংস্কার বড় সাধারণ নহে। বহু বৎসর হইতে ধর্ম্মপণ্ডিতগণ বংশা-

বলী ক্রমে এই সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছেন এবং এই সূত্রে গৌড় রমতীর ইতিহাস, বিকৃতই হউক বা অবিকৃতই হউক, তাঁহারা এক প্রকার অবগত আছেন। ধর্ম্মের গীতেও এই সূত্রে একটা ঐতিহাসিক প্রবাহ চলিতেছে,—

"জন্ম নিতে যাও গৌড় রমতী নগর।
ধার্ম্মিক ভূপতি যার রাজা গৌড়েশ্বর॥ ২৫৪
জন্মেছে কলির অংশে পাত্র পাপমতি।
সে হবে তোমার ভাই কর্ণসেনপতি॥ ২৫৫
বেণুরায় পিতা তোর জননী মন্থরা॥ ২৫৬

সুতরাং রঞ্জা* রমতীনিবাসী বেণুরায়ের কন্যা। ধর্ম্ম স্বয়ং ছলনা করিয়া দেব-নর্ত্তকীকে যখন আপন পূজা-প্রচারার্থ গৌড় রমতী নগরে পাঠাইয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হয়, ঐ স্থান ধর্ম্মপূজার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। ধর্ম্ম তাহা দেখিয়াছিলেন কি না, জানি না; তবে ধর্ম্মপূজকগণ দেখিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপূজাকালে লাউসেনী পদ্ধতি অনুসারে কালু ডোম ও তাহার স্ত্রী লখী ডোমনীর পূজা করিতে হয়। এই কালু ডোমের বাড়ী রমতীতে ছিল। এ ক্ষেত্রে কালু ডোমের পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন কি তাহা বলিয়া রাখি,—কালু ডোমের পূজাটি প্রাচীন না হইলেও নিতান্ত আধুনিক নহে। ধর্ম্মপূজার মন্ত্র ও অনুষ্ঠান-গুলি প্রাচীন। রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির মধ্যে কালু ডোম বড় স্থান পায় নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে লাউসেনী ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতির মধ্যে কালু ডোম সস্ত্রীক স্থান পাইয়াছে। সুতরাং নীচ কালু ডোম ধর্ম্মকৃপায় দেবতার আসন পাইয়াছে। রামা-বতী তাহার জন্মভূমি। এই ধর্ম্মপূজক তান্ত্রিক-বৌদ্ধগণকে তখন এদেশে "দলুই" বলিত।

"পেরুল সহর গৌড় প্রবেশে রমতী।
পথে দেখা হইল কালু ডোমের সংহতি॥" ৪৬০ (১৩ সর্গ)

কালু ডোমকে লাউসেন ময়নায় লইয়া যাইবার জন্য প্রলোভন দেখাইয়া-ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"বান্ধাব পুরট পাগ পরো পট্ট ধুতি।
দলুই সবার কাণে দোলাইব মতি॥" ৪৮২॥ (১১ সর্গ)

* মাণিক গাঙ্গুলী রঞ্জাপুরের কথা লিখিয়াছেন—"রঞ্জাপুর যাই তার তৃতীয় দিবসে।" ৭৬—"তরাসে গেলাম ছুটে রঞ্জাপুর ক্ষিপ্র।"—৯৮ "রাজ্যধর বিদ্যাপতি নাই রঞ্জাপুরে॥"১০০

"সহর কোটাল হইল কালু মহাবল।
চারিদিকে চৌকি থাকে দলুই সকল॥" ৫২২॥ (ঐ)

ইহাতে একটি কথা মনে হয়—"দলুই" ডোমের পূর্ব্ব উপাধি নহে; যখন তাহারা ধর্ম্মপূজক হইয়াছিল, তখন "দলুই" উপাধি পায়। সম্ভবতঃ "দলুই" ধর্ম্মপূজক নীচ জাতিকে বলা হইত। বলিতে পারি না, এই মাল-দহের দলুই পরবর্ত্তীকালে উত্তরে গিয়া সম্মান পাইয়াছে কি না। এই দলুইগণকে লইয়া এদেশে লাউসেন যেমন ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক কালবিরূপ ত্রিপুরা দেশে গিয়া এই প্রকারের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তিব্বতের দলুই নামও ইহার অনুরূপ। সন্ধ্যাকর নন্দী রাম-চরিতে দেবপালকেই হউক কিম্বা অন্য কোন পালরাজকেই হউক লক্ষ্য করিয়া সমুদ্রকুলবংশ * বলিয়া গিয়াছেন।

ঘনরাম বলিয়াছেন—

"কুমুদবান্ধব-বন্ধু সিন্ধু পিতা যার।
স্বধর্ম্ম ধরণী ধন কি কহিব তার॥" (১৪ সর্গ)

পালরাজের "সিন্ধু-পিতা" বলিয়া ঘনরাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং সবিশেষ ইতিহাসও প্রদান করিয়াছেন। এক্ষেত্রে ঘনরামের ও সন্ধ্যাকর নন্দীর কথা এক হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে দেখিতেছি, ঘনরাম মিথ্যা পাল-কাহিনী বর্ণনা করেন নাই।

সন্ধ্যাকর নন্দী-লিখিত পালবংশের ইতিহাসের সহিত ধর্ম্মমঙ্গলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পাইতেছি বলিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কবিকল্পনা বলিয়া ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই রমতী নগরের বেণুরায়ের কন্যার সহিত সম্ভবতঃ গোপালের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এক পক্ষে গৌড়েশ্বরের শ্বশুরবাড়ীও রমতী হইতেছে।

রামপালের রামাবতী তৎকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শেখ শুভোদয়াতে রামপালের একটি কীর্ত্তিকথা লিখিত আছে। যথা—

"রামপালস্য এক পুত্র স্তেন কদাচিদ্-যোষিদ্ধর্ষিতা। জ্ঞাত্বা স রাজা স্বপুত্রং

---

* In the Ramacharita the Palas are said to have been descended from the ocean-god. (M. Asia 8-13 Vol. III No I Preface page, 2 Introduction) 1910.

শূলেন যোজয়ামাস। অদ্যাপি তেষাং যশো গীয়তে লোকৈঃ। রামপালো রাজা একমেব পুত্রং অপরাধিনমনপরাধিনম্বা শূলেন যোজয়ামাস। যস্ত কীর্ত্তির্ম্মহুষ্যেষু পুণ্যলোকেষু গীয়তে।"+

যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, এই মহতী কীর্ত্তির স্থান বলিয়া প্রাপ্য সম্মানে রামাবতীরই অধিকার। এই প্রবাদ অবলম্বনে ঘনরাম মহামদের পুত্রগুলিকে শূলে চাপাইয়া দিয়াছেন কি না বলা যায় না।

এই রামাবতী হইতে রামপালপুত্র মদনপাল যে তাম্রশাসন পট্ট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই—শ্রীরামাবতী নগর পরিসরসমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীরামপালদেবঃ পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমন্মদনপালদেব কুশলী।

রামাবতী নগরে যে দিন মদনপালদেবের এই মহান্ শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই উৎসবক্ষেত্রে আগমনের জন্য গঙ্গাবক্ষে ধ্বজপতাকাদি-শোভিত নৌসেতু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে দিন দেশবিদেশের রাজন্যগণের আগমন-জনিত "বাহিনীখরখুরোৎখাত ধূলীধূসরিত দিগন্তরাল" হইয়া উঠিয়াছিল। এই সেই রামাবতীর কথা বলিতেছিলাম।

শ্রীহরিদাস পালিত।

বৃথা নহে।

(ইংরাজী হইতে)

বলিও না—"বিফল প্রয়াস,
বৃথা শ্রম, বৃথা দেহ-নাশ।
শত্রু নাহি মানে পরাজয়
কাল যাহা, আজও তাই রয়।"
আশা যদি হয় ভ্রান্তিময়,
ভয় সেও মিছা কথা কয়।
অদূরে ধূমের অন্তরালে,
হয়ত পলায় অরিদলে;
মিত্রগণ পশ্চাতে ধাবিত,
তুমি গেলে বিজয় নিশ্চিত।

হেথা হের শ্রান্ত ঊর্ম্মিচয়,
কষ্টে তিল অগ্রসর হয়;
ফিরে দেখ শতখান চে'য়ে,
নীরবে এসেছে সিন্ধু ধে'য়ে।
শুধু নহে পূরব গবাক্ষে
দিবালোক দেখা দেয় কক্ষে।
সম্মুখে রবির ঊর্দ্ধগতি
কি মন্থর মনে হয় অতি;
পশ্চিমেতে ফিরাও নয়ন—
ধরাতল আলোকে মগন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

+ শেখ শুভোদয়ায় যাহা লিখিত আছে তাহাই লিখিত হইল।

লাল ফুল।

(১)

লীলার তপস্যার সঙ্গে বোধ হয় কিছু অভিসম্পাত ছিল। সে গুণবান্ ও রূপবান্ স্বামী পাইয়াছিল; কিন্তু আশা মিটাইয়া স্বামীকে দেখিতে বা স্বামীর সেবা করিতে পারিত না। তাহার পিতৃবংশের একটি দোষ ছিল। বিবাহের পর লীলার শ্বশুর তাহা শুনিয়া বধূর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহার স্বামী যতীন্দ্রনাথ কোন্ কালের সেই বংশের দোষ ধরিয়া স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি পিতার কথার উপর কথা কহিতেন না। সেই জন্য লুকাইয়া লুকাইয়া কলেজের ফেরৎ লীলার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেন। তাহাও অবশ্য প্রত্যহ পারিয়া উঠিতেন না। লীলার সমস্ত আকুল আগ্রহ স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। সেই প্রেমপূর্ণ নয়ন, প্রশস্ত ললাট, হাসিমাখা অধর দেখিবার জন্য লীলা পাগলিনীর মত গবাক্ষে বসিয়া থাকিত। যতীনবাবু লীলাদের বাটীর সম্মুখে আসিয়া গবাক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেন। হায় সমাজ! দুইটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় মিলিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তবু ত মিলন হয় না! মিলনের সামান্য সময়টুকুতেই লীলা সুখী হইত। কিন্তু সুখের সঙ্গে কত আশঙ্কা—লুকাইয়া আসা, যদি শ্বশুর কোন দিন জানিতে পারেন তাহা হইলে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইলে কি পুত্র আর আসিবেন? তাহা হইলে—তাহা হইলে লীলার কি হইবে? কি যে হইবে, সে কথা লীলা ভাবিতে পারিত না। ভাবনার শেষ সীমায় যাইতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। কারণ সে জানিত, সে অবস্থায় মৃত্যু ভিন্ন আর গতি নাই।

(২)

লীলা সর্ব্বদাই ভাবিত, এখন তিনি কি করিতেছেন?—যদি কেহ আসিয়া বলিত! হৃদয় সর্ব্বদাই হৃদয়সর্ব্বস্বের জন্য ব্যাকুল। লীলা আপন হৃদয়কে আপনিই তিরস্কার করিত। অবুঝ হৃদয় না বুঝিয়া তবুও ব্যাকুল হইত। লীলার সইয়ের কাছে লীলা সুখদুঃখের সব কথাই বলিত ও মাঝে মাঝে বলিত, "ঠাকুরমার গল্পের সেই লাল ফুল যদি থাকিত, তাহা হইলে আমি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম, অথচ কেহ দেখিতে পাইত না।" একদিন

সই ধরিয়া বসিল, "তোমার লাল ফুলের গল্পটি বল। যাহার জন্ত তোমার এত দুঃখ, তাহার গল্পটি আমি শুনিব।" "তবে শুন" বলিয়া লীলা সইয়ের সহিত স্বীয় শয্যায় শয়ন করিয়া গল্প আরম্ভ করিল।—

এক রাজার দুই রাণী ছিলেন। বড় রাণী একটি সন্তান রাখিয়া লোকান্তরিত হইলেন, ছোট রাণীর খুব আনন্দ হইল। তবে সঙ্গে সঙ্গে সতীনের কাঁটাটি যাইল না, এই যাহা একটু দুঃখ। রাজকুমারকে ধাই মানুষ করিতে লাগিল। ধাই ছাড়া রাজকুমারকে কাহারও আদর করিবার উপায় ছিল না; এমন কি রাজা ও নহে। যদি রাজা কোন দিন তাহাকে কোলে লইতেন, তাহা হইলে রাণী তিন দিন মানাগার হইতে বাহির হইতেন না। কাযেই রাজা আর তাহার দিকে চাহিতেন না। তিন বৎসর পরে ছোট রাণীর একটি টুকটুকে ছেলে হইল। তাহার জন্য দুই মাস ধরিয়া রাজ্যে উৎসব হইল। এক দিন মধ্যাহ্নে ছোট রাণী ছেলেকে লইয়া আদর করিতেছেন,

"খোকা আমাদের চৌধুরী,
হাঁ করেছেন গজগিরি
হাতে পেয়েছেন চাঁপা
খোকার বউ ডাক্‌ছে।
ভাত খাওসে বাবা।"

রাজকুমার সেই দালানে ধাইমার কোলে ছিল, ছড়া শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ছোট মা, আমার বউ আমায় ডাক্‌বে? ছোট রাণী রাগিয়া বলিলেন, "সরে যা।"—তিনি ছেলেকে বলিলেন,

"খোকনের শ্বশুর যায় হাটে
দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে
আর খোকনের শাশুড়ী পান খায়
বাউটি বাঁধা দিয়ে।"

বড় রাজকুমার বলিল, "না, খোকার শাশুড়ী নয়, আমার শাশুড়ী।" ছোট রাণী মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, "ভ্যালা সতিনের কাঁটা। ছেলেটাকে আদর করিবারও যো নাই।" সেই দিন রাজা আসিয়া অন্দরে দেখিলেন, রাণীর মুখ অন্ধকার। সেই রাগের ফলে বড় রাজকুমার ও ধাই রাজবাটীর

পার্শ্বে আর একটি ছোট বাটীতে রহিলেন। সেই দিন অবধি রাজবাটীতে তাহাদের 'প্রবেশ নিষেধ' হইল।

রাজকুমার যখন যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন আপনার অবস্থা বুঝিয়া সে আর সে রাজ্যে থাকিতে চাহিল না। ধাইমা তাহাকে বড় ভালবাসে, বলিলে মত দিবে না, সেই জন্য তাহাকে কিছু না বলিয়া সে এক দিন গভীর রাত্রিতে পিতার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কত কষ্টে নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত ছাড়াইয়া অর্দ্ধেক দিন উপবাসী থাকিয়া বড় রাজকুমার এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার মলিন দেহ, রুক্ষ কেশ ও ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া রাজ্যে কেহই তাহাকে ঠাঁই দিল না। সে গাছতলায় থাকিত ও ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিত। সেই সময় ধাইমা'কে স্মরণ করিয়া রাজকুমার নয়নজলে বক্ষ ভাসাইত। এক দিন বৃষ্টি হইল। সারা রাত রাজকুমার বসিয়া ভিজিল। প্রাতে তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। একজন কৃষক সেই দিক্ দিয়া যাইতেছিল, রাজকুমারের অবস্থা দেখিয়া তাহার দয়া হইল। সে তাহাকে আপন পর্ণকুটীরে লইয়া গেল। কৃষকের যত্নে রাজকুমার সুস্থ হইলেও সেই কুটীরে রহিল। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে রাজকুমার শুনিল, সেই দেশের রাজকন্যা রাত্রিকালে শয়নকক্ষে থাকেন না। অথচ রাজা রাজ্যের সকল বাটী অনুসন্ধান করিয়াছেন; কোথাও কন্যাকে দেখিতে পায়েন নাই। প্রাতঃকালে দেখা যায় রাজকন্যা আপনার পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন! রাজা কন্যাকে কত দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সখীরাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রাজকন্যা বলিয়াছেন, "কোথায় আবার যাইব?" অথচ সকলে যতক্ষণ জাগরিত থাকে ততক্ষণ রাজকন্যা নিদ্রা যায়েন। সকলে নিদ্রিত হইলে রাজকন্যাকে আর পাওয়া যায় না। একদিন নিশীথে সখীদের নিদ্রা ভাঙ্গিলে তাহারা দেখিল, রাজকন্যা শয্যায় নাই। রাজবাটীর সকল কক্ষ খুঁজিয়া তাহাকে পাওয়া গেল না। অথচ প্রাতে রাজকন্যা বিছানায়! সেই দিন হইতে রাজা-রাণী ভয়ে ভয়ে প্রত্যহ নিশীথে কন্যার গৃহে আসিতেন, আর শয্যা শূন্য দেখিতেন। তাঁহারা মনে করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই উপদেবতার কায। তাঁহাদের মনে সুখ রহিল না। প্রতিদিন সকলে পরামর্শ করিত, রাত্রিতে জাগিয়া থাকিবে ও কি ঘটে দেখিবে। কিন্তু রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরেই সকলে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইত। আজ

পাঁচ বৎসর এইরূপ হইতেছে। রাজা রাজ্যময় ঘোষণা করিয়াছেন, রাজকন্যা রাত্রিতে কোথা যায়েন, তাহা যে বলিতে পারিবে, তাহাকে রাজ্য সহ রাজকন্যা দান করিবেন। কত রাজপুত্র কোটালপুত্র চেষ্টা করিয়াছেন, কেহই সফলশ্রম হইতে পারেন নাই। রাজকুমারের ইচ্ছা হইল,—এ রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে ভাবিল আমি নিঃসম্বল, ধনজনহীন আমি সফলশ্রম হইতে পারিব কি? তথাপি থাকিয়া থাকিয়া রাজ্য ও রাজকন্যা-লাভের লোভ তাহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল।

আজ পাঁচদিন কৃষক বড় পীড়িত, রাজকুমার তাহার কাছে বসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতেছে। কৃষক রাজকুমারকে বলিল, "বাছা আমার বাড়ীর দক্ষিণ দিকে দুই ক্রোশ গেলে একটি জঙ্গল। সেই জঙ্গলে গোলপাতার এক রকম ছোট ছোট গাছ আছে। শিকড় সমেত সেই গাছ যদি আনিয়া দাও, তবে তাহার রস পান করিলেই আমি সুস্থ হইব।" রাজকুমার সানন্দে স্বীকৃত হইল।

জঙ্গল হইতে শিকড় সমেত গাছ লইয়া ফিরিবার সময় রাজকুমার দেখিল, একটি পক্ষীর শাবক কাঁটাগাছে পড়িয়া ঝটপট করিতেছে; কিছু-তেই উঠিতে পারিতেছে না। তখন রাজকুমার গাছগুলি রাখিয়া শাবকটিকে তুলিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। সেই সময় ঝড়ের মত একটা শব্দ হইল ও রাজকুমার শুনিতে পাইল, কে বলিতেছে, "আমার সন্তান লইয়া যাইতেছিস?" রাজকুমার উপরদিকে চাহিয়া দেখিল, এক বৃহৎ পক্ষী উড়িতে উড়িতে আসিতেছে ও ঐ কথা বলিতেছে। রাজকুমার বলিতে যাইতেছিল, "আমি শাবক লইয়া পলাই নাই, শাবককে রক্ষা করিয়াছি।" কিন্তু বলিবার সময় হইল না। পক্ষী নিমেষে আপনার শাবক কাড়িয়া লইল ও পক্ষাঘাতে রাজকুমারকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। শাবক ক্ষীণস্বরে জননীকে সকল কথা বলিল। তখন বৃহৎ পক্ষী রাজকুমারের কাছে আসিয়া ক্ষমা চাহিল ও তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পক্ষীতে এমন সুন্দর কথা কহিতে পারে দেখিয়া রাজকুমারের বিস্ময় হইল। সে আপনার সকল কথা বলিল, রাজ্যের কথা বলিল, কৃষকের কথা বলিল, আর রাজকন্যার কথা বলিল। পাখী সব শুনিয়া বলিল, "রাজকুমার তুমি আমার শাবককে বাঁচাইয়াছ, আমি তোমার কিছু উপকার করিব। তুমি আমার শাবকটিকে লইয়া থাক। আমি এখনই আসিতেছি।" বলিয়া পাখী উড়িয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে পাখী ঠোঁটে করিয়া একটি লালফুল ও একটি পালক আনিয়া রাজকুমারের হাতে দিল ও বলিল, "এই ফুলটি তুমি যতক্ষণ কাণে রাখিবে ততক্ষণ কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না। আবার যখন কাণ হইতে ফুল খুলিবে তখন সকলে তোমাকে দেখিতে পাইবে। আর তুমি আমার পালকটির ভস্মের কাজল চক্ষুতে দিয়া রাজকন্যার ঘরে যাইলে তোমার নিদ্রাকর্ষণ হইবে না। তবেই তুমি রাজকন্যার ব্যাপার সব জানিতে পারিবে।" রাজকুমার আনন্দে ফুল, পালক ও সেই গাছগুলি লইয়া কৃষকের বাটী যাইল। কৃষক আরোগ্য হওয়ার পর রাজকুমার কৃষককে বলিল, "আজ রাত্রিতে আমি আসিব না।"

রাজকুমার সেই লাল ফুলটি কর্ণে দিয়া ও পাখীর পালকের কাজল পরিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইল। সে সকলকে দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু তাহাকে যে কেহ দেখিতে পাইতেছে না, ইহা প্রথমে রাজকুমারের বিশ্বাস হইতেছিল না। যখন সে বাহিরবাটী হইতে অন্দরে ও ক্রমে রাজকন্যার গৃহে আসিয়া একটি কোণে দাঁড়াইল অথচ কেহ কিছু বলিল না, তখন সে বুঝিল, সত্যই লাল ফুলের অসাধারণ গুণ।

গভীর নিশাথে রাজপুরীর যখন সকলেই নিদ্রিত, তখন রাজকন্যা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকুমার সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, বিশালকায় চারিজন পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যাকে প্রণাম করিল। রাজকন্যা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাদে আসিলেন, রাজকুমারও উহাদের সহিত ছাদে আসিল। রাজকুমার দেখিয়া বিস্মিত হইল, ছাদের কোণে একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত রথ। রাজকন্যা তাহাতে উঠিলেন, রাজকুমারও এক পাশে উঠিল। তখন সেই চারিজন পুরুষ রথ চালাইয়া আকাশের দিকে লইয়া চলিল ও মধ্যে মধ্যে রাজকন্যাকে বলিতে লাগিল, "রথ আজ দ্রুত চলে না কেন? বোধ হইতেছে আর কেহ রথে উঠিয়াছে। কিন্তু উঠিলে আমরা অবশ্যই দেখিতে পাইতাম।" রাজকন্যা বলিলেন, "তোমরা যখন রাজপুরীতে প্রবেশ কর তখনই সকলে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়। কে উঠিবে?"

এ কি! রাজকুমারের চক্ষুর সমক্ষে এ কোন স্বপ্ন-রাজ্য উপস্থিত হইল। এ কোন্ দেশ, যাহাতে শত সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত? রথ থামিল। রাজকন্যার সহিত রাজকুমার এক অপরূপ সভায় উপস্থিত হইল। রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে রাজা ও রাণী বসিয়া আছেন। পরীরা সব চামর ব্যজন

করিতেছে। কি সুন্দর গীত-বাদ্য শ্রুত হইতেছে! মধুগন্ধে দশদিক ভরিয়া গিয়াছে। এ কি সৌন্দর্য্য ও আনন্দপূর্ণ সভা? দুঃখ কখন ইহার কাছে আসিতে পারে না। দুঃখ বলিয়া যে কোন জিনিষ আছে, এ রাজ্যের লোক তাহা জানে না। একি স্বর্গ? ইনি কি দেবরাজ ইন্দ্র? রাজকুমারের মনে হইতে লাগিল, সে যেন কখন এ দেশে ছিল। এইরূপ ভাবনায় রাজকুমার যখন তন্ময়, তখন শুনিতে পাইল, মধুর স্বরে কে তাহাকে ডাকিতেছে, "রাজকুমার, বৎস! আমার কাছে আইস। লাল ফুল খুলিয়া ফেল।" রাজকুমার চাহিয়া দেখিল, রাজা ডাকিতেছেন। লাল ফুলটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে রাজকুমার সিংহাসনের কাছে নত হইয়া বসিল। রাজকন্যা ব্যাকুল ভাবে ডাকিলেন, "জয়ন্ত! জয়ন্ত আমার! এতদিনে আবার তোমায় দেখিলাম? জয়ন্ত আমার!" সে স্বরে কি আকুলতা, কি প্রেম-আহ্বান! সকলের নয়নে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিল। রাজকুমার জ্ঞানহারার মত সিংহাসনের কাছে বসিয়া রহিলেন। যেন কি মনে পড়ে, পড়ে না।

রাজকন্যা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেবরাজ! আর যেন আমি আমার স্বামীকে না হারাই। উঁহার কি কিছুই মনে পড়িতেছে না? আমার দিকে উনি ফিরিয়া চাহিতেছেন না কেন?" "মা স্থির হও, তোমার পতিভক্তির গুণেই এত শীঘ্র জয়ন্তের শাপ-মোচন হইল। এই লও, জয়ন্তকে এই পারিজাত-মালা পরাইয়া দাও, সব কথা উহার মনে পড়িবে।" রাজকন্যা মালাগাছটি রাজকুমারের গলায় দিলেন। তখনই রাজকুমার প্রেমপূর্ণনেত্রে রাজকন্যার দিকে চাহিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করিল।

দেবরাজ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস সব কথা যদি স্মরণে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বল, কেন তুমি স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলে।" রাজকুমার ধীরে ধীরে বলিল, "সে দিন সভায় উপস্থিতির সময় আমি আসি নাই ও আমার নীহারকে আসিতে দিই নাই। কারণ, তাহার সেই প্রেমপূর্ণ সৌন্দর্য্যমাখা মুখখানি ছাড়িয়া সভায় নৃত্যগীতে যোগ দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পরদিন আপনার মুখে শুনিলাম যে, আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছি, সুতরাং দিনকতক আমায় স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যে জন্ম লইতে হইবে; যাহার মোহে মুগ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করি নাই, তাহাকে দিনকতক ছাড়িতে হইবে। আর নীহার আমায় অনেক বার বলিয়াছিল, 'কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া তবে প্রেমের আরাধনা করিলে কি ভাল হয় না?' আমি সে কথা শুনি নাই, সেজন্য আমিই

পুনঃ মর্ত্ত্যে জন্মিব। কিন্তু নীহার আপনার পায়ে ধরিয়া আমার সঙ্গে জন্ম লইতে চাহিল। তাহার পর আর আমার কিছু মনে ছিল না। আমি সব ভুলিয়া মর্ত্ত্যে ছিলাম।”

দেবরাজ বলিলেন, “নীহারের কোন ইচ্ছাকৃত অপরাধ ছিল না। তাহার জ্ঞানোদয়ের পরই, আমি প্রতি রাত্রিতে রথ পাঠাইয়া তাহাকে স্বর্গে আনিতেছি ও প্রাতে পাঠাইতেছি। তুমি কোথায় তাহা নীহারকে জানিতে দিই নাই। কিন্তু সে প্রতি নিশায় আমাকে গীতবাদ্যে তুষ্ট করিয়া—বর চাহিয়াছে, যাহাতে শীঘ্র তোমার সহিত মিলন হয়, উভয়ে শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে আসিতে পায়। সেই ছোট পাখী ও বড় পাখী আমার দূত, আমার অনুমতিতে তোমাকে লাল ফুল দিয়া আসিয়াছে। আজ তোমরা মর্ত্ত্যে যাও, বিবাহের পর শাপমুক্ত হইয়া চলিয়া আসিবে।” জয়ন্ত ও নীহার দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া রথে আসিয়া উঠিল।

পরদিন রাজপুত্র রাজকন্যার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, “আমি গণিয়া দেখিয়াছি, রাজকন্যাকে পরীতে উড়াইয়া লইয়া যায়। কিন্তু আজ রাত্রিতে আমি আপনাদের লইয়া রাজকন্যার গৃহে থাকিব ও কিছু মন্ত্র পাঠ করিব—তাহা হইলে আপনাদেরও মোহ-নিদ্রা হইবে না, রাজকন্যাকেও পরীতে লইয়া যাইবে না। যদি আমি পারি, তাহা হইলে এক মাসের মধ্যে আমায় রাজকন্যাকে দান করিবেন কি না?” রাজা বলিলেন, “তুমি যদি আমার কন্যাকে অপদেবতার কুহক হইতে উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে রাজ্য ও কন্যা উভয়ই তোমাকে দিব। রাজপুত্রের কথামত সব হইল। সে রাত্রিতে সকলে জাগিয়া রহিল, কাহারও ঘুম আসিল না এবং রাজকন্যাকেও পরীতে উড়াইয়া লইয়া গেল না।

তাহার পর রাজকুমারের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্ব্ব-দিন রাজকুমার রাজার কাছ হইতে অনেক টাকা লইয়া কৃষককে দিয়াছিল। রাজা ও রাণী বড় আনন্দে জেনির কুহক হইতে উদ্ধার-কর্ত্তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন। কিন্তু ফুলশয্যার পরদিন সকলে দেখিল, রাজপুত্র রাজকন্যা চিরনিদ্রায় মগ্ন। সমস্ত রাজ্যের আনন্দ গভীর শোকে পরিণত হইল।

সই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “রাজারাণীর জন্য বড় কষ্ট হয়, আর একটা গল্প বল না, সই!” লীলা বলিল, “সেকেলে গল্প আমার মনে থাকে না। মা'র কাছে ঐ গল্পটি শুনি। আমার নাকি সেই রকম একটি লাল ফুল

পাইতে ইচ্ছে হয়, তাই ঐ গল্পটি এত মনে ছিল। তুই এত গল্প শুনিতে ভালবাসিস, মাকে বলিস তিনি বলিবেন।"

(৩)

আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তবু লীলা যতীনবাবুকে ছাড়ে নাই, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে। কারণ, আজ যতীনবাবুর কলেজ বন্ধ হইল। তাঁহার পিতা পুত্রকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "কলেজের ছুটি হইলে দেশে যাইয়া জমাজমী দেখিও। তবু দুই মাস আপনারা তদারক করিলে নায়েব গোমস্তা সায়েস্তা থাকিবে।"

সেই কথা যতীনবাবু লীলাকে আজ বলিয়াছেন। কি করিয়া সে আজ তাহার দেবতাকে ছাড়িবে? যে দুই তিন দিন অন্তর দেখিয়াই মন বাঁধিতে পারে না, সে দুই মাস দেখিতে পাইবে না! মানুষের যদি ইচ্ছা-মৃত্যু হইত তবে আজ লীলা হাসিতে হাসিতে যতীনবাবুর বক্ষে প্রাণত্যাগ করিতে পারিত। তাহা হইলে কি সুখেরই হইত! পিতার অমতে এরূপ লুকাইয়া লুকাইয়া যতীনবাবু কি চির দিন আসিতে পারিবেন? সর্ব্বদাই এই বিচ্ছেদের আশঙ্কার অপেক্ষা কি মৃত্যু ভাল নহে? যতীনবাবু সাদরে লীলাকে কত বুঝাইতেছেন।—কেন মিছা ভয় পাও? কখন কি পিতার মত ফিরিবে না? আর এ দুই মাস ত দেখিতে দেখিতে যাইবে। এই দুই মাসের বিরহ সহ্য করিতে পারিবে না? চেষ্টা কর, পারিবে। এত অধীরা হইয়া আমায় কষ্ট দিও না। হায় যতীনবাবু, সকল মানব-মানবীর যদি সহ্য-গুণ সমান হইত, তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কষ্ট থাকিত না। অনেক কষ্টে রাত্রি আটটার সময় তিনি লীলাকে বুঝাইয়া বাটী ফিরিলেন, যাইবার সময় লীলাকে দেশের ঠিকানা দিয়া যাইলেন, তথায় পিতামাতা কেহ নাই, চিঠি যাইলে কোন ক্ষতি নাই। তিনিও প্রত্যেক দিন পত্র লিখিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন।

(৪)

যতীনবাবু পনর দিন পরেই দেশ হইতে চলিয়া আসিলেন; পিতাকে বলিলেন, দেশের জলবায়ু সহ্য হইল না। সেই দিন যতীনবাবুর ছোট বোন দাদার পকেট হইতে একটি পেন্‌সিল লইতে গিয়া পদ্যে লিখিত দুই খানি লাল চিঠি পাইল। সে একটু একটু পড়িতে শিখিয়াছিল, কিছুই বুঝিল না। কিন্তু তাহার দিদি পদ্য পড়িতে ভালবাসে বলিয়া ছুটিয়া যাইয়া দিদির হাতে দিল।

দাদার পকেটে স্ত্রীলোকের হাতের লেখা পত্মপূর্ণ চিঠি! দিদি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া পড়িতে বসিল।

হৃদয়দেবতা,

বলেছ আমায় বাঁধিতে হৃদয়
ব্যাকুলতা যা'তে নাহিক হয়।
নূতন এ কথা শুনে পাই ব্যথা
পারি না জীবন হলেও লয়॥
সমাজ সংসার সকলি অসার
তোমারে দেখার আশার কাছে।
'নিঠুর সংসার' বলে বার বার
দিতেছ যাতনা হৃদয় মাঝে॥

* * *

কেন—পারি না ছাড়িতে দেখার আশা,
কেন—ভুলিতে পারি না ও ভালবাসা?

* * *

দেখার আশায় রেখেছি জীবন,
যাবে না সে আশা হলেও মরণ।

তোমার লীলা

হৃদয়দেবতা,

চাহি না স্বর্গের সুখ-নন্দন-কানন
দেখিতে চাহি না আমি অমরা ভুবন।
প্রণমি যখন আমি দেবতা-চরণে
তখনো তোমার কথা পড়ে শুধু মনে।
কায কর্ম্ম করি যবে সংসার-মাঝারে
তখনো তোমারে হেরি হৃদয়-আগারে।
প্রাতঃকালে উঠি যবে হরষিত মনে
তখনো নিমগ্ন প্রভু, তোমারি স্মরণে।
মধ্যাহ্নে ও-মুখ ভাবি ব্যাকুলিত প্রাণ,
আমি কি পেয়েছি তব হৃদিপ্রান্তে স্থান?
রাত্রিতে যখন হই নিদ্রায় মগন
তখনো তোমারি প্রভু নেহারি স্বপন। ইত্যাদি

চিঠি দুইখানি পাঠ করিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে বুঝিল, বৌ-দিদি লিখিয়াছে। কবে কাহার কি দোষ ছিল বলিয়া এ নির্দ্দয়তা বড়ই অন্যায় বোধ হইল। সে ভাবিল, সে জনকজননীর পায়ে ধরিয়া বৌদিদিকে আনিতে বলিবে। ইহাই ভাবিয়া সে মাতার কাছে যাইয়া সব কথা বলিল ও তাঁহাকে পত্র দুইখানি দিল। পত্র দিয়া সে বলিল, "যদিও এ পত্র তোমাদের পড়া উচিত নহে, আমার দেওয়াও উচিত নহে; কিন্তু বাবা পড়িলে সব বুঝিতে পারিবেন। সেই যখন দাদা লুকাইয়া যাইতেছেন, তখন বৌদিদিকে আনিতে দোষ কি? সুষমার যদি কোন দুষ্টঘরে বিবাহ হয়, আর তাহার শ্বশুররা এই রকম করে তাহা হইলে কি হয়? তুমি বাবাকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল। বিবাহের পূর্ব্বে খোঁজ না লইয়া এখন এ ব্যবহার কি সঙ্গত?" যতীনবাবুর মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আজ বলিব। দেখি কি হয়।"

যতীন বাবুর পিতা বৈকালে স্ত্রীর নিকট হইতে সেই পত্র পাইলেন; খানিকটা পড়িয়া লজ্জিত হইয়া স্ত্রীর হাতে দিলেন ও বলিলেন, "এ পত্র তোমার বা আমার কাহারও পড়া উচিত নহে। তুমি কেমন করিয়া এই পত্র পড়িবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলে?" "কি করিব বিপৎকালে লজ্জা করা বৃথা। তাহা না হইলে সুরমা কি এ পত্র আমাদের হাতে দিত? তোমার গোঁ—বৌ আনিব না; এখন বুঝ ব্যাপার কি হইতে পারে।"

যতীন বাবুর পিতা বুঝিলেন, সে কথা ঠিক; এই জন্যই পুত্রের দেশের জল-বায়ু সহ্য হয় নাই। উপযুক্ত পুত্র যদি বধূকে লইয়া ভিন্ন হয়, তখন মান কোথায় থাকিবে? অনেক ভাবিয়া তিনি বধূকে লইবার মত করিলেন।

(৫)

সেই দিন যতীন বাবু দেখিলেন, লীলার চুল রুক্ষ, সে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কথায় কথায় লীলা বলিল, "আমার পাগলামী-চিঠিগুলি সব ছিঁড়িয়াছ ত?" যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সবই আমার বাক্সে আছে। কেবল শেষের দুইখানি জামার পকেটে আছে।" লীলা বলিল, "সে কি? যদি কেহ পড়ে তাহা হইলে ত মুস্কিল।" যতীন বাবু বলিলেন, "আমার জামার পকেট হইতে লইয়া কে পড়িবে?" লীলা বিষণ্ণমুখে বলিল, "যদিই বা কেহ পড়ে!"

তাহার পরদিন যতীন বাবু ভগিনীর কাছে সব শুনিলেন। সুরমা চিঠি পড়ার জন্য ক্ষমা চাহিল ও পত্র দুইখানি ফিরাইয়া দিল। যতীন বাবু বলিলেন, "তুই যে আনন্দের সংবাদ দিলি, সুরমা, তাহাতে আবার ক্ষমা কি?"

(৬)

লীলার অদৃষ্টদেবতা হাসিয়া চাহিয়াছেন। এখন সে শান্তিপূর্ণ প্রাণে তাহার দেবতার কাছে আছে। প্রথম লীলাকে আনিতে সমাজে গোল হইয়াছিল। যতীনবাবুর পিতা বিষয়ী লোক, তিনি সহজেই সব মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

মিলনের পর লীলার সই একদিন লীলার সহিত দেখা করিতে আসিল। কথায় কথায় সেই লাল ফুলের কথা উঠিল। সই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "সই, তুই লাল ফুলের জন্ম আগে ইচ্ছা করিছিলি। লালফুল পেলেই তোর সকল দুঃখের অবসান হইবে। বল্ দেখি, কি লাল ফুল পেয়েছিলি ও কোন্ স্বর্গের দূত দিয়াছিল।" লীলা হাসিতে হাসিতে যতীনবাবুর বাক্স খুলিয়া সেই দুই খানি লালচিঠি বাহির করিয়া দিল ও বলিল, "এই দেখ লাল ফুল। আর স্বর্গের দূত—সে আমার ননদ সুরমা ও সুষমা।" শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী।

দীন রাজ্যেশ্বর।

বাদশাহ * পাশে আসি' মহিষী কহিলা ধীরে—
"হে ধরণীপতি!
রাঁধিবার কালে আজি কর্ম্মদোষে পুড়ে' হাত
হের কি দুর্গতি!
নারীর সৌভাগ্য এ যে স্বামিপুত্রকন্যা লাগি'
স্বহস্তে রন্ধন;
নাহি রহে ক্লেশ, নাথ, শুধু যদি দেহ মোরে
দাসী একজন।"
আদরে ধরিয়া হাত কহিলেন বাদশাহ
করুণ বচনে,
"বড় পাইলাম ব্যথা তোমার এ দশা, প্রিয়ে,
হেরিয়া নয়নে।
আমি রাজ্যেশ্বর; কিন্তু জান, সতি, পতি তব
কত নিঃস্ব, দীন!
জীবিকানির্ব্বাহতরে বিশ্রাম-সময়ে লিখি
পুঁথি, প্রতি দিন।
রাজকোষে আছে যত মণিমুক্তা অর্থরাশি,
গচ্ছিত সে ধন;
নাহি অধিকার মোর সাধিতে প্রজার অর্থে
নিজ প্রয়োজন।
রাজ্যেশ্বরী হয়ে তবু ঐশ্বর্য্যবঞ্চিতা তুমি,
চিরকাঙ্গালিনী;
অক্ষম অভাগ্য পতি; কোথা পাবে দাসী, প্রিয়ে,
দরিদ্র-গৃহিনী!"

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

* সম্রাট নাসিরুদ্দিন।

রাজা মটুক রায়।

(৩)

এ দিকে চম্পাবতী স্বামী পাইবার আশায় গৌরীপূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। "চম্পার উপর শেষে সদয় হইয়া গৌরী, বর দিতে গেল শেষে রথে ভর করি। * * * ভবানি বলিল মাগো শান্ত কর মন, খণ্ডন না হবে কভু বিধির লিখন। মিলিবে সুন্দর পতি জাতি মোছলমান, সেই জন হয় মোর ভগ্নির সন্তান। জানিবে তাহার নাম গাজি জেন্দা পীর, রাজতি ছাড়িয়া ফেরে হইয়া ফকির। জানিবে তাহার পিতা ছাহা ছেকন্দর, সোণায় বান্দিল সেই বিরাট নগর। বলি রাজার কন্যা জান অজুপা শুন্দুরি, আমার সে বুন-বেটি তোমার শাশুড়ি। মোর বুনবেটা গাজি আমি হই মাসি, কার্ত্তিক গণেশ হইতে তারে ভালবাসি। শুন চম্পাবতী তোরে দিল এই বর, আমার বুনের বেটা স্বামী হবে তোর। এতেক বলিয়া গৌরী গমন করিল, রথ আরোহণ করি বৈকুণ্ঠেতে গেল।"

এ দিকে কান্তপুরে বসিয়া গাজী সাহেব স্বপ্ন দেখিলেন যে, কালুকে সত্বর ব্রাহ্মণা নগরে চম্পার তল্লাসে পাঠাইতে হইবে; কোন ভয় নাই, মটুক রাজার সহিত যুদ্ধে গাজীর জয় হইবে। কালু আল্লার নাম লইয়া ব্রাহ্মণা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছিরা নিরা দুই ভাই নদীঘাটে খেয়া দেয়। তাহারা কালুকে নগরে প্রবেশ করিতে বারম্বার নিষেধ করিল। পাটনিদ্বয় কিছুতেই ফকিরকে পারে লইয়া যাইতে স্বীকার হইল না, অবশেষে মণি মুক্তা ও মোহরের প্রলোভনে তাহারা কালুকে পার করিয়া দিল।

ফকিরকে নৌকায় তুলিয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "দক্ষিণা নামেতে আছে দেও একজন। জবন দেখিতে পাইলে করে সে ভোক্ষোণ। ওপারেতে গেলে তোমায় খাইবে রাক্ষসে। মেঙ্গে পেতে খাও তুমি গিয়া অন্য দেশে। কালু বলে যাব আমি করে দাও পার, অদৃষ্টেতে আছে যাহা ঘটিবে আমার।"

কালুর রাজদর্শন ঘটিল। তিনি রাজসভায় গাজী সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, অবশেষে চম্পার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাবও করিলেন। ফকিরের প্রস্তাবে মটুক রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কালুকে বন্দী করিলেন। এদিকে গাজী সাহেব ধ্যানে কালুর বিপদ অবগত হইয়া "আফছোস্

করিয়া ফিরে, উড়িলেন বাও ভরে পৌছিলেন সুন্দর বনেতে। সুন্দর বনেতে গিয়া বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া বাঘ সবে লাগিল ডাকিতে। গাজির শুনিয়া ডাক, বাঘ আইল লাখে লাখ, এসে সবে ছালাম করিল, ছালাম করিয়া ফের জমিনেতে রেখে ছের বলে সাহেব কি দায় ঘটিল। নয়নেতে দেখি নির, বল কি হইল ফির, গাজি বলে কান্দিয়া তখন, জেরূপেতে কালু যায় যে প্রকারে একে একে যত বিবরণ।"

গাজী সাহেব অবশেষে বেড়াভাঙ্গা, কালকুট, চিলাচক্ষু, কেন্দো, দেলেওয়ারা প্রভৃতি ব্যাঘ্র সমভিব্যাহারে কান্তনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাজী সাহেব নদী পার হইবার সময়ে ব্যাঘ্রদিগকে ভেড়া করিয়া পার করিলেন, নিশিযোগে নদী পার হইয়া গাজী সাহেব রাজধানী অবরোধ করিলেন। এই যুদ্ধ-প্রসঙ্গে অনেক অজগবি ও অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণা রায়ের প্রসঙ্গগুলি আমাকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হইবে। কারণ, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' যে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ-রায়ের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিতে পাই এবং প্রাচীন কবি মুকুন্দরামের পুঁথিতে যে দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান অবগত হওয়া যায়, সেই দক্ষিণ রায় যে আমাদের যশোহর জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান লাউজিনি গ্রামের রাজা মটুক রায়ের বন্ধু ও সেনাপতি ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার বাসনা রহিয়াছে।

রাত্রিতে ফকির সাহেব আসিয়া ব্যাঘ্রগণসহ ব্রাহ্মণা নগর অবরোধ করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রত্যূষে অবগত হইবামাত্রই মটুক রাজা দক্ষিণা রায়কে সংবাদ দিলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "এতেক শুনিয়া রায় হাসি হাসি কয়, এর লাগি ভয় কেন রাজা মহাশয়। এই সবে যাই আমি থাক খোসালেতে, মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে। এতেক বলিয়া বির গোশ্বাদল হইয়া, যুদ্ধেতে চলিল অঙ্গে বসন পরিয়া। আশি গজের লম্বা ধুতি পরিয়া লইল, আশি মনের টোপ বির মাথায় পরিল। হাজার মনের এক জিঞ্জির কোমরে, কসিয়া বান্দিল বির ধুতির উপরে। হাজার মনের এক খঞ্জর লইল, তার পরে ঢাল এক পৃষ্ঠে তুলে দিল। বারস মনের গদা হাতেতে লইল, যাত্রা করি সংগ্রামেতে সাজিয়া চলিল।"

যাত্রাকালে পথে অমঙ্গল দেখিয়া দক্ষিণার হৃদয় দমিয়া গেল, যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যাঘ্র দেখিয়া দক্ষিণারায় ভীত অন্তঃকরণে নদীকিনারে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাদেবীকে স্মরণ করিলেন। "ডাক শুনি গঙ্গাদেবী উঠিল ভাসিয়া, প্রণাম করিল বির গঙ্গাকে দেখিয়া। আশীর্ব্বাদ করি দেবি জিজ্ঞাসে তখন, কহ কহ বির মোরে ডাক কি কারণ। কান্দিতে কান্দিতে বির লাগিল কহিতে, শুন মাগো

বলি আমি তব চরণেতে। মটুক রাজা সেবিতেছে ছোট কালাবধি, সেবিয়া আসিছে তার জনক অবধি সে রাজার জাতকুল আজি মাগো জায়, ফকির এক আসি তার কন্যা নিতে চায়। বেসোমার বাঘ আনিয়াছে সাথে কোরে, ব্রাহ্মণা নগর সব রাখিয়াছে ঘিরে। দয়া করি ওগো মাতা দেহ না কুম্ভির, তবে তারে দেখি আমি কেমন ফকির। গঙ্গাদেবী বলে বির বলহ সত্বর, সে ফকিরের নাম কিবা কোন দেশে ঘর। এত শুনি বলে রায় শুনগো জননি, গাজি সাহা নাম তার লোকমুখে শুনি। পশ্চিম দেশেতে আছে বিরাট নগর, পিতা তার বাদসা জান নাম ছেকন্দর। অজুপা বলির কন্যা তাহার জননি, লোকমুখে শুনিয়াছি আমি নাহি চিনি। এত শুনি গঙ্গা বলে সন্দেহ কি এতে, ব্রাহ্মণ চলিয়া গেছে মোছলমান জেতে। শুনহ দক্ষিণ রায় বলি যে তোমায়, গাজি সাহা জান মোর ভগ্নিপুত্র হয়। রক্ত মাংস এক জান নাহি হয় পর, বেটা হইতে দয়া আছে গাজী পরে মোর। আমি আর গৌরী দোহে সহায় তাহার, ফিরাইতে কার শক্তি বিবাহ চম্পার। * * * কুম্ভির না দেহ যদি কারণে আমার, এখনি মরিব আমি নিকটে তোমার। এতেক বলিয়া বির গদা লইয়া হাতে, মারিতে উঠায় বির আপনার মাথে। তাহা দেখি গঙ্গা বলে থাক থাক বির, কুম্ভির দিতেছি আমি তোমার খাতির।"

এইবার দক্ষিণা রায়ের কুম্ভীরে ও গাজী সাহেবের ব্যাঘ্রে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। গাজী সাহেবের ব্যাঘ্রগণ নখদন্তবিহীন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। তখন গাজী সাহেব আল্লার মহিমায় রৌদ্রের তেজ বাড়াইয়া দিলেন। কুম্ভীরগণ রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নদীতে ঝাঁপ দিল, ব্যাঘ্রগণ আসিয়া দক্ষিণা রায়কে আক্রমণ করিল। দক্ষিণা অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় গৌরী আরাধনা করিলেম "কান্দিয়া কহেন বির দেবির সদনে, কি বলিব দেখ মাগো আপন নয়নে। তুরুকের বাঘে মোরে রাখিল ঘিরিয়া, নগরের লোকজন মরিল ভাগিয়া। এই জন্য করি মাগো তোমাকে স্মরণ, ভূত ও পিশাচ দেহ আমার কারণ।"

অতি কষ্টে দক্ষিণা রায় ভূত প্রেত পাইলেম। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। প্রেতগণের লোষ্ট্র নিক্ষেপে ব্যাঘ্রগণ ভগ্নপদ হইয়া যুদ্ধস্থান হইতে প্রস্থান করিল। নিরুপায় হইয়া গাজী সাহেব অগ্নিদেবীকে আহ্বান করিলেন। অগ্নিভয়ে পিশাচগণ রণে ভঙ্গ দিল। তখন দক্ষিণা রায় ব্যাঘ্রের দংশনে অস্থির হইয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। সেই হুঙ্কারে স্বর্গ মর্ত্ত কম্পমান্ হইল, ব্যাঘ্রগণ অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিল। মোটের উপর দক্ষিণা রায়ের নিকট ব্যাঘ্রগণ পরাজিত হইল। দক্ষিণা রায়

গদাঘাতে গাজী সাহেবকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে গাজী সাহেব আল্লার নাম স্মরণ করিয়া দক্ষিণাকে হস্তস্থিত আশা ফেলিয়া মারিলেন, দক্ষিণা আশার আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গাজী তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণা চম্পাবতীর বিবাহে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হওয়ায় মুক্তি পাইলেন।

এ দিকে দক্ষিণা রায় যুদ্ধে ধরা পড়িয়াছেন শুনিয়া মটুক রাজা স্বয়ং যুদ্ধ-সজ্জা করিলেন। তিনি বলিলেন, গাজীকে ধরিয়া মায়ের নিকট কালু ও গাজীকে বলি দিবেন। "কালির নিকটে কালি পূজার সময়, দুই জনে নরবলি দিব যে নিশ্চয়।"

তীর তোপ ঢাল বর্ষা ঢাক ঢোল সিঙ্গা বাঁশী হাতী ঘোড়া উট প্রভৃতি লইয়া মটুক রাজা সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সৈন্যের পদভরে মেদিনী কাঁপিল, ধূলায় আকাশ ঢাকিয়া গেল। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ব্যাঘ্রগণের তেজ মটুক রাজা সহ্য করিতে পারিলেন না, হাজার হাজার সৈন্য রণক্ষেত্রে ব্যাঘ্রের দ্বারা আহত হইতে লাগিল। মটুক রাজা প্রথম দিনের যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। "ভাগিয়া মটুক রাজা কোন্ কাম করে, আছিল জিওং কুণ্ড সেই রাজার ঘরে। সেই কূপের জল রাজা কুম্ভ কৈরে তোলে, রাত্রিযোগে ছিটাইল গিয়া রণস্থলে। হাতী ঘোড়া যত তার মরে গিয়েছিল, সবার গায়েতে জল ছিটাইয়া দিল। আর যত লোকজন মরেছিল তার, ছিটাইয়ে দিল জল অঙ্গেতে সবার। জত লোক মরে ছিল পাইয়া জীবন, হাতি ঘোড়া বেঁচে তার উঠিল তখন।" পরদিন আবার যুদ্ধ বাধিল, গাজীর ব্যাঘ্রগণ মৃতপ্রায় হইল। তিনি ধ্যানে মটুক রাজার মৃত সৈন্যগণের প্রাণপ্রাপ্তির কারণ অবগত হইলেন। "গাজী বলে শুন বাঘ কহি সমাচার, মৃত্যুজীবকূপ আছে ঘরেতে রাজার। সেই কূপ আছে ঘরের অমুক স্থানেতে, গো হত্যা করিয়া যদি ফেল সে কূপেতে, তবে সে পলকে রণজয় হইয়া জায়, বাঁচিবার শক্তি আর কারু নাহি রয়।"

গাজীর পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইল, জিবৎকুণ্ডের জল নিশাযোগে গো-রক্তে অপবিত্র করা হইল। পরদিবস মটুক রাজার হত সেনা জীবৎকুণ্ডের জলে আর প্রাণ পাইল না। রাজা যুদ্ধে হারিয়া গেলেন, গাজী সাহেবের ব্যাঘ্রগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। মটুক রাজা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এবং গাজীর সহিত চম্পার বিবাহ দিবেন, স্বীকৃত হওয়ায় গাজী রাজার বন্ধন খুলিয়া দিলেন। তখন মহা সমাদরে কালু গাজী মটুক রাজার গৃহে গমন করিলেন।

যত ব্রাহ্মণ ছিল পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিল, নগরবাসী সব মুসলমান হইল; ধুম ধামের সহিত চম্পার পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

কিছুদিন শ্বশুরবাড়ী থাকিয়া গাজী চম্পাসাথে স্বদেশযাত্রা করিলেন। গাজী সাহেব পথে পথে ভ্রমণ করিবার সময় চম্পাকে হলুদের ফুল করিয়া রাখিতেন এবং পরে মানুষ করিতেন। চম্পাকে লইয়া কালু গাজী পাতালদেশে গেলেন, তথায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা জলুহাসের সহিত মিলন হইল। তিন ভ্রাতা ও দুই বধূ আমোদ আহ্লাদ করিতে করিতে বিরাটনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। কালু রাণী অজুপা সুন্দরীর নিকট ফকিরি লইয়া গৃহত্যাগ হইতে চম্পাবতীর বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিয়া জননীর মনস্তুষ্টি করিলেন। এই স্থানেই মুসলমান কেতা-বের বয়ান শেষ হইল।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

বীণাপাণির উদ্বোধন।

ঝঙ্কারিয়া বীণার স্বরে মরাল'পরি বরষপরে
সোণারস্বপনপরশ লয়ে সরস হরষ ভরে,
কে আসেরে জাগায়ে ধরা আবার মোদের ঘরে।
আলোকরথে দ্যুলোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী,
ভূলোকমাঝে পুলক লয়ে আস্‌ছে বীণাপাণি,
ওগো মোদের বীণাপাণি।

কাহার আঁচল বাতাস পেয়ে, মলয় আজি এলো ধেয়ে,
মুকুলমুখে আকুল বুকে রসাল আছে চেয়ে,
চম্‌কে উঠে পাপীয়া পিক মধুর উঠে গেয়ে।
আলোকরথে দ্যুলোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী॥
ভূলোকমাঝে পুলক লয়ে আস্‌ছে বীণাপাণি॥

ওগো কাহার বীণার তানে ভ্রমর জাগে নবীন প্রাণে,
শুক্‌নো তরু মঞ্জরিছে কুসুমকিশলয়ে,
কুন্দ যূথী হৃদয় মেলে, নীহারপূত হ'য়ে।
আলোকরথে দ্যুলোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী,
ভূলোকমাঝে পুলক লয়ে আস্‌ছে বীণাপাণি॥

ওগো কাহার মণির হারে পীযূষ ঝরে শত ধারে,
কাহার চরণ পরশ পেয়ে শিউরে উঠে ধরা,
হাস্‌ছে যে সে সোণার শীষে পরাণ দিশেহারা,
আলোকরথে দ্যুলোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী,
ভূলোকমাঝে পুলক লয়ে আস্‌ছে বীণাপাণি॥

এলোকেশে স্বভাববালা ধর্‌ছে কাহার বরণডালা,
বসন্ত, তা'র কুহেলিকার ঘোমটা নেছে হরে'
সীমন্তে তা'র রবিকরের পীযূষধারা ঝরে,
আলোকরথে দ্যুলোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী—
ভূলোকমাঝে পুলক লয়ে আস্‌ছে বীণাপাণি॥

শ্রীকালিদাস রায়।

অদৃষ্টচক্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘটক।

আশ্বিনের মধ্যভাগ। অপরাহ্নে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও প্রতিবেশী শিবরতন চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহের সম্মুখস্থ চাতালে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। শেষ আশ্বিনে দুর্গোৎসব—বাঙ্গালার মহোৎসব; বাঙ্গালীর জীবনে মিলনের—আনন্দের উৎসব, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার গঠনকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিমাগঠনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিলে উভয়ে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। আকাশে ধূসর মেঘ। এবার বর্ষা বিলম্বে আরব্ধ হইয়াছিল, আজও শেষ হয় নাই, একদিন যদি আকাশ মেঘশূন্য হয়—পরদিন হইতে আবার বর্ষণ হইতে থাকে। দুই এক বিন্দু বৃষ্টি পড়িল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,"মা কি এবার কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয়ে আসিবেন?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "তাহাই সঙ্গত। পূর্ব্বে এই শরতে বাঙ্গালার উৎসব ছিল; এখন শরতে ঘরে ঘরে শ্মশান রচিত হয়। দেশে স্বাস্থ্য নাই—সুখ নাই—আনন্দ নাই। এ অবস্থায় মা'র কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয়ে আসাই সঙ্গত।"

"চলুন ঘরে যাই।" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিলেন ও মাদুরটি লইয়া যাইবার জন্য হুকা লইয়া আগত ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

এমন সময় একজন যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "হাঁ। কাহাকে চাহ?"

"তাঁহারই সহিত একটু কাযের কথা কহিতে আসিয়াছি।"

"আমারই নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য। বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘরে চল।"

তিন জনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রথম কক্ষে দুইখানি তক্তপোষের উপর সতরঞ্চি ও তদুপরি চাদর বিস্তৃত ছিল। তিনজন তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। যুবক এক পার্শ্বে পদদ্বয় ঝুলাইয়া

[illegible] দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "উঠিয়া ভাল করিয়া উপবেশন কর।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "এ কালের ছেলেদের বান্ধা জুতা খুলা সহজ নহে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমরা বন্ধন ছাড়াইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হই, আর ইহারা কেবল বন্ধনের উপর বন্ধনের পক্ষপাতী।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "সেটা বয়সের ধর্ম্ম। যে বয়সে বন্ধনেই সুখ, সে বয়সে বন্ধনমুক্ত হইতে চাহিলে সংসার চলিবে কিরূপে ?"

যুবকের দিকে চাহিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে কি প্রয়োজন, বাবা ?"

যুবক বলিল, "আপনার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবককে ভাল করিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "হাঁ।"

"এখন বিবাহ দিবেন ?"

"ভাল পাত্র পাইলেই দিব।"

"আমার সন্ধানে একটি পাত্র আছে। পাত্রের পিতা পশ্চিমে এঞ্জিনিয়ার ; পাত্র পিতার একমাত্র পুত্র ; এণ্ট্রান্স পাস করিয়া—"

বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ভাল ওসকল কথা পরে হইবে। আমি স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায়। পাত্র কি ?"

যুবক সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "আমি কি তাহা না জানিয়াই আসিয়াছি ? পাত্র মুখোপাধ্যায়।"

"মুখোপাধ্যায়।—যোগেশ্বর পণ্ডিতের কাহার সন্তান ?"

যুবক এত কথা জানিয়া আইসে নাই ; বলিল, "আমি সে সংবাদ লইয়া আসি নাই। আপনি এখন বিবাহ দিবেন কি না জানিতে আসিয়াছিলাম। সব সংবাদ লইয়া আর একদিন আসিব।"

"ভাল কোন্ গাঁই জান ?"

যুবক মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল, "তাহা আমি বলিতে পারি না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"কলিকাতা হইতে।"

"বাবা, ঘটকালী তোমার কায নহে। তুমি ঘটক হইলে পাত্রের পরিচয় না জানিয়া বুড়া মানুষের বাড়ী সম্বন্ধ করিতে আসিতে না।"

যুবক বিব্রত হইল; বলিল, "আমি নূতন ব্রতী।" তাহার পর সে নমস্কার করিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বৃষ্টিতে কোথায় যাইবে? একটু অপেক্ষা কর।"

"বিলম্ব হইলে ট্রেণ পাইব না।"

"এখন ত কোন ট্রেণ নাই।"

যুবক অপ্রতিভ হইল, কিন্তু অপ্রতিভ ভাব কাটাইয়া বলিল, "পথ ভাল নহে, একটু অগ্রে যাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিলেন, যুবক অপ্রতিভ হইয়াছে, আর কিছুক্ষণ থাকিলে পাছে আরও অপ্রতিভ হয় এই আশঙ্কায় যাইতেছে। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

যুবক চলিয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "ব্যাপারটা কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বুঝা গেল না। আজকালকার ছেলেদের বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত।"

ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বাহিরে যাইয়া যুবককে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার গৃহ হইতে কিছু দূরে রাজপথ দুই দিকে গিয়াছে। যে পথ ষ্টেশনের দিকে গিয়াছে যুবক সে পথে না যাইয়া যে পথ ঘাটের দিকে গিয়াছে সেই পথে গেল।

* * * * *

ঘাট হইতে কিছু দূরে তীরে একখানি নৌকা বদ্ধ ছিল। যুবক যাইয়া সেই নৌকায় উঠিল। সবন্ধু যতীশচন্দ্র সেই নৌকায় ছিল। যুবক উপস্থিত হইতেই দুই তিনজন জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ কি?"

যুবক বলিল, "এমন বিপদেও মানুষ পড়ে। আর একটু হইলেই ধরা পড়িতাম।" এই বলিয়া যুবক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথনের সারাংশ বিবৃত করিল। শুনিয়া অমূল্যচরণ বলিল, "তোমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল ফলিয়াছে। আমি বুঝিয়াছিলাম, সুরেশ্বর একটা অনর্থ ঘটাইবে।"

একজন যুবক বলিল, "কিন্তু আপনি ত সেদিন সুরেশ্বরের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছিলেন!"

অমূল্যচরণ বলিল, "তাহাতে কি? কেহ বুদ্ধিমানের কায করিলে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়াছি বলিয়া কি সে নির্ব্বোধের কায করিলে তাহার বুদ্ধির নিন্দা করিব না?"

"একজন লোক কি কখন বুদ্ধিমান্ এবং কখন নির্ব্বোধ হয়?"

"কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে তর্ক করা ভাল। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, শয়তানকেও তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা দিবে। কোন লোক যদি কখন সুবুদ্ধির কার্য্য করে, তবে তাহার প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উদারতার পরিচায়ক নহে। তদ্ভিন্ন 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।' সুরেশ্বর কি কখন এরূপ কার্য্য করিয়াছে যে, এ কার্য্যে সে দক্ষ হইবে? এরূপ কার্য্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ, এরূপ কার্য্যে অশিক্ষিত লোক পটুত্ব লাভ করিতে পারে না।"

কথাটা ক্রমে তর্কের বিষয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া একজন যুবক বলিল, "যাহা হইবার হইয়াছে, সে বিষয় লইয়া তর্ক করা বৃথা। সুরেশ্বর যে ধরা পড়ে নাই, ইহাই সৌভাগ্য—আশা করি, ইহাতে আমাদের বন্ধুবরের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে।"

অমূল্যচরণ বলিল, "আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে সেই আশা করিতেছি। সুরেশ্বর যে ধরা পড়ে নাই, সেটা দৈবাৎ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার ধরা পড়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আজকার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যেন ভবিষ্যতে সাবধান হইতে শিখি; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই।"

যে যুবক অমূল্যচরণের বাক্যে বিরক্ত হইয়াছিল, সে জনান্তিকে বলিল, "সদুপদেশ পিতামাতার নিকট, গুরুমহাশয়ের নিকট, এমন কি পাঠ্যপুস্তকেও অনেক পাইয়াছি। সে জন্য বন্ধুজনের সহিত প্রীতিভ্রমণে আসিবার প্রয়োজন ছিল না। অমূল্যবাবুর ভাবটা এইরূপ যে, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি তাঁহারই হস্তগত, আমরা সব অজ্ঞান। লোকটার দাম্ভিকতা অসহ্য।"

তাহার পর নানা কথা হইতে লাগিল। কিন্তু যতীশচন্দ্র সে কথোপকথনে যেন সম্পূর্ণরূপে যোগ দিতে পারিতেছিল না, সে কেমন অন্যমনস্ক। সে কি ভাবিতেছিল। তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া একজন রহস্য করিয়া বলিল, "তারা কি ইহারই মধ্যে নিরাশ হইলে?" সকলে হাসিল। যতীশচন্দ্র সে হাসিতে হাসি মিশাইল। কিন্তু যতীশচন্দ্র সত্য সত্যই সরোজার কথা ভাবিতেছিল। শরতের অপরাহ্নে উজ্জ্বল রবিকরে উদ্ভাসিতা—অসমপ্রভূষণা হাস্যজ্যোতিত

বক্ষ—উদ্ভেদোন্মুখযৌবনার রূপ তাহার তরুণ হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর তাহার সঙ্গীদিগের কথায় তাহার হৃদয়ে যে আশাবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বালিকার কুলপরিচয়ে সে বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাই আজ সে সরোজার কথা ভাবিতেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুর্ভাবনা।

ধরণীধরের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার মত বিষয়ী ব্যক্তির চরিত্রে তাহার কতকগুলি বিস্ময়কর বোধ হইত। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, জননীর কথার প্রতিবাদ করা তাঁহার অভ্যাস-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি যে স্থানেই থাকুন না কেন—যত ক্ষতি হয় অকাতরে সহ্য করিয়া শারদীয়া পূজার সময় গৃহে আসিতেন; বলিতেন, বিজয়ার দিন যে জননীকে প্রণাম করিতে না পারে, সে অতি দুর্ভাগ্য। একবার পূজার সময় তিনি কোন খরস্রোতা তরঙ্গিনীর উপর সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধানে একজন ইংরাজের সহকারী ছিলেন। পূর্ত্তবিভাগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নদী দুইবার অর্দ্ধনির্ম্মিত স্তম্ভাদি ভাঙ্গিয়া আপনার স্রোতঃপথের বাধা দূর করিয়াছিল। দিনরাত্রি মজুর খাটাইয়া কায চলিতেছিল। এই অবস্থায় ধরণীধর পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার উপরস্থ কর্ম্মচারী বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? যখন দিবসে আহারের ও রাত্রিকালে নিদ্রার সময় করিতে পার না—তখন ছুটি!" ধরণীধর বলিলেন, "সে যাহাই হউক, আমি যাইব। মা আমার পথ চাহিয়া আছেন।" কর্ম্মচারী বলিলেন, "টেলিগ্রাফ কর।" ধরণীধর বলিলেন, "মা বুঝিলেও আমার মন বুঝিবে না।" কর্ম্মচারী বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "আজ তিন দিন হইল আমি তোমার পদ ও বেতন বৃদ্ধির জন্য লিখিয়াছি; তুমি এখন বাড়ী যাইলে আমি তোমার বিরুদ্ধে লিখিতে বাধ্য হইব।" ধরণীধর বলিলেন, "চাকরী যায় সেও ভাল, তথাপি অন্ততঃ একদিনের জন্য একবার আমাকে যাইতেই হইবে।"—তিন দিন দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া ধরণীধর স্তম্ভনির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিলেন। ডাকগাড়ী তাঁহার গ্রামের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে থামে না—অগত্যা পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া পদব্রজে চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ধরণীধর গৃহে আসিলেন। সে দিন বিজয়া; রাত্রি দশটা

বাজিয়া গিয়াছে। যতীশচন্দ্র ঘুমাইয়াছে। সুপ্ত গৃহে ধরণীধরের জননী জাগিয়া আছেন। তাঁহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তা—নয়নে অশ্রু। পুত্র কেন আসিল না? কখনও ত এমন হয় নাই! এমন সময় গৃহদ্বার হইতে ধরণীধর ডাকিলেন, "মা!" পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিহ্বলা জননী দ্রুতপদে যাইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন। পুত্র মাতৃচরণে প্রণত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। জননীর দুঃখাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য ধরণীধর আসিবার পূর্ব্বে তিন দিন অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য করাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপরস্থিত কর্ম্মচারীর বিরক্তির আর অবকাশ ছিল না, তিনি সানন্দে সহকারীকে ছুটি দিয়াছিলেন।

এবারও পূজার সময় ধরণীধর গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি গৃহাগত পুত্রের পাঠবিষয়ের সংবাদ লইলেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি পুত্রের অঙ্কে পারদর্শিতার পরীক্ষা করিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, পুত্র অঙ্কশিক্ষার কোন চেষ্টাই করে নাই; তাহার পক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব।

অমূল্যচরণ কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিল। যতীশচন্দ্রের বহু রচনা তাহার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যতীশচন্দ্র তাহাতে বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। সে পত্রখানির কয় সংখ্যা এমন ভাবে এমন স্থানে রাখিয়াছিল যে, ধরণীধর সহজেই সেগুলি দেখিলেন। কতকগুলি প্রবন্ধে পুত্রের নাম দেখিয়া তিনি যতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব প্রবন্ধ কি তোমার রচনা?" যতীশচন্দ্র বলিল, "হাঁ।" সে মনে করিয়াছিল, তাহার এই কৃতিত্বের পরিচয়ে পিতা বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু ইহাতে ধরণীধর আনন্দিত হইলেন না; পরন্তু ইহাতে তাঁহার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইল। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "পাঠাবস্থায় নানা দিকে মন দিলে পাঠের অসুবিধা হয়। সেই জন্যই সেকালে এদেশে শিক্ষার্থীর কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। য়ুরোপে বিদ্যালয়ে বাসব্যবস্থাও বোধ হয় এই কারণেই উদ্ভাবিত হইয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। এখন প্রবন্ধ লিখিয়া কোন বিষয়ে মতপ্রকাশের বয়স তোমার হয় নাই। শিক্ষা সম্পূর্ণ কর, অভিজ্ঞতা লাভ কর—মতামত প্রচারের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। আমাদের পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, বাখরগঞ্জের গুরুর শিক্ষা না পাইলে কাহারও মতের মূল্য হয় না,—অর্থাৎ চাউলের দর না জানিলে—সংসারের ব্যাপার না বুঝিলে কাহারও

বুদ্ধি পরিপক্ক হয় না।” পিতার এ কথা পুত্রের ভাল লাগিল না। ইহার পর ধরণী-ধর পুত্রের কার্য্যের ও বন্ধুদিগের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তাহার বন্ধুরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে আসিয়া থাকে। তিনি অনেকের নাম সংগ্রহ করিলেন। বৃদ্ধা অমূল্যচরণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বিশেষ প্রশংসা করিলেন। জননীর নিকট তাহার কথা শুনিয়া ও তাহারই সম্পাদিত মাসিকপত্রে পুত্রের প্রবন্ধাদি দেখিয়া ধরণীধরের মনে হইল, তাহারই সহিত যতীশচন্দ্রের অধিক ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা এবং তাহার পরিচয় জানিলেই তিনি তাহার বন্ধুদলের পরিচয় পাইবেন।

ধরণীধরের একজন পরিচিত ব্যক্তি কলিকাতায় থাকিতেন। উভয়ে বহুদিন এক স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে পথিনির্ম্মাণজন্য উভয়ে একত্র বাস করিয়া বহু দিন বহু কষ্ট ও বিপদ্ সহ্য করিয়াছিলেন। এমনও হইয়াছে যে, তাম্বুর নিকট বন্য জন্তুর গর্জ্জন শুনিয়া উভয়ে অগ্নি জ্বালাইয়া একত্র জাগিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। একের বিপদে অপরই সহায় ও সম্বল ছিলেন। ধরণীধর যদি সামাজিক হইতেন তবে রামতারণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় ও অনাবিল বন্ধুত্বে পরিণত হইত।

কিন্তু বিপত্নীক ধরণীধর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। তাঁহার সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা পুত্রকে দিয়া তিনি কেবল তাহারই জন্য কার্য্য করিতেন। কারণ, সেই পুত্রই তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর একমাত্র স্মৃতি। নিঃসঙ্গ প্রবাসে এক এক দিন নিশীথে বিনিদ্র ধরণীধর পত্নীর উদ্দেশে বলিতেন, “তোমাকে এক দিনের জন্য সুখী করিতে পারি নাই। তুমি যাহাকে রাখিয়া গিয়াছ, যেন তাহাকে সুখী দেখিয়া মরিতে পারি। তাহা হইলেই এই দুঃখ-দাবানল-দগ্ধ নিষ্ফল জীবন সার্থক মনে করিব।” ধরণীধরের যাহাই হউক তাঁহার প্রতি রামতারণের ভাল-বাসার ও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। ধরণীধরের নির্ম্মল চরিত্র, প্রবল কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায় রামতারণের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল। রামতারণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে ধরণীধরকে তাঁহার গৃহে উপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কয় বৎসর পরে উভয়ে সাক্ষাৎ—‘সেকালের’ অনেক কথা হইল। তাহার পর ধরণীধর তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন। রামতারণের পুত্র নিবারণচন্দ্র যতীশচন্দ্রের সহপাঠী ছিল। তাহার নিকট পুত্রসম্বন্ধে সংবাদ লই-বার উদ্দেশেই ধরণীধরের বন্ধু-গৃহে আগমন। শুনিয়া রামতারণ বলিলেন, “আমি

শুনিয়াছি, যতীশ বাজে কাযে অধিক সময় দেয়, পাঠবিষয়ে কিছু অমনোযোগী। সে বড় দলে মিশিয়াছে। আমি দুই একবার মনে করিয়াছি, আপনাকে এ কথা লিখিব। কিন্তু লিখি নাই, কারণ সে অন্য দিকে খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছে, সেও ত সুখের বটে। বিশেষ সে আপনার একমাত্র সন্তান—তাহাকে ত আর উদরান্নের চিন্তায় চিন্তিত হইতে হইবে না।" ধরণীধর বলিলেন, "এখন হইতে অন্য দিকে মন দিলে কোন দিকেই কিছু হইবে না। ই঺চড়ে পক্ক ফলে কোন কাযই হয় না।" রামতারণ বলিলেন, "নিবারণ এখনই আসিবে। কলেজের ছুটির সময় হইয়াছে।"

অল্পক্ষণ পরে পার্শ্বের কক্ষে পুত্রের পদশব্দ শুনিয়া রামতারণ ডাকিলেন, "নিবারণ!" যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া নতমস্তকে পিতার আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় রহিল। রামতারণ বলিলেন, "যে ধরণীধর বাবুর কথা বহুবার তোমাদিগকে বলিয়াছি; যিনি বহু বার বহু বিপদে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ইনিই সেই ধরণী-বাবু। নিবারণ আসিয়া ধরণীধরকে প্রণাম করিল। "থাক—থাক্" বলিয়া তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন। নিবারণ বসিল। তখন রামতারণ পুত্রের নিকট ধরণীধরের আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন। ধরণীধর তাহাকে জ্ঞাতব্য বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। নিবারণ বলিল, "আমি যতীশের সম্বন্ধে অধিক কিছু জানি না। সে আমাদিগের সহিত মিশে না। বাহিরেই তাহার বন্ধুর বাহুল্য। যাহা হউক আমি যতদূর পারি, সংবাদ লইয়া বাবাকে বলিব।"

ধরণীধর বিদায় লইলেন, এবং বন্ধুপুত্রের বিনীত ব্যবহারে ও পুত্রের চাঞ্চল্যে কি প্রভেদ, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বিহগকূজিত সায়াহ্নে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মুখ চিন্তায় মলিন। ইহার ছয় দিন পরে শানগরের ঘাটে একখানি নৌকা লাগিল। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া রামতারণ পথ জিজ্ঞাসা করিয়া ধরণীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ধরণীধর সংবাদের জন্য যাইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আশা করেন নাই যে, রামতারণ সংবাদ লইয়া স্বয়ং আসিবেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে ধরণীধর বিশেষ আনন্দিত ও আপ্যায়িত হইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, বন্ধুবৎসল রামতারণ যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অবিলম্বে বন্ধুকে তাঁহার পুত্রের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ বিপদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন। বাল্যের বন্ধুত্বের শীর্ণধারা অনেক সময় জীবনে বিস্তৃত বালুকাবৃত প্রান্তরে অদৃশ্য হইয়া যায়। যৌবনের বন্ধুত্ব অনেক সময় জোয়ারের জলের মত

প্রবল ও উচ্ছ্বসিত এবং তাহারই মত অল্পকালস্থায়ী। বার্দ্ধক্যের বন্ধুত্ব স্থির—ধীর—গম্ভীর; তাহার চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু গভীরতা আছে, তাই তাহা স্থায়ী।

দুই একটি কথার পর রামতারণ বলিলেন,"নিবারণ সকল সংবাদ লইয়াছে।"

ধরণীধর বন্ধুর মুখপানে চাহিলেন। সে সংবাদ বলিতে রামতারণের যেমন আগ্রহ ছিল—শুনিতে ধরণীধরের তেমনই ঔৎসুক্য ছিল।

নিবারণ সংবাদ আনিয়াছিল, যতীশচন্দ্র বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠে অত্যন্ত অমনোযোগী। সে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ তাহার মত প্রতিভাবানের জন্য নহে, এই বিশ্বাসবশে সাহিত্যচর্চ্চায় যশসঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত। তাহার একদল বন্ধু তাহার সেই বিশ্বাস দৃঢ় করিতে ও সেই চেষ্টাবিষয়ে তাহাকে উৎসাহিত করিতে ব্যাপৃত। তাহাদের কথায় যতীশচন্দ্র আপনাকে অতিরিক্ত প্রতিভাবান্ বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে অমূল্যচরণ সর্ব্বপ্রধান। এখন তাহার উপর অমূল্যচরণের প্রভাবই অত্যন্ত অধিক। এই অমূল্যচরণের পরিচয় পাইয়াই রামতারণ কিছু চিন্তিত হইয়াছেন ও ব্যস্ত হইয়া বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।

অমূল্যচরণ মাতুলের পরিচয়ে পরিচিত। তাহার মাতুল কলিকাতা সমাজে বিত্তে ও বিদ্যায় বিখ্যাত ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি সুচরিত্র, বিদ্বান্ কিন্তু দরিদ্র পাত্রে ভগিনীদান করিয়াছিলেন। ভগিনীপতি হাইকোর্টে উকীল হইয়া তাঁহারাই একটি মোকদ্দমা পরিচালনের জন্য মফঃস্বলে যাইয়া বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করেন। সে শোকে অমূল্যচরণের মাতুল একান্ত কাতর হইয়াছিলেন। তখন হইতে ভগিনী ও ভগিনীর একমাত্র সন্তান দশমবর্ষ বয়স্ক বালক অমূল্যচরণ তাঁহার সংসারভুক্ত হয়েন। ভগিনীই সে সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। মাতুল ভাগিনেয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাগিনেয় সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয়ের অধ্যয়নে কোনরূপ উন্নতি করিতে পারিল না দেখিয়া তিনি অগত্যা তাহার ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলে তাহার ইংরাজীর সহিত নগণ্য, সংস্কৃতের সহিত অল্প ও বাঙ্গালার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মাতুল স্নেহাধিক্যহেতু ও লোকনিন্দাভয়ে ভাগিনেয়কে আবশ্যকমত শাসন করিতে পারিতেন না; এ দিকে মাতামহীর আদরটা কিছু অতিরিক্ত ছিল, ইহাতে অমূল্যচরণ কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। সে উচ্ছৃঙ্খলতা মাতুলের বিশেষ ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। অমূল্যচরণ তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় ছিল, তাঁহার পুত্রগণও অমূল্য চরণের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল। এ অবস্থায় তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে অমূল্যচরণই তাহাদিগের অভিভাবক হইবে। তিনি

সে আশায় হতাশ হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয় বলিয়া ও অনেক স্থলে প্রতিনিধি হইয়া অমূল্যচরণ কলিকাতার সমাজে পরিচিত হইয়াছিল। তাহাতে সে আচার ব্যবহারে "লেফেপাদুরস্ত" হইয়াছিল। বিশেষ আপনার অজ্ঞতা ও অক্ষমতা গোপন করিয়া বিজ্ঞতার ও ক্ষমতার ভাণ করিতে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাই লবশাটপটাবৃত অমূল্যচরণ সমাজের উচ্চস্তরেও প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তাহার মাতুল মৃত্যুকালে তাহাকে ২৫০০০ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থ হস্তে পাইয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ষাবারিপাতে স্রোতস্বতীর মত কূলপ্লাবী হইয়া উঠে। ফলে সে সে অর্থ নষ্ট করিয়াছে। সংপ্রতি সে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিয়াছে। যতীশচন্দ্র তাহার প্রধান সহায়। চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল অমূল্যচরণের সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধুপুত্রের পক্ষে অকল্যাণকর হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াই রামতারণ বন্ধুকে সে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন।

সকল কথা শুনিয়া ধরণীধর চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তখনও তিনি অমূল্যচরণের সহিত পুত্রের ঘনিষ্ঠতার স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, যতীশচন্দ্র কেবল প্রবন্ধ লিখিয়া মাসিক পত্র প্রকাশে অমূল্যচরণকে সাহায্য করে।

তিনি তাহাকে যে অর্থ দিতেন তাহা যে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং সে যে পিতামহীর নিকটও অর্থ পাইত এবং সেই অর্থ যে অমূল্যচরণ পত্র প্রকাশের নাম করিয়া লইত তাহা তিনি জানিতেন না।

বন্ধু গৃহে "মিষ্টমুখ" করিয়া রামতারণ বিদায় লইলেন। ধরণীধর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং রামতারণের নৌকা ছাড়িয়া দিলে ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখগামী হইলেন। তখন পশ্চিম গগনে দিনান্তশোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দূরে প্রান্তরের পরপারে তরুরাজির শ্যামশোভা যেন অবিচ্ছিন্ন। কেবল কতকগুলি তাল ও নারিকেল তরু নিঃসঙ্গ গর্ব্বে ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নারিকেল তরুর পত্র-মুকুট আনত—তালের নবপত্রগুলি ঊর্দ্ধগ—যেন পুরাতনগুলিকে পদতলে ফেলিয়া উঠিতে চাহিতেছে। পশ্চাতে গগন অস্ত রবির কিরণজালে রক্তাভারঞ্জিত। কেবল নিম্ন হইতে কতকগুলি মেঘ ধীর নিশ্চল গতিতে উঠিয়া ক্রমে সমস্ত গগন অন্ধকার করিতেছে। সেই সান্ধ্য গগনে ধরণীধর আপনার জীবনের সাদৃশ্য উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন অমনই আশার রক্তাভারঞ্জিত ছিল। কিন্তু কালমেঘ উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধরণীধর গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাত্রিকালে আহারের সময় তাঁহার জননী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি কোন অসুখ হইয়াছে?"

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-এভন্।

ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ লোক মাত্রেরই পক্ষে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড একটি মহা পীঠস্থান। এই গ্রামে সেক্‌সপীয়ার জন্মগ্রহণ করেন, পার্শ্বস্থ গ্রামে তিনি বিবাহ করেন ও শেষ বয়সে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

ষ্টেশনে নামিয়া একটু আসিলেই একটি সুন্দর ফোয়ারা দেখা যায়। ইহা সেক্‌সপীয়ারের মার্কিণ ভক্তদিগের দান। গ্রামে ঢুকিলেই কেমন একটু পুরাতনের ভাব মনে আইসে। যদিও অনেক বাটী আধুনিক, তথাপি মনে হয় যেন অধিবাসীরা এখনও ষোড়শ শতাব্দির ভাবে বিভোর, আর যেন সকলেই সেক্‌স-পীয়ারের স্বগ্রামস্থ বলিয়া মনে মনে গৌরব অনুভব করেন।

যে বাটীতে সেক্‌সপীয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই পুরাতন ভাবেই সংরক্ষিত। বলা আবশ্যক যে, একজন মার্কিণ ধনী এই আবাসটি ক্রয় করিয়া স্বদেশে সংস্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করেন। তখন ইংলণ্ডের লোক ব্যস্ত হইয়া সভা ডাকিয়া টাকা তুলিয়া ৪৫০০০ টাকা মূল্যে বাটীটি ক্রয় করেন। এখন "Trustees and Guardians of Shakespeare's Birthplace" একটি রেজিষ্টারি করা সভা। এই সভা সেক্‌সপীয়ারের জন্মভবন ব্যতীত তাঁহার স্ত্রীর পৈতৃক কুটীর এবং New Place নামক তাঁহার শেষ বয়সের অবাসগৃহও ক্রয় করিয়া রক্ষা করিতেছেন।

যে বাটীতে মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা এখন মুজিয়মে পরিণত। অতি সামান্য একটি দ্বিতল কাষ্ঠের বাড়ী, নিম্নে ৪টি ও উপরে ৪টি ঘর। উপরের যে ঘরে শিশু সেক্‌সপীয়ার প্রসূত হইয়াছিলেন, সিঁড়ির পার্শ্বেই সেই ছোট ঘরে এখন সাবধানে ঢুকিতে হয়; পাছে খসিয়া পড়ে। বাড়ীটি অনেক কষ্টে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে, অনেক স্থানে কড়ি দিয়া চাড়া দিয়া সোজা রাখিতে হইয়াছে। এই বাটীতে সেক্‌সপীয়ার সম্বন্ধে যত কিছু পুস্তক, চিত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে সে সকল, তাঁহার ও তাঁহার নিকট আত্মীয়দিগের হস্তলিপি, তাঁহার সমসাময়িক মুদ্রা, তখনকার কালের বাতি, তাঁহার অঙ্গুরীয়ক ও তাঁহার পুস্তকের যতরূপ সংস্করণ আছে, সবই সংরক্ষিত।

এই বাটীতে ঢুকিলে মনে যে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় তাহা বলাই

বাহুল্য। উপরে উত্তরদিকে একটি ছোট ঘর। তাহার এক ধারে একটি জানালার মত। সেই স্থানে কবির একটি তৈলচিত্র রক্ষিত, দেখিলে মনে হয়, যেন কবি স্বশরীরে উপস্থিত। বাটীর পশ্চাতে (উত্তরে) একটি সুন্দর উদ্যান। এই স্থানে তাঁহার পুস্তকাবলীতে যত প্রকার গাছ বা ফুলের কথা আছে, সে সব রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকের গাত্রে একটি করিয়া ফলক, কোন্ নাটকের কোন্ অঙ্কে কোন্ গর্ভাঙ্কে এবং কোন্ ছত্রে সেই লতা বা বৃক্ষের কথা আছে, তাহা ক্ষোদিত।

এই বাটী দেখিয়া আমি পার্শ্বস্থ সটারি গ্রামে কবির স্ত্রীর কুটীর Aune Hathaway's Cottage দেখিতে যাই। পথে পরিচিত পল্লীদৃশ্য—শ্যামল ক্ষেত্র; কৃষকরা কায করিতেছে; আকাশও সেদিন মেঘমুক্ত—পরিষ্কার, যেন বঙ্গের শ্যামল দৃশ্য। গ্রাম্য রাস্তা দিয়া হ্যানসম ক্যাবে চড়িয়া গম্য স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি, খড়ের চালদেওয়া পুরাতন ছোট কুটীর; সম্মুখে ক্ষুদ্র বাগান। নিকটে কাহাকেও দেখিলাম না। স্বয়ং হুড়কা খুলিয়া ভিতরে গিয়া দেখি, একজন স্ত্রীলোক রক্ষী ভাবে আছেন। দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে সে-কালের গুটিকতক চেয়ার টেব্‌ল প্রভৃতি, অগ্নিকুণ্ডের (fireplace) কাছে একটি চওড়া কুলুঙ্গির মত স্থান, সেই স্থানে বসিয়া বোধ হয় কবিবর স্ত্রীর সহিত গল্প করিতেন।

মেঠো রাস্তা দিয়া গ্রামে ফিরিয়া পুরাতন গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এই স্থানে কবির Christening বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইয়াছিল। তাঁহার নাম-সম্বলিত সেই পুরাতন খাতার সেই সেই পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করিয়া কাচের আধারে সংরক্ষিত। এই গির্জ্জার High altarএর বামে কবি মহানিদ্রায় শয়ান। কি ভাগ্য, দেখিলাম তাঁহার কবর রেলিং দিয়া ঘেরা। তাহার পার্শ্বেই কবির স্মৃতিচিহ্ন বা মনুমেণ্ট। গোরের উপর সেই পরিচিত inscription—"Good friend of Jesus love forbeare. &." ষ্ট্রাটফোর্ড গ্রামের রাস্তা পাতরবাঁধান, তবে পাতরগুলি কত কালের বলিতে পারি না, অনেক ক্ষয় হইয়াছে।

নিউ প্লেস্ (New Place) এ কবির যে বাসস্থান ছিল, তাহা আর নাই, তবে পার্শ্বে খনন করিয়া সেই বাটীর ভিত্তি অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে, এবং একটি পুরাতন কূপ—বোধহয় কবি যাহার জল ব্যবহার করিতেন—আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাটীর পার্শ্বে কবির বন্ধু ন্যাশ (Thomas Nash) এর

বাড়ী এখন ক্রয় করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছে। তথায় কবির বাটীর যে সব অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা ও কবির বন্ধুবর্গের অনেকের চিত্র প্রদর্শিত হয়। বলিতে ভুলিয়াছি, সর্ব্বত্রই—গির্জ্জায় পর্য্যন্ত—দর্শকের নাম ও ঠিকানা লিখিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক রক্ষিত আছে।

New Placeএর পার্শ্বেই একটি সাধারণের ভ্রমণ-উদ্যান। তথায় একটি mulberry গাছ আছে। কথিত আছে, ইহা কবির স্বহস্ত-প্রোথিত একটি বৃক্ষের চারা।

তাহার পর পূতসলিলা এভনের তীরে নূতন ম্যুজিয়ম এবং রঙ্গালয় দেখিতে গেলাম। অনেকেই জানেন, সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা মেরি করেলির যত্নে ও চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। প্রতি বৎসর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ কর্ত্তৃক এই রঙ্গালয়ে সেক্‌সপীয়ারের নাটক অভিনীত হয়। মেরি করেলি এই গ্রামেই বাস করেন। বেশ বড় লাল পাথরের বাটী। নিম্নে প্রকাণ্ড পুস্তকালয়, সিঁড়িতে এবং উপরে চিত্রশালা এবং প্রকাণ্ড রঙ্গালয়। পার্শ্বে সুন্দর উদ্যান, তাহাতে কবির ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তি।

কিরূপ যত্নে ও কি ভক্তির সহিত ইংলণ্ডবাসী তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবির স্মৃতিচিহ্ন জাগরূক রাখিয়াছেন! আমাদের দেশের কবিদিগের স্মৃতি আমরা কি ভাবে রক্ষা করিতেছি!

বার্মিংহাম।

ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড হইতে আমি বার্মিংহামে যাই। যে ট্রেণে যাই তাহা অনেকটা সেকালের খিদিরপুর যাইবার ট্রামের ন্যায়, দুইখানি গাড়ি ও একটি এঞ্জিন; তবে গাড়িগুলির অবশ্য দুই ধারেই কাচ আঁটা।

পথে ইংলণ্ডের বন দেখিলাম। রেলের পার্শ্বে গ্রাম খুব কম, কেবল জঙ্গল, তবে জঙ্গলও যেন সুরক্ষিত বলিয়া মনে হইল।

লণ্ডনে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন কথা হইতেছিল। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, বার্মিংহাম যাইতেছেন কেন? আমি বলিলাম, ইংলণ্ডের একটি Manufacturing town দেখিবার ইচ্ছা আছে। তিনি বলেন, যদি শিল্প কোথায় স্বভাবের সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে তাহাই দেখিতে চাহেন (Nature absolutely spoilt by art) তবে লিড্‌স্‌এ (Leeds) যাউন। বাস্তবিকই বার্মিংহামকে সুন্দর বলা যায় না, কেবল চিম্‌নি ও ধূম। অবশ্য সহরের পার্শ্বে বেশ খোলা যায়গা আছে এবং

কয়েকটি সুন্দর পার্কও আছে। একটি—ক্যাননহিল পার্ক—আমি দেখিয়াছিলাম। তথাপি town properএর প্রশংসা আমি করিতে পারি না। ইহাকে লণ্ডনের একটি ছোট ও অপরিষ্কার সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্র পড়িতেছেন। সকলের সঙ্গেই আলাপ হইল। একজন আবার কলিকাতায় আমার ছাত্র ছিলেন। আর দেখিলাম, এ স্থানের প্রাচ্য সভা (Oriental Association); ভারতবর্ষীয়, তুরস্ক, মিশরদেশীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও চীনদেশীয় ছাত্ররা ইহার সভ্য। একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক বার্মিংহ্যামে ডাক্তারি করিতেছেন, তিনি ইহার সভাপতি। শুনিলাম, একটি ভারতসভাও আছে; কিন্তু আমি তাহার অধিবেশনে যাইতে পারি নাই।

বার্মিংহ্যামে একদিন কতকগুলি বালক 'ব্ল্যাকি' 'ব্ল্যাকি' বলিয়া কিছু দূর আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছিল, আর কোথায়ও এ ভোগ ভুগিতে হয় নাই।

এডিনবরা

স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা অতি সুশোভন ক্ষুদ্র নগর; তিন দিক্ পাহাড়ে বেষ্টিত। সহর অতি পরিষ্কার। প্রধান রাস্তা প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট; এক ধারে অতি সুন্দর বাগান এবং অন্য পার্শ্বে মনোরম সৌধাবলী—দেখিতে বড়ই চমৎকার। কথিত আছে যে, য়ুরোপের মধ্যে ইহাই সুন্দরতম রাস্তা। মনে করুন, কলিকাতার চৌরঙ্গী রাস্তার বাটীগুলা যদি সবই সুশ্রী হইত এবং সম্মুখের ময়দান যদি পত্রপুষ্প-শোভিত সুন্দর উদ্যানে পরিণত হইত, তাহা হইলে কি সুন্দর শোভা হইত। প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট অনেকটা ইহারই অনুরূপ। বাগানটি (Prince's Garden) রাস্তা হইতে খানিকটা নীচু, এবং এই স্থানে একটি অতি মনোরম ঘড়ি আছে। ঘড়িটি বাগানের এক কোণে, যেন একটা প্রকাণ্ড ডালাবিহীন ওয়াচ (openface) শায়িত রহিয়াছে, ঘড়ির কাঁটা এবং অঙ্কগুলি সমস্তই কুসুমে রচিত—বিদ্যুৎ-সংযোগে ঘড়ি চালিত হয়।

এই রাস্তার পার্শ্বে সহরের প্রধান প্রধান বিপণিশ্রেণী দেখা যায় এবং উদ্যানের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড সৌধ স্যার ওয়ালটার স্কটের মনুমেণ্ট। ইহা একটি মন্দিরের ন্যায় বাটী; তাহাতে স্কটের প্রতিমূর্ত্তি বসান আছে।

এডিনবরার এক পার্শ্বে শষ্পাবৃত গুটিকতক সুন্দর পাহাড়; তাহাদের নাম Blackford Hills এবং The Braids। এই দুইটি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার

এডিনবরাবাসীদিগের—বিশেষতঃ প্রণয়ীদিগের—সমীরণ-সেবনের প্রিয় স্থান। এই পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে মানমন্দির স্থাপিত।

অন্য পার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধ Holyrood Castle এর পার্শ্বে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Arthur's Seat নামক পাহাড়। ইহাতে তৃণাদি বড় নাই। পাহাড়টি দেখিতে যেন একটি বৃহৎ চৌকির ন্যায়—সেই জন্যই এ নাম।

এডিনবরা পার্ব্বত্য সহর; ক্রমাগতই উঁচু নিচু। তবে সহরের মধ্যে Prince's Garden ভিন্ন আরও একটি প্রকাণ্ড পার্ক আছে, তাহারই ধারে এডিনবরার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসালয় (পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ Infirmary) এবং য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত।

সহরের মধ্যে দেখিবার জিনিষ অনেকগুলি আছে, তবে সেগুলির বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে এডিনবরা হইতে কিছু দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের কথা কিছু বলিব।

প্রথম, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ও স্কটের উপন্যাসপাঠকের সুপরিচিত পুরাতন রসলিনক্যাস্‌ল (Rosslyn Castle)। ইহা এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত। দুই একটি ঘর খাড়া আছে, একটির দরজার উপর বাটী নির্ম্মাণের তারিখ পড়া যায়—খৃষ্টাব্দ ১৩০৪। নিম্নে অন্ধ কারাগৃহগুলি অনেকটা অভগ্ন আছে। দুর্গের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড পাহাড় ও নিবিড় জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটি নদী এবং নিকটস্থ পার্ব্বত্য রাস্তা। Glens দেখিতে বাস্তবিকই বড় সুন্দর। তিন দিকে এই পাহাড় ও জঙ্গল একধারে সুগভীর পরিখা; এ দুর্গ যে বাস্তবিকই দুর্ভেদ্য ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, এডিনবরার নিকটে সমুদ্রের উপর সেতু Firth of Forth Bridge শুনিয়াছি, গ্ল্যাস্‌গো সহরের নিকটস্থ টে (Tay) সেতু ইহা অপেক্ষাও বড়; কিন্তু তাহা আমি দেখি নাই। এই ফার্থ অব্‌ ফোর্থ ব্রিজ স্থপতিবিদ্যার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাঁচ সহস্র লোকের সাত বৎসর অহোরাত্রব্যাপী পরিশ্রমের ফলে ও পাঁচ কোটির অধিক টাকা খরচ করিয়া এই সেতু নির্ম্মিত। সেতুর উপর ডবল লাইন রেল পাতা। জলের নিকট দাঁড়াইয়া সেতুটি অত্যন্ত উচ্চ দেখায় এবং অপর কূল ভালরূপ নজরে আইসে না। আমি যে দিন সেতু দেখিতে গিয়াছিলাম ইংলণ্ডের নৌবাহিনীর এক অংশ—খ্যাতনামা ড্রেড্‌নট্‌ (Dreadnought) প্রভৃতি ১০।১২ খানা যুদ্ধ জাহাজ সে দিন সেতুর নিকট ছিল।

এডিনবরার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কথা বলিবার পূর্ব্বে তথাকার অধিবাসী-দিগের একটা কথা বলিব। অনেকেই জানেন, স্কটলণ্ডে ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল, এবং রবিবারে কেহ কোনওরূপ কায করেন না, অর্থাৎ Sabbath-keeping পূরা মাত্রায় প্রবল, কিন্তু শুনিলে চমৎকৃত হইবেন যে, রবিবারে বালকবালিকাদিগকে পর্য্যন্ত খেলিতে দেওয়া হয় না—অন্ততঃ বাটীর বাহিরে এই অবস্থা। বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াস্থল পর্য্যন্ত সে দিন বন্ধ। হয় ত বৈকালের দিকে কেহ কেহ বেড়াইতে পায়, কিন্তু সে দিন খেলাধূলা একেবারে নিষিদ্ধ।

এডিনবরার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি—(১) হোলিরুড প্রাসাদ (২) এডিনবরা ক্যাস্‌ল্ এবং (৩) ক্যালটন হিল।

হোলিরুড—স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে ইহা খুব সুপ্রসিদ্ধ স্থান। অতি প্রাচীন কাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের রাজাদের ইহাই আবাস ছিল। অতি-বৃহৎ প্রান্তরের মধ্যে এবং Arthur's Seat নামক পাহাড়ের গাত্রে এই প্রাসাদ। প্রাসাদের সম্মুখে একটি অবিশাল প্রাঙ্গণ, তাহাতে একটি মুকুট-শোভিত ফোয়ারা। প্রাসাদের মধ্যে কতকগুলি ঘর এখনও রাজা এডিনবরায় আসিলে ব্যবহৃত হয়, সে সব প্রকোষ্ঠে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মেরী—কুইন্ অব্ স্কটসের বাসগৃহগুলি সবই দেখা যায়। দুই একটি ঘর বেশ বড়; প্রায় আর সব কক্ষই ক্ষুদ্রায়তন। বিশেষতঃ যে কক্ষে রাণী মেরী আহার করিতেন এবং যথা হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্র রিচিওকে ধরিয়া আনিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে হত্যা করা হয়, সে কক্ষটি অতিশয় ক্ষুদ্র, একটি রেল গাড়ির কামরার ন্যায়। প্রায় সব ঘরেই স্কটলাণ্ডের ইতিহাসে খ্যাত ব্যক্তি-দিগের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত এবং ছাতগুলি অনেক Heraldic inscriptionsএ সুশোভিত। যে কক্ষে রাণীর সভাধিবেশন হইত, সে কক্ষটি কিছু বড় এবং তাহার দরজার নিকট একটি পিত্তলফলকে লিখা আছে, সেই স্থানে রিচিও হত হয়েন। বলিয়া রাখা উচিত যে, ঘরের মেঝে কাষ্ঠমণ্ডিত, ছাতও তাহাই।

প্রাসাদের পূর্ব্বগাত্রে পুরাতন চ্যাপেলের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই স্থানে সেকালের অনেক রাজা রাণী ও প্রধান প্রধান লোকের দেহ সমাহিত, কিন্তু এখন সমাধিগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এডিনবরা ক্যাস্‌ল্ বা দুর্গ—সমুচ্চ পাহাড়ের একটি শৃঙ্গ কাটিয়া সমতল

করিয়া তাহার উপর এই দুর্গ নির্ম্মিত। প্রবেশদ্বার দেখিলে শিমলাশৈলে বড়লাটের প্রাসাদের প্রবেশদ্বার মনে পড়ে।

ভিতরে অন্যান্য দুর্গেরই মত অনেকগুলি ফটক, কোনং কোনও ফটকের উপরিস্থ কক্ষ কারাকক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। আবাসগৃহগুলি অতি ক্ষুদ্রায়তন। একটি ঘরে স্কটলাণ্ডের রাজমুকুট ও রাজকীয় মণিরত্ন রক্ষিত রহিয়াছে। যদিও ইংলণ্ডের রাজা স্কটলাণ্ডের রাজা বটেন, তথাপি স্কটলাণ্ডের রাজকীয় পরিচ্ছদ, মুকুট, মণিমুক্তা প্রভৃতি লণ্ডনে লইবার নিয়ম নাই। তাহা এই ক্যাস্‌লে রক্ষিত থাকে; রাজা স্কটলাণ্ডে আসিলে তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। এই কক্ষের পার্শ্বে একটি সামান্য কক্ষ। তথায় মেরীর পুত্র গ্রেটব্রিটেনের যুক্তরাজ্যের প্রথম অধিপতি স্কটলাণ্ডের ষষ্ঠ ও ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স্ ভূমিষ্ঠ হয়েন। সেই কক্ষে এখন একজন স্ত্রীলোক বসিয়া Picture Post card বিক্রয় করেন। যে রক্ষী রাজমুকুট প্রভৃতির প্রহরী, সেও Picture Post card, কাগজচাপা প্রভৃতি বিক্রয় করে।

ক্যাস্‌ল এখনও সেনাবাসের জন্য ব্যহৃত হয়।

ক্যাল্‌টন হিল (Calton Hill)—এডিনবরা সহরের ভিতর একটি পাহাড়। ইহার উপর কবি বার্ণসের মনুমেণ্ট আছে, নেল্‌সনের মনুমেণ্ট আছে, একটি জ্যোতিষিক মানমন্দির আছে, আর আছে একটি অর্দ্ধসমাপ্ত গৃহ, তাহাকে স্কটলাণ্ডের গর্ব্ব ও দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি বলে (the pride and poverty of Scotland) ওয়াটার্লুর যুদ্ধে যে সকল স্কচ সৈন্য হত হয়, তাহাদের সম্মানার্থ এই গৃহ বা মনুমেণ্ট আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে ইহা সমাপ্ত হয় নাই, তাই এই নাম।

এডিনবরার ম্যুনিসিপাল ম্যুজিয়ম, Market Cross (বাজারের মধ্যস্থ ক্রুশ কাষ্ঠ) প্রভৃতি দেখিবার জিনিস বটে। তথাকার হাইকোর্ট অতি ক্ষুদ্র, নিম্নতলেই আদালতগৃহ। নূতন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার জিনিষ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ছাত্র অধ্যয়ন করেন, অধিকাংশই চিকিৎসাবিদ্যার্থী। একটি কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী অনেক বৃটীশ ছাত্র এডিনবরায় আছেন। তাঁহাদের প্রভাবে এডিনবরার নেটিভ ছাত্ররা ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সহিত সদ্ব্যবহার করেন না। এমন কি শুনিলাম, যদি কোনও বৃটীশ ছাত্রের আহারকালে কোনও ভারতবর্ষীয় ছাত্র সেই টেব্‌লে গিয়া বসে, তবে প্রথমোক্ত ছাত্র আহার ত্যাগ

করিয়া উঠিয়া যায়। আরও শুনিতে পাইলাম যে, ছাত্ররা নিয়ম করিতে চাহিয়াছিল যে, য়ুনিভার্সিটির সন্তরণসভায় কোনও কালা ছাত্র সভ্য হইতে পারিবে না। সুখের বিষয়, অধ্যক্ষ এ নিয়ম রহিত করিয়া দিয়াছেন। তবে বলা উচিত যে, সব ছাত্রই এই বিদ্বেষভাবে পোষণ করে না; এবং ক্রমে ইহা কমিতেছে। সুখের বিষয় ইংলণ্ডের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ ভাবের কথা কিছু শুনি নাই। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কিন্তু ব্যারিষ্টারির পীঠস্থানে Inns of Court এ এ ভাবে কিছু আছে, অন্ততঃ একটি স্থলে আমি দেখিয়াছি, বৃটীশ ও কালা ছাত্রদের বসিবার ঘর (Common Room) স্বতন্ত্র।

কেম্ব্রিজ।

এডিনবরা হইতে ট্রেণে কেম্ব্রিজ আসিতে পথে কার্লাইলের একলিফেকান (Ecclefechan) এবং বিবাহার্থী যুবকযুবতীর তীর্থস্থান গ্রেটনা দেখা যায়। রেল হইতে যতটা বুঝা যায়, দুইটিই অতি ক্ষুদ্র গ্রাম।

স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ সহজেই বুঝা যায়। ইংলণ্ডের প্রথম ষ্টেশন ফ্লরিষ্টন (Floriston) দেখিলে মনে হয়, হাঁ গাছপালা ও সমতল ক্ষেত্র আছে বটে, Caledonia বাস্তবিকই Stern and wild পথে একটা আমাদের দেশের নদীর মত নদী দেখা যায়, বোধ হয় টে (Tay) কি টাইন্ (Tyne) রেলের দুই ধারে অনেক লবণের ও কয়লার খনি দেখা যায়; আর Oxenholene নামক ষ্টেশন হইতে কল্পনায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেক্ ডিষ্ট্রীক্টস্এর ছবি দেখা যায়, দূরে পাহাড়গুলি বেশ দেখা যায়, হ্রদের কিছুই দেখা যায় না। পথে দুই ধারে অনেক শস্যক্ষেত্র, গোমেষাদি চরিতেছে। দেখিলাম একটি মেষের লেজ গরুর লেজের ন্যায় লম্বা!

রাগ্‌বি (Rugby) ষ্টেশনে প্রায় ৪০ মিনিট অপেক্ষা করিয়া গাড়ি বদল করিতে হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল, রাগ্‌বি স্কুল দেখিয়া যাইব, কিন্তু শুনিলাম স্কুল ষ্টেশন হইতে দূরে; সাধ অপূর্ণ রহিল।

সন্ধ্যার পর কেম্ব্রিজে পৌঁছিলাম। ভ্রাতা সঙ্গে করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। তাঁহার আবাসস্থল হইতে বাসা প্রায় ১ মাইল দূর। ছাত্রাবাসে অবশ্য বাহিরের লোক থাকিতে পায় না, কিন্তু তাঁহার আবাসস্থানের নিকটেও আমার জন্য বাটী পায়েন নাই; কারণ, স্নানাগারে আমার নিতান্ত প্রয়োজন এবং কেম্ব্রিজে অধিকাংশ বাটীতেই স্নানাগারের একান্ত অভাব।

কেম্ব্রিজ অতি ছোট সহর, কলেজগুলি এবং ছাত্রাবাস বাদ দিলে প্রায় কিছুই থাকে না।

যে নদীর নামে কেম্ব্রিজ খ্যাত সেই ক্যাম আমাদের দেশের সাধারণ খাল অপেক্ষাও সরু; প্রায় দশ হাত চওড়া হইবে। আবার গ্র্যাণ্টা নামে যে নদী আসিয়া ক্যামে পড়িয়াছেন তিনি এত বড় যে একটি পাইপের ভিতর দিয়া ক্যামে প্রবেশ করিয়াছেন!

ছাত্ররা কেহ কেহ কলেজে বাস করেন; কিন্তু স্থানাভাববশতঃ অনেকেই বোর্ডিং হাউসে থাকেন। এই সব বাটী রেজেষ্টারি করা। গৃহকর্ত্রীদিগকে কলেজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রের দুইটি করিয়া ঘর, একটি শয়নের এবং অন্যটি বসিবার। ছোট ছোট বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীতে ২,৩ বা ৪ জন ছাত্র বাস করেন। সন্ধ্যা ৮টায় দরজায় চাবি পড়ে, ৮টার পর ১০টার মধ্যে বাটী ফিরিলে ২ পেনি জরিমানা দিতে হয়, ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত তিন পেনি, ১২টার পর প্রবেশ নিষেধ। গৃহকর্ত্রীকে খাতা রাখিতে হয়। তাঁহার গৃহস্থ ছাত্ররা কে কখন বাড়ী ফিরে লিখিয়া রাখিতে হয়, আবার অন্য বাটীর কোন ছাত্র ৮টার পর তাঁহার বাটীতে থাকিলে কতক্ষণ ছিল তাহাও লিখিতে হয়। এতভিন্ন রাত্রিতে এক একজন শিক্ষক (Proctor) দুইজন অনুচর (ইহাদিগকে Bulldog বলে) লইয়া সহরের রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান; ছেলেদের দেখা পাইলেন নাম ও কলেজের নাম লিখিয়া লয়েন। অপরাধীর জরিমানা হয়।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত ছেলেদের তত্ত্বাবধান কিছুই হয় না। লেক্‌চর শুনিতে না গেলে কেহ কিছু বলে না। সপ্তাহে কয়েক দিন কলেজে ডিনার খাইতে হয়। যদি কেহ নিয়ম মত ডিনার খায় এবং ৮টার পূর্ব্বে বাসায় আইসে তবে সে লিখা পড়া করুক বা না করুক পরীক্ষায় উপস্থিত হউক বা না হউক কেহ খবর রাখিবেন না। কলেজে যিনি tutor থাকেন তাঁহার নিকট লিখা পড়ার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্য বলিয়া দিবেন কিন্তু না জিজ্ঞাসা করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। ফলকথা সবই আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করে এবং এসব স্থানে self-help বা আত্মনির্ভরতা যথেষ্ট শিক্ষা হয়।

কেম্ব্রিজের কলেজগুলি অবশ্য খুব পুরাতন। অনেকগুলি কলেজ ক্যামের ধারে অবস্থিত এবং নদীর অপর পারে উদ্যানসম্বলিত। কলেজের নদীর ধারের অংশকে Backs বলে। এ অংশ বেশ উপবনের ন্যায়; শুনিলাম, গ্রীষ্মকালে বড় সুন্দর দেখায়।

King's College নামক কলেজের চ্যাপেল বেশ সুন্দর illuminated বাতায়ন শোভিত।

কলেজ ভিন্ন কেম্ব্রিজে দেখিবার জিনিষ (১) ম্যুজিয়মস্থিত চিত্রশালা অনেক উৎকৃষ্ট চিত্রে শোভিত (২) পুস্তকাগার ইহাতে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকই আছে। এখন আইন হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের ১ খানি ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে, ১ খানি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ১ খানি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতেই হইবে। (৩) ব্যোটাানিকাল গার্ডেন যদিও ছোট তথাপি সংগ্রহসম্পদে উল্লেখযোগ্য এবং (৪) ইউনিয়ন বা ছাত্রসভা এই সভায় ছাত্রদিগের পড়িবার জন্য পুস্তকাগার, খেলিবার জায়গা, ধূমপানের স্থান এবং সভাসমিতির স্থান আছে। ছাত্র ভিন্ন শিক্ষকরাও অনেক সময় এই স্থানে আইসেন। ছাত্রসভাটি পার্লামেণ্টের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলেও চলে। ইংলণ্ডের অনেক রাজমন্ত্রীর বক্তৃতার হাতেখড়ি এই স্থানে হইয়াছে।

কেম্ব্রিজ ইংলণ্ডের জলাভূমি (Fen country) তে অবস্থিত, কাযেই অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর। কেম্ব্রিজে আহারের পর আমাদের দেশের মত নিদ্রাকর্ষণ হয়, এবং আমাদের দেশের মত এ স্থানে জ্বরও হয়।

কেম্ব্রিজের চতুঃপার্শ্বে অনেক বেড়াইবার স্থান আছে। একটু দূরে দুইটি ছোট পাহাড় দেখা যায়, তাহাদিগকে ছাত্রভাষায় Gog এবং Magog বলে।

কেম্ব্রিজের নিকটে ঈলি নামক পুরাতন গির্জ্জা। ঈলির গির্জ্জাটি অবশ্য খুবই সুবৃহৎ এবং সুন্দর ভাবে সজ্জিত।

Illuminated জানালার বাহাদুরি এই যে, ঘরের ভিতর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যকিরণে ছবি হাসিতেছে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখুন, সূর্য্যের মুখও দেখা যায় না, আকাশ মেঘাবৃত। যত এইরূপ জানালা দেখিয়াছি সবই এইরূপ।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

আফ্রিকায় ইস্‌লামধর্ম্ম।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীমতী হেমলতা দেবী আফ্রিকায় ইসলামধর্ম্ম বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে ইস্‌লাম সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে ইস্‌লাম সম্বন্ধে আলোচনা অল্পই হইয়া থাকে; এই কারণে মুসলমানদিগের ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ নানা ভ্রমাত্মক ধারণা সাধারণের চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য আমরাই তজ্জন্য দায়ী, কেন না বাঙ্গালা ভাষায় ইস্‌লাম সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিয়া ভ্রমের অপনোদন আমাদেরই কর্ত্তব্য, অথচ তাহার চেষ্টা এখনও আমাদের মধ্যে হয় নাই।

লেখিকার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। কিন্তু এক বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বহু বিবাহের কথার উত্থাপন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "মহম্মদ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু ২ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অধিক নহে।" আজ যদি বিলাতের শফরীগেটদিগকে পার্লামেণ্ট মহাসভায় স্থান দিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখান হয়, তথাপি ২০০ শত বৎসর পরে স্ত্রীলোকরা হয়ত বলিবেন, 'বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু ২ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অধিক হয় নাই।" ফল কথা এক যুগেই চিরযুগের জন্য সনাতন বিধান করা অসম্ভব; তবে যে বিধানের কালানুযায়ী সম্প্রসারণশক্তি যত অধিক সে বিধান তত উৎকৃষ্ট। হজরত মোহাম্মদের বিধানে স্ত্রীলোকগণ এক সময়ে মোসলেম জগতে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের কিরূপ সমকক্ষ হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এস্থলে সম্ভবে না। ইস্‌লাম স্ত্রীলোকের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে সভ্যজগতের এখনও বহু বিলম্ব আছে। ইস্‌লামের স্ত্রীলোকের আদর্শ বাস্তবিকই খুব উন্নত।

লেখিকা পরে লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক পুরুষের চারিটি করিয়া বৈধপত্নী গ্রহণের নিয়ম থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহাতেই তাহার শেষ নহে, কারণ ইচ্ছামত স্ত্রীত্যাগের অধিকার মুসলমানের আছে এবং মুসলমান বিধি অনুসারে ক্রীতদাসীগণ মুসলমান প্রভুর ভোগের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।" চারিটি বিবাহ, ইচ্ছামত স্ত্রীত্যাগ এবং ক্রীতদাসীগণকে ভোগের সামগ্রী বলিয়া গণ্য করা, তিনটিই মুসলমানের শাস্ত্রে আছে; কিন্তু ঐ তিনটি বিষয় এস্থলে যেরূপভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান শাস্ত্রে যে যদৃচ্ছা ভোগবিলাসের অনুমতি আছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হয় না। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের প্রত্যেকটিতে যে বাধাবিঘ্ন আছে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে আর সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ থাকিবে না। শত শত বিবাহকারীদিগকে এককালীন চারিটিতে আবদ্ধ করিয়া হজরত মোহাম্মদ যুক্তিসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছিলেন, কারণ সহসা এক-বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে গেলে তাহা তদানীন্তন আরব জাতির সম্যক্ অনুমোদিত হইত না, সুতরাং তিনি ধর্ম্মপ্রচারে তাহাদের সহায়তা লাভে বঞ্চিত হইতেন। একেশ্বরবাদ প্রচারই তাঁহার প্রধান কার্য্য; তন্নিমিত্ত দুই একটি সামাজিক কুপ্রথা বজায় রাখিয়াও তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে কুপ্রথাগুলিকে যদৃচ্ছা পল্লবিত হইবার অবসর দিয়াছেন, এরূপ নহে, বরং সেগুলি যাহাতে প্রথমে সংযত ও পরে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, কৌশলে তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন,—"তোমরা দুই তিন কিম্বা চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পার; কিন্তু যদি প্রত্যেকের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমান ব্যবহার করিতে না

পার তবে তোমাদিগকে একটি বিবাহই করিতে হইবে।" (কোরান শরীফ চতুর্থ অধ্যায়।)। কোরান শরীফের এই বচন যদৃচ্ছা বিবাহকে সংযত করিতেছে। মোসলেম পণ্ডিতগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, ইস্‌লামের গূঢ় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে যে একাধিক বিবাহ সম্পূর্ণরূপে ইহার নীতিবিরুদ্ধ। আজ কাল মুসলমান শিক্ষিত সমাজে বহুবিবাহ বিরল তবে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, যাহাতে সমাজ দুষিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিতে পারে এরূপ বিধান শাস্ত্রে থাকাই অনুচিত। এ আপত্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণার্থ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, হিন্দুসমাজে প্রাচীনকালে (এমন কি অল্পদিন পুর্ব্বে কুলীনদিগের মধ্যে) বিবাহ বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় রীতি প্রচলিত ছিল, তদ্দারা আধুনিক সমাজ দুষিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় কি?

"ইচ্ছামত" স্ত্রীত্যাগ করিবার অধিকার মুসলমানের আছে, এ কথা সত্য নহে। স্বামীর যেমন স্ত্রীত্যাগ করিবার ক্ষমতা আছে, স্ত্রীরও তেমনই স্বামিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু কোনটিই "ইচ্ছামত" নহে। ত্যাগে এত বাধা আছে যে, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে উহা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। যে স্থলে ত্যাগ না করিলে একবারেই চলে না, এবং ত্যাগে পরিবারের মধ্যে আদর্শহানি সম্বন্ধে যে অনিষ্টটুকু ঘটে, রক্ষায় তদপেক্ষা অন্য বিষয়ে অধিকতর অনিষ্ট সংঘটন অনতিক্রম্য হইয়া উঠে, সেই স্থলেই বিচারকের নির্দ্দেশে ত্যাগ করা শাস্ত্রসঙ্গত। ইহা কেবল একটি লঘুতর অনিষ্টদ্বারা একটি গুরুতর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার উপায়। ত্যাগ যে সমাজের অনিষ্টকর, একথা পরোক্ষে ইস্‌লাম স্বীকার করিতেছে, "ঈশ্বর তোমাদিগকে যে যে কার্য্য করিবার অনুমতি দিয়াছেন, তন্মধ্যে স্ত্রীত্যাগ বা স্বামিত্যাগ তাঁহার নিকট হেয়তম।"

শেষ কথা "মুসলমান বিধি অনুসারে ক্রীতদাসীরা মুসলমান প্রভুর ভোগের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অবশ্য একথা সত্য যে, প্রাচীন আরবজাতির মধ্যে এ প্রথা বর্ত্তমান ছিল, এবং হজরত মোহাম্মদ উহাকে একবারে উৎপাটিত করিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু যাহাতে উহা আপনাপনি লোপ পায়, তাহার বিধান করিতে তিনি ভুলেন নাই। "তোমাদের দাসীদিগকে ব্যভিচারে বাধ্য করিও না।" (কোরান শরীফ ২৪শ অধ্যায়) পুনশ্চ "যে ব্যক্তি ব্যভিচারে ভীত হয়, তাহাকে এরূপ বিবাহ (দাসী বিবাহ) করিতে অনুমতি প্রদত্ত হইল। কিন্তু যদি তোমরা দাসী বিবাহ না করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমাদেরই মঙ্গল হইবে।" (কোরান শরীফ চতুর্থ অধ্যায়) সুতরাং সূক্ষ্মবিচার করিয়া দেখিতে গেলে, দাসীমাত্রেই যে প্রভুর ভোগের সামগ্রী, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

মুসলমান শাস্ত্রের যে সকল বিধি কেহ কেহ অকল্যাণকর মনে করেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সে সকল বিধি চিরন্তন নহে। সমাজ যত উন্নত হইতে থাকে, সেগুলি ততই আপনা আপনি প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়। সম্প্রসারণ শক্তির দিক দিয়াই শাস্ত্রীয় বিধিসমুহের বিচার করিতে হয়। সুতরাং "সর্ব্বপ্রকার কোমলবৃত্তি, সাধুবৃত্তি ও পরার্থপরতা শিক্ষার কেন্দ্র যে পরিবার তাহাই যদি এইরূপ দুষিত হয়, তবে সমাজ কোনরূপে বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না" বলিয়া লেখিকা যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা অমূলক।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মাননীয় লেখিকার নিকট আমরা ইস্‌লাম সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা আশা করি।

শ্রীমোহাম্মদ আসাদ আলী।

সমালোচনা।

প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস।*

অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের এই পুস্তকখানি প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য রচিত। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "এই ক্ষুদ্র ইতিহাসখানি যে শ্রেণীর বালকবালিকার জন্য অভিপ্রেত পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল না। * * * ঘটনাবাহুল্যে পুস্তকখানির কলেবর পূর্ণ না করিয়া, যে সকল ঘটনা দ্বারা কোন একটি সময় বা কোন একটি রাজার সম্বন্ধে একটি পরিস্ফুট ধারণা হইতে পারে, কেবল সেইগুলিই দেওয়া হইয়াছে।"

পূর্ব্বে প্রথম শিক্ষার্থী বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঙ্গালার ইতিহাস পড়ান হইত। তাহাদিগের পাঠের জন্য দেশপূজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্ন ও মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' বহুদিন বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির পুস্তক পরিচিত ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুত মার্শমন সাহেবের রচিত ইংরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে।" রাজকৃষ্ণ বাবুর পুস্তকে মৌলিকতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহাও বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস—সুতরাং কিছু নিরস।

যে স্থলে বাঙ্গলার ইতিহাস রচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বা রাজকৃষ্ণবাবুও যথেষ্ট সরসতার সঞ্চার করিতে পারেন নাই সে স্থলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সরস করিতে খগেন্দ্রবাবুকে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুখের বিষয় খগেন্দ্রবাবুর শ্রম সার্থক হইয়াছে। তিনি এই দুরূহ অনুষ্ঠানে বহু পরিমাণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

বালক বালিকাদিগকে সরস ও সরলভাবে ইতিহাস শিক্ষা দিবার চেষ্টা প্রতীচ্যে বহুদিন হইতে হইয়া আসিতেছে। 'লিট্‌ল্ আর্থার্স হিষ্ট্রী' বহু ছাত্রকে ইংলণ্ডের ইতিহাস শিখাইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স বালকবালিকা-

---

* শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, প্রণীত।

দিগের জন্ম ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। সংপ্রতি রাডিয়ার্ড কিপলিং একখানি ইতিহাসের মধ্যে মধ্যে কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়া রচনা সরস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

"যে বয়সে কল্পনা পল্লীর গল্প, রাজপুত্ররাজকন্যার উপকথাকে আশ্রয় করিয়া তৃপ্ত হয়, সে বয়সে গল্পের ছলে ইতিহাস শিক্ষা দিবার প্রণালী অবলম্বন করিলে সুফলের আশা করা যাইতে পারে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার মাত্রা কমিয়া যায়, সে সময় গল্পের সাহায্য আর তত আবশ্যক হয় না।"—এইজন্য দুই বর্ষব্যাপী এই পাঠ্যপুস্তকখানির শেষভাগ অপেক্ষা প্রথমাংশেই গল্প বেশী দেওয়া হইয়াছে।"—এ সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থকার পাঠ্যপুস্তকখানির আয়ুষ্কাল বিবেচনা করিয়া একাংশে গল্পের মাত্রাধিক্য প্রদান করিয়া ইতিহাসের প্রতি কিছু অত্যাচার করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে একটু ফাঁকি দিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা হয়—হিন্দুপ্রাধান্যকাল—মুসলমানপ্রাধান্যকাল—ইংরাজপ্রাধান্য কাল। এই তিন অংশের প্রথম অংশের ইতিহাসই অসম্পূর্ণ। প্রাচীন ভারতবাসী হিন্দুদিগের ইতিহাসরচনাবিমুখতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পণ্ডিত-প্রবর ওলডেনবর্গ হইতে তরুণ লেখক ব্রাড্‌লী বার্ট পর্য্যন্ত অনেকে অনেক প্রকার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ফলে প্রাচীন ভারতবাসীর ইতিহাসরচনা-বিমুখতাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাংশের অসম্পূর্ণতার মুখ্য কারণ নহে। কোন প্রাচীন জাতিই সমসাময়িক ইতিহাস রচনা করে নাই। স্থাপত্যনিদর্শনে, সাহিত্যে, উৎকীর্ণ প্রস্তরে তাহাদের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিচ্ছিন্ন অংশের সংযোগফলে ইতিহাস রচনা করিতে হয়। ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী বিদেশী শাসন ও বিজেতৃগণকর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের কীর্ত্তিলোপচেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ কারণে ইতিহাসের উপযুক্ত উপাদানের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় না সত্য; কিন্তু আবশ্যক উপাদানের অভাবও নাই। এই সকল উপাদান হইতে সংপ্রতি ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রাচীন ভারতবর্ষের একখানি মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই অংশের ইতিহাস আমরা মিত্র মহাশয়ের মত সুশিক্ষিত অধ্যাপকের অনু-সন্ধানফলে নূতন কথা জানিবার আশা করি। গ্রন্থের এই অংশে অধিক গল্প দিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে সে আশায় হতাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ যে সুগম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বহুদিন হইল সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতি

প্রধান ঘটনাগুলি লইয়া সুললিত কবিতায় ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। 'ভারতগাথা' সংক্ষিপ্ত। আলোচ্য পুস্তকখানি সেরূপ সংক্ষিপ্ত নহে। ইহা যে উদ্দেশ্যে রচিত, ইহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

গ্রন্থের চিত্রসম্পদ্‌ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তকে ৫৯খানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্রগুলির বাছাই সম্বন্ধেও গ্রন্থকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেকালের জাহাজ, সেকালের চিত্র, সেকালের স্থাপত্য—এ সকলের প্রতিকৃতি সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত হয় না। কিন্তু বহুপৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনায় যাহা বুঝান অসম্ভব, একখানি চিত্রে তাহা সহজেই সুস্পষ্ট হয়। গ্রন্থকার বর্ণনীয় বিষয় বিশদ করিবার জন্য চিত্রনির্ব্বাচনে বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থের রচনাপ্রণালী যথাসম্ভব সরল। 'আর্য্যাবর্ত্তের' বর্ত্তমান সংখ্যায় 'দীন রাজ্যেশ্বর' শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনীয় বিষয়টি গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে—"বাদশাহের অনেক বেগম থাকে, নাসিরুদ্দীনের একমাত্র স্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে রাঁধিতেন। একদিন রাঁধিবার সময় তাঁহার হাতের আঙ্গুল পুড়িয়া যায়। তখন তিনি নাসিরুদ্দীনের নিকট একজন দাসী চাহিলেন। নাসির বলিলেন 'আমি প্রজাদের অর্থের রক্ষকমাত্র, নিজের জন্য সে অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার আমার নাই।' রাজমহিষীর ভাগ্যে দাসী রাখা ঘটিল না।"

গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে সর্ব্ববিধ ভ্রমবর্জ্জিত করিবার জন্য যথাসম্ভব যত্ন করিয়াছেন। "সচরাচর ভ্রমক্রমে বখ্‌তিয়ার খাল্‌জিকেই বঙ্গবিজেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু বখ্‌তিয়ারের পুত্র ইখতিয়ার উদ্দীন্ মহম্মদই বঙ্গবিজয় করেন।" এই ভুলটি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বোধহয় এক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিকই ছাত্রদিগের জন্য রচিত গ্রন্থে এ ভুলটির সংশোধন করেন নাই। মিত্র মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "যদি এ ভ্রম সংশোধন করাই আবশ্যক হয়, তবে এইরূপ প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকেই তাহা করা বাঞ্ছনীয়।"

এইরূপে নানাগুণে পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত হইবার উপযুক্ত।

দিল্লী।

যে ভূখণ্ডে দিল্লী নগরী অবস্থিত, সময়ক্রমে সেই স্থান নানা নাম ধারণ করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই স্থানের নাম ছিল সমন্তপঞ্চক। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে এই স্থানেই ব্রাহ্মণ্য শক্তির সহিত ক্ষাত্র বলের ঘোর সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল। এই স্থানেই পাচটি পুষ্করিণী খনন করিয়া পরশুরাম ক্ষত্রিয়রক্তে তাহা পূর্ণ এবং সেই শোণিতে তাঁহার পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরাম তপস্বী ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু ক্ষত্রিয়রাজের দৌহিত্র ও পুত্র। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে কেন অস্ত্রধারণ করিলেন? এই অস্ত্রধারণ ব্রাহ্মণ জাতির সহিত ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্ঘর্ষেরই পরিচায়ক। পুরাণপাঠে জানা যায়, পরশুরামের পিতা জমদগ্নি একজন বনবাসী তপস্বী ছিলেন। হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ায় যাইয়া রাত্রিকালে জমদগ্নির আশ্রমে বাস করেন। ঋষির একটি হোমধেনু ছিল। সেই হোমধেনুটি আবার কামধেনু। তাহারই প্রসাদে ঋষি সানুচর হৈহয়নাথকে আতিথ্য-সৎকারে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলদৃপ্ত গর্ব্বান্ধ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সেই ধেনুটির উপর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। সেই সবৎসা ধেনুটিকে তিনি বলপূর্ব্বক মাহিস্মতী নগরে লইয়া যায়েন। ইহাই হইল পরশুরামের সহিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বিবাদের কারণ। এই বিবাদে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিহত হয়েন। ইহা ব্যক্তিগত বিবাদের কথা। কিন্তু ইহার জন্য পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবার জন্য একবিংশতি বার ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন কেন? তাহারও একটা কারণ আছে। সে কারণটি এই;—

> "দৃপ্তং ক্ষত্রং ভুবোভারমব্রহ্মণ্যমনীনশৎ।
> রজস্তমোবৃতমহন্ ফল্গুন্যপি কৃতেহংসি॥"
>
> ভাগবত ৯।১৫।১৫

"ক্ষত্রিয়গণ বলদৃপ্ত, ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধাচারী (অথবা বেদ-বিরুদ্ধাচারী) রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য তাহাদের অপরাধ গুরুতর না হইলেও পরশুরাম তাহাদিগকে নাশ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকে "অব্রহ্মণ্যম" এই বিশেষণ হইতেই এই ব্যাপারটি বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। বশিষ্ঠের সহিত ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্রের বিবাদের কারণও এইরূপ। বিশ্বামিত্র রাজা বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীকে হরণ করিতে যাইয়া বিপাকে

পড়িয়াছিলেন। এই বিশ্বামিত্র পরশুরামের পিতামহীর সহোদর। আবার ক্ষত্রিয় রাজা কল্মষপাদ বশিষ্ঠের পুত্র শক্তিকে চাবুকের প্রহারে জর্জ্জরিত এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বরুণনন্দন বশিষ্ঠের ও অন্যান্য ঋষিগণের আশ্রম দগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা পরশুরামের সময়ে বা তাহার কিছুকাল পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। এই সময়ে এইরূপ আরও দুই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহাতেই মনে হয়, তদানীন্তন ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিতে এবং ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এই কারণেই ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় জাতির বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল। নতুবা কেবল কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অপরাধের জন্য পরশুরাম সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না।

পরশুরাম সমন্তপঞ্চকেই পাঁচটি হ্রদ প্রস্তুত করিয়া ক্ষত্রিয়গণের রক্তে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ অঞ্চলেই ব্রাহ্মণ্য শক্তির সহিত ক্ষাত্র শক্তির সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ইহা একটি যুগান্তরকারী ব্যাপার। পরশুরামের পিতা জমদগ্নির মাতুল বিশ্বামিত্র ইহার পূর্ব্বেই বশিষ্ঠের নিকট পরাভূত হইয়া বলিয়াছিলেন ;—

"ধিগবলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
বলাবলং বিনিশ্চিত্যতর্প এব পরং বলম্॥"

বিশ্বামিত্র তপোবলকেই প্রধান মনে করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণসমাজে প্রবিষ্ট হইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন। অতঃপর পরশুরামের হস্তে ক্ষত্রিয়গণ নির্জ্জিত হইলে ব্রাহ্মণ্য শক্তি আবার প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। এই ভীষণ ব্যাপারের পর হইতেই দ্বাপর নামে নূতন যুগ গণিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। সুতরাং দিল্লী অঞ্চলেই এই যুগান্তরকারিণী ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

পরশুরামের সহিত যুদ্ধে ঐ অঞ্চল একেবারে জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহার পরে চন্দ্রবংশীয় সম্বরণ রাজপুত্র কুরু ঐ অরণ্য নষ্ট করিয়া ঐ ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র ও কুরুজঙ্গল হয়। লোকে তখন ইহার প্রাচীন সমন্তপঞ্চক নাম ভুলিয়া যায় এবং ইহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পাণ্ডবদিগের সময়েও এই স্থানের কোন কোন অংশে জঙ্গল ছিল। ঐ বন খাণ্ডববন নামে বিখ্যাত। অর্জ্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া এই স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। পরশুরামের

কিছুকাল পরে এই স্থানে সুদর্শননামে এক রাজা খাণ্ডবী নামে এক পুরী নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বহু ধনরত্ন সংগ্রহও করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশী-রাজ বিজয়ের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলে এই স্থান জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এরূপ একটি পৌরাণিকী বার্ত্তাও পাওয়া যায়। রামায়ণের সময় এই ভূভাগ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

যাহা হউক, দ্বাপর যুগের শেষভাগে এই অঞ্চল আবার সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়েও ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত গর্ব্বান্ধ ও আত্মম্ভরী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই সময় ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত বিলাসীও হইয়াছিলেন। এই স্থানেই দ্বাপরের শেষভাগে সসাগরা ধরার অধীশ্বর মহা-রাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। যজ্ঞসভা কিরূপ কারু-কৌশলে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যুধিষ্ঠিরের এই ঐশ্বর্য্য-দর্শনে দুর্য্যোধনের জ্ঞাতি-সুলভ ঈর্ষ্যানল সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানেই—এই ব্যাপারেই ভারতে ক্ষাত্রবীর্য্য-বিনাশের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এই বিদ্বেষের বীজ অল্পকালের মধ্যে মহাদ্রুমে পরিণত হইয়া কুরুক্ষেত্রের মহাসমররূপ বিষময় ফল প্রসব করিয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষাত্রবীর্য্য চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। কথিত আছে, যে সময়ে দুর্য্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, সেই সময় এক বিকর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষত্রিয়রাজই তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তদ্দর্শনে সভাস্থ কতিপয় ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, ভারতে ক্ষাত্র তেজ অচিরেই লুপ্ত হইবে; কলিতে আর ক্ষত্রিয়জাতি প্রবল হইতে পারিবে না।

ইহার পরই কুরুক্ষেত্রের মহাহবে ভারতের ক্ষত্রিয়-শক্তি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভারতের যে স্থানে যত লোক যুদ্ধ করিতে ও অস্ত্র ধরিতে জানিত, তাহারা প্রায় সকলেই এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রাণ দিয়াছিল। এই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রাণ হারায়। ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত সৈন্য লইয়া এক একটি অক্ষৌহিণী হইয়া থাকে। সুতরাং এই যুদ্ধে ৩৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬শত যোদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর যাহাও ছিল, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে তাহাও নিঃশেষ হয়। এদিকে ঐ সময়েই যদুবংশ অন্তর্ব্বিবাদে ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধের পর সমগ্র ভারত বিধবার রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। নিতান্ত শিশু

ও স্থবির ব্যতিত যোদ্ধৃজাতির মধ্যে আর কেহ ছিল না। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে, এবং বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে থাকে। সেই জন্য লোকে শ্রীকৃষ্ণকে ভূভারহরণকারী অবতার এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে যুগবিপ্লবকারী ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতে কলি নামে নূতন যুগ আরব্ধ হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর হইতেই ঐ যুগ গণিত হইতে থাকে। ভারতের এই তৃতীয় যুগান্তরকারী ব্যাপারও কুরুক্ষেত্রে বা সমন্তপঞ্চকে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

তাহার পর ভারতের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কলিযুগ এখনও চলিতেছে। কিন্তু এই কুরুবর্ষে ইহার পরও ভারতের ইতিহাসের গতিপরিবর্ত্তনকারী অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ইতিহাস ও ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনায় কতকটা অনুমান করা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অন্ততঃ পাচ ছয় শত বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়াছিল। তাহার পর কি কারণে কোথায় কোন্ বিপ্লবের প্রভাবে এই ক্রিয়াকাণ্ড বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা কে বলিতে পারে? বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেই যে এ দেশে বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডের লোপ ও বিকৃতি এবং জ্ঞানকাণ্ডের অবনতি ও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। এই অন্ধকারাবৃত যুগে কুরুবর্ষে কত যুগান্তরকারী ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে, কত অমরকীর্ত্তি লোকলোচনের সম্মুখ হইতে কিছু কালের জন্য আত্মগোপন করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

সাত শত বর্ষের কিছু অধিককাল পূর্ব্বে এই কুরুবর্ষেরই বক্ষে তিরোরীর প্রান্তরে মহম্মদ সাহাবদ্দীন চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এই সময় আবার ভারতীয় রাজগণের মধ্যে জ্ঞাতিবিবাদ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হয়। সেই জ্ঞাতিবিবাদই পৃথ্বীরাজের বলক্ষয়ের নিদান। তাহার পর স্থানেশ্বর-প্রান্তরে দিনব্যাপী সংগ্রামের পর ভারতের ক্ষাত্রতেজ চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরই ভারতে পাঠান-শাসনের প্রতিষ্ঠা।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে আবার ঐ পানিপথের বিশাল প্রান্তরে বাবরের শৌর্য্যে পাঠান-রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ভারতে মোগল যুগের আবির্ভাব হয়। ইহার ত্রিংশ বর্ষ পরে আবার এই পানিপথ-প্রান্তরে অকবরের সহিত হিন্দু সেনাপতি হিমুর ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধেই পাঠানদিগের ক্ষমতা

একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভারতে আবার কতকটা শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইহার পর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে এই পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে উদীয়মান মহারাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত সমবেত মুসলমান শক্তির তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। যে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি এই ঘটনার পূর্ব্বদিন সমস্ত ভারত অধিকার করিবার কল্পনা করিতেছিল সেই মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরেই চূর্ণ হইয়া যায়। এই যুদ্ধে মোগল শক্তি জয়যুক্ত হইলেও অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুরন্ত আমেদশাহ আর ভারতে প্রবেশ করিতে সাহসী হয়েন নাই। এই যুদ্ধের পরই ভারতে ইংরাজের রাজত্বপ্রতিষ্ঠার পথ সুপ্রশস্ত ও সুগম হইয়া উঠে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী লর্ড লিটন্ ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধিরূপে প্রথম দরবার করিয়াছিলেন। তাহার পর লর্ড কর্জ্জন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয়ের অভিষেক দরবার এই স্থানে অতি সমারোহে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

এবার সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ স্বয়ং ভারতে আসিয়া এই দিল্লীতেই রাজসূয় দরবার করিয়াছেন। দিল্লীর চিরন্তনী কীর্ত্তিমালার সহিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের স্মৃতি বিজড়িত রহিবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

গত অক্টোবর মাসের 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' নামক পত্রে মিঃ জি, এ, চন্দ্রবারকর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে একটি সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনি স্বামিজীর জীবনকথা ও তাঁহার মতামত সম্বন্ধে প্রায় সকল কথারই আলোচনা করিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ইদানীং এই ধর্ম্ম পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালা দেশেও স্থানে স্থানে এই ধর্ম্ম প্রসারলাভ করিতেছে, সুতরাং দয়ানন্দের চরিত ও মত জানিবার জন্য অনেকের কৌতুহল উদীপ্ত হইতেছে। আমরা নিম্নে চন্দ্রবারকর মহাশয়ের সেই সন্দর্ভের সার সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

চন্দ্রবারকর মহাশয় লিখিয়াছেন পৃথিবীর মধ্যে ভারতে মধ্যে মধ্যে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শের অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া মানবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে দয়ানন্দ এই প্রকার মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি। আচারনিষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমতের মধ্যে লালিতপালিত হইয়া তিনি উদার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, মানবের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তির দিকে প্রধাবিত করিয়াছেন।

ভারতে বিশেষত্ব।

কাথিবার উপদ্বীপে মোর্ভিরাজ্যে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম উমাশঙ্কর। উমাশঙ্কর ঐ অঞ্চলে জমাদার, মহাজন, ও জমিদার ছিলেন। উমাশঙ্কর শিব উপাসক। যখন দয়ানন্দের বয়ঃক্রম পাচ বৎসর তখন তিনি তাঁহাকে তদ্দেশপ্রচলিত প্রথামতে শিক্ষালাভ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। উমাশঙ্কর শৈব ছিলেন, দয়ানন্দকেও তিনি শৈবধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি পালন করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। যখন দয়ানন্দের বয়স ১৪ বৎসর মাত্র তখন শিব চতুর্দ্দশীর দিন তিনি দয়ানন্দকে শিব চতুর্দ্দশীর ব্রত ও উপবাস করাইয়া গ্রামের প্রান্তস্থিত শিবমন্দিরে লইয়া যায়েন। সেইস্থানে গ্রামস্থ সকল শৈব শিবনাম যপ ও শিবনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। যামিনীর শেষভাগে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়েন, এমন কি উমাশঙ্করও নিদ্রিত হয়েন। সেই নৈশ নিস্তব্ধতায় যখন সকলে নিদ্রিত হইয়াছেন, তখন দয়ানন্দ দেখিলেন, একটি মূষিক শিব-লিঙ্গের গাত্রে বিচরণ করিতেছে। দেখিয়া বালক দয়ানন্দের মনে এই চিন্তার উদয় হইল, আমি সম্মুখে যে দেবতা দেখিতেছি, ইনিই কি বাস্তবিক কৈলাসনাথ পিনাকোপাণি দেবাদিদেব মহাদেব? যদি তাহাই হয়েন তবে গাত্রস্থ মুষিককে বিতাড়িত করিতে পারিতেছেন না কেন? এই চিন্তা তাহার মনে উদিত হইলে তিনি তাঁহার পিতাকে জাগরিত করিলেন; এবং তাঁহাকে সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহার সন্তোষ হইল না। তিনি অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং জননীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া শিবরাত্রির ব্রত ভঙ্গ করিলেন। এই দিন দয়ানন্দের মনে শৈবধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাসের

বীজ উপ্ত হয়। সেই জন্য দয়ানন্দের শিষ্যগণ শিব চতুর্দ্দশীর রজনীতে এই ঘটনার স্মৃতি উৎসবের স্বরূপ, দয়ানন্দ বোধ উৎসব করিয়া থাকেন।

বৈরাগ্য।

এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে কয়েকটি আত্মীয়ের বিয়োগব্যথায় দয়ানন্দের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইতঃপূর্ব্বে দয়ানন্দ শাস্ত্রগ্রন্থে জীবন ও মরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনে মনেও এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে কোন উপায়েই হউক জীবন ও মরণ সমস্যার সমাধান করিবেন। তিনি যোগদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। অবশেষে একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের সন্ধ্যাকালে গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ কালে তিনি শুদ্ধ চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভ্রমণ, শিক্ষা ও মতপরিবর্ত্তন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যোগদ্বারা সিদ্ধিলাভ ও জীবন মরণ সমস্যার সমাধান তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্য তিনি স্বামী পূর্ণানন্দ প্রভৃতি গুরুর নিকট অনেক শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি স্বামী বিরজানন্দের নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করেন। শুনা যায়, স্বামী বিরজানন্দ দয়ানন্দকে মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে ও বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।

বৈদিকধর্ম্ম প্রচার।

বিরজানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হয়েন। তিনি প্রথমে মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে নানাস্থানে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়। দয়ানন্দ তথায় স্বীয়-মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কনোজ, ফরাক্কাবাদ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে কানপুরে একটি প্রকাণ্ড সভা হয়। কানপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ থেয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় হিন্দু পণ্ডিতদিগের সহিত দয়ানন্দের বিচার হয়। অতঃপর দয়ানন্দ ভারতের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১০ এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ে প্রথম আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আর্য্যসমাজের দশটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর আজমীরে তাঁহার দেহান্তর হয়।

দয়ানন্দের মত।

দয়ানন্দ বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে স্ত্রীলোকের ১৬ হইতে ২৪ বৎসর বয়সে এবং পুরুষের ২৫ হইতে ৪৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। তিনি বিদেশযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ পাতাল বা আমেরিকায় গমন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য উদ্দালক মুনিকে আমেরিকা হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুপত্নী মাদ্রি ইরাণ বা পারস্য রাজার দুহিতা ছিলেন। অর্জ্জুন উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, উলুপী আমেরিকার কোন রাজ্যের শাসনকর্ত্তার কন্যা ছিলেন। সুতরাং জ্ঞানলাভার্থ বিদেশগমন ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য। শিক্ষা সম্বন্ধে দয়ানন্দ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও গুরুকুলে বাস করিয়া অধ্যয়ন তাঁহার অভিপ্রেত।

সমাজ-প্রেস ৮৩।১ মেছোবাজার, কলিকাতা
এম্ এন্ পালিত কর্তৃক মুদ্রিত।

বেলভেডয়ার ।

সমাচ্ছন্ন। আমি ইহা শকট হইতে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, দুইটি বৃক্ষ এক স্থানে জন্মিয়াছিল; কালে দুই কাণ্ড এক হইয়া এই অপূর্ব্ব যুগ্মবৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। এ দৃশ্যটি বড়ই মনোরম।

রাণী বাহালের সুদূর শৈলশ্রেণীর নিবিড় সুনীলশোভা নেত্রপথে প্রতিভাত হইল। সম্মুখে গুল্মলতাতৃণাচ্ছাদিত বৃক্ষাবিরল প্রান্তর—তৎপরে বনরাজী;—তৎপশ্চাতে দূর—অতি দূর ধরণীপ্রান্তে গিরিমালা। বিচিত্র সুন্দর ঘননীল ভূধরশোভা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। আমার শকট ক্রমে তাঁতিপাড়া গ্রামে পৌঁছিল। এই স্থানে প্রায় পাঁচ শতের উপর তন্তুবায় বাস করে। অনেক খোড়োঘরের দাওয়ায় (অর্থাৎ বারান্দায়) স্তূপীকৃত গুটি (Cocoons) ঢালা রহিয়াছে। কোন কোন দাওয়ায় সূত্র মসৃণ করা হইতেছে। এই স্থানে অতি উত্তম তসর ও বাফ্‌তা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ তসর ও বাফ্‌তা ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানেও প্রস্তুত হয় না। ইহা বড়ই টেঁকসই ও সুন্দর।

এই স্থান হইতে দক্ষিণাভিমুখে শকটের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পুণ্য স্রোতস্বিনী বক্রেশ্বর নদীকূলে উপনীত হইলাম। ইহা অতি অল্পপরিসর বালুকাময় গিরিনদী; অদূরাস্থিত কোন পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুণ্যতীর্থ বক্রেশ্বর ধাম পরিবেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। একই নদী স্থানে স্থানে তীর্থমাহাত্ম্যে ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে।

আমি শকটারোহণে পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম। অশ্বদ্বয় অবলীলাক্রমেই বালুকাগর্ভ নদীর উপর দিয়া শকট টানিয়া লইয়া গেল। আমি তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইলাম।

বক্রেশ্বর-তীর্থ।

বক্রেশ্বরে উপনীত হইয়া আমি শকট হইতে অবতরণ করিয়াই প্রথমে দাইহাট নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ জমীদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নবপ্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রায় আড়াই বৎসর হইল এই কালীবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। জমীদার মহাশয় ইহাতে জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত পূজার ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তীর্থদর্শনেচ্ছু ভদ্রলোকমাত্রেই এই কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতে পারেন। যাহাতে অতিথিঅভ্যাগতের যত্ন ও পরিচর্য্যার ত্রুটি পরিলক্ষিত

না হয় সে বিষয়ে জমীদার মহাশয়ের কর্ম্মচারীর প্রতি বিশেষ আদেশ আছে; কর্ম্মচারী মহাশয়ও প্রভুর আদেশ যথাবিহিত পালন করিয়া থাকেন।

কালীবাড়ীতে কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে আমি একটি পাণ্ডাকে তীর্থপ্রদর্শক স্থির করিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম। আমি প্রথমে এই তীর্থের দ্রষ্টব্য স্থানাদির বর্ণনার পূর্ব্বে এই স্থানের প্রাচীন বা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রদান করিব।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

স্মরণাতীত পুরাকালে সুব্রত ও লোমশ ঋষি লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঋষিদ্বয় যথাকালে স্বয়ম্বরমণ্ডপে উপনীত হইলে স্বয়ং স্বর্গরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য সভাসীন ব্যক্তিবর্গ সর্ব্বাগ্রে ঋষিরাজ লোমশকে সাদর-সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইহা দেখিয়া তদীয় বন্ধু সুব্রত ঋষি অভিমানে, ক্ষোভে ও রোষে সভাস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি নিদারুণ ক্রোধানলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ও এরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, প্রস্থানকালে তাঁহার দেহের অষ্টাঙ্গ বক্র হইয়া গেল। তদবধি তিনি ঋষি অষ্টাবক্র নামে সাধারণ্যে সুপরিচিত হইলেন। বক্রাঙ্গ হইয়া বিকলাঙ্গ অষ্টাবক্র অশান্তচিত্তে পৃথিবীর নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইয়া অষ্টাবক্রেশ্বর নামক শিবস্থাপনা করিয়া শিবসাধনায় ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার প্রতি মহাদেবের আদেশ হইল, যে পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের গুপ্ত কাশী নামক স্থানে গিয়া শিবসাধনা না করিবেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি কোন প্রত্যাদেশ হইবে না। ইহা শুনিয়া মহর্ষি অষ্টাবক্র বঙ্গদেশে এই বক্রেশ্বর নামক স্থানে আসিয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যায় নিমগ্ন রহিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়কারী মহারুদ্র তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, এই তীর্থে আসিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তোমার পূজা ও পরে আমার পূজা করিবে সে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের অধিকারী হইবে। অতঃপর বিশ্বকর্ম্মার প্রতি অষ্টাবক্রের তপস্যাপূত ভূমির উপর মন্দির নির্ম্মাণের প্রত্যাদেশ হওয়াতে দেবশিল্পী বক্রেশ্বর নদীর পূর্ব্বতীরে একটি সমুচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অষ্টাবক্রের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত মন্দিরের অস্তিত্ব এক্ষণে নাই। বর্ত্তমান মন্দিরটি দুই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। ইহাতে তাদৃশ সূক্ষ্মশিল্পচাতুর্য্যও নাই। কিন্তু ইহা আকারে বৃহৎ। কেহ কেহ ইহাকে বৈদ্যনাথের মন্দিরের সহিত তুলিত করিয়া থাকেন

বক্রেশ্বর।

যাত্রা।

বক্রেশ্বর অতি প্রাচীন তীর্থ; বঙ্গদেশের বীরভূম জিলায় অবস্থিত। কিন্তু এই রম্য তীর্থের বিষয় বাঙ্গালায় অনেকেই অবগত নহেন। পঞ্জিকায় তীর্থ-তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে সত্য; কিন্তু বক্রেশ্বরে তীর্থযাত্রীর বহুল্য নাই। এই পরম রমণীয় তীর্থ আমাদের গৃহদ্বারেই অবস্থিত, অথচ কোন্ পথ দিয়া তথায় যাইতে হয় তাহা আমরা অনেকেই অবগত নহি। বহু দিন হইতে আমার হৃদয়ে এই তীর্থপরিদর্শনের বাসনা লুক্কায়িত ছিল। সময় ও সুযোগের অভাবে সে ইচ্ছা এত দিন অপূর্ণ ছিল। বিগত ১৭ই আশ্বিন, ১৩১৮, আমার ভাগ্যে এই তীর্থপরিদর্শন ঘটিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অণ্ডাল-সিন্থিয়া ব্রাঞ্চ লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশন হইতে বক্রেশ্বর যাওয়াই সুবিধা। কারণ দুবরাজপুর হইতে বক্রেশ্বর ৪।৫ মাইলের অধিক দূর নহে; পথও পাকা—সুগম। কিন্তু দুবরাজপুরে অশ্বযানের একান্ত অভাব; তবে গোযান যখন তখন পাইবেন এবং দুবরাজপুরে আশ্রয়স্থানও মিলিতে পারে।

আমি কিন্তু সিউড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অশ্বযানে বক্রেশ্বর গমন করিয়াছিলাম। সিউড়ী দূরত্বে দুবরাজপুর হইতে দ্বাদশ মাইল। সিউড়ী হইতে বক্রেশ্বর দশ মাইল মাত্র। যাতায়াতের ভাড়া ৪৲ টাকা। সিউড়ীতে অশ্বযানের অভাব নাই।

সিউড়ী হইতে পশ্চিমে অনিন্দ্যসুন্দর রাজপথ বক্রেশ্বরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ৯ মাইল দূরে অবস্থিত তাঁতিপাড়া নামক গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নামক নদীতীরে বক্রেশ্বরতীর্থ। আমি সিউড়ীতে এক রাত্রি বাস করিয়া ১৭ই আশ্বিন বুধবার, একাদশী তিথির অরুণরাগরঞ্জিত প্রভাতে পুণ্য তীর্থ বক্রেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, তাই প্রভাতে প্রকৃতির শোভা স্নিগ্ধমধুর। প্রফুল্ল চিত্তে বারিপাতস্নিগ্ধ শারদ প্রভাতের হরিত প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে শকটারোহণে গমন করিতে লাগিলাম। সিউড়ী সহর অতিক্রম করিয়াই প্রথমে সুনীল গগনে বিরাট ইন্দ্রধনুর অপূর্ব্ব শোভা আমার চিত্ত হরণ করিল। আমার মনে পড়িল,—

হে প্রকৃতি! একি হেরি! কে তোমায় রয়েছি ঘেরি,
মেঘে সৌদামিনী - শৈলে ইন্দ্রধনু-হার।
স্বর্ণে শিখিপুচ্ছ নব,—সেখানে যে সে বিভব!
নয়নে পলক মোর, পড়িবে কি আর।

আশ্বিন মাস। শরতের শ্যামল প্রকৃতি মেঘালোকে উজ্জ্বলমধুরে মিশিয়া হরিত মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে দিগন্তবিস্তৃত শস্যপূর্ণ প্রান্তর দিগবলয়চুম্বিত অরণ্যানী পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভাতপবনে তরঙ্গায়িত হইতেছে। ধান্য-ক্ষেত্রের এখন অপূর্ব্ব শোভা এক বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে অসংখ্য প্রস্ফুটিত রক্ত কোকনদ-শোভিত কুমুদকহ্লারখচিত সরোবরসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। বীরভূম প্রদেশের ন্যায় সরোবরশোভা বাঙ্গলায় অন্যত্র দুর্লভ। যে দিকেই নেত্র-পাত কর দেখিবে, বিশাল সরোবরসমূহের স্বচ্ছ দর্পণবৎ জলরাশি সূর্য্যকিরণে চল চল করিতেছে। কূলে কূলে শ্বেত বলাকাশ্রেণী বিচরণ করিতেছে। নানাবিধ জলচর ও বনপক্ষীর কাকলীকোলাহলে আকাশ মুখরিত। কোথাও হরিততৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে গোমহিষাদি পশুকুল নবীন তৃণ ভক্ষণে ব্যাপৃত; কেহ বা বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ান হইয়া রোমন্থনে পরিতৃপ্ত হইতেছে।

এ প্রদেশে নারিকেল বৃক্ষ বিরল; প্রায়ই দেখা যায় না। তবে খর্জ্জুর ও তাল তরুশ্রেণীর দৃশ্যে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে। স্থানে স্থানে খর্জ্জুরতাল-বনবেষ্টিত পুষ্করিণী। আবার কোথাও গ্রামপ্রান্তে তাহাদের মালিকার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ শোভা বড়ই মনোমোহন। প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিলে একটি গ্রামের সন্নিকটে পথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি নিবিড় জটাজূটবিলম্বিত বটতরুর ছায়াশীতল চিত্তানপথ (Avenue) কি মনোরম! সেই স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিয়া লইলাম।

আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি ঘনসন্নিবিষ্ট আম্রকাননে বহুকালের পুরাতন একটি শৈবালমণ্ডিত মসজিদ দেখিলাম। এই জীর্ণ—ভগ্ন ভজন-মন্দিরে এখন আর নিয়মিত উপাসনা হয় না; তবে কখন কখন পরিশ্রান্ত পথিক বা ফকির বিশ্রামার্থ এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।

পথের ধারে একটি পাদপের শোভা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। বৃক্ষটি যেন হরিহরমূর্ত্তি। ইহার অর্দ্ধাংশ অশ্বত্থ অপরার্দ্ধ তিন্তিড়ী পল্লবে

সে স্থান মহাশ্মশান। পুণ্যভূমি বারাণসী মহাশ্মশান; পুণ্যক্ষেত্র বক্রেশ্বরও মহাশ্মশান। এই শ্মশানের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

কুণ্ড।

এই স্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ বিরাজিত। এই সকল কুণ্ডের মধ্যে কতকগুলির জল অত্যন্ত উষ্ণ। ভূগর্ভ হইতে প্রস্রবণ মৃদু বেগে উত্থিত হইতেছে বলিয়া জলের উপরিভাগে অসংখ্য বুদ্‌বুদ সৃষ্ট হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে ক্রমাগত বুদ্‌বুদ্ হইতেছে ও মিশাইতেছে। কেবলমাত্র যে বুদ্‌বুদ উত্থিত হইতেছে তাহা নহে; কয়েকটি কুণ্ড হইতে ঘন ঘনাকারে বাষ্প উত্থিত হইতেছে ও গন্ধকের গন্ধ নির্গত হইতেছে। সম্ভবতঃ কুণ্ড-গুলির অধোদেশে ভূগর্ভাভ্যন্তরে গন্ধকের খনি বিরাজিত। প্রায় সমস্ত কুণ্ডই বক্রেশ্বর নদীগর্ভে অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গদেশের আর কোন তীর্থস্থানে (এক রাজগৃহ ব্যতীত) এতগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ দৃষ্ট হয় না। মুঙ্গেরে একমাত্র সীতাকুণ্ড। সেই উষ্ণপ্রস্রবণই অনেকের নিকট সমধিক সুপরিচিত। কিন্তু বক্রেশ্বরের ও রাজগৃহের প্রস্রবণসমূহের বিষয় অনেকেই বিদিত নহেন।

কুণ্ডের সংখ্যা সর্ব্বসমেত আটটি। (১) ক্ষার কুণ্ড (২) ভৈরব কুণ্ড (৩) অগ্নি কুণ্ড (৪) সৌভাগ্য কুণ্ড (৫) জীবিত কুণ্ড (৬) ব্রহ্ম কুণ্ড (৭) শ্বেতগঙ্গা (৮) বৈতরণী। এতদ্ভিন্ন সূর্য্য কুণ্ড নামক আরও একটি কুণ্ড আছে। কিন্তু পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই।

উপরোক্ত অনেক কুণ্ডেরই জল যে উষ্ণ তাহা নহে। কতকগুলিতে শীতল জল বর্ত্তমান। শ্বেতগঙ্গা নামক কুণ্ডের অর্দ্ধাংশ শীতল ও অর্দ্ধাংশ উষ্ণ; বড়ই বিচিত্র।

এই সকল কুণ্ডে স্নান করিয়া পূজাতর্পণ প্রভৃতি সম্পন্ন করিলে অসীম পুণ্য সঞ্চিত হয়। তীর্থধামের চিরপ্রথানুসারে প্রত্যেক কুণ্ডেরই মাহাত্ম্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক কুণ্ডেরই স্নান করিবার স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। পাণ্ডাগণ স্নান করাইবার সময় তীর্থযাত্রীকে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া থাকেন। কোন কুণ্ডেই স্নান করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কারণ, অগ্নিময় জলে স্নান করিবার শক্তি আমার কোথায়? আমি কেবলমাত্র পাপহরা নদীর উপকূলে বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণে উষ্ণ নীর স্পর্শ করিয়া, শ্বেতগঙ্গার জল স্পর্শপূর্ব্বক বক্রেশ্বর নদীতে গিয়া স্নান সমাপ্ত করিলাম।

এই স্থানের পাপহরা নদী বিখ্যাত। ইহার সলিল ধূমাকীর্ণ ও অগ্নিময়।

যেন অগ্নিতরঙ্গময়ী বৈতরণী। অপর প্রান্তে সৈকতভূমিতে প্রজ্বলিত চিতানলে একটি শব ভস্মীভূত হইতেছিল। উষ্ণতোয়া পাপহরা পুণ্য নদীর কূলে বসিয়া আমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত আত্মবিস্মৃত হইলাম—জীবনের তুচ্ছ সুখদুঃখ বিলাসভোগ ও ঐশ্বর্য্যতৃষ্ণার নশ্বরত্ব ক্ষণকালের জন্য আমার অজ্ঞান চিত্তে উপলব্ধি করিলাম। ঐ ত আমার সম্মুখেই একটি মানবদেহ ভস্মে মিশাইয়া গেল। উহার সবই ত পড়িয়া রহিল। কে তাহার মহাপথে চিরসাথী হইল?—কে যেন অন্তর শিহরিত করিয়া বলিল—আবার কে? জন্মার্জ্জিত কর্ম্মই তাহার চিরসঙ্গী। আবার কে? আমি পাণ্ডার সাহায্যে নিম্নলিখিত মহাস্তোত্র আবৃত্তি পূর্ব্বক নদীকূল পরিত্যাগ করিলাম;—

ওঁ ত্রিকুণ্ডে নিঃসৃতে দেবি রৌদ্রবিবেককারিণি।
নাম্না পাপহরাণি ত্বং মম পাপহরা ভব: ॥
যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে কৌমারেচান্তিমে কৃতং।
তৎ সর্ব্বং হরং মে দেবি নমঃ পাপহরেঽম্বিকে ॥
নমঃ পাপহরে দেবি দেবলোকোক্তি বিশ্রুতে।
ত্বয়ি স্নানেন দানেন পাপং মে যাতু সংক্ষয়ং ॥
জন্মকোটি সহস্রেণ যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং।
তন্নাশয়িত্বা মাং পাহি হরবক্রেশ্বরপ্রিয়ে ॥

শ্মশান।

এই বক্রেশ্বর নদীকূলে শ্মশান। অনেকে এই শ্মশানকে মহাশ্মশান বলিয়া থাকেন। এ শ্মশানেও অসংখ্য নরনারীর মুণ্ড অস্থি ও খর্পর লুণ্ঠিত হইতেছে। এই স্থানে নগরের কোলাহল হইতে অতি দূরে অবস্থিত নির্জ্জন নদীকূলে ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে বহু গ্রামের শবদাহ হইয়া থাকে; এমন দিন নাই, যে দিন অন্যূন দশটি মৃতদেহের সৎকার না হইয়া থাকে। পাঠক পাঠিকা তারা পীঠের মহা-শ্মশানের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন। এ স্থলে তাহার অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এই শ্মশানে পাপহরা নদীর কূলে একটি অঘোরপন্থী যোগীর কুটীর। যোগী এই কুটীরে একাকী বাস করিয়া যোগসাধনা করিয়া থাকেন। যোগীবর কোথায় গিয়াছিলেন; আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই।

সমাধি।

শ্বেত গঙ্গার উত্তরে উচ্চ টিলার উপর মালগিরি; গিরি গোস্বামী নামক জনৈক সাধুর সমাধি মন্দির। এই স্থলে অক্ষয় বট বৃক্ষ অবস্থিত। বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য

বটে; কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহা পুরীর বিমলা দেবীর মন্দিরের অনুরূপ। যাহা হউক ভগবান্ বক্রেশ্বরের মন্দির গাম্ভীর্য্যহীন নহে। এই মহাদেব মহর্ষি অষ্টাবক্রেরই স্থাপিত। পূজার সময় দেবাদিদেবকে অষ্টাবক্রেশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। এই তীর্থের অপর নাম গুপ্ত কাশী।

বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণের সময় মন্দিরের উত্তরপূর্ব্বকোণে ক্ষোদিত। সেই অংশটি রাজনগরের রাজমন্ত্রী দর্পনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৬৮৫ সালিবাহন (খৃঃ ১৭৬১) সালে বিনির্ম্মিত। মন্দিরের পূর্ব্বপ্রান্তে ভিতরের প্রাচীরগাত্রের একটি প্রস্তরফলকে হালর্ম্মা ও আরব নামক দুই ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়। অপর একটি প্রস্তরের ফলকে ১৬৭৭ বা (খৃঃ ১৭৫৫) সাল লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন যাহা লিখিত আছে তাহা সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। পাঠক ইহা হইতেই বক্রেশ্বরের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিয়া লউন।

দ্রষ্টব্য স্থানাদির বিবরণ।

বক্রেশ্বরে আসিয়া প্রথমতঃ বক্রেশ্বর নদীতে কিম্বা কোন একটি পুণ্য কুণ্ডে স্নান করিয়া বক্রেশ্বর দর্শন করিতে হয়। মন্দিরের বর্ণনা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান্ বক্রেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একটু নিম্নে ভূগর্ভে নামিয়া যাইতে হয়। দর্শক প্রথমে দেখিবেন, একটি পিত্তল-নির্ম্মিত গোলাকার পেনেটের মধ্যস্থলে পিত্তল-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ। লিঙ্গের মস্তকে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। তদুপরি জল কিম্বা দুগ্ধ ঢালিলে কতকাংশ ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পার্শ্বস্থিত জল-প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যায়। উক্ত পিত্তল-নির্ম্মিত লিঙ্গের পশ্চাদ্-ভাগে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ বিরাজিত। ইহাই বক্রেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি। ইহা প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় না; পাণ্ডা মহাশয় বলিয়া দিলে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া জানিতে পারিলাম। আমার বোধ হইল যে, এই মূর্ত্তি বৈদ্যনাথের মূর্ত্তির অনুরূপ; তবে উপরিভাগ সাধারণ শিবলিঙ্গের ন্যায়—বৈদ্যনাথের মত চেপ্টা নহে।

মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মহাভূমি পীঠভূমি। ইহা ভারতবর্ষের একপঞ্চাশৎ মহাপীঠের অন্যতম। এই স্থানে দেবীর ভ্রূমধ্য পতিত হয়। এই পুণ্যক্ষেত্রে মহাদেবী মহিষমর্দ্দিনীরূপে বিরাজ করিতেছেন। পীঠভূমির উপর কোন এক ভক্ত মহাপুরুষ অষ্টধাতুনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। বীরভূমের মহাপুণ্যময় পঞ্চপীঠের মধ্যে এই স্থানেই আমি

জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে দর্শন করিলাম। অন্য কোন পীঠস্থানে মূর্ত্তি দেখি নাই।

পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র মন্দিরপ্রকোষ্ঠে ভৈরব বক্রনাথ অবস্থান করিতেছেন। মহাবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে ছিন্নভিন্ন হইবার পর যে যে স্থান জগদম্বার দেহাংশ-পতনে পীঠরূপে পরিণত সেই সেই স্থানেই ভোলানাথ মহেশ্বর ভৈরবরূপে বিরাজিত। প্রেমের এরূপ জলন্ত নিদর্শন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর পরিলক্ষিত হয় না। মহাগর্ভে নামিয়া বক্রনাথের দর্শন ও পূজা করিতে হয়। বক্রেশ্বর ও বক্রনাথ দুইটি স্বতন্ত্র শিবলিঙ্গ।

বক্রেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ প্রাচীন শিবমন্দিরমালার শোভা বিচিত্রদর্শন। মন্দিরসংখ্যা তিনশতাধিক হইবে। গত শতাব্দীতে ধনাঢ্য তীর্থযাত্রিগণের দ্বারা এই সকল শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বক্রেশ্বরের আরাধনা করিয়া যাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছিল তাঁহারাই মন্দিরস্থাপনা করিয়াছিলেন। মন্দিরগুলি কিন্তু আকারে বৃহৎ নহে। প্রত্যেকটিতেই এক একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত। কোন কোন মন্দির হইতে দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু এই মহাস্থানের মহাগাম্ভীর্য্য দেখিয়া বোধ হয় যে, শূন্যমন্দিরে দেবপ্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। অকস্মাৎ কবিগুরু মধুসূদনের গম্ভীর বাণী দৈব বাণীর ন্যায় আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল,

> "দেবশূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবসে
> দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।"

মন্দিরগুলির সংস্কার বহুকাল হয় নাই; হইবে কি না তাহাও বলা যায় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাকৃতিক উৎপাত সহ্য করিয়া তাহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি শ্যামল শৈবালে সমাচ্ছন্ন; কতকগুলির উপরিভাগ তৃণাবমণ্ডিত; কতকগুলির শিরোদেশ গুল্মলতাসমাবৃত। মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ণ গলির ন্যায় পথ গিয়াছে। প্রত্যেক মন্দিরের ব্যবধান অপর একটি মন্দির হইতে যৎসামান্য। মন্দিরগুলির অতি প্রাচীন ও জীর্ণ দশা দেখিয়া মিষ্টার ব্রাইন এই স্থানটিকে সে কালের প্রাচীন য়ুরোপীয় সমাধি-ক্ষেত্রের সহিত তুলিত করিয়াছেন। বাস্তবিক এই নির্জ্জন তীর্থভূমি গাম্ভীর্য্য-বৈচিত্র্যে মহাসমাধিরই সহিত তুলনীয়। শব হইতে শিব, সে শিব যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তাহাই মহা সমাধি মন্দির—সে মন্দির যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত

নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, এই সমাধিস্থানের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে ও তাহার প্রলেপ প্রদান করিলে কঠিন শূলরোগ আরোগ্য হয়। ঔষধ গ্রহণের সময় গোসাঞী প্রভুর নিকটে একটি ডোর কৌপীন মানসিক করিয়া সমাধির উপরে প্রদান করিতে হয়। এই গোসাঞী প্রভু দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বক্রেশ্বর তীর্থে বাস করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ যে,—যোগীবর বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে সমাধি লাভ করিয়া কাশীধামে পুনরাবির্ভূত হয়েন এবং ঘটনাক্রমে তথায় বক্রেশ্বরনিবাসী কয়েকটি পাণ্ডাকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি আদেশ করেন—আমি শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর ক্ষেত্রে সমাধি গ্রহণ করিয়াছি; তোমরা সেই সমাধির উপর একটি শিবলিঙ্গ অচিরে স্থাপিত করিবে। তিনিই ঐ পাণ্ডাদিগকে তদীয় সমাধির মৃত্তিকা ভক্ষণ ও প্রলেপের দ্বারা নিদারুণ শূলপীড়া আরোগ্যের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। শুনিলাম, এই স্থানে আসিয়া অনেক শূলগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

গুহা।

পূর্ব্বলিখিত মহিষমর্দ্দিনী দেবীর মন্দিরের নিকট একটি ক্ষুদ্র গুহা অবস্থিত। বহুকাল পূর্ব্বে দুখিয়া গিরি নামক জনৈক যোগী এই গুহায় বাস করিয়া যোগসাধনা করিতেন। গুহাটি দৈর্ঘ্যে চারি হস্ত, প্রস্থে আড়াই হস্ত, এবং ঊর্দ্ধেও আড়াই হস্তের অধিক নহে। ইহার প্রবেশদ্বার ঊর্দ্ধে দেড় হস্ত, প্রস্থে এক হস্ত মাত্র।

ভৈরব বেদী।

শ্বেতগঙ্গার পশ্চিমোত্তর কোণে ভৈরব বেদী। একটি প্রাচীন সুদীর্ঘ শাল্মলী তরুমূল পরিবেষ্টিত করিয়া অনুচ্চ গোলাকার বেদী নির্ম্মিত। বৃক্ষতলে ভৈরবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই স্থলে অপর একটি নিম্বতরুর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বটবৃক্ষ।

শ্বেতগঙ্গার অপর প্রান্তে বিশাল বটবৃক্ষ অবস্থিত। এই তরুরাজই অক্ষয় বট। ইহার মস্তক হইতে শতসহস্র স্থূল জটা বিলম্বিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তরুতল সুশীতল ছায়াময়। পূর্ব্বে অনেক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এই তরুতলে সংস্থাপিত ছিল, কিন্তু কালবশে সকলই জটাজূটে আবৃত হইয়া এক্ষণে লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

কালীবেদী।

এই স্থানে কালীপূজার জন্য একটি চতুষ্কোণ অনুচ্চ বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বেদীতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক মহাকালীর পূজা হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বক্রেশ্বর ধামের অপর দ্রষ্টব্যের মধ্যে তিনটি পুষ্করিণীর বিষয় উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীধাম প্রবেশের পথের বামপার্শ্বে সাতফুলী, চন্দ্রসায়ের ও দামুসায়ের নামে সুবৃহৎ পুষ্করিণীত্রয় অবস্থিত। দক্ষিণে পূর্ব্বোক্ত নবনির্ম্মিত কালীবাড়ী। পুষ্করিণীর নীর শ্যামল শৈবালে সমাচ্ছন্ন। আমার বোধ হয়, দীর্ঘকাল ইহাদের পঙ্কোদ্ধার হয় নাই।

এই নির্জ্জন তীর্থভূমি বৎসরে দুইবার লোককোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকে। মাঘ মাসে বীরভূমি কেন্দুবিল্বে মহাকবি জয়দেব গোস্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ মহা মেলা হয়। সেই সময় শতসহস্র তীর্থযাত্রী ও মেলাদর্শনার্থী পুণ্যক্ষেত্র বক্রেশ্বরে আসিয়া মহাদেবকে দর্শন করেন। ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশীর সময় এই স্থানে যাত্রীর জনতা বর্ণনাতীত। সেই সময় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি দূর স্থান হইতেও ব্যবসায়ী আসিয়া এই স্থানে দোকানপাট খুলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বৎসরের অপর সমস্ত সময় গুপ্তকাশী বক্রেশ্বরধাম জনশূন্য।

এই তীর্থস্থান দেখিয়া আমার এইরূপ অনুমান হয় যে, এমন এক দিন ছিল যখন এই তীর্থস্থানে প্রত্যহ বহু যাত্রী সমাগত হইয়া শিবার্চ্চনা করিতেন। তখন লোকের চিত্তে ভক্তি ছিল, তাই অনেকের মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত শিবমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এক্ষণে সে মহতী ভক্তি আর নাই—লোকের দুর্দ্দশাও তদনুরূপ। শিবস্থাপনা বর্ত্তমান কালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে—আর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হয় না। পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি সংস্কারাভাবে জীর্ণ দশায় উপনীত। বহু শিবলিঙ্গের মস্তকে বিল্বজলও নিক্ষিপ্ত হয় না।

আমি পূজা প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া অপরাহ্ণে শিউড়ী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্তার।*

যে রাজনীতিবিশারদ ব্রাহ্মণ এ দেশে বিষয়বুদ্ধিবিজ্ঞ জনের আদর্শ সেই চাণক্য বলিয়াছেন, বিদ্বানের সহিত রাজার তুলনা হয় না; রাজা স্বদেশে পূজিত—বিদ্বান সর্ব্বত্র সম্পূজিত। এ কথা ভারতের প্রাচীন হিন্দুরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন বোধ হয় জগতে আর কোথাও কোন সম্প্রদায় সেরূপ বুঝেন নাই। তাই ভারতে যে সম্প্রদায় পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিদ্যাচর্চ্চা ও বিদ্যাবিতরণই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, ভারতের সামাজিক বিভাগে সেই সম্প্রদায়ের স্থান সর্ব্বোচ্চে। ভারতে ব্রাহ্মণগণ সদর্পে বলিতে পারেন, তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কোন পূর্ব্ব-পুরুষ মূর্খ ছিলেন না। এ দর্প জগতে আর কে করিতে পারে? তখন ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাবিতরণ জীবনের ব্রত করিতেন, নৃপতিরা তাঁহাদিগের বিদ্যাবিতরণের সুবিধা করিয়া দিতেন,—ধনীরাও তাঁহাদিগকে আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ দিতেন—যেন ধনাভাবে—সংসারের দুর্ভাবনায় তাঁহাদিগের বিদ্যাদানকার্য্যে ব্যাঘাত না ঘটে। ভারতে এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষ জ্ঞানে জগতে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানমন্দিরে যে আলোকশিখা জ্বালাইয়াছিলেন, রাজনৈতিক ঝটিকায়ও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একদল অগ্নিহোত্রী; জ্ঞানাগ্নিবিষয়ে ভারতে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্রী।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে দেশে পূর্ব্বে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল—এখন সেই দেশই ক্রমে অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুর্দ্দশাও বাড়িতেছে। আমরা যে সর্ব্ববিষয়েই জগতের অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইতেছি শিক্ষার অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। ইংলণ্ডের, জার্ম্মানীর ও আমেরিকার বিষয় বিবেচনা করিলে এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সুব্যবস্থা না হইলে আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে না—ঘুচিতে পারে না।

এক্ষণে দরিদ্রের সহিত ধনীর ও এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সহানুভূতির অভাবে হিন্দু সমাজে শিক্ষাবিস্তারকার্য্য পদে পদে বাধা পাইতেছে।

* সর্ব্ববঙ্গ হিন্দুশিক্ষাসম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

পূর্ব্বে রাজারা, ধনবানগণ, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এই শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে সহায়তা করাতেই ইহার উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিস্তারে কিছু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এবার সম্রাট স্বীয় সাম্রাজ্যপরিভ্রমণ স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার জন্য—শিক্ষাবিস্তারে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে সরকারী সাহায্যের মাত্রা বাড়িবে—এ আশা অবশ্যই করা যায়। কেনই বা করিব না?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেকালে হিন্দু সমাজে অর্থশালীরা শিক্ষকদিগকে অর্থসহায্য করিতেন। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে গৃহে রাখিয়া—আহার্য্য ও শিক্ষা দান করিতেন। তখন শিক্ষাদান ব্যবসায়—অর্থাগমের উপায় ছিল না; পরন্তু জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি হইতে উৎপন্ন পরার্থে আত্মোৎসর্গের নামান্তরমাত্র ছিল। সেই উচ্চ আদর্শের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে, অশিক্ষিতদিগকে শিক্ষাদান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য; যাঁহারা অর্থশালী তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে, শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিয়া সমাজের উন্নতিসাধনে সহায়তা না করিলে তাঁহারা কর্ত্তব্যচ্যুত হইবেন।

আজ বঙ্গদেশে বিশ লক্ষ হিন্দু বালক অশিক্ষিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। ইহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সমাজের পঙ্গুত্ব ঘুচিবে না—জাতীয় উন্নতির উপায় নাই। কিন্তু ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার উপায় কি? সকল সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। আমরা যদি ব্যক্তিগত, বর্ণগত ও শিক্ষাগত সকল প্রভেদ ভুলিয়া একযোগে কার্য্য করিতে পারি, তবেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। যাহাতে জাতীয় উন্নতি হইবে, সে কার্য্যে কি আমরা একযোগে রত হইতে পারিব না? যদি না পারি, আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ—জীবন বৃথা।

য়ুরোপে শিক্ষাবিস্তারব্যাপারে দেখা যায়—তথায় সকলকেই শিক্ষিত করিতে আন্তরিক চেষ্টা সপ্রকাশ। তথায় ধনীরা অর্থসাহায্য দিয়া, শিক্ষিত-গণ ও ধর্ম্মযাজকগণ চেষ্টা করিয়া সমাজের সকল স্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাহারই ফলে য়ুরোপের উন্নতি। আর তাহারই অভাবে আমাদের অসীম দুর্দ্দশা।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বলিয়াছেন, সহানুভূতি ভারতে ইংরাজ-শাসনের মূলমন্ত্র হইবে। আমরা কি এমনই সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়াছি যে, আমাদিগের

স্বদেশবাসীদিগকে সহানুভূতি দিতে কুণ্ঠিত হইব? আশা করি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদর্শ স্মরণ করিয়া, আমরা সর্ব্ববিধ স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া মানুষের মত কায করিতে অগ্রসর হইব।

বলা বাহুল্য সমাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কি উপায়ে বর্ত্তমান কালে শিক্ষাবিস্তারের সুবিধা, তাহা বিবেচনা করিয়া অবস্থার উপযোগী উপায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে। মহকুমায় মহকুমায় স্থানীয় সমিতি সংগঠিত করিয়া স্থানীয় অবস্থা অবগত হইতে হইবে। কোন্ গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের কিরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত, তাহা বুঝিয়া স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা—স্থানীয় অবস্থার উপযোগী উপায়—অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া আসিবে।

মূল সভা, মহকুমায় অবস্থিত শাখাসমিতি ও পল্লীসমিতি একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গরূপে কার্য্য করিয়া একই উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—সহানুভূতি ব্যতীত এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না—হইতে পারে না। তাই আমি আমার স্বদেশীয় শিক্ষিত ও ধনশালী ব্যক্তি মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছি, এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া —পরামর্শ দিয়া, কার্য্য করিয়া. ধন দিয়া তাঁহারা জাতীয় উন্নতির উপায় করুন,—যে মহা যজ্ঞের আয়োজন হইতেছে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া, দেশবাসীকে তাহার ফলভোগ করিয়া ধন্য হইতে দিন। যেরূপ শিক্ষাবিস্তারে ভারতবর্ষ এককালে সভ্যতায় ও সমৃদ্ধিতে প্রধান ছিল—যেরূপ শিক্ষাবিস্তারে য়ুরোপ ও আমেরিকা আজ প্রধান্য লাভ করিয়াছে—সেইরূপ শিক্ষাবিস্তারে আমরাও যে আবার উন্নত হইতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আশায় ও সেই উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশা করি, বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই ইহাতে যোগদান করিবেন।

আমি সকল সম্প্রদায়কেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান ও অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা শিক্ষা দিবেন, তাঁহারা যেমন সাগ্রহে শিক্ষাদান করিবেন, যাঁহারা শিক্ষার্থী তাঁহাদিগকেও তেমনই আগ্রহসহকারে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মেঘ যে বারিবর্ষণ করে উদ্ধত ও উন্নত গিরিশৃঙ্গ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু নিম্নভূমিতে যে তড়াগ সেই বারিগ্রহণের আশায় বুক পাতিয়া থাকে, তাহারই বক্ষে সে বারি সঞ্চিত হয়। শিক্ষার্থী

যদি শিক্ষালাভ করিবার জন্য ব্যাকুল না হয়েন, তবে শিক্ষাবিস্তারকার্য্য সম্পূর্ণ হইতে বিলম্ব অনিবার্য্য। দুঃখের বিষয়, আজকাল হিন্দু সমাজে চারিদিকেই যে অবসাদ লক্ষিত হইতেছে, শিক্ষালাভপ্রয়াসেও তাহা দেখা যাইতেছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও এ বিষয়ে যে আগ্রহ লক্ষিত হইত, এক্ষণে যেন তাহা মন্দীভূত হইয়াছে। তখন দরিদ্র পিতা ধনীর দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও পুত্রের শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহে সচেষ্ট হইতেন; দরিদ্র পুত্রও পরের ঘরে দয়াদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। এইরূপ দারিদ্র্যের মধ্যে—বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া উত্তরকালে বিদ্যাগুণে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প নহে। এখন আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে এইরূপ আগ্রহ—এইরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা—এইরূপ একাগ্রসাধনার সঙ্কল্পের অভাব নিতান্তই বেদনার কারণ। ফলে যে সকল সম্প্রদায়ে মূর্খ ছিল না বলিলেই হয়, সে সকল সম্প্রদায়েও নিরক্ষরের বাহুল্য ঘটিতেছে। এ অবস্থান্তর যে কিরূপ শোচনীয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আমি পূর্ব্বে শিক্ষার্থীদিগকে তড়াগের সহিত তুলিত করিয়াছি। তড়াগ যেমন মেঘবর্ষিত বারি লাভ করিয়া তাহা পরার্থে ব্যয় করিয়া জীবের অশেষ কল্যানবিধান করিয়া থাকে—শিক্ষা লাভ করিয়া অপরকে শিক্ষাদানে উপকৃত করাই তেমনই শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তব্যচ্যুত হইবেন—দেশে শিক্ষাবিস্তারেও বহু বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটিবে।

পূর্ব্বকালে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণগণ বিনাব্যয়ে বিদ্যাদান করিতেন। ভারতে বৌদ্ধগণও এই আদর্শভ্রষ্ট হয়েন নাই; পরন্তু তাঁহাদিগের ভিক্ষুগণ ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে অবাধে শিক্ষাদান করিতেন। আজিও ব্রহ্ম প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধান স্থানে বিহারে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজাধিকারের পরও দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন;—একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,—আর একজন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা দুইজন সরকারী শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিয়া এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাহাতে বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সুখের বিষয়, এখন আবার প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হইতেছে এবং একাধিক স্থানে সকল বালককেই প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহাতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা

হয়, সে পক্ষে চেষ্টা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থমাত্রকেই বালকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। এ দেশে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে—প্রতীচ্য প্রথায় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে নবদ্বীপাদি শিক্ষাকেন্দ্রে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তখনও অন্যান্য বর্ণের মধ্যে শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং অন্যান্য বর্ণের বহু ব্যক্তি উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে সর্ব্ববিধ বাধা অতিক্রম করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে যখন শিক্ষালাভের পথ বহুপরিমাণে সুগম হইয়াছে তখন তাঁহারা কেন শিক্ষালাভে সচেষ্ট না হইবেন? পূর্ব্বে তাঁহারা শিক্ষাবিস্তারের জন্যও যে চেষ্টা করেন নাই, এমন নহে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের জন্য যেমন বিপুল অর্থ দিয়াছিলেন—মতিলাল শীল মহাশয় তেমনই ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিপুল অর্থ দিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, এখন আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একযোগে দেশে শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে মনোযোগী হইবেন। শিক্ষা ব্যতীত আমাদের উন্নতির উপায় নাই—শিক্ষার অভাবে আমাদের দুর্দ্দশা বর্দ্ধিত হইতেছে—ইহা বুঝিয়া সকলে সমবেত চেষ্টায় এই অনুষ্ঠান সফল করিতে সচেষ্ট হইবেন। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি নাই। আমরা যদি সত্য সত্যই কায়মনোবাক্যে দেশে এই শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে সচেষ্ট হই—যদি আমাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিয়া উন্নতির উপায়বিধান করিতে প্রয়াস পাই—তবে এ অনুষ্ঠান অচিরে সফল হইবে এবং আমাদের দুর্দ্দশার অমানিশাশেষে উন্নতির দিবালোকবিকাশে অধিক বিলম্ব হইবে না।

ইহার জন্য আমাদিগকে শিক্ষার প্রয়োজন বুঝিতে হইবে; বুঝিতে হইবে, শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির অন্য উপায় নাই; বুঝিতে হইবে, এ কার্য্য সমাজের—সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না; আর বুঝিতে হইবে, উদার ও অবাধ সহানুভূতি ব্যতীত এই সমবেত চেষ্টা সফল হইবে না। বর্ণগত, শিক্ষাগত, অর্থগত সর্ব্ববিধ বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া আমাদিগকে এই কার্য্যে যোগ দিতে হইবে, যাঁহার যেরূপ সাধ্য তাঁহাকে সেইরূপ সাহায্য দান করিতে হইবে। কাহারও ঐকান্তিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। আমরা সমবেত চেষ্টায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অচিরে সাফল্য লাভ করিতে পারিব। তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অবসান হইবে—ভবিষ্যৎ উন্নতির

পথ সুগম হইবে—আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত নষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধার করিয়া ধন্য ও জগতে সমাদৃত হইতে পারিব।

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ।

বসন্তের উপহার।

আজ অন্তরে মম জাগিছে কেবল
তোমার মূরতিখানি ;
যেন পশিছে শ্রবণে সঙ্গীত সম
তোমার অতুলবাণী।
আমি হৃদয়ে তোমায় ভকতি-অর্ঘ্য
কতই ত করি দান ;
তবু জাগ্রত থাকে আকুল বাসনা,
তৃপ্ত হয় না প্রাণ।
তাই শোভা-মণ্ডিত নব বসন্তে
আকুল তৃষিত চিতে,
প্রভো, রচিয়া মাল্য নূতন পুষ্পে
এসেছি তোমারে দিতে।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

চন্দ্রদ্বীপ।

বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। দুঃখের বিষয় যে চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতিত্বে, শৌর্য্যে ও বিদ্যাচর্চ্চায় আজিও আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি; দুর্দ্ধর্ষ মগ ও ফিরিঙ্গীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমানাধিকারেও যে স্থান প্রায় তিন শত বর্ষ বাঙ্গালার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙ্গালীর বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছিল সেই প্রসিদ্ধ বার ভূঁইয়ার অন্যতম চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের পরিচয় ও চন্দ্রদ্বীপের অবস্থানাদি অনেকেই অবগত নহেন।

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস।

সেনবংশীয় রাজা দনৌজমাধবের রাজত্বের পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ আছে। যথা—

(১) সেনবংশীয় রাজা দনৌজমাধবের গুরু চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী ভগবতীর আরাধনা করিতেন। কিন্তু তদীয় পত্নীর নাম ভগবতী হওয়ায় তিনি পত্নীর নাম জপ করেন মনে করিয়া মনের দুঃখে নৌকাযোগে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিতে যায়েন। অনন্তর ভগবতী ধীবর কন্যাবেশে দেখা দিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বলেন এবং বর দেন যে, সেই স্থান শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা হইবে এবং তাঁহার নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া খ্যাত হইবে। এদিকে তদীয় শিষ্য দনৌজমাধব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সমুদ্রে ডুব দিয়া মদনগোপাল ও কাত্যায়নী বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। পরদিন সেই স্থান শুষ্ক হইয়া দ্বীপাকার হয়। তিনি গুরুর উপদেশ অনুসারে তথায় রাজধানীস্থাপন করেন এবং গুরুর নামানুসারে দ্বীপটির নাম চন্দ্রদ্বীপ রাখেন।

(২) তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয় সংগ্রহ করিয়াছেন,—প্রসিদ্ধ চন্দ্র ব্যাকরণপ্রণেতা চন্দ্রগোমীর ইষ্টদেবীর নাম ও পত্নীর নাম এক হওয়ায় তিনি পত্নীত্যাগ করেন। তজ্জন্য তাঁহার শ্বশুর বারেন্দ্রপ্রদেশের রাজা সনাতন চন্দ্রগোমীকে পেটিকাবদ্ধ করিয়া গঙ্গায় ছাড়িয়া দেন। চন্দ্রগোমী গঙ্গাস্রোতে গমন করিয়া সমুদ্রোপকূলে দ্বীপাকারে আবির্ভূত হয়েন, তজ্জন্য সেই দ্বীপটির চন্দ্রদ্বীপ নাম হয়।

(৩) দিগ্বিজয় প্রকাশিকা বিবৃতিতে আছে যে, মহাদেবের ললাটাগ্নিতে জল শুষ্ক হইয়া চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি হয়।

চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রাস্তোয় পূর্ণা চ ভূমিকা।
মহাদেব প্রসাদেন ভস্মা ভূতাহি মৃত্তিকা॥
জলাগ্নিলদাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং সুখ-কারিকা॥
মেঘনা নদী পূর্ব্ব ভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইন্দ্রল পুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে চ সুন্দর বনং।
ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোম কান্তোদ্রি বর্জ্জিতেঃ।
সোম কান্তে চ দ্বৌদেশৌ বিখ্যাতৌ নৃপশেখর॥
জম্বু দ্বীপঃ পশ্চিমে চ শ্রীকারোহি তথোত্তরে।
বাকলাখ্যো মধ্য ভাগে রাজধানী সমীপতঃ॥ (৬২১)।

(৪) এড়ু মিশ্রের কারিকায় আছে,—

চন্দ্র দ্বীপস্য সীমায়াং রত্নাকরো বিরাজতে।
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তস্য চন্দ্রবর্দ্ধতে বপুঃ।
তস্য তদ গুণ যোগেন চন্দ্রদ্বীপ ইতি স্মৃত॥

চন্দ্রবৎ ক্ষয়বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার চন্দ্রদ্বীপ নাম হইয়াছে।

এই সকল প্রবাদের মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না সন্দেহ। বহু প্রাচীন কালে যশোহরের অস্তিত্ব থাকা সত্বেও যেমন প্রতাপাদিত্যের সময় যশাই পাটনীর নামানুসারে যশোহর কিম্বা দিল্লীর যশ হরণ করে বলিয়া যশোহর নামের উৎপত্তি এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তদ্রূপ এক এক সময় চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে এক একটি কথার রচনা হইয়াছিল। দনৌজমাধবের সময় চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি অপ্রমাণসিদ্ধ; যেহেতু দনৌজমাধবের পিতৃব্য মাধবসেনের অধিকৃত দ্বাদশ দ্বীপের মধ্যে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের নাম আছে। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকায় আদিশূরপ্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

জিত্বা চ বৌদ্ধ রাজান স্তথা গৌড়াধিপান্ বলাৎ।
তাম্রলিপ্তীং তথা চন্দ্রদ্বীপং শ্রীহট্ট সংজ্ঞকং॥

(মিশ্রকারিকা)।

আবার আদিশূর জয়ন্তের জামাতা কাশ্মীরাধিপতি জয়াদিত্য গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে তাহার অধীশ্বর করিয়া যায়েন। এই পাঁচজন রাজার মধ্যে সমতট প্রদেশের রাজাও একজন (সাহিত্য ১৭।২) উক্ত প্রমাণানুসারে আদিশূরের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও চন্দ্রদ্বীপ যে একটি রাজ্য ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২য় প্রবাদটিও অভ্রান্ত বলা যায় না; যেহেতু, চন্দ্রগোমীর শ্বশুর বারেন্দ্রদেশের রাজা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক (বাণী ৩।৫) কিন্তু তৎপূর্ব্বেও যে চন্দ্রদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ৩য় প্রবাদের মূলে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে তাহা পরে আলোচিত হইবে। ৪র্থ প্রবাদটির দ্বারা কালনিরূপণ করা যায় না।

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শেষভাগে পুষ্করাধিপ চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করেন। এই সময় চন্দ্রবর্ম্মার নামানুসারে ইহার চন্দ্রদ্বীপ নাম হওয়া অসম্ভব নহে; যেহেতু, তাহার কয়েক বর্ষ পরেই সমুদ্র গুপ্তের সময় সমতট প্রদেশে রাজ্য গঠিত হয় (সাহিত্য ১৭।২)। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানে গুপ্ত-বংশের অধীনে সামন্ত রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন। পরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইহা খড়্গবংশের শাসনাধীন হয়। ইহার পর আদিশূর চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করেন। শূরবংশের পর পালবংশীয় ও সেনবংশীয়-দিগের অধীনে কে কখন্ রাজত্ব করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। ১১৯৯ খৃঃ খিলজী কর্ত্তৃক গৌড়বিজয় হইলে রাজা কেশব সেন তদীয় ভ্রাতা বিক্রমপুরের স্বাধীন রাজা বিশ্বরূপ সেনের আশ্রয় লয়েন। বিশ্বরূপ সেনের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ কেশব সেন কিছুদিন (১২৪৫-১২৫০) রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দনৌজমাধব্ বিক্রমপুরের সিংহাসনারোহণ করেন। দিল্লীশ্বর বলবন মঘিসুদ্দিন তুগ্রিলকে শাসন করিতে যখন আইসেন তখন (১২৮০ খৃঃ) সুবর্ণগ্রামাধিপতি দনৌজমাধব জলপথে দিল্লীশ্বরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সুবর্ণ-গ্রাম মুসলমানাধিকারভুক্ত হইলে তিনি ১২৯০ খৃষ্টাব্দের সমকালে কি তাহার কিছু পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। সেই হইতে চন্দ্রদ্বীপের ধারাবাহিক ইতিহাস কতক পাওয়া যায়।

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যটি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম অংশকে সুগন্ধাপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশকে প্রকৃত চন্দ্রদ্বীপ বলে। সুগন্ধাপ্রদেশ প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের ৭ম পটলে বর্ণিত আছে যে, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ভূভাগ বঙ্গ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও দেবী ভাগবতের মতে গঙ্গা বা ভাগীরথী এবং পদ্মা পৃথক নদী; পূর্ব্বকালে ভাগীরথী বা গঙ্গার সহিত পদ্মার যোগ ছিল না; বরং তখন পদ্মা বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্রনদের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই পদ্মাই তখন নলিনী নামে আখ্যাত ছিল। রামায়ণে (বালকাণ্ড ৪৩শ অধ্যায়) আছে যে, শঙ্কর

ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিন্দুসরোবরের অভিমুখে গঙ্গাকে পরিত্যাগ করেন; তথা হইতে গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হয়েন; হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী এই তিন ধারা পূর্ব্ব দিকে—সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু এই তিন স্রোত পশ্চিম দিকে ও অবশিষ্ট একটি স্রোত মহারাজ ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এই স্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী। কালক্রমে ভাগীরথীর স্রোত (বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া) পদ্মায় মিলিত হইয়াছে। এই নবপ্রবাহিত স্রোত শেষে পদ্মা নামে পরিচিত হয় (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম অধ্যায়) এবং সুগন্ধাপ্রদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান বরিশাল ফরিদপুরাদি পৃথক্ হইয়া পড়ে। পুরাণতন্ত্রাদিতে দেখা যায়, সতী দক্ষালয়ে দেহ-ত্যাগ করিলে তাঁহার দেহ বিষ্ণুচক্রে ৫১ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় এবং প্রত্যেক স্থলে একটি করিয়া পীঠস্থান হয়। তথায় ভগবতীর এক এক অংশ এবং একজন করিয়া ভৈরব আছেন। সুগন্ধা প্রদেশান্তর্গত বর্ত্তমান বরিশাল জিলার শিকারপুর গ্রামে দেবীর নাসিকা পতিত হয়। তথায় দেবী সুগন্ধা উগ্রতারা বর্ত্তমান আছেন। এবং ঝালকাঠীর নিকটবর্ত্তী নকুল্লাপুর গ্রামের দক্ষিণপার্শ্ব-সংলগ্ন শিববাড়ী* গ্রামে ভৈরব ত্র্যম্বক আছেন।† কথিত আছে যে, সৌগন্ধা নদীর এক কূল দেবী অপর কূল ভৈরব। বরিশাল জিলার প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা যায় যে, উক্ত শিববাড়ীর দক্ষিণ অংশে অসংখ্য নদ নদী এবং উত্তর অংশ নদনদী-বিহীন। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, পূর্ব্বকালে শিকারপুর পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। পরে শিববাড়ী হইতে চর পড়িতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দ্বীপ হয় এবং মধ্যস্থ অংশ সৌগন্ধা নদীতে পরিণত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ৩য় প্রবাদের মহাদেবের ললাটাগ্নিতে জল শুষ্ক হইয়া দ্বীপ সৃজন বোধ হয় এই শিববাড়ী হইতে আরম্ভ হয়। এই দ্বীপই পরে চন্দ্রদ্বীপ নামে আখ্যাত হয়। আড়িয়ালখাঁ এবং তাহা হইতে বহির্গত যে নদী বরিশালের নিকট দিয়া নলছিটি, ঝালকাঠী, কাউখালী প্রভৃতির স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে সম্ভবতঃ তাহাই প্রাচীন সৌগন্ধা নদীর একটি লুপ্তপ্রায় প্রবাহ। পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ কখন কত দূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহা সঠিক বলা যায় না। রামায়ণের কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে (৪০ অধ্যায়) লিখিত আছে যে, সুগ্রীব

---

* শিববাড়ী গ্রামকে কোন কোন গ্রন্থকার শ্যামরাইল বলিলেও ইহা দলিলপত্রাদিতে ও সেটেলমেণ্টের কাগজাদিতে শিববাড়ী গ্রাম বলিয়া লিখিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকও শ্যামরাইল বলিয়া কোন গ্রাম জানে না।

† মহাভারতে আছে যে, তীর্থপর্য্যটনে সুগন্ধা, শতকুম্ভা ও পঞ্চযজ্ঞায় নাইলে স্বর্গলোকপূজিত হয়।

বনপর্ব্ব, ৮৪ অঃ।

পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরগণকে সীতার অন্বেষণার্থ সামুদ্রিক দ্বীপ সকলে যাইতে বলিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, রামায়ণের সময় দ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাভারতে (বনপর্ব্ব ১১৪ অঃ) আছে যে, যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নন্দা ও কৌশিকীতীর্থে স্নানাদি করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হয়েন ও তথায় পঞ্চশত নদীমধ্যে অবগাহন করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মহাভারতের সময়ে এই দ্বীপ বহুদূর দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছিল। কালিদাস রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে গঙ্গাস্রোতমধ্যস্থ বহু দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সমতট প্রদেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকলের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ প্রকৃত চন্দ্রদ্বীপ আধুনিক হইলেও নিতান্ত অল্প দিনের নহে। ভূমিকম্পে ও জলপ্লাবনে মধ্যে মধ্যে ইহার অনেক স্থান বিলীন হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপের অবস্থানাদি।

প্রাচীন কুলগ্রন্থ মহাবংশাবলীতে প্রসিদ্ধ কায়স্থের বাসস্থানপ্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের সীমা এইরূপ লিখিত আছে—

> পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইচ্ছামতী তথোত্তরে।
> মধুমতিঃ পশ্চিমে চ সমুদ্রো দক্ষিণে তথা।

ষোড়শ শতাব্দীতে পদ্মা যখন কানাইপুরের নিম্নে প্রবাহিতা ছিল তখন ইচ্ছামতী মধুমতী নদীর উৎপত্তি স্থলের কিঞ্চিৎ উত্তরে পদ্মার অপর পারে পদ্মা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে বর্ত্তমান পাবনা ও ঢাকা জিলার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিতা হইতেছিল। এখনও উহার নিদর্শন আছে। সুতরাং পাবনা ও ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশ এবং সমস্ত ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ জিলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত হইতেছে। ইহার সমর্থক আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

> বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি উত্তরে।
> সমন্তাৎ শাসনাগঞ্জ শাসকোহয়ম্ মহীপতিঃ।

(বিশ্বকোষ। ভবিষ্য ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরখণ্ড)।

এই কুশদ্বীপ পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছামতী নদীর উত্তরতীরস্থ পাবনা জিলার কুশহাটী পরগণা হইলে পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। যাহা হউক মহারাজ দনৌজমাধবের সময় এই স্থান চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পরবর্ত্তীকালে বোধ হয় ছিল না।

দিগ্বিজয় প্রকাশিকা বিবৃতিতে মেঘনা ও বলেশ্বরের মধ্যস্থ ইদিলপুর হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত ভূভাগ চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাজা তোডরমল বাক্‌লা সরকারের এইরূপ সীমানা দিয়াছেন—খালি-ফিতাবাদ বা যশোহরের পূর্ব্ব সাধারণতঃ পদ্মার পশ্চিম তীরে, বদ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে, দক্ষিণে ভাটি পর্য্যন্ত ভূভাগ বাকলা সরকার। যাহা হউক রাজা তোডরমলনির্দ্দিষ্ট সীমা ধরিলে সমস্ত ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং খুলনা ও যশোহরের কতকাংশ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত।

চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী।

পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী কখন্ কোথায় ছিল তাহা বলা যায় না; তবে রাজা দনৌজমাধবের সময় হইতে কচুয়া ও মাধবপাশা এই দুইটি রাজধানীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে বাক্‌লা যে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল তাহা কতক অনুমান করা যায়।

পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত বাউফল থানার অধীন কচুয়া নগরী চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী। তথায় ২।১টি পুরাতন দালানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কচুয়ার পার্শ্বস্থ কালাইয়া নদীর অপর তীরে কমলার দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে। কচুয়ার পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত তেতুলিয়া নদীর অপর পারস্থ চরবাসীদিগের কাহারও কাহারও বাক্‌লাই আখ্যা দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে যে, বাক্‌লায় বাস ছিল বলিয়া তাহাদের বাক্‌লাই আখ্যা হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে কচুয়া ও বাক্‌লা সংলগ্ন গ্রাম ছিল; কালক্রমে বাক্‌লা নগরী তেতুলিয়ায় অন্তর্হিত হইলে মহারাজ দনৌজমাধব বাক্‌লার সংলগ্ন কচুয়া নগরীতে রাজধানীস্থাপন করেন; কিন্তু তাহা বাক্‌লা নামে প্রসিদ্ধ থাকে। এমন কি পরবর্ত্তীকালে মাধবপাশা যখন রাজধানী হয় তখনও কেহ কেহ রাজাদিগকে বাক্‌লার রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থেও রাজধানীর নিকটে বাক্‌লার অস্তিত্ববর্ণনা আছে। পূর্ব্বে বাক্‌লা প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায় যে, বাকলা নগরী চাউল, রেশমী ও কার্পাস বস্ত্রের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল। বহুদিন হইল বাক্‌লা নগরী নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এই স্থানের অধিবাসীর মধ্যে দুই একটি বংশের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকুলতিলক রূপ ও সনাতনের বাড়ী বাক্‌লায় ছিল; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যাজনিক ক্রিয়োপলক্ষে বাক্‌লা হইতে যশোহরের ফতয়াবাদে

অবস্থান করিতেন। রূপ ও সনাতন কর্ণাটী ব্রাহ্মণ ছিলেন ; সেনবংশও কর্ণাট হইতে এ দেশে আইসেন। সম্ভবতঃ সেই জন্যই রূপ ও সনাতনের পূর্ব্বপুরুষগণকে সেনবংশীয় রাজগণ সাদরে আশ্রয় দিয়াছিলেন (বাণী ৩) এতদ্ভিন্ন দনৌজমাধব গৌড়দেশ হইতে কুলাচার্য্য ও অনেক কুলীন কায়স্থ আনাইয়া বাস করান।

দনৌজ মাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥
গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থ কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥ (বঙ্গজ কায়স্থ কারিকা)

মহারাজ দনৌজমাধব ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের আমলে অনেক কুলীন কায়স্থ কচুয়া ও বাকলাবাসী হয়েন। রাজাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকায় বসুবংশীয়গণই এইস্থানে প্রবল ছিলেন। বসুবংশীয় তিন সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় (১)। দনৌজমাধব পুরবসুর কন্যা বিবাহ করিলে (২) পুরবসুর প্রপৌত্র চক্রপাণি বসু ভূসম্পত্তি পাইয়া কচুয়াবাসী হয়েন। পরবর্ত্তীকালে চক্রপাণীর উত্তর পুরুষ চাঁদশী দাস বংশে বিবাহ করিয়া চাঁদশীবাসী হয়েন (খোষালচন্দ্র রায়ের বাখরগঞ্জের ইতিহাস,১৪৭পৃঃ) দ্বিতীয়তঃ সেনবংশীয় শেষ রাজা জয়দেব দেহেরগাতি নিবাসী বলভদ্র বসুর করে কন্যা সম্প্রদান করিলে বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ বসু রাজত্ব পাইয়া কচুয়াবাসী হয়েন। রাজধানীপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশ মাধবপাশায় যায়েন। এতদ্ভিন্ন বৎস বসু বংশীয় শ্রীগর্ভ বসু মালখানগর হইতে কচুয়ায় আসিয়া বাস করেন। এই বংশীয় বলরাম বসু ভরতকাঠীবাসী হয়েন। জলপ্লাবন, মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার এবং রাজধানীপরিবর্ত্তনের জন্য ক্রমে কচুয়া জনশূন্য হইয়া পড়ে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের পরই রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় কচুয়া হইতে মাধবপাশায় রাজধানীপরিবর্ত্তন করেন। মাধবপাশা বরিশাল হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। তথায় রাজপ্রাসাদ ক্রমেই জঙ্গলময় হইয়া পড়িতেছে। মাণিক মুন্সীর বংশধর ও অন্যান্য কয়েক ঘর ধনী থাকিলেও গ্রামটি ক্রমে ভীতিজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে। দুর্গাসাগর নামক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা এখনও অতীতের স্মৃতি জাগাইতেছে।

---

(১) কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কোন সময় এরূপ বিশেষ বর্ণনা দ্বারা উপকার হইতে পারে॥

(২) সতোন কার্ণঘোষায় পশ্চাৎ ভীম গুহায়চ।
মহদ্রাজ্যে দনূজায় মাধবায় বিশেষতঃ॥
(পুরবসুর সম্বন্ধ—দ্বিজ বাচস্পতির কারিকা)

রাজাদিগের পরিচয়।

দনৌজমাধব রাজা হইয়া সমাজসংস্কার করতঃ সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করিতে চেষ্টা করেন; ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ সমীকরণ করেন। ইঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রমাবল্লভ, তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ, তৎপুত্র হরিবল্লভ ও তৎপুত্র জয়দেব ক্রমান্বয়ে চারিজন প্রায় ১৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা কৃষ্ণবল্লভের কন্যা কমলা-দেবী কালাইয়া নদীর তীরে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিন দ্রোণ তের কার্ণি (প্রায় ৩০০ বিঘা) বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান। এই দীঘি কমলার দীঘি নামে খ্যাত। ১৮৭৬খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনে এতদ্দেশে গৃহাদি জলমগ্ন হইলে শত সহস্র লোক এই কমলার দীঘির উচ্চ পাহাড়ে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। রাজা জয়দেবের পুত্র ছিল না। তিনি একমাত্র কন্যাকে দেহেরগাতিনিবাসী বলভদ্র বসুর করে সম্প্রদান করেন। রাজার মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজা হয়েন।

> বলভদ্রাত্মজো ধীমান্ পরমানন্দ সংজ্ঞকঃ।
> তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী।
> চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালঃ সেনবংশ-সমুদ্ভবঃ।
> মৃত্যুকালং প্রাপ্য স হি ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ।
> পরমানন্দক তস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ॥ (কুলাচার্য্য গ্রন্থ)

পরমানন্দ বসুও সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্য বঙ্গজ কায়স্থের ৯ম সমীকরণ করেন। পরমানন্দের পুত্র জগদানন্দ পরম ভগবদ্ভক্ত ছিলেন ও গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিয়া মৃত্যুকালে গঙ্গাগর্ভে আত্মসমর্পণ করেন। জগদানন্দের পুত্র কন্দর্প-নারায়ণ রায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ক্ষমতাশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইনি যবন সর্দ্দার গাজিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ও মগদিগকে নিহত করিয়া বাসুরী-কাঠী, ক্ষুদ্রকাঠী, হোসেনপুর ও মাধবপাশা নগরী স্থাপিত করেন। রাজা কন্দর্প-নারায়ণ রায় ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। কন্দর্পনারায়ণের নামাঙ্কিত একটি কামান এখনও মাধবপাশা রাজবাড়ীতে আছে। কন্দর্প নারায়ণের পর হইতেই ক্রমে রাজবংশের ক্ষমতাক্ষয় হইতে থাকে। ইঁহার পুত্র রামচন্দ্র বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় পরিব্রাজকগণ এইস্থানে আসিয়া ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং চন্দ্রদ্বীপমধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তখন রামচন্দ্রের বয়স একাদশ বর্ষ। বহুদিন তাঁহার সহিত যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা চলে। সেই

সময় কিছুকালের জন্য রাজা রামচন্দ্র প্রবাসী ছিলেন। সেই অবসরে মগ ও ফিরিঙ্গীরা বাক্‌লায় ফিরিয়া অধিকাংশ স্থান দখল করে। কিন্তু রাজা রামচন্দ্র আসিয়া পুনরায় তাহা অধিকার করেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ অধিকার ও তথায় সমাজাধিপত্য লাভের জন্য বিবাহরাত্রিতে জামাতা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্রকে বন্দী করেন। রামচন্দ্রের সেনাপতি রামনারায়ণ সিংহ চৌষট্টি দাঁড়যুক্ত নৌকা বৃক্ষপ্রস্তরাবরুদ্ধ যমুনা নদীর উপর দিয়া টানিয়া লইয়া রাজার উদ্ধার করেন। রাজা সেনাপতিকে রায়চৌধুরী উপাধি দিয়া জমিদারী অর্পণ করেন। তদ্বংশধর উজীরপুরে বাস করিতেছেন। ভুলুয়ার রাজা লক্ষণমাণিক্য চন্দ্রদ্বীপরাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা রামচন্দ্র মেঘনা নদীর মধ্যে তাঁহাকে ধৃত ও বন্দী করিয়া রাজধানীতে আনয়ন করেন। তথায় লক্ষণমাণিক্যের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ নৌযুদ্ধে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি মেঘনানদীর উপকূলে ফিরিঙ্গীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) নবাব তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। এক দিন তথায় গমন করিয়া যবন-ভোজ্যের আঘ্রাণ লওয়ায় তিনি জাতি নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া মহাসাধনায় হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করেন। কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র প্রতাপনারায়ণ, তৎপরে কীর্ত্তিনারায়ণের ভ্রাতা বাসুদেবনারায়ণ, তৎপর বাসুদেবনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ রাজা হয়েন। প্রেমনারায়ণ অপুত্রক কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার ভাগিনেয় উলাইলের উদয়নারায়ণ মিত্র রাজা হয়েন। প্রেমনারায়ণের স্ত্রীর কুচক্রে উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদের নবাবের হস্তে বন্দী হয়েন। এক দিন নবাব তাঁহাকে এক ব্যাঘ্রের সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত করেন; কিন্তু উদয়নারায়ণ অমিতবিক্রমে মুষ্ট্যাঘাতে ব্যাঘ্রকে ভূপাতিত করিলে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাকে চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন প্রদান করেন। এই উদয়নারায়ণের পর হইতে রাজগণ জমিদাররূপে পরিগণিত হয়েন। কারণ, তখন বঙ্গে ইংরাজপ্রাধান্য। উদয়নারায়ণের পর তৎপুত্র শিবনারায়ণ, তৎপুত্র লক্ষীনারায়ণ, তৎপুত্র জয়নারায়ণ ক্রমান্বয়ে রাজা হয়েন। জয়নারায়ণের মাতা দুর্গাবতী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দুর্গাসাগর নামক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান। যে স্থানে ২।৩ হাত মাটির নিম্নে জল পাওয়া যায়, সে স্থানে এরূপ গভীর ও প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা কি প্রকারে খনন করা হইয়াছিল ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

জয় নারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপ বিক্রীত হয়। তৎপরে নৃসিংহনারায়ণ। ইহাঁর

দুই দত্তক পুত্র ছোট রাজা ও বড় রাজা নামে খ্যাত। বরিশালের রাজকীয় দরবারে এখনও ইহাঁদের শ্রেষ্ঠ আসন।*

শ্রীহেমন্তকুমার বসু।

ব্যর্থ বসন্ত।

হে বসন্ত, ঋতুরাজ, পরি' চির-নব সাজ,
পত্র পুষ্প মুকুল ভূষণ,
সেই পুরাতন প্রীতি বিরহ-মিলন-স্মৃতি
ল'য়ে আসি' দিলে দরশন।
শূন্য মোর কুঞ্জবনে আজি তব আগমনে
কে করিবে মঙ্গলাচরণ,
অর্ঘ্য রচি' এ কুটীরে চিরাগত অতিথিরে
কে লইবে করিয়া বরণ!
শুনি' কোকিলের গান, পঞ্চমে বাঁধিয়া তান
বীণাযন্ত্রে কে দিবে ঝঙ্কার,
পরিপূর্ণ করি' সাজি তুলি' নব পুষ্পরাজি
কে রচিবে মালা-অলঙ্কার!
কে আজি মাধবী-বনে বসিবে সে শিলাসনে,
মন্দানিলে শিথিল অঞ্চল!
কাহার দেহের প'রে লুটিবে সোহাগভরে
চন্দ্রকর—পুলকবিহ্বল!
আজি এ দখিণা বায় ধীরে কেঁদে বহে যায়,
যারে খোঁজে—না পায় সন্ধান!
কূজন-গুঞ্জনে গানে বনের মর্ম্মরে, প্রাণে
জাগে শুধু বিলাপের তান।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

---

* কায়স্থজাতির সামাজিক গ্রন্থ বাঙ্গালার ইতিহাসের—বিশেষ চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসের—প্রধান উপকরণ তজ্জন্য কায়স্থ কুলগ্রন্থ হইতে বহু উপাদান সংগৃহীত হইল।

অদৃষ্টচক্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

ধরণীধর প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বড়দিনের ছুটীর সময় দুই মাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিবেন; ততদিনে পুত্রের বিদ্যালয় বন্ধ হইবে—তিনি তাহাকে নিকটে রাখিয়া তাহার অধ্যয়নের তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু রামতারণের নিকট তিনি যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তিনি কিছু বিচলিত হইলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, ততদিন বিলম্ব করাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না—তিনি তৎপূর্ব্বেই বাড়ী আসিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

কর্ম্মস্থান হইতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি জননীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ডাকবিভাগের কৃপায় শানগরে না যাইয়া শ্যামনগরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধানে হরকরাদিগকে কষ্ট দিয়া শেষে "এ নামের কোন মালিক গ্রামে নাই"—২নং পিয়ন চন্দ্রকান্তের এই মন্তব্যসহ প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার আগমন-সংবাদ গৃহে পৌঁছে নাই।

ধরণীধর নৌকায় আসিতেছিলেন,—ভারতের পাপহারিণী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর প্রবাহে উজান বাহিয়া নৌকা অগ্রসর হইতেছিল। ধরণীধর এ বার কিছু অধিক দিনের জন্য গৃহে আসিতেছিলেন—সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু অধিক ছিল। সে সকলের মধ্যে পুস্তকই অধিক। ধরণীধরের কোন সখ ছিল না। তিনি তাঁহার ব্যর্থসুখভোগ জীবনে—নিঃসঙ্গ প্রবাসে কেবল বিদ্যাচর্চ্চায় শান্তি ও সান্ত্বনা, সুখ ও আনন্দ পাইতেন। আর তাঁহার হৃদয়ে অভিলাষ ছিল,—পুত্র যতীশচন্দ্রকে তিনি সর্ব্ববিধ অভাব হইতে অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত অর্থ দিবেন,—সে স্বচ্ছন্দে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া খ্যাতিলাভ ও পারিবারিক সুখভোগ করিবে; তাঁহার জীবনে অবস্থা-বিপাকে এই উভয়ের একটিও লাভ ঘটে নাই। এই আকাঙ্ক্ষার জন্যই তিনি আজও বিদেশে চাকরী করিতেছেন; তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন অনায়াসে কাটাইবার জন্য আবশ্যক সঞ্চয় তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই করিয়াছেন—সে জন্য এখনও তাঁহার প্রবাসক্লেশ সহ্য করা নিষ্প্রয়োজন।

নৌকা অগ্রসর হইতেছিল। গঙ্গাপ্রবাহের দিকে চাহিয়া ধরণীধর ভাবিতেছিলেন, এই গঙ্গার কূলে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা—প্রাচীন ভারতের মানস-পদ্ম বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সৌরভ আজও শিল্পে ও সাহিত্যে বর্ত্তমান; এই গঙ্গার

কূলে প্রাচীন ভারতবাসীরা যে ধর্ম্ম ও সমাজশৃঙ্খলা উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন এত দিনেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই—কত ধর্ম্ম—কত সমাজ কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু ভারতীর ধর্ম্ম ও সমাজ আজও বর্ত্তমান; তাহার পর এই গঙ্গার কূলে রক্তসিক্ত বিজয়লালসার নিবৃত্তি হইলে আর্য্য ও সেমিটিক সভ্যতার অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল, যে ধর্ম্ম আরবের মরুভূমি হইতে মরুবাত্যার মত প্রলয়মূর্ত্তি প্রবল বেগে বাহির হইয়াছিল তাহাও এই গঙ্গার কূলে আসিয়া স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিয়াছিল; তাহার পর নূতন অঙ্কে নূতন দৃশ্য, কিন্তু যে নগণ্য গ্রাম ইংরাজের রাজধানী হইয়া আজ প্রাসাদমালিনী মহানগরীর শ্রী ধারণ করিয়াছে সেই কলিকাতাও গঙ্গার কূলে অবস্থিত। কত বিপ্লববাত্যা, কত পরিবর্ত্তনপ্রবাহ গিয়াছে; কিন্তু গঙ্গা সমভাবে ভারতবর্ষকে স্নিগ্ধতা ও উর্ব্বরতা দান করিয়া ধন্য করিতেছে।

সহসা নদীকূলে বাদ্যরব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ধরণীধরের মনে পড়িল—আজ জগদ্ধাত্রী পূজার বিজয়া। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কাহারা গঙ্গা-জলে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে। সংসারের গতিই এইরূপ। পূর্ব্বদিন যে প্রতিমাকে অবলম্বন করিয়া জগজ্জননীর সত্তা অনুভব করিতে সচেষ্ট হইয়াছি; যাহার চরণতলে প্রণত হইয়া মহাশক্তির লীলা দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভক্তি-রসাপ্লুত হইয়াছি আজ আর তাহাকে কোন প্রয়োজন নাই, তাই আজ সে প্রতিমা নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে! ধরণীধর ভাবিলেন, তাঁহার বাল্যকালে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে কত পূজা হইত, পূজায় কি আনন্দ—কি উৎসব ছিল। তখন এই সব উৎসবে মিলনের আনন্দালোকে সমাজের সকল স্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। আর এখন? ধরণীধর ভাবিলেন—কত অল্প দিনে কি পরিবর্ত্তন! কিন্তু পুরাতন উৎসব গেল, কোন নূতন উৎসব তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে কি? উৎসবহীন—আনন্দহীন—সুখহীন জাতি কত দিন আপনার অস্তিত্ব-সংরক্ষণে সক্ষম হইবে?

ধরণীধর ভাবিতে লাগিলেন। নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকা যখন শানগরের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন দিন শেষ; পশ্চিম গগনে অস্তগমনোন্মুখ তপনের তেজহীন আলোক গঙ্গাসলিলে ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। ধরণীধরের নৌকা ঘাটে ভিড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আর একখানি নৌকা ঘাটে ভিড়িয়াছিল। সে নৌকা হইতে কয়জন যুবক অবতরণ করিয়াছিল। ধরণীধর গৃহে যাইয়া দ্রব্যাদির জন্য ভৃত্যকে পাঠাইবেন বলিয়া কূলে অবতরণ করিলেন। যুবকগণ

তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। তাহাদের কথোপকথন তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। একজন বলিল, "আজ যাওয়াটাই বৃথা হইল।" আর একজন বলিল, "কেন?" প্রথম বক্তা বলিল, "কায ত কিছুই অগ্রসর হইল না।"—তৃতীয় জন বলিল, "ওহে পথঘাটের সন্ধান না জানিয়া কি দুর্গ জয় করা যায়? সব সংবাদ হস্তগত হইলে তখন কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে বিলম্ব হয় না। সাফল্যও সহজ হয়। ক্রমে সব সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতেছে।" চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "যোগ্যে যোগ্যে মিলন প্রকৃতির নিয়ম। এক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? তবে সব কায অল্পসময়সাধ্য হয় না।" প্রথম বক্তা বলিল, "যতীশ বাবুর এ বিবাহ সংঘটিত হই-বেই।' অমূল্য বাবু, শ্যামাপূজার সময় আপনি আসিতে পারেন নাই; আমরা আসিয়াছিলাম। সেই সময় আমরা কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরমা'কে বলিয়াছি, ইচ্ছাপুরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের একটি পরমা সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা আছে। তাহার সহিত যতীশবাবুর বিবাহ হইলে বড় মানায়। সুরেশ আমার কথায় সায় দিয়া বলিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বেই তাহার মাতুলালয়; সেও মেয়েটিকে দেখিয়াছে।" একজন বলিল, "সুরেশের ত মাতুলালয়, আর তোমার?" জিজ্ঞাসিত হইয়া যুবক উত্তরে বলিল, "শ্বশুরালয়।" সে অকৃতদার; সকলে খুব হাসিল। এমন সময় নৌকা হইতে মাঝি ডাকিতে ডাকিতে আসিল, "বাবুরা—ওগো বাবুরা; নৌকায় এই ছড়ি ফেলিয়া আসিয়াছেন।" যুবকগণ পশ্চাদ্দিকে চাহিল। যতীশ-চন্দ্র দেখিল, ধরণীধর আসিতেছেন। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য সে আপনার নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার পর সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিবার পর যাইয়া পিতৃচরণে প্রণত হইল। তাহার সঙ্গীরা পূর্ব্বে কখনও ধরণীধরকে দেখে নাই। তাহারা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝি ছড়ি দিয়া চলিয়া গেল।

যতীশ নতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কি বলিবে বুঝিতে পারিল না। তাহার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। ধরণীধর পুত্রকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইঁহারা তোমার বন্ধু?"

যতীশ মুখ তুলিল না, মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ।"

"বাটীতে সংবাদ দিয়াছ? ইঁহাদের আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে?"

"হাঁ।"

তখন ধরণীধর যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার পুত্রের বন্ধু। আমি বিদেশে থাকি, তাই আপনাদিগের সহিত আমার পরিচয়

হয় না। আজ আপনাদিগের সহিত সাক্ষাতে পরম প্রীত হইলাম।" যুবকগণ বৃদ্ধের পরিচয়ে স্তম্ভিত হইল। অমূল্যচরণ সর্ব্বাগ্রে বিপন্নভাব গোপন করিয়া আসিয়া ধরণীধরকে প্রণাম করিল। তাহার পর একে একে সকলেই ধরণীধরকে প্রণাম করিল। তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগের পরিচয় লইতে লইতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুবকগণ বুঝিতে পারিল না, তিনি তাহাদিগের ব্যবহার ও বাক্যালাপ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন।

গৃহে আসিয়া ধরণীধর স্বয়ং যুবকদিগের আহারের তত্ত্বাবধান করিলেন; এবং সেই অবসরে তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর তাহারা বিদায় লইল।

যতীশ সেদিন আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না।

সে দিন রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া ধরণীধর ভাবিতে লাগিলেন। তিনি দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার নয়নে নিদ্রা আসিল না। দুশ্চিন্তাজনিত মানসিক চাঞ্চল্য তাঁহাকে জীবনে মৃত্যুর আস্বাদ, ব্যথিত শোকাতুর সকলের যন্ত্রণার নির্ব্বাণোপায় নিদ্রাসুখ লাভ করিতে দিল না। তিনি পুত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার তাহার বন্ধুদিগকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে, বিশেষতঃ অমূল্যচরণকে, দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অতিরিক্ত সুরাপান তাহার দেহে আপনাদের কলঙ্কিত স্পর্শচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল; সে চিহ্ন ধরণীধরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। ধরণীধর স্বভাবতঃ সকল বস্তুকে ও ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেন; তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায়ে তাঁহার সেই স্বাভাবিক পর্য্যবেক্ষণশক্তি শাণিত অস্ত্রের মত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। আবার বহুবিধ লোকের সহিত ব্যবহারের ফলে তিনি লোকচরিত্রবিচারে বিলক্ষণ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অমূল্যচরণকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি পুত্রের কল্পিত ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার ছায়াপাতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আজ দুশ্চিন্তাতাড়িত ধরণীধরের মানসপটে মৃত্যুশয্যায় শয়ান পত্নীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। ধরণীধরের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। তিনি উদ্দেশে বলিলেন, "তুমি তোমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর। তোমার পুণ্যে—তোমার আশীর্ব্বাদে পুত্রের সকল অকল্যাণ দূর হইবে,—সকল বিপদের অবসান হইবে।"

—————

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্র।

ধরণীধর গৃহে আসিলেন। তখনও যতীশচন্দ্রের বিদ্যালয় বন্ধ হয় নাই; কাযেই সে কলিকাতায় থাকিত, শনিবারে গৃহে আসিত। সপ্তাহান্তে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইত। যতীশচন্দ্রের মনোভাব গোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও ধরণীধর স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন, শনিবারে গৃহে আসিয়া যতীশ কেবল ভাবিত, কবে সোমবার আসিবে—সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। পিতা যখন পুত্রকে নিকটে পাইবার জন্য এত ব্যাকুল, পুত্র তখন পিতার সান্নিধ্য ক্লেশকর বোধ করে! কেন এমন হয়? স্নেহশীল পিতা আপনার নিকট আপনাকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া পুত্রের ব্যবহার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, দোষ তাঁহার; তিনি বিদেশে থাকেন, পিতাপুত্রে বর্ষান্তে বা বর্ষমধ্যে দুইবার সাক্ষাৎ হয়—সেও অল্পদিনের জন্য; এ অবস্থায় পিতাপুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহসম্বন্ধ শিথিল হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু এ চিন্তায়—এই কথায় মন শান্ত হইল না। স্নেহ নিম্নগামী সত্য; কিন্তু স্নেহ কি স্নেহ আকৃষ্ট করে না? আর তিনি যে সংসারের সকল সুখ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ প্রবাসে জীবন যাপন করিতেছেন, সে কাহার জন্য? সেই বিদেশে তাঁহাকে রোগে শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই; তাঁহার মৃত্যুকাল সমাগত হইলে পিপাসাশুষ্কমুখে জলবিন্দু দিবার কেহ থাকিবে না,—হয় ত কোন বনমধ্যে বা গিরিশিখরে ভৃত্যগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত তাঁহার শব শৃগালকুক্কুরের আহার হইবে। তিনি কাহার জন্য বিদেশে শ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন? পুত্র কি তাহা বুঝিতে পারে না? ধরণীধর ভাবিতেন। সে ভাবনায় কেবল যাতনা। তাঁহার যথেষ্ট অবসর—যে কায লইয়া তিনি সময় কাটাইতেন—হৃদয়ের শোক ভুলিতেন—এখন সে কায নাই, কাযেই ভাবনার অন্ত ছিল না। সময় সময় যখন দুশ্চিন্তার ভারে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িত তখন তিনি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন; মনকে বুঝাইতেন, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন—তাহাই তাঁহার কার্য্য। হায় কর্ত্তব্য, তুমি অনেক সময় সংসারমরুভূমিতে মরীচিকা মাত্র—শ্রান্তপথিককে কেবল দ্বিগুণ যাতনা দান কর।

এই ভাবে মাসাধিক কাল কাটিবার পর যতীশচন্দ্রের কলেজ বন্ধ হইল। সে গৃহে আসিতে চাহিল না—তখনও পরীক্ষার দুই মাস বিলম্ব আছে, এই সময়ের মধ্যে সতীর্থদিগের সহিত অনেক আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষকদিগের

নিকট আবশ্যক বিষয় জানিয়া লওয়া প্রয়োজন হইবে—এই ওজুহাতে সে কলিকাতায় থাকিতে চাহিল। কিন্তু ধরণীধর বলিলেন, যখন সে যে দিন ইচ্ছা প্রভাতে কলিকাতায় যাইয়া অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, তখন তাহার পক্ষে গৃহে আসাই শ্রেয়ঃ; বিশেষ গৃহে অধ্যয়নে কোনরূপ অন্তরায় ঘটিবে না, এবং অঙ্কসম্বন্ধে তিনি আবশ্যক সাহায্য করিতে পারিবেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় যতীশ গৃহে আসিল।

গৃহবাস যতীশের ভাল লাগিত না। সে কলিকাতায় তাহার সাহিত্যিক সহচরদিগের সহিত মিশিবার জন্য ব্যস্ত হইত। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট নীরস পুস্তক পাঠে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না; অথচ তাহাকে সেই সকল পুস্তক পাঠে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিতে হইত। এ অবস্থায় তাহার যে প্রায়ই কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হইত তাহা বলাই বাহুল্য।

ধরণীধর পুত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন—তাহার ব্যবহারে ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, বিহগ-শাবক যখন আপনার পক্ষে ভর দিয়া অনন্ত অম্বরে উড়িতে শিখে—সে যখন আপনি আপনার আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে, তখন বাহিরে তাহার সহস্র বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও বিহগ-জননীর পক্ষে তাহাকে আর নীড়ে—আপনার পক্ষতলে রক্ষা করা অসম্ভব। তাহা বুঝিয়া পুত্রের বিপদসম্ভাবনায় তিনি চঞ্চল হইলেন। পিতামাতার এই স্নেহসঞ্জাত চাঞ্চল্যে আমরা তরুণ বয়সে বিরক্ত হই; কারণ, আশঙ্কা পরিণত বয়সের ধর্ম্ম; কিন্তু যখন আমরা তরুণ বয়স অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হই—যখন পুত্রকন্যার বিপদশঙ্কায় আমাদিগের পিতৃহৃদয় চঞ্চল হইতে আরম্ভ হয়, তখন আমরা সে চাঞ্চল্যের স্বরূপ বুঝিতে পারি এবং পিতামাতার প্রতি পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তখন তাঁহারা সে চাঞ্চল্যের অতীত হইয়া চির-শান্তি লাভ করিয়াছেন।

পুত্রের পাঠে অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া ও অঙ্কশাস্ত্রে তাহার আবশ্যক দক্ষতার অভাব দেখিয়া ধরণীধর বুঝিলেন, তাহার পক্ষে এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা নাই। ইহা বুঝিয়া তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন। তিনি প্রবাসে পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সাফল্যের সুখস্বপ্নে সকল দুঃখ—সকল অসুবিধা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন; পুত্রের জন্য শ্রম করিয়া আপনার ব্যর্থ জীবন সার্থক মনে করিতেন। এখন পুত্রের ব্যবহারে সে স্বপ্ন টুটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু হতাশা অপেক্ষা আশঙ্কা অধিক বেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্ববার গৃহে আসিয়া

বন্ধু রামতারণের কথাতেও যে আশঙ্কা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—যে আশঙ্কা স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ে পুত্রের প্রতি বিশ্বাস শিথিল করিতে পারে নাই, অমূল্যচরণের দর্শনে সে আশঙ্কার স্বরূপ সপ্রকাশ হইয়াছিল, সেই বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল। পুত্র এমন বন্ধু কেমন করিয়া সংগ্রহ করিল? লোকের বন্ধু দেখিয়া যদি লোকের চরিত্র বুঝা যায় তবে যতীশ এখন নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু যে, "অসৎ সঙ্গে থাকিলে পরে অধর্ম্মের ফল ফলে" সেই অসৎসঙ্গে থাকিয়া সে কত দিন অবিচলিত থাকিতে পারিবে? পথ পিচ্ছিল—পথিক সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ, তাহার পক্ষে সতর্কতা অস্বাভাবিক। এ অবস্থায় পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। এই সকল ভাবনায় ধরণীধরের হৃদয় সর্ব্বদাই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধির মত চঞ্চল থাকিত। তিনি প্রবাস হইতে গৃহে আসিয়া সুখলাভ করা দূরে থাকুক নূতন অসুখে পীড়িত হইতে লাগিলেন। কেবল প্রবাসেও যেমন গৃহেও তেমনই অধ্যয়নে তিনি সময় সময় সকল দুঃখ ভুলিতেন—সকল আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন,—সকল দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইতেন।

একদিন মধ্যাহ্নে—আহারের পর স্বীয় কক্ষে ধরণীধর 'বিষ্ণুপুরাণ' পাঠ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার জননী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে দিন একাদশী। মা'কে দেখিয়া ধরণীধর পুস্তকপাঠ বন্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আজ একটু শুইলে না?"

মা বলিলেন, "শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে যায়; তাই আজ শুই নাই। একটা কথা বলিব বলিব মনে করি, হইয়া উঠে না; আজ বলিতে আসিয়াছি।"

"কি কথা, মা?"

"যতীশের বিবাহ দিতে হইবে। ছেলে ডাগর হইয়াছে। আমি আর কত দিন বাঁচিব? আমার সাধও বটে, আর বৌকে ত সংসারের কায শিখাইয়া যাইতেও হইবে। আমি আর কোন আপত্তি শুনিব না।"

দুই বৎসর হইতে মা যতীশের বিবাহের কথা বলিতেছেন। এতদিন ধরণীধর বিলম্ব করিয়াছেন। কিন্তু এবার তাঁহার মতপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চঞ্চলহৃদয় শান্ত করিতে—উদ্ভ্রান্তকে সংসারে বদ্ধ করিতে প্রেমের মত উপায় আর নাই। যুবকের তরুণ হৃদয়ে প্রেম-পিপাসা স্বাভাবিক। তাই বধূর প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া পুত্রকে বিপদের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার কথা এবার ধরণীধরের মনে হইয়াছে। কাযেই এবার আর তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত পুত্রের অধ্যয়নে ক্ষতির সম্ভাবনার কথা বলিয়া জননীর প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলেন না;

বলিলেন,—"আমি পাত্রীর সন্ধান লইব। গ্রামে ত আর ঘটক নাই। কলিকাতায় যাইয়া রামতারণকে বলিয়া আসিব কি?"

মা বলিলেন, "সে-ই ভাল কথা। আমি একটি পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। যতীশের দুইজন বন্ধু মেয়েটকে দেখিয়াছে। তাহারা বলে, মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।"

মা'র কথা শুনিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের দিন নদীকূলে যতীশচন্দ্রের সহচরবৃন্দের কথা ধরণীধরের মনে পড়িল। তিনি বুঝিলেন, তাহারা এই পাত্রীর কথাই বলিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির পিত্রালয় কোথায়?"

"ইচ্ছাপুরে। মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা।"

"ভাল; আমি সন্ধান লইব।"

এ সম্বন্ধে সন্ধান লইবার উপায় সম্বন্ধে ধরণীধরকে কিছু চিন্তিত হইতে হইল। পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালার পল্লী আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল—পল্লীর অভাব দূর করিবার উপায় পল্লীতেই থাকিত—তখন গ্রামে ঘটক ছিল। এখন পল্লীগ্রামের অবস্থা পরিবর্ত্তিত। বিবাহ প্রায় সহরেই নিষ্পন্ন হয়—পূর্ব্বের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিচয়ের ব্যবস্থা আর নাই। কাজেই গ্রামে এখন ঘটকের অভাব। অনেক ভাবিয়া ধরণীধর গ্রামের "ঠাকুরদাদা"—হরিনাথ ভট্টাচার্য্যকে সব কথা বলিয়া ইচ্ছাপুরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন।

বৃদ্ধ হরিনাথ আবশ্যক সংবাদাদি লইয়া আসিলেন; ধরণীধরকে বলিলেন, "ভায়া হে! তোমার ঘরে মেয়ে দিতে পারা মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু মেয়েটি লক্ষে একটি—সে মেয়ে আনিতে পারাও সৌভাগ্য।"

ধরণীধর জননীর সহিত এ বিষয় পরামর্শ করিলেন। হরিনাথের কথা শুনিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার জননীর আগ্রহ যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইল।

তাহার পর একদিন ধরণীধর স্বয়ং হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া ইচ্ছাপুরে গমন করিলেন। বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কথা হইল, এখন "আশীর্ব্বাদ" হইয়া থাকিবে; যতীশের পরীক্ষার পর বিবাহ হইবে। ধরণীধর দেখিলেন, মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা সাক্ষাৎ ভগবতীই বটে।

যতীশ শুনিল, ইচ্ছাপুরে সেই বালিকার সহিতই তাহার বিবাহ স্থির হইল। অধ্যয়নে তাহার যেটুকু মনোযোগ ছিল—তাহাও গেল। সে কল্পনাসৃষ্ট সুখলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। যুবকের উদ্দাম কল্পনা তাহাকে যে স্বপ্নরাজ্যে লইয়া গেল সে রাজ্যের সুখ এই দুঃখ-শোক-তাপময় জগতে লাভ করা যায় না

বেলভেডিয়ার।

কলিকাতার উপকণ্ঠে স্নিগ্ধ পল্লীশোভার মধ্যে আলীপুরে* বঙ্গের ছোটলাটের বাসভবন বেলভেডিয়ার অবস্থিত। গৃহের বর্ত্তমান নাম অবশ্য য়ুরোপীয়। কিন্তু গৃহটি প্রথম মুসলমান শাসনসময়ে নির্ম্মিত বলিয়া জানা যায়। যখন ভারতবর্ষ মোগল শাসনাধীন—দিল্লীর সিংহাসনে আওরঙ্গজেব অধিষ্ঠিত তখন সুবা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আজীম ওস্‌সান মৃগয়ার জন্য এই গৃহ নির্ম্মিত করান। তাহার পর হুগলীর কয়জন মুসলমান শাসনকর্ত্তা সময়ে সময়ে এই গৃহে বাস করিতেন। দেখা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পর ভ্যান্‌সিটার্ট এই গৃহের অধিকারী হয়েন। কি সূত্রে যে উহা তাঁহার হস্তগত হয় তাহা জানা যায় না। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে মীরজাফরের নিকট হইতে যে অর্থ গৃহীত হয়—তাহার মধ্যে স্বীয় অংশের টাকা দিয়া ভ্যান্‌সিটার্ট উহা ক্রয় করেন। কিন্তু তিনি কাহার নিকট হইতে উহা ক্রয় করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। ভ্যান্‌সিটার্ট স্বয়ং ইটালীয়ান ছিলেন; গৃহ অধিকারের পর উহার আবশ্যক পরিবর্ত্তন ও সংস্কার শেষ করাইয়া স্বীয় মাতৃভাষায় উহার বেলভেডিয়ার নামকরণ করেন।

ক্লাইভ শাসন-সংস্কারে সচেষ্ট হইলে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এই গৃহে সমবেত হইয়া ক্লাইভের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাই কর্ত্তব্য স্থির করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভের স্বদেশগমনে ভ্যান্‌সিটার্ট গভর্ণর নিযুক্ত হয়েন। তখন কাউন্সিলের সদস্য হইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে আলীপুরে এক উদ্যান বাটিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্যানবাটিকা ভ্যান্‌সিটার্টের গৃহের দক্ষিণে—সম্ভবতঃ বর্ত্তমান এগ্রিহর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটীর উদ্যানে অবস্থিত ছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'ইংলিশম্যান' পত্রে জনৈক লেখক লিখিয়াছিলেন, এই গৃহ বেলভেডিয়ারের হাতায় অবস্থিত ছিল। আমরা সদস্যসমিতির কার্য্যবিবরণে দেখিতে পাই, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস স্বীয় উদ্যানবাটিকায় গমনের পথে—কালীঘাটে আদিগঙ্গার উপর একটি সেতু নির্ম্মাণের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত লেখকের মতে যে স্থানে বর্ত্তমান কালীঘাটের সেতু অবস্থিত ঐ স্থানেই অবস্থিত একটি পুরাতন

* কলিকাতা জয় করিয়া সিরাজদ্দৌলা উহার আলীনগর নামকরণ করেন। আলীপুরে তাহারই শেষ চিহ্ন বিদ্যমান কি না জানা যায় না।

জীর্ণ সেতুর পরিবর্ত্তে হেষ্টিংস একটি নূতন সেতু নির্ম্মিত করিতে চাহেন। তিনি প্রার্থিত অনুমতি পাইলেও—পরবৎসর স্বদেশে গমন করায় সেতুনির্ম্মাণ হয় নাই।

দেখা যায়, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ১৬০০০ টাকায় একটি গৃহ বিক্রয় করেন। ঐ গৃহ বেলভেডিয়ার কি না বাকল্যাণ্ড* সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা লাভের জন্য সর্ব্বদাই জমী ও গৃহ ক্রয়-বিক্রয় করিতেন। আলীপুর, কলিকাতা, রিষড়া, সুখসাগর প্রভৃতি নানাস্থানে হেষ্টিংসের গৃহের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই গৃহ যে বেলভেডিয়ার এমনই মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ভ্যানসিটার্ট স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে গভর্ণর ভেরেলেষ্ট ঐ গৃহে বাস করিতে থাকেন। ওলন্দাজ নৌসেনাধ্যক্ষ ষ্ট্যাভোরিনাস ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন,—ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক ডিরেক্টর হুগলী গমনকালে ভেরেলেষ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ তদীয় উদ্যান গৃহে গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই উদ্যানগৃহ বেলভেডিয়ার। ভেরেলেষ্টের কর্ত্তৃত্ব-কালে মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রায়ই বেলভেডিয়ারে যাইতেন।

ইহার পর কার্টিয়ার গভর্ণর হইলে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্মেণ্টের প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে এই বেলভেডিয়ার ভবনে তাঁহাদের প্রীত্যর্থে সঙ্গীত ও পানভোজনের ব্যবস্থা হয়।

কার্টিয়ারের পর গভর্ণর হইয়া হেষ্টিংস বেলভেডিয়ারে বাস করিতে থাকেন। এই সময় তিনি তাঁহার বেলভেডিয়ারসংলগ্ন উদ্যানগৃহ ভাবীপত্নী ও তাঁহার সন্তানদিগের জন্য ছাড়িয়া দেন। এই বেলভেডিয়ারেই তাঁহার সহিত নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী কামাল উদ্দীনের সাক্ষাৎ হয়†। বেভারিজ‡ বলিয়াছেন, হেষ্টিংস বর্ত্তমান হেষ্টিংস হাউস লিখিতে বেলভেডিয়ার লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার এই অনুমানের কোন কারণনির্দ্দেশ করেন নাই। এই সময় হেষ্টিংস বর্ত্তমান হেষ্টিংস হাউসের নির্ম্মাণ কার্য্য আরব্ধ করান। বিবাহান্তে তিনি এই নবনির্ম্মিত গৃহে বাস আরম্ভ করেন। তখন কেবল সামাজিক নিমন্ত্রণাদির জন্য বেলভেডিয়ার ব্যবহৃত হইত। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপ ফ্রান্সিসের কুটুম্ব ও প্রাইভেট সেক্রেটারী ম্যাক্রেবী লিখিয়াছিলেন যে, তিনি সঙ্গীতোৎসবে হেষ্টিংসের

---

* Bengal under the Lieutenant-Governors.
† Gleig's Memoirs of Warren Hastings.
‡ *Trial of Nand Kumar.*

বাগানবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, আলীপুরে কোন বাটীতে আহারের পর তিনি ও কর্ণেল মনসন বেড়াইতে বেড়াইতে হেষ্টিংসের নূতন গৃহে গমন করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস কোন্ সময় বেলভেডিয়ার ক্রয় করেন তাহা জানা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি মেজর টলীকে ঐ গৃহ বিক্রয় করেন। মিসেস ফে* লিখিয়াছিলেন যে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলভেডিয়ারে হেষ্টিংস পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তকের টীকাকার ফার্মিঞ্জার বলেন, তিনি হেষ্টিংস হাউসেই গিয়াছিলেন; হেষ্টিং-সের দুইটি গৃহ পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী থাকায় নবাগতের পক্ষে এরূপ ভ্রম অসম্ভব নহে। ইহার পর দেখিতে পাই, হেষ্টিংসের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে আহত ফ্রান্সিস বেলভেডিয়ারে নীত হয়েন। হেষ্টিংস্ বলেন, তিনি বেলভেডিয়ারে নীত হয়েন। ফ্রান্সিস লিখিয়াছেন, তিনি টলীর গৃহে নীত হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টলী হেষ্টিংসের নিকট হইতে ঐ গৃহ ক্রয় করেন। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দ্বৈরথ যুদ্ধের কারণ সকলেই অবগত আছেন। তবে ইহার সংঘটনস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বাষ্টিডের মতে† আলীপুর রোডের ৫নং ভবনের উত্তর সীমার নিকটে উহা সংঘটিত হয়। কিন্তু লং যাহা লিখিয়াছেন ‡ তাহাতে বোধ হয়, আদি গঙ্গার উত্তর কূলে কলিকাতার দিকে বর্ত্তমান জিরাট সেতুর নিকটে ইহা সংঘটিত হয়।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে বেলভেডিয়ার ভাড়ার বা বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয়। ঐ বৎসর মেজর টলীর মৃত্যু হয়। বোধ হয়, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পক্ষ হইতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। গৃহ বিক্রীত না হওয়ায় মেজর ব্রুক বার্ষিক ৩৫০০৲ টাকা ভাড়ায় কুড়ি বৎসরের জন্য উহা ভাড়া লয়েন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস বিলাতে পত্নীকে লিখেন যে, আলীপুরের সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ নিলামে চড়াইয়া উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় তিনি আপনিই ডাকিয়া রাখিয়াছেন। তিন খণ্ডে সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে নূতন বাটী, পুরাতন বাটী, ও সাদা জমীর উল্লেখ দেখা যায়। নূতন বাটী অবশ্য বর্ত্তমান হেষ্টিংস হাউস, পুরাতন বাটী বোধ হয় বেলভেডিয়ারসংলগ্ন উদ্যানগৃহ। বাষ্টিড টলীর নিকট বেল-ভেডিয়ার বিক্রয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া বেলভেডিয়ার এই ফিরিস্তিভুক্ত মনে করিয়া

---

* Original Letters from India.

† Echoes from Old Calcutta.

‡ Selections.

ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। হেষ্টিংস স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রতিনিধি-দিগের চেষ্টায় তাঁহার সম্পত্তি বিক্রীত হয়। তখন ব্যবহারজীব জ্যাকসন পুরাতন বাটী ২৭৫০০ সিক্কা টাকায়, টমসন ও টার্নার নূতন বাটী ২৭০০০ টাকায় এবং এটর্নী হ্যানিকোম সাদা জমী ৭২০০ টাকায় ক্রয় করেন। তখনও প্রায় ৭০ বিঘা জমী অবিক্রীত থাকে। হেষ্টিংসের পত্নীর পূর্ব্বপক্ষের পুত্র জুলিয়াস ইম্‌হফ ভারতে বাস করিতে আসিলে হেষ্টিংস এই জমী তাঁহাকে দেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে মেজর টলীর প্রতিনিধিরা বেলভেডিয়ার গৃহ টমাস স্কটকে বিক্রয় করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বার্চ্চ স্কটের নিকট হইতে ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বার্চ্চের নিকট হইতে বেলভেডিয়ার ক্রয় করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উহা ম্যাকিলনের হস্তগত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর তৎ-কালীন প্রধান সেনাপতি সার এডওয়ার্ড প্যাজেট এই গৃহে বাস করেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন এডভোকেট জেনারল চার্লস্ প্রিন্সেপ এই গৃহের সংস্কার করেন। বোধ হয় তিনি তখন এই গৃহেই বাস করিতেন। পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ উহা ক্রয় করেন। *

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় লেফটেনাণ্ট-গভর্ণরের পদ সৃষ্ট হইলে তাঁহার বস-বাসজন্য বড়লাট লর্ড ড্যালহাউসীর পরামর্শে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রিন্সেপ-পরিবারের নিকট হইতে এই গৃহ ক্রয় করেন। ঐ বৎসর ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লর্ড ড্যালহাউসী লিখেন—ঐ গৃহ ৮০০০০৲ টাকায় খরিদ করিয়া ২০০০০৲ টাকায় উহার সংস্কার করাইলে মোট ব্যয় পড়িবে ১০০০০০৲ টাকা। উহার সুদ শতকরা বার্ষিক ৩৷৹ টাকা ও সংস্কারের ব্যয় শতকরা বার্ষিক ২৷৹ টাকা হিসাবে ধরিয়া লেফটেনাণ্ট-গভর্ণরের নিকট মাসিক ৫০০৲ টাকা ভাড়া আদায় করিলে সরকারেরও ক্ষতি হইবে না, অধিবাসীর প্রতিও অবিচার হইবে না। ইহার পর ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি লিখেন যে, লেফটেনাণ্ট-গভর্ণরকে কলিকাতায় অবস্থানহেতু সামাজিক নিমন্ত্রণাদিতে প্রচুর ব্যয় করিতে হইবে—তাহা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার ছোটলাটের নিকট বাড়ীভাড়া আদায় না করাই সঙ্গত তদবধি বেলভেডিয়ার বঙ্গের ছোটলাটদিগের বাসভবন। বলা বাহুল্য এই গৃহে বহুবিধ পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে।

এই গৃহসংলগ্ন জমীরও কতকাংশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। হেষ্টিংস-পত্নীর পুত্র ইমহফ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে নবাব নাজীমকে একটি অট্টালিকা ও

---

* Letters and Memorials.

তৎ-সংলগ্ন জমী সমেত পুষ্করিণী প্রভৃতি বিক্রয় করেন। উহার চৌহদ্দী দেখিয়া মনে হয়, ঐ জমী বেলভেডিয়ারের দক্ষিণে ছিল। বর্ত্তমানে ঐ জমীতেই এগ্রিহর্টি-কাল্‌চারাল্‌ সোসাইটীর উদ্যান ও আলিপুর রোড হইতে কালীঘাটের পুল পর্য্যন্ত লম্বিত রাস্তার উত্তরাংশের গৃহগুলি অবস্থিত। কে তাঁহার রচিত মেটকাফের জীবনীতে মেটকাফের যে বাসগৃহের স্থাননির্ণয়ে অক্ষম হইয়াছেন ইহাই বোধ হয় সেই গৃহ। ইহা নবাব সাহেবের কুঠী বলিয়াই পরিচিত ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সার সিসিল বিডন ঐ গৃহ ও জমী ক্রয় করেন ও তিন বৎসর পরে বাটী ভাঙ্গিয়া জমী গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করেন। তখন ঐ জমীর কতকাংশ বেলভেডিয়ারের হাতাভুক্ত করা হয় ও কতকাংশ আলীপুর ঘোরাবারিকের জন্য রাখা হয়। এই শেষোক্ত জমীই এখন পূর্ব্বোক্ত সোসাইটীর অধিকৃত।

যাঁহারা কলিকাতায় বড়লাটের ও ছোটলাটের উভয়েরই বাসভবন দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বেলভেডিয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। সকল ছোটলাটই ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল স্বীয় জীবনীতে লিখিয়াছেন —ইহা "a charming house in charming grounds" সার রিচার্ড টেম্পল স্বীয় পুস্তকে* ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি বড়লাট লর্ড ডাফরিণের পত্নী স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, দৃশ্যসৌন্দর্য্য ও আরামবিষয়ে বেলভেডিয়ারের সহিত লাট-প্রাসাদের তুলনা হয় না।†

বেলভেডিয়ারের অর্থ সৌন্দর্য্যের রাণী। সার রিচার্ড টেম্পল সত্যই বলিয়া-ছিলেন—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ নাম সার্থক হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

---

* Men and Events of my Time.

† Our Viceregal Life in India.

রামায়ণী সভ্যতা।

সাহিত্য।

রামায়ণী যুগে ভারতবর্ষে যে সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল শাস্ত্রাদির তৎকালীন অবস্থা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রসম্পদ, যাহা গ্রন্থাকারে আমাদের নিকট পরিচিত হইতেছে, ঐ সকল শাস্ত্র তৎকালে কিরূপ ভাবে জনগণের নিকট পরিচিত ছিল এবং কি ভাবেই বা আলোচিত হইত তাহার সম্বন্ধে রামায়ণে বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী "শিক্ষা প্রণালী" প্রবন্ধে (১) বলিয়াছি যে, তৎকালে লিপিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না থাকায় মৌখিক শিক্ষাদান প্রণালীই প্রচলিত ছিল এবং শাস্ত্রাদি গ্রন্থকারে নিবদ্ধ না থাকিয়া জনগণের স্মৃতিমন্দিরে বিরাজিত থাকিত ও তজ্জন্য স্মৃতি ও শ্রুতি নামে পরিচিত ছিল। বাস্তবিক বেদের শ্লোকগুলি যে মুখে মুখেই রচিত হইয়া স্মৃতিতে রক্ষিত হইত ও শ্রুতিতে প্রচারিত হইত বেদেও তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। *

---

(১) আর্য্যাবর্ত্ত—অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ঋকবেদের ১ম অষ্টক, ১ম মণ্ডল, ৩য় অধ্যায়, ৩৮ সূক্ত হইতে ১৪শ ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।—

"মুখে শ্লোক রচনা কর, মেঘের ন্যায় তাহা বিস্তার কর, উকথ স্তুতি বিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত সূক্ত পাঠ কর।"

৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদে বৃহত্তম সংখ্যা বাচক শব্দের উল্লেখ দেখিয়া দৃঢ়তার সহিত বৈদিককালে লিপিবিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সকলেই জানেন যে, লিপিজ্ঞানের পূর্ব্বে শিশুদিগের মধ্যে গণিত বিদ্যার প্রচার থাকে না। তৎ প্রতিকারণ এই যে, গণিত বিদ্যা অতি গহন অতি দুর্ব্বদ্ধ্য; লিপি সাহায্য ব্যতীত তাহার শিক্ষা বা অনুশীলন সম্ভবপর হয় না। কাজেই শিশুরা নিরক্ষর অবস্থাপ্রযুক্ত গণিত ক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ থাকে। লিপিজ্ঞদিগের গণিতাধিকার, আর নিরক্ষরদিগের অনধিকার, এতদৃষ্টে আমরা বলিতে পারি। বৈদিক ঋষিরা যখন গণিত প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তখন আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহাদিগের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন লিপিপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কেন না, লিপির সাহায্য ব্যতীত গণিত ক্রিয়া অনুশীলিত হইতে পারে না।"

(উপাসনা ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩০ পৃষ্ঠা)

নিরক্ষর লোক যে গণিতের উচ্চ উচ্চ সংখ্যা গণনা করিতে পারে না বা উচ্চ সংখ্যার পরিমাণ করিতে পারে না একথা সকল সময় স্বীকার করা যায় না। বর্ণজ্ঞানহীন অসভ্য গারোদিগের গণিতজ্ঞান দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহারা শিক্ষিত লোকের ন্যায় এক দুই করিয়া সহস্র পর্য্যন্ত গণনা করিয়া তাহার একটা পরিমাণ করিতে না পারিলেও তাহাদের নিজের ভাবে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর সংখ্যার হিসাব প্রদান করিতে পারে। গারোরা কাহণ হিসাবে গণনা করিয়া

বর্ত্তমান সময় ভারতের প্রাচীন সম্পদ বলিয়া যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রামায়ণে বেদের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা গ্রন্থরূপে পরিচিত নহে। রামায়ণে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদের উল্লেখ স্পষ্ট ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

হনুমানের বিদ্যাবত্তা লক্ষ্য করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

নানৃগ্বেদ বিনীতস্য ন যজুর্ব্বেদ ধারিণঃ।
ন সামবেদ বিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ ২৮॥ কি ৩।

রামের এই উক্তির মধ্যে কেবল তিন বেদেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তবে কি রামায়ণের সময় চারি বেদ প্রচারিত হয় নাই? বেদ কি তখনও "ত্রয়ী" নামেই পরিচিত ছিল?

অথর্ব্ব বেদ যে অন্যান্য তিন বেদ হইতে আধুনিক তাহা কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ বিশেষভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভাগবত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও হরিবংশ—ইহাদিগের মতে বেদ তিনটি। শতপথ নামক প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদ্ প্রভৃতিতেও তিন বেদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। পুরুষ সূক্ত মধ্যেও তিন বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের টীকায় সায়ণাচার্য্যও তিন বেদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থের কোনখানিই বোধ হয় অথর্ব্ব বেদ হইতে প্রাচীন নহে। অথচ এই পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলিও তৎপূর্ব্বরচিত গ্রন্থকে বেদের সম্মানিত পর্য্যায়ে স্থান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ, অথর্ব্ববেদ সংগৃহীত হইয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত অন্যান্য বেদের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।

রামায়ণে অন্যান্য বেদের সঙ্গে অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ না থাকিলেও বালকাণ্ডের ১৫শ সর্গে অথর্ব্ব সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদজ্ঞ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ কিয়ৎক্ষণ সমাধিস্থ হইয়া থাকিয়া পরে রাজা দশরথকে বলিলেন—

ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্র কারণাৎ।
অথর্ব্ব শিরসি প্রোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ॥

মুখে মুখে সহস্র কাহনের হিসাব দিতে পারে। "লিপি জ্ঞানের পূর্ব্বে শিশুদিগের মধ্যে গণিত বিদ্যার প্রচার থাকে না" পণ্ডিত মহাশয়ের এই উক্তিরও আমরা সসম্মানে প্রতিবাদ করিতেছি। দেখিতেছি, লিপিজ্ঞানহীন ভৃত্য প্রতিদিন শত পয়সার হিসাব মুখে মুখে প্রদান করিতেছে এবং প্রভুকে প্রবোধ দিয়াও কিছু কিছু আত্মসাৎ করিতে পারিতেছে। এই অবস্থায় এই উক্তি কিরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে? লিপিজ্ঞানহীন অধিবাসীরা যে ভাবে আপনাদের মনের মত সংখ্যা গণনা করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তম সংখ্যার অনুমাণ জ্ঞান লাভ করে প্রাচীন আর্য্যরাও যে সেইরূপ প্রক্রিয়ারই গণনা করিতেন তাহা আমরা ক্রমে আলোচনা করিব।

এই শ্লোকের অথর্ব্ব শব্দটির দ্বারা অথর্ব্ব বেদকেই নির্দ্দেশ করিতেছে এমন বুঝা যায় না। অথর্ব্ব ঋষিপ্রণীত মন্ত্রকেও বুঝাইতে পারে।

কাহারও কাহারও মতে অঙ্গিরবংশীয় মহর্ষি অথর্ব্বই অথর্ব্ব বেদের রচয়িতা। মহর্ষি অথর্ব্বরচিত অথর্ব্বশীর্ষক শ্লোকগুলি পূর্ব্বে "ত্রয়ী"র অন্তর্গত ছিল; মহর্ষি বেদব্যাস সেগুলি ত্রয়ী হইতে পৃথক করিয়া তাহার দ্বারা অথর্ব্ব বেদের ভাগ সমাধান করেন। ইহার পর অথর্ব্ব বেদে আরও কতকগুলি শ্লোক যোজিত হয়।

মহর্ষি বেদব্যাস কোন্ সময়ে অথর্ব্ব বেদের বিভাগক্রিয়া সমাধা করেন তাহা অথর্ব্ব বেদের ১৯ কাণ্ডের, ৭ম সূক্তে লিখিত আছে। ঐ সূক্তে লিখিত হইয়াছে যে, "উক্ত বেদের সঙ্কলনকালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে অবস্থিত ছিল এবং অশ্লেষার শেষে কিম্বা মঘার প্রথমে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল।"

এই গণনা অনুসারে স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫১৪ খৃঃ পূঃ অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছিল।* এই রচনাকাল রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী?

রামায়ণের প্রথম স্তর মহর্ষি বাল্মিকীকর্ত্তৃক মুখে মুখে সঙ্গীতরূপে রচিত হইয়াছিল। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু কবির বহু কল্পনা যোজিত হইয়া ইহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং অতঃপর কোনও কৃতি লেখকের পরিশ্রমে ও পাণ্ডিত্যে তাহা সংগৃহীত হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। লিখিত এবং প্রচারিত হইবার পরও প্রতি শতাব্দীতে এবং ধর্ম্মবিপ্লবের উত্থান এবং পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রুচি ও ধর্ম্মানুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ইহারও পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। এরূপ স্থলে বর্ত্তমান রামায়ণের কোন্ অংশ আদি কবির রচিত ও কোন্ অংশ পরবর্ত্তী সময়ে সংযোজিত হইয়াছে তাহা সাহস করিয়া বলিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। তথাপি রামায়ণে স্থলে স্থলে এমন কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যাহা স্পষ্টই কোনও নির্দ্দিষ্ট সমাজবিপ্লব বা ধর্ম্মবিপ্লবের পর সংযোজিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণে এইরূপ প্রক্ষিপ্ত অংশ এত অধিক প্রবেশলাভ করিয়াছে যে, তাহাতে রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে অনেকেই রামায়ণকে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

রামায়ণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইবার পর যে সকল সাময়িক ভাব পরবর্ত্তী

---

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে এই গণনা স্থির করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার গণনা দেখিতে ও বুঝিতে চাহেন তাঁহারা 'বিশ্বকোষে' "অথর্ব্ব বেদ" শব্দ দেখুন।

লেখকগণকর্ত্তৃক সেই গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সমাজের দৃষ্টিতে হীন করিয়াছে এই স্থলে সেইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াই মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

(১) "অবতারবাদ" রামায়ণের একটি মারাত্মক প্রক্ষিপ্ত বিষয়। বাল্মীকির সঙ্গীতে অবতারবাদের কোনও ভাব ছিল না। তৎকালীন সমাজ অবতারবাদ-বিষয়ে ঘোর অনভিজ্ঞ ছিল। এমন কি অবতারের কথা দূরে থাকুক সেই প্রাচীন সমাজ অবতারের মূল বিষয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতাই তখন সমাজে পরিকল্পিত হয়েন নাই। পাঠক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রামায়ণের সেই আদিম স্তরটির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

রামায়ণে দেবতার সংখ্যা মাত্র তেত্রিশটি তাহা আমরা রামায়ণের দেবতা শীর্ষক প্রবন্ধেই আলোচনা করিয়াছি।*

কৈকেয়ী রাজা দশরথকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়া দেবতাদিগকে ও স্থূলদেহী, মহৎভাব এবং ক্ষমতাযুক্ত পদার্থসমূহকে সাক্ষী করিতেছেন—

> তচ্ছৃণ্বস্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্র পুরোগমাঃ ॥ ১৩
> চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহরাত্র্যহনী দিশঃ।
> জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্ব্বা সরাক্ষসা ॥ ১৪
> নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
> যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব ॥১৫
> সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
> বরং মম দদাত্যেষ সর্ব্বে শৃণ্বস্তু দৈবতাঃ ॥১৬ (অঃ ১১)

"ইন্দ্রপ্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা (১) শ্রবণ করুন, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নভোমণ্ডল, দিক্, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নিশাচর প্রাণী, গৃহদেবতা, অন্যান্য দেবতা সকলে অবগত হউন, এই সত্যসন্ধ ধর্ম্মজ্ঞ মহীপতি দশরথ আমাকে অভিলষিত বর প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

---

* রামায়ণের সমাজ—সাহিত্য,—১৩১৬—ভাদ্র—২২১ পৃষ্ঠা।

(১) দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই তেত্রিশটি দেবতা। ইঁহারা বৈদিক ও রামায়ণী যুগের দেবতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই সমাজের পরবর্ত্তী। বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে, কিন্তু বেদে বিষ্ণু সূর্য্যব্যতীত অপর কেহ নহেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যাস্কের 'নিরুক্ত' লিপিবদ্ধ হয়। যাস্কের নিরুক্তেও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কোন উল্লেখ নাই। তিনি অগ্নি ইন্দ্র ও সূর্য্যকেই প্রধান দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কৈকেয়ী সমাজপ্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগকেই ভক্তিভরে মান্য করিয়াছিলেন। কৈ, তাহাতে ত বিষ্ণুর নাম নাই! রাম যে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া রামায়ণে কল্পিত হইয়াছেন, যে ব্রহ্মা বাল্মীকিকে রামায়ণ লিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন ও যে শিবের ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রাম জনকনন্দিনীর পাণিলাভ করিয়াছিলেন আমাদের বর্ত্তমান সমাজের এই প্রসিদ্ধ দেবত্রয়কে কেন কৈকেয়ী পরিত্যাগ করিলেন।

(২) যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয়ের জন্মকাল পৌরাণিক যুগে স্বীকার করিতে হয়, তবে ইঁহাদের সংসৃষ্ট যে সকল গল্প ও পুরাণ রামায়ণে স্থান পাইয়াছে তাহাদিগকেও পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বাস্তবিক রামায়ণে বর্ণিত সমুদ্রমন্থন, মদনভস্ম, রামের হরধনুভঙ্গ, পরশুরামের বিষ্ণুধনুবিষয়ক আখ্যায়িকা বা রুদ্র-বিষ্ণু-বিরোধ প্রভৃতি অন্যান্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবসম্বন্ধীয় গল্প বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী কবিবরা লিখিত হইয়া রামায়ণে সংযোজিত হইয়াছে।

(৩) রামায়ণে বুদ্ধমতের উল্লেখ করিয়া সেই মতকে নাস্তিক বাদ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। (অযোধ্যা। ১০৯) রাম জাবালির নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যের নিন্দা করিয়া বলিলেন—

যথাহি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ॥৩৪

"চোর যেরূপ দণ্ডার্হ বুদ্ধমতানুসারী তথাগত নাস্তিক এবং আপনিও সেইরূপ দণ্ডার্হ জানিবেন। প্রজাগণের বুদ্ধিপরিশুদ্ধির জন্য নাস্তিক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা রাজার কর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তি নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করে না।"

জাবালিকথিত নাস্তিক্যবাদ চার্ব্বাকের নাস্তিক্যবাদের অনুরূপ। ইহার সহিত বৌদ্ধমতের সম্বন্ধ অতি অল্প। রামায়ণের ন্যায় একখানি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ইতিহাসে বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্মের ও বুদ্ধের নিন্দা প্রচার প্রয়োজন হওয়ায় বৌদ্ধবিপ্লবের অবসানে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় কোন হিন্দু কবিকর্ত্তৃক এই মত রামায়ণে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

(৪) রামায়ণী যুগে ভারতে মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। রামায়ণের প্রথম ৬ কাণ্ডের কোন স্থানেই মূর্ত্তিপূজার উল্লেখ নাই; কিন্তু উত্তরকাণ্ডে শিবপূজার উল্লেখ আছে। উত্তরকাণ্ডে কেবল শিবপূজা নহে বহু আধুনিক বিষয়েরও উল্লেখ

দৃষ্ট হয়। এই কাণ্ডটি যে বাল্মীকির রামায়ণের অন্তর্গত নহে, যিনি বাল্মীকির সঙ্গীতভাগ সংগ্রহ করিয়া রামায়ণ সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহার উক্তিতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

(৫) রামায়ণে মনুষ্যের পরমায়ুর উল্লেখস্থলে সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র বৎসরের উল্লেখ দেখা যায়। আদিকাণ্ডের (১ম স্বর্গে) রামায়ণের অজ্ঞাতনামা সংগ্রাহক লিখিয়াছেন—

দশবর্ষ সহস্রানি দশবর্ষ শতানিচ।
রামোরাজ্য মুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকম্ প্রযাস্যতি ।৯৮

প্রথম ৪টি সর্গ পাঠ করিলেই পাঠক দেখিবেন, এই সর্গ কয়টি কোন পরবর্ত্তী কবিকর্ত্তৃক লিখিত হইয়া রামায়ণের ভূমিকাস্বরূপ তাহাতে সংযোজিত হইয়াছে। রামের বয়সের সংখ্যা দেখিয়াই ইঁহাকে পৌরাণিক কবি বুঝিতে পারিবেন। এই কবি যে স্থানে সুবিধা পাইয়াছেন সেই স্থানেই এইরূপ বৃহত্তম সংখ্যার উল্লেখ-দ্বারা প্রকৃতবিষয়কে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। পৌরাণিক যুগের কবিদিগের রচনার ইহাও একটি পরিচয়। এইরূপ কবিদিগের প্রসাদে আমরা বঙ্গীয় পঞ্জিকায় ত্রেতাযুগের মনুষ্যপরমায়ুর পরিমাণ "দশসহস্র বর্ষ" ও মানবদেহের পরিমাণ "চতুর্দ্দশ হস্ত" পরিমিত জানিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি।

বাস্তবিক পক্ষে রামায়ণের আদিস্তরের রচনা হইতেও বৈদিককালের ন্যায় মনুষ্যপরমায়ুর পরিমাণ শতবর্ষই অবগত হওয়া যায়।* এতদ্ব্যতীত আদিকবির

* রামকে দশরথ রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, এই সংবাদ মন্থরা নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে কৈকেয়ীকে প্রদান করিলে কৈকেয়ী বলিলেন—

সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্ ॥ ১৫
ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবম্ বর্ষ শতাৎ পরম্।
পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ ॥ ১৬
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কি মিদং পরিতপ্যসে ॥ ১৭ (অযোধ্যা ৮)।

"কুব্জে তুমি দুঃখিত কেন? ভরতও যে রামের শতবর্ষ পরে পিতৃ-পিতামহগণের রাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন। ভাবি কল্যাণের নিদানস্বরূপ এই সুখকর ব্যাপার উপস্থিত; তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন?"

ঋক্ বেদের বহু স্থানে এইরূপ শতবর্ষে মানবপরমায়ুর আভাস রহিয়াছে। "সেই চক্ষুঃস্বরূপ দেবগণের হিতকর নির্ম্মল (সূর্য্যমণ্ডল) উদিত হইতেছেন। আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই। শত শরৎ বাঁচিয়া থাকি।" (রমেশচন্দ্র দত্ত—৭ মণ্ডল—৬৬ সূক্ত—১৬ ঋক্)

অন্যত্র—"তৎ প্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন।"
(ঐ—১০২ সূক্ত—শেষার্দ্ধ)

অন্যত্র—"এইরূপ পুত্র ও পৌত্রকে আমরা শত বৎসর পোষিত করি।" ঐ
তোকম্ পুষেম তনয়ং শতং হিমাঃ!
(১ অষ্টঃ—৬৪ সূত্র—১৪ ঋক

রচনার সময় ও বয়সজ্ঞাপক যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা স্বভাব অতিক্রম করিয়া যায় নাই। ইহা আমরা রামের বিবাহ, বনবাস, রাজ্যলাভ প্রভৃতির আলোচনায় দেখাইয়া আসিয়াছি।

রামায়ণের আদি রচনা যে প্রক্ষিপ্তরচনার নিষ্পেষণে স্বীয় অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছে তাহা আমরা সংক্ষেপে এইস্থলে উল্লেখ করিলাম। এই প্রক্ষিপ্তের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা মূল বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন মূল বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

সংযম।

(সংস্কৃত হইতে)

কি কায সম্পদে যেবা দান নাহি করে?
কি কায সামর্থ্যে যেবা শত্রু দেখি' ডরে?
কি কায বিদ্যায় যেবা ধার্ম্মিক না হয়?
কি কায জীবনে যেবা জিতেন্দ্রিয় নয়?

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

ব্রাহ্মণযুগ।

বৈদিক যুগের কিছু পরেই ব্রাহ্মণ যুগ। অথর্ব্ববেদের অধিকাংশই তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পর লিখিত হয়—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই স্থির করিয়াছেন। আমরাও অথর্ব্ববেদকে ব্রাহ্মণযুগের মধ্যে ধরিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণযুগ বিলাসের যুগ। তখন আর্য্যগণ ঐশ্বর্য্যশালী; যুদ্ধবিগ্রহ শান্ত; আর্য্যগণ নিশ্চিন্ত। ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে বসিয়া, অবসর সুখে—ভৈষজ্য-তত্ত্বের অন্বেষণে, তাঁহারা বহু দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণশাস্ত্রীর মতে—যখন অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হয়, তখন কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ছিল; অশ্লেষার শেষে বা মঘার প্রথমে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। খৃঃ পুঃ ১৫১৬ অব্দে অথর্ব্ববেদ সংগৃহীত হইয়াছিল। অনেকের মতে অথর্ব্ববেদ প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সময়ে আয়ুর্ব্বেদের শৈশব, অথর্ব্ববেদের সময় আয়ুর্ব্বেদ পুষ্টাবয়ব। অথর্ব্ববেদ পড়িলে আয়ুর্ব্বেদের ক্রম-বিকাশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন। চরক, সুশ্রুত এবং ভাবমিশ্রও এ কথার সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদের আর একটি নাম 'অথর্ব্ব-সর্ব্বস্ব।'

আমরা এই ব্রাহ্মণযুগকে বিলাসের যুগ বলিয়াছি। ঐশ্বর্য্যশালী আর্য্যগণ ব্রাহ্মণযুগে বিলাসী ও আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়িলেন। আলস্য চিরকালই যমের প্রধান সদস্য। ব্রাহ্মণযুগে আমরা ব্যসনজাত মেহ, অকালবার্দ্ধক্য, পাণ্ডু, রাজযক্ষ্মা, দকোদর, প্লীহোদর, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, কাস, পামা, বলাস, রক্তস্রাব, পক্ষাঘাত, কৃমি, নষ্টবীর্য্য, ক্ষত, চক্ষুরোগ, কেশপাত, শোথ, গণ্ডমালা, শূল, উন্মাদ, জায়ান্য (Tumor), অপচী, বক্ষণীড়া, আস্রাব (আমাশয়) তক্ষণ (জ্বর) প্রভৃতি বহু রোগের নাম দেখিতে পাই।* বৈদিকযুগে এত রোগ ছিল না।

এই সময় দেবর্ষি নারদ, সাধারণকে ব্যসনের অপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।† কিন্তু তাঁহার উপদেশ কেহই শুনিল না, রোগও কমিল না। তখন পরদুঃখ-কাতর ভরদ্বাজ শ্বাপর্ণ, বুদিল, কাশ্যপ, বৈজবাপ, গোভিল প্রভৃতি

* অথর্ব্ববেদ, কৈশিকসূত্র, দারিল ও কেশবের টীকা দেখুন।

† ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম, ১৩।

মহর্ষিগণকে সঙ্গে লইয়া পীড়িতের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। দশমূল, শণ, তিল, পৃশ্নিপর্ণী, পাঠা, অপামার্গ, অশ্বত্থ, গুগ্‌গুলু, ঘৃতকুমারী, কুড়, হরিদ্রা, মুঞ্জতৃণ, পলাশ, কপিত্থ, লাক্ষা, শমীবৃক্ষ, পিপ্পলী, ভরণীবৃক্ষ, অজশৃঙ্গী, চীপুদ্রু, মৃগশৃঙ্গ, গোমূত্র, মধু, স্বর্ণ, মুক্তা, সীসক প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য ঔষধের উপাদানস্বরূপ গৃহীত হইল।

আর্য্যরাজ্য তখন পঞ্জাব হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ধনী তখন যান-আরোহণ শিখিয়াছেন; গো, বৃষ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি পশুরও আদর বাড়িয়াছে। প্রয়োজন বুঝিয়া একদল "শল্য বৈদ্য" পশু চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন; আর এক দল যানারোহণে কাহারও কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে—তাহার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মণযুগেই জগতে প্রথম পশুচিকিৎসা আরব্ধ হইয়াছিল। মহর্ষি শুপর্ণ প্রণীত 'পশ্বাময়াবলোকঃ' নামক পশুচিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় এখনও পাওয়া যায়। ইহাতে কেবলমাত্র অশ্বরোগের চিকিৎসা আছে। অশ্বের জ্বর, মুখরোগ, কাস, বাত, বমন, অতিসার, তন্দ্রা, দাহ, চক্ষুরোগ ও কর্ণরোগের কয়েকটি মুষ্টিযোগ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণযুগে আর এক শ্রেণীর অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন, তাঁহারা প্রসবকালে ধনী মহিলাগণের সাহায্য করিতেন। এই যুগে অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। শারীর বিদ্যারও উন্নতি হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞক্ষেত্রে নিহত পশুর শারীরব্যবচ্ছেদের বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে শল্য-তন্ত্র-শিক্ষার্থিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই সময় ব্রণ (ক্ষত) চিকিৎসারও প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল।১ একদল "শল্যবৈদ্য" গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শুধু ব্রণ চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেন, ক্ষতস্থানের রক্তস্রাব নিবারণের জন্য মন্ত্রপূত প্রস্তরচূর্ণ প্রয়োগ করিতেন।২

ব্রাহ্মণযুগেও "দৈব ব্যাসাশ্রয়" চিকিৎসার প্রাধান্য ছিল। ঔষধ বাহ্যিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হইত। কোনও ঔষধ রোগীকে ধারণ করান হইত, কোনও ঔষধের ঘ্রাণ লইতে হইত, কোন কোন ঔষধ শরীরের স্থান বিশেষ মাদুলী তাগা বা কবচের মত বাঁধিয়া দেওয়া হইত। কোন ঔষধ প্রলেপ ও মালিশরূপে ব্যবহৃত হইত।

১। শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪র্থ, ১৷৫৷৮।

২। কৌশিক সূত্র ২৫, ৬।

রোগে শোকে নিরাশায় মানুষের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। এই সকল মানসিক ব্যাধিরও তাঁহারা প্রতীকার করিতে পারিতেন। অথর্ব্ব বেদের "উপচার" দেখিলে ঋষিদিগের লোকহিতৈষণা বুঝা যায়। কোথায় কোন্ গর্ব্বিতা কামিনী, পতির পবিত্র প্রেমকে যৌবনের দর্পে উপহাস করিয়া হতভাগ্যের জীবনের এক হিরন্ময় অধ্যায় ভস্মের মত মসীমলিন করিয়া দিয়াছে; কোথায় ঈপ্সিতের অনাদরে উপেক্ষিতা তরুণী অনন্যাসক্ত ক্ষুব্ধহৃদয় প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের প্রতীক্ষা করিতেছে; সেই ভূর্ভুব-স্ব-প্রভুর উপাসকগণ, শান্তিস্বস্ত্যয়নের সাহায্যে তাহাদের দুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হইতেন। তখন একটি মাত্র প্রেমচুম্বনে দম্পতীর যুগ-যুগান্তের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যাইত; দুইটি পরস্পর বিরোধী ব্যথিত হৃদয়ে এক চিরস্থায়ী শান্তিময় সন্ধি স্থাপিত হইত।৩

ব্রাহ্মণযুগের বৈদ্যগণ রোগের লক্ষণ নিরূপণ করিতে পারিতেন। বৈদিক-যুগে ইহা ছিল না। অথর্ব্ববেদে "তক্ষণ" নামক রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক। "তক্ষণের" লক্ষণের সহিত ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ মিলিয়া যায়। "তক্ষণ" একপ্রকার জ্বর, এ জ্বরের লক্ষণ—পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও শীতাবস্থা, জ্বর ছাড়িয়া আবার আইসে, কখন দুই দিবস, কখন তিন দিবস কখনও বা চারি দিবস অন্তর জ্বর প্রকাশ পায়। রোগীর মস্তকে যন্ত্রণা, ও কাস প্রভৃতি আনুসঙ্গিক অন্যান্য উপসর্গ থাকে। এ জ্বরের কারণ "অগ্নি" বা বিদ্যুৎ, সুতরাং রোগীর দেহের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যদি এ জ্বর শীঘ্র বন্ধ না হয়, তাহা হইলে পাণ্ডু (যকৃৎ বা পিত্তবিকার জনিত রক্তহীনতা) পমন (চুলকণা) এবং বলাস (ক্ষয়) প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে।

ব্রাহ্মণযুগের বৈদ্যগণ কুষ্ঠরোগে হরিদ্রা, ভৃঙ্গরাজ, ইন্দ্র, বারুণী, (রাখাল শশা) এবং নিলীকা ব্যবহার করিতেন; উদরাময়ে মুঞ্জ তৃণ, ক্ষতরোগে অরুন্ধতী লতা, তক্ষণরোগে কুড়, নেত্ররোগে সর্ষপের প্রলেপ, কেশ-পাতে নিতত্নী লতা, গণ্ডমালায় গোমূত্র, নষ্টবীর্য্যে কপিত্থ এবং সর্ব্বরোগে অপামার্গ ব্যবহার করিতেন। পরমায়ু ও বলবৃদ্ধির জন্য—মুক্তা ও স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত। ভূতযোনিজ রোগে জঙ্গিড বৃক্ষের ব্যবস্থা ছিল। অরুন্ধতী লতা, নিতত্নী লতা ও জঙ্গিড বৃক্ষ যে কি ছিল এখন তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য, অথর্ব্ববেদ ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থে এই তিনটি ঔষধের নাম পাওয়া যায় না।*

৩। ইমাম—সপত্নীম্ বাধতে, যয়া সম্বিন্দতি পতিম্।

* অথর্ব্ব বেদের "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যানি" মন্ত্রসমূহ দেখুন।

তখন, ক্ষেত্রিয় রোগে [Hereditary diseases. Pulmonary. Consumption] মৃগশৃঙ্গ ব্যবহৃত হইত। পুরাণে লিখে—প্রথমে চন্দ্রের ক্ষয়রোগ হয়; চন্দ্রের কলঙ্ককে অনেকেই "হরিণ" বলেন। চন্দ্র হরিণ কোলে করিয়া বসিয়া থাকেন। ক্ষয়রোগনাশক বলিয়াই কি চন্দ্র মৃগকে এত ভালবাসেন? এই জন্যই কি চন্দ্রের নাম মৃগাঙ্ক? পরবর্ত্তী যুগেও চন্দ্রের নামানুসারে যক্ষ্মারোগের অনেকগুলি ঔষধের 'নামকরণ' হইয়াছিল। যথা—"মৃগাঙ্ক বটী" "রাজ-মৃগাঙ্ক" "শশাঙ্কপ্রভা গুড়িকা" "চন্দ্রামৃত রস" "চন্দ্রকলা বটী" ইত্যাদি। মৃগ যে ক্ষয়-নাশক তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীবনাশক্তির ক্ষয় হইলে—মৃগনাভির প্রসাদে কোটি কোটি মানব পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণযুগে সর্পবিষের চিকিৎসা ছিল। অথর্ব্ববেদে নানাবিধ সর্পের উল্লেখ আছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে মধুপান করান হইত। জলমিশ্রিত যব (Barley) সর্ব্বরোগে পথ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। এই যুগে জলচিকিৎসা বা হাইড্রোপ্যাথি প্রচলিত ছিল, ঔষধরূপে "ঝরণার জল" ও "স্রোতের জল" ব্যবহৃত হইত।

আজকাল য়ুরোপে যে Psychopathy চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ-যুগেই এ চিকিৎসার সূত্রপাত হয়।

ব্রাহ্মণযুগের বৈদ্যগণ, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বস্তিযন্ত্র (পিচ্‌কারী) এবং মূত্রবদ্ধ হইলে শলাকা প্রয়োগ করিতেন। তাঁহারা বন্যৌষধির কাথ দ্বারা রোগীকে স্নান করাইতেন।

পিত্তরসের সাহায্যে অন্নাদির পরিপাক হয়, এই বৈজ্ঞানিক সত্য—ব্রাহ্মণ-যুগেই আবিষ্কৃত হয়। সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সম্প্রদায়ভেদে কর্ম্মের বিভাগ—এই যুগেই প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণযুগে "ভূত প্রেতের" প্রবল প্রতাপ, ভূতযোনির ভয়নিবারণের জন্য কাশ্যপ ঋষি একখানি তন্ত্র লিখিয়াছিলেন। ভূতবিদ্যাবিষয়ক বহুগ্রন্থই এই সময় রচিত হইয়াছিল। সে সকল গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না, ডল্লনাচার্য্যের টীকায় কোন কোন গ্রন্থের দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশ্যপতন্ত্র এখনও পাওয়া যায়।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ।

"পিক্‌নিক্‌"।

ভক্তকবি তুলসীদাস গাহিয়া গিয়াছেন "দুখ মে সব কোই হরি ভজে সুখ মে না ভজে কোই।" সুতরাং আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থাবান্ প্রোফেসার স—বাবু যে "অবিরাম জ্বরের" পক্ষকালব্যাপী প্রবলতাড়নায় ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে উৎকণ্ঠিতা পত্নীর স্থানীয় জাগ্রত দেবতা "চণ্ডীমাই"এর নিকট ছাগশিশুর "মানত" সমর্থন করিবেন ইহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। এবং ভগবদ্ভক্তি হইতে মানবপ্রীতির উৎপত্তিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সুতরাং রোগমুক্তির পর স—বাবু পরহিতব্রত ছাগশিশুর আত্মত্যাগের সুফল কেবল দেবীকেই সমর্পণ না করিয়া অনুগত বন্ধুজনকেও তাহার অংশ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। স্থির হইল, কোন আসন্ন শুভদিনে স—বাবু দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়া বন্ধুবর্গকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিবেন। কিন্তু হায় "ন চ দৈবাৎ পরং বলং!" সে শুভদিন আর আসিল না। স—বাবুর স্বীয় রোগমুক্তির পর পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার পুত্র, কন্যা, পত্নী, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়ী সকলেই পীড়িত হইতে লাগিলেন। বিপন্ন স—বাবু চিকিৎসকের পরামর্শে সকলকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে পাঠাইয়া "মেসের" বাসায় "পরবাসী" হইয়া পড়িলেন। পূজার জন্য আহৃত ছাগশিশু অবাধে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এমন সময়ে সহসা একদিন রজনীপ্রভাতে ছাগশিশুর অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়া স—বাবু তাহার শ্মশ্রুদ্গম এবং শরীরে "সুরভি"-সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই দ্রুতপদে বন্ধুবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে এই বিপদের বার্ত্তা জানাইলেন।

বন্ধুবৎসল চ—বাবু বন্ধুবরের বিপদ দেখিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, স—বাবুর প্রীতিভোজ "পিক্‌নিকে" পরিণত হউক, এবং চাঁদা করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা হউক। সকলেই সাগ্রহে চ—বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া ছাগপীড়িত স—বাবু পরম পুলকিত হইলেন। সেই দিনই সন্ধ্যায় চা পান করিতে করিতে আহার্য্যের তালিকা, বন্ধুবর্গের নাম, চাঁদার পরিমাণ প্রভৃতির রীতিমত বিবরণ আবেগপূর্ণ আলোচনা এবং সুগভীর গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল। স্বয়ং অঙ্কশাস্ত্রবিৎ প্র—বাবু কর্ম্মবীর ন—বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ আয়ব্যয়ের সূক্ষ্মতম হিসাব করিয়া ফেলিলেন। কেবল যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, অর্থাৎ দিনস্থির করাটি বাকি রহিল।

কিন্তু সকলেই জানেন যে, বিশ্ববিস্থালয়ের পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রথম দৃষ্টিতে যে অঙ্কটিকে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও ভদ্র বলিয়া মনে হয়, কার্য্যতঃ সেইটির সমাধানই অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। প্র—বাবু মফঃস্বল চলিয়া গেলেন, হ—বাবুর "সেসন" আরব্ধ হইল, ফ—বাবু কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, ডাক্তার বাবুর অজীর্ণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, এবং ক—বাবু একটি স্থানীয় আন্দোলনের সমাধান লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, ৩৬৫ দিনের মধ্যে কোন দিনেই সকলের সুবিধা হওয়া অসম্ভব।

এমনই করিয়া দুই মাস কাটিয়া গেল। ছাগশিশুর বিপদজনক অবাধ পরিণতি স্মরণ করিয়া স—বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এক দিন তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, আর "পিক্‌নিকে" প্রয়োজন নাই; বলিদানান্তে দেবীর প্রসাদ তিনি বন্ধুবর্গের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দিবেন। কথাটা কর্ম্মবীর ন—বাবুর প্রাণে লাগিল। ন—বাবু হুঁকাহস্তে আস্ফালন করিয়া বলিলেন, "আগামী রবিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। রবিবার দিন যেমন করিয়া হউক 'পিক্‌নিক' আমি করিবই।"

শনিবার রাত্রিতে ন—বাবুর উৎসাহে এবং ক—বাবুর সমর্থনে পরদিন মধ্যাহ্নে "পিক্‌নিক্" স্থির হইয়া গেল। যাঁহাদের সে দিন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা তালিকা হইতে নির্ম্মমভাবে তাঁহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।

সহৃদয় ক—বাবু এই শুভকার্য্যের জন্য আপনার উদ্যান বাটীটা বন্ধুবর্গের কর্ত্তৃত্বাধীনে সমর্পণ করিলেন। উদ্যোগপর্ব্ব আরব্ধ হইল। স্থির হইল ন—বাবু পরদিন প্রভাতে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবেন; এবং ভোজনবিলাসী বি—বাবু এ সম্বন্ধে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। উল্লাসে রথীবৃন্দ বাটী ফিরিলেন। ছাগশিশুর দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স—বাবু বহুদিনের পর প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। প্রত্যুষেই ন—বাবু এবং বি—বাবুর সম্মিলিত হইয়া আহার্য্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিবার কথা। কিন্তু দৈবের উপর মানুষের হাত নাই। সুতরাং সে দিন শয্যাত্যাগ করিতে বি—বাবুর কিছু বিলম্ব হইল। অগত্যা প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া তাঁহার বাড়ী ফিরিতে যথেষ্ট বেলা হইয়া গেল। ফিরিতেই দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট "পরামাণিক" নন্দনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভাবের পারম্পর্য্য অনুসারে তাহাকে দেখিয়াই বি—বাবুর চুল ছাঁটিবার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল। চুল ছাঁটিলেই স্নানের প্রয়োজন। এবং স্নান করিলেই ক্ষুধার

উদ্রেক অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুধার সময় আহার না করিলে "পিত্তপতনের" সমূহ সম্ভাবনা। সুতরাং স্নানান্তে দ্বাদশখানি "পরেটা" এবং দুই ছিলিম তামাকু সেবন করিয়া বাহির হইতে বি—বাবুর ১১টা বাজিয়া গেল। সহকারীহীন ন—বাবু চক্রহীন বিমানের মত কাযেই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

বেলা ১টার সময় আয়োজন সমাপ্ত হইল, মধ্যাহ্ন-আহার মধ্যাহ্ন-বিহারে পরিণত হইল। কিন্তু নির্ব্বিকারভাবে ধূমপান করিতে করিতে বি—বাবু সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আহারেবিহারে প্রভেদ অতি অল্পই; কেবল উপসর্গের বিভিন্নতা মাত্র। আম্রকানন ভেদ করিয়া, অরহর ক্ষেত্র কম্পিত করিয়া, কণ্টকিত খর্জ্জুর শাখার সুখস্পর্শ হইতে কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া "পক্ষীরাজ" সহিত "এক্কা" উন্মুক্ত প্রান্তরে সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ন দুইটার সময় ক—বাবুর উদ্যান দৃষ্টিগোচর হইল। উল্লাসে বন্ধুবর্গ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

রন্ধনের আয়োজন আরব্ধ হইল। নানাপ্রকারের সুভোজ্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মধ্যাহ্নভোজনের আশায় লুব্ধচিত্ত শূন্যজঠর বন্ধুবৃন্দ ভবিষ্যৎ সুখের আলোচনার দ্বারাই বর্ত্তমান অভাবের কথা ভুলিয়া যাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পাচক প্রথমেই "তরকারী" চড়াইয়া দিয়াছিল। তরকারী সিদ্ধ হইয়া আসিলে মশ্‌লার অনুসন্ধান করিতে গিয়া বেচারা সবিস্ময়ে দেখিল যে, মশ্‌লার কোন প্রকার ব্যবস্থাই নাই। অবগত হইয়া ধূমপান বিভোর বি—বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "হাঁ হাঁ মশলাটা আন্‌তে ভুল হ'য়ে গেছে বটে।" বলিয়া তিনি পুনরায় তাম্রকুট সেবনে প্রগাঢ় মনোনিবেশ করিলেন।

বি—বাবুর আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ন—বাবু বলিলেন, "মশাই, আপনাকে দিয়ে কি কোন কায হবার যো নেই?" বি—বাবু অবিচলিতভাবে বলিলেন, "To err is human"। ন—বাবু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বাক্‌বিতণ্ডা ক্রমশঃ বাহুযুদ্ধে পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখিয়া ধীরবুদ্ধি ডাক্তারবাবু পাচককে বলিলেন, "আহা ততক্ষণ মাংসটা সিদ্ধ করে ফেল না। ওতেও ত সময় লাগ্‌বে।" পাচক স্বীকৃত হইয়া মাংসের সন্ধানে গেল। চ—বাবু "মালি"কে মশলা আনিতে পাঠাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মাংসও আনা হয় নাই! বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। স—বাবু হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

থিওসফিষ্ট ফ—বাবু বলিলেন, "আহা এত ভাবচেন কেন? প্র—বাবু ত এখনও আসেন নি, আমি 'টেলিপ্যাথি' করে দিচ্চি, মাংস ও মশলা তাঁর সঙ্গে চলে আসবে।" কিন্তু এ কথায় কেহই কর্ণপাত করিলেন না। ঘোরতর বিতর্ক আরব্ধ হইল, পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আহা আসুন না ততক্ষণ পান্তুয়াগুলার সদ্ব্যবহার করা যাক্, তা'র পর স্থির হ'য়ে একটা ব্যবস্থা করে ফেল্‌লেই হবে।" ডাক্তারবাবু স্বয়ং পথপ্রদর্শন করিলেন, তর্ক করিতে করিতে অজ্ঞাতে অপর সকলেও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দৃষ্টান্তের শক্তি এমনই।

কিন্তু পান্তুয়া সেবনের পরেও সমস্যার কোনই মীমাংসা হইল না। ন—বাবু ক্রোধে মুহূর্মুহু ধূমাকর্ষণ করিতে লাগিলেন; বি—বাবু চ—বাবুর সঙ্গে "বিস্তি" খেলিতে বসিলেন এবং ডাক্তারবাবু অন্য সকলকে নিকটে ডাকিয়া কোন্ খাদ্য কিরূপে রন্ধন করিলে সুপাচ্য ও সুস্বাদু হইতে পারে গম্ভীর ভাবে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পাচক হতাশ হইয়া কেবল জল সিদ্ধ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে সত্যই প্র—বাবু উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাংস ও মশলা। উল্লাসে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিজয়োৎসাহে ফ—বাবু বলিলেন, "কেমন? 'টেলিপ্যাথি' মানেন কি না?" বলিয়াই ঘড়ি ধরিয়া তাঁহার চিন্তার সময় এবং প্র—বাবুর গৃহপরিত্যাগের সময়ের সূক্ষ্ম তুলনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্র—বাবু সকলের বুদ্ধিবৃত্তিকে যথাসাধ্য ধিক্কার দিয়া মাংসাদি পাচককে দিয়া আসিলেন। অচিরে সুখাদ্যের সুরভিতে সমস্ত উদ্যান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স—বাবু ও ন—বাবু ক্ষুধাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী অরহরক্ষেত্রে সুবিমল বায়ুর অন্বেষণে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে অলক্ষিতে আকাশ ধীরে ধীরে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঝড় ও বৃষ্টি আরব্ধ হইল। সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মেঘাচ্ছন্ন শীতরজনীর সন্ধ্যা অতি সত্বর উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে চারি দিক ঘনান্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজনে আলোকের ব্যবস্থা ছিল না। শীতার্ত্ত বন্ধুবর্গ অন্ধকারে জ্বলন্ত চুল্লীকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। কেবল থিওসফিষ্ট ফ—বাবু দূরে সন্ধ্যা-ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

ধ্যানান্তে উদ্বিগ্ন-চিত্তে সকলকে একান্তে ডাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,

"দেখ, আজকের গতিক ভাল নয়। এখানে কোন প্রেতযোনির বাস আছে। রাত্রিতে এখানে আহারের আয়োজন করা ভাল হয় নি।"

দিবালোকে প্রেতকে অবাধে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে, বিশেষতঃ মেঘ ও বর্ষার দিনে কথাটা কিছু গুরুতর হইয়া উঠে। সুতরাং মুখে পরিহাস করিলেও সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী অজ্ঞাতে যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। যখন রন্ধন সমাপ্ত হল তখন চারিদিক "সূচিভেদ্য" অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত; টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে; থাকিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে তুষার শীতল আর্দ্র-বায়ু হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছে।

অন্ধকারেই "পাতা" হইল। অনেক চেষ্টায় একখণ্ড কাষ্ঠকে মশালে পরিণত করিয়া মধ্যস্থলে রাখা হইল। ভোজন আরম্ভ হইল।

প্রথমেই তরকারী ও পলান্ন পড়িল। পোলাও মুখে দিয়া ন—বাবু বলিলেন, "আরে ছ্যাঃ চালগুলো অর্দ্ধেক কাঁচা র'য়ে গেছে! দূর হোক্‌গে মাংসটা বের কর।"

পাচক আসিয়া পাতে মাংস দিয়া গেল। মাংস মুখে দিয়াই ফ—বাবুর মুখ-মণ্ডল ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। ভীতিকম্পিত কণ্ঠে ফ—বাবু বলিলেন, "ভাই যা ভয় ক'রেছিলুম তাই! একেবারে tasteless, কে যেন চিবিয়ে সমস্ত রসটুকু শুষে নিয়েচে!" শুনিয়া সকলেরই বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ন—বাবু পাচককে বলিলেন, "ঠাকুর একবার আলোটা দেখাও ত।" কি আশ্চর্য্য! আলোকের সাহায্যে সকলেই সুস্পষ্ট দেখিলেন, সমস্ত মাংসই যেন চর্ব্বিতাবশেষ! কম্পিতবক্ষে সকলেই নীরবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সহসা বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ দীপ্তি নৈশ অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাদম্বিনীবক্ষে ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বায়ু আসিয়া ক্ষীণ আলোকটিকেও নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে অনুনাসিক স্বরে কে বলিল, "সেলাম বাবু লোগ।"

বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল। "ওরে বাবারে" বলিয়া যে যে দিকে পারিল প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইল! হতবুদ্ধি পাচকও মাংসের কটাহ মাটিতে ফেলিয়া বাবুদের অনুসরণ করিল। কেবল ধীরবুদ্ধি ডাক্তার বাবু এই দারুণ দুর্য্যোগেও মস্তিষ্ক স্থির রাখিয়া উত্তপ্ত "চপে" পকেট দুইটি পূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইতিঃপূর্ব্বেই তিনি একবার ভ্রমণে বাহির হইয়া দোকানদারের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন।

প্র—বাবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, "আহা এমন ষ্টুপিড ত দেখি নি" বলিতে বলিতে অজ্ঞাতে অগ্রগামীদেরই অনুসরণ করিলেন।

অন্ধকারে পথ হারাইয়া, সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া, সিক্তবস্ত্রে, কর্দ্দমাক্ত-দেহে সকলে গৃহে ফিরিলেন।

ডাক্তারবাবু রাত্রিতে দোকানেই রহিয়া গিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিয় সংবাদ দিলেন যে, তাঁহারা যাহার অনুনাসিক শব্দে ধাবমান হইয়াছিলেন, সে ব্যক্তি সেই গ্রামের চৌকিদার; সংবাদ পাইয়া সে বাবুদের "সম্মান দিতে" আসিয়াছিল। তাঁহাদের পলায়নে হতবুদ্ধি হইয়া সে গিয়া গ্রামে সংবাদ দিলে গ্রামের সমুদায় দুষ্ট ছেলে সমবেত হইয়া আহার্য্য সামগ্রী সমস্তই বাটীতে লইয়া গিয়াছে!

শুনিয়া সকলেই লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং সকলে মিলিয়া ফ—বাবুকে আক্রমণ করিলেন। ফ—বাবু বলিলেন, "কিন্তু মাংসের ব্যাপারটা?" সকলে বলিলেন "মাংস ত আমরা মুখেই দিই নি।" ফ—বাবু বলিলেন "সেটা কি আমার দোষ?" সংবাদ লইয়া জানা গেল, আহার্য্যের সঙ্গে রন্ধনপাত্রগুলিও অপহৃত হইয়াছে! পাত্রগুলি অপরের, সুতরাং চাঁদার টাকা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ন—বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; বি—বাবু "খাওয়াটা মাঠে মারা গেল" বলিয়া ক্ষোভে ম্রিয়মান হইলেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ স—বাবু জ্যোতিষমতে তাঁহার সে সময়টা কিরূপ যাইতেছে তাহারই গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

কালী পোদ্দার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কেবলরাম পোদ্দার নামক একজন সুবর্ণবণিক্ ব্যবসায়বাণিজ্যের সুবিধার আশায়-পৈত্রিক বাসস্থান বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া যশোহরের নিকটবর্ত্তী বগচরে আইসেন। কেবলরামের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কিন্তু ব্যবসায়বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিয়া ধনশালী হইয়া উঠিলেন। কেবলরাম অর্থলাভ করিয়া জমীদারী ক্রয় করিতে ব্যগ্র হইলেন।

এই সময় দশশালা বন্দোবস্তের ফলে অনেক প্রাচীন জমীদারের জমীদারী বিক্রয় হইতে থাকে। কেবলরাম এই সুযোগে চাঁচড়ার রাজাদিগের সম্পত্তি হইতে ইষফ্‌পুর ও ইমাদ্‌পুর প্রভৃতি কয়েকটি পরগণার কতকাংশ ক্রয় করিলেন। কালীপ্রসাদ এই কেবলরামেরই পুত্র।

গুরুপ্রসন্ন নামে কালীপ্রসাদের এক সহোদর ছিলেন। সুতরাং কেবল-রামের মৃত্যুর পর কালীপ্রসাদ অর্দ্ধাংশে সামান্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সামান্য সম্পত্তির আয় হইতে যে বহুব্যয়সাধ্য সাধারণ-হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন, প্রভূত সম্পত্তিশালীর পক্ষেও তাহা করিতে পারিলে শ্লাঘার বিষয় হইত।

কালীপ্রসাদের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাঁহার নির্ম্মিত বগচর হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুপ্রশস্ত রাজবর্ম্ম। ইহা "কালীপোদ্দারের রাস্তা" নামেই পরিচিত। শুনা যায়, এক সময়ে কালীপ্রসাদের বৃদ্ধা মাতা গঙ্গাস্নানে যাইতে অভিলাষিণী হইয়া পুত্র কালীপ্রসাদকে সে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। পুত্র মাতার জন্য পাল্‌কী বেহারা ও লোকজনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে সে সংবাদ দিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা একটু হাসিয়া বলিলেন—"কালী, আমার যাইবার জন্য ত পাল্‌কীর বন্দোবস্ত করিলে, কিন্তু আমার পাড়াপ্রতিবেশী গরীব-দুঃখীর যাইবার কি বন্দোবস্ত করিয়াছ? তাহারা যে আমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইবে বলিয়া আশা করিয়া আছে। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া না লইয়া যাইতে পারিলে আমার ত স্নানের ফল হইবে না!" পুত্র লোকজন বন্দোবস্ত করিয়া রাস্তার কার্য্য আরব্ধ করাইয়া দিলেন। কালীপ্রসাদের অনুষ্ঠিত রাস্তা নির্ম্মাণ শেষ হইলে পুত্রগৌরবে গৌরবান্বিতা জননী সেই রাস্তা দিয়া পাড়াপ্রতি-বেশী গরীবদুঃখীদিগকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন।

এই রাস্তা ব্যতীত কালীপ্রসাদ আরও বহু সাধারণহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। এ স্থলে আমরা তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—১। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে উঠিবার সোপান ২। আঠারনালা ঘাটের মন্দিরসম্মুখস্থ ইষ্টকনির্ম্মিত নাটমন্দির ৩। ধলেশ্বরী দেবীর মন্দিরসম্মুখস্থ ইষ্টকনির্ম্মিত নাটমন্দির। ৪। দাইতলা খালের উপরিস্থিত ইষ্টকসেতু ৫। নীলগঞ্জের নিম্নস্থ ভৈরব নদের উপরিস্থিত ইষ্টকসেতু ৬। নীলগঞ্জের ধর্ম্মশালা ৭। চূড়ামণকাটি হইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ১৫০ মাইলব্যাপী রাজবর্ত্ম ৮। ঝিকারগাছার নিকটস্থ কপোতাক্ষ নদের উপরিস্থিত লৌহসেতু। ৯। যাদবপুরের নিকট বেতনা নদীর ইষ্টকসেতু। ১০। কান্তপুরের ইষ্টকসেতু। ১১। নাওভাঙ্গা হরিদাসপুরের ইষ্টকসেতু।

ইহার মধ্যে কয়েকটি কার্য্যের সাময়িক সংস্কারব্যয়নির্ব্বাহজন্য কালীপ্রসাদ বার্ষিক তিন শতাধিক মুদ্রা আয়ের ভূমীসম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করেন।

তখন উদারহৃদয় মিষ্টার ওয়ালটার এস্, সিটন-কার একাধারে যশোহরের জজ ও কালেক্টর। তিনি গভর্ণমেণ্টকে কালীপ্রসাদের এই সদনুষ্ঠানগুলির কথা লিখিয়া জানাইলে গভর্ণমেণ্ট একজোড়া শাল,একটি জোব্বা এবং সোণার জরি ও মুক্তাখচিত একটি শিরপেঁচ খিলাতসহ কালীপ্রসাদকে 'রায়' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত ও অভিনন্দিত করিবার জন্য মিষ্টার সিটন-কারকে অনুমতি করেন। কালীপ্রসাদকে এই খিলাত ও উপাধি প্রদান উপলক্ষে মিষ্টার সিটন-কার ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ যশোহরে এক দরবারের অনুষ্ঠান করেন। এই দরবারে সিটন-কারের পর ভদ্রলোকদিগের প্রতিনিধিরূপে রায় লোকনাথ বসু ও নীলমাধব ঘোষ কালীপ্রসাদের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসাদ সেই স্থলেই যশোহর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ৪০০৲ টাকা, দাতব্য হাঁসপাতালে ১০০৲ ও দরবার উপলক্ষে সমবেত দরিদ্রদিগকে ৩০০৲ টাকা বিতরণ করিয়া স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কালীপ্রসাদ চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জনহিতকর পুণ্যকার্য্যাবলী আজিও তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষিত করিতেছে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

সমালোচনা।

সঙ্গীত-চন্দ্রিকা।*

অধুনা শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে সঙ্গীতসম্বন্ধে স্বরলিপিগ্রন্থপ্রচারের চেষ্টা হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও মহারাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। ইহাঁরা 'সঙ্গীত-সার' 'কণ্ঠকৌমুদী' ও 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা' এই তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সঙ্গীত শিক্ষার্থিগণের এক বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। এই সঙ্গে অপর এক-খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেখানি স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার'। শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয়ের পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর হইল নাড়াজোলাধিপতির সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যো-পাধ্যায় 'সঙ্গীতমঞ্জরী' নামক কণ্ঠসঙ্গীতের এক স্বরলিপিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সঙ্গীত-জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্দ্ধ-মানাধিপতির সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাও কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরলিপিগ্রন্থ।

এতদ্দেশীয় নিরক্ষর 'কালোয়াৎ'দিগের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে যে, সঙ্গীত জিনিষটা লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য নহে। সুতরাং কোন স্বরলিপি-পুস্তকের প্রচার দেখিলে তাঁহারা অগ্রেই নাসিকাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে ওস্তাদের মুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। গুরুমন্ত্র যেমন লিখিয়া শিখিতে নাই, সেইরূপ সঙ্গীতও লিপিবদ্ধ করিয়া শিখিলে চলিবে না; লিপিবদ্ধ করিলে সঙ্গীতের গৌরব নষ্ট হইবে। এই বিশ্বাস একান্ত ভ্রান্ত।

মোটামুটি সঙ্গীত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত। এতদুভয়ের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতেরই প্রাধান্য। ইহার কারণ এই যে, কণ্ঠোদ্ভূত ধ্বনির মধ্যে যতটা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, যন্ত্রোদ্ভূত ধ্বনির মধ্যে ততটা হয় না। যন্ত্রে স্বাধীনভাবে সঙ্গীত হইলেও উহার প্রধান উদ্দেশ্য কণ্ঠসঙ্গীতের সহায়তা করা। সুতরাং কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরলিপিসম্বন্ধে আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

ধ্বনির বৈচিত্র্যই সঙ্গীতের প্রাণ। সঙ্গীত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনিকে সময়বিভাগ করিয়া কৌশলে সাজান হইয়াছে। ধ্বনির

---

* শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৬১ ও ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ২, টাকা।

প্রকারভেদ ও সময়ের বিভাগ এই দুইটিকে সঙ্গীতের অস্থিচর্ম্ম বলা যাইতে পারে। সঙ্গীতের কারুকার ঐ উপাদান হইতে সঙ্গীতের মূর্ত্তি খাড়া করেন। সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিতে হইলে উহার উপাদান দুইটিকে অগ্রে লিপিবদ্ধ করিতে পারা আবশ্যক।

গানের মধ্যে যে প্রকার সময়বিভাগ থাকে তাহা লিপিবদ্ধ করা ততদূর কঠিন নহে। ইহার কারণ, গানে একটা ছন্দ থাকে, সঙ্গীতের ভাষায় তাহাকে তাল কহে। এই ছন্দ গানের মধ্যস্থিত ধ্বনিগুলির স্থিতিকাল এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, কোন একটা স্থিতিকালকে নির্দ্দিষ্ট করিলে অপরগুলিকে তাহার অংশ বা গুণিতক হিসাবে প্রকাশ করিতে পারা যায়।

ধ্বনির প্রকারভেদ কিরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। কণ্ঠোদ্ভূত ধ্বনির তিনটি বিশেষত্ব আছে। উহা স্বর হইতে পারে কিম্বা ব্যঞ্জন হইতে পারে। যদি স্বর হয়, তবে 'অ', 'ই' 'উ' প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের কোন একটা হইবে। যদি ব্যঞ্জন হয় তবে 'ক' 'চ' 'ত' 'প' প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যঞ্জনের কোন একটা হইবে। এই গেল প্রথম বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়া আমরা পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি। ধ্বনির দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রবল ভাবে কিম্বা মৃদু ভাবে উচ্চারিত হইতে পারে। দূরে অবস্থিত কোন ব্যক্তিকে ডাকিবার সময় আমরা প্রবল ভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করি; কিন্তু নিকটস্থ কোন ব্যক্তির সহিত কথোপকথনের সময় ধ্বনি অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া লই। ধ্বনির তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, উহার ওজন (pitch) উচ্চ হইতে পারে কিম্বা নিম্ন হইতে পারে। উচ্চ বলিতে চড়া বুঝায় এবং নিম্ন বলিতে খাদ বুঝায়। এই চড়া খাদের আবার নানাবিধ স্তর হইতে পারে। ধ্বনির এই বিশেষত্বের প্রধান ব্যবহার সঙ্গীতে।

ধ্বনির স্বরব্যঞ্জন হিসাবে প্রকারভেদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং সঙ্গীতের স্বরলিপিকরণে উহার জন্য আর নূতন চিহ্নের প্রয়োজন নাই।

মৃদুপ্রবল হিসাবে ধ্বনির যে প্রকারভেদ হইতে পারে হিন্দুসঙ্গীতে তাহার স্থান নাই বলিলেও চলে। সেটা হিন্দুসঙ্গীতের পক্ষে মর্য্যাদাসূচক নহে। গীতের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে ধ্বনি মৃদু বা প্রবল করিতে পারিলে উহার যে সৌন্দর্য্য বাড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে দুই চারি কথা পরে বলিব।

ধ্বনির ওজন হিসাবে যে প্রকারভেদ তাহার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্নের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে কি না দেখা যাউক

পৃথক্ পৃথক্ ওজনের ধ্বনিকে পৃথক্ পৃথক্ স্বর বলা যায়। সঙ্গীতে যে স্বরগুলি লাগে তাহাদের ওজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকে। সে সম্বন্ধ তত জটিল নহে। সঙ্গীতের শ্রুতিমধুরত্ব অনেকাংশে এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। হিন্দুসঙ্গীতে ব্যবহৃত স্বরসকলকে ওজনের নিম্নোচ্চতা অনুসারে সাজাইয়া স্বরগ্রাম রচিত হইয়াছে। ঐ স্বরগ্রাম এরূপ সম্পূর্ণ যে, উহার মধ্যস্থিত স্বর ভিন্ন অন্য স্বর সঙ্গীতে লাগাইলে শ্রুতিকটুদোষ ঘটে। সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বরগ্রামস্থ স্বরগুলিকে 'ষড়জ', 'ঋষভ', 'গান্ধার' প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।* এখন ইহাদের জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্নের উদ্ভাবন করিলেই সঙ্গীতের স্বরলিপির যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করা হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাক্যের ন্যায় সঙ্গীতও লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য। পার্থক্য এই যে, সঙ্গীতের স্বরলিপিতে স্বরের বিভিন্নতা প্রকাশ করিতে হয়, বাক্যের স্বরলিপিতে তাহার প্রয়োজন হয় না।

কোন বিদ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিলে তাহা হইতে দুইটি ফলের আশা করা যায়। প্রথমতঃ, সেই বিদ্যা অবিকৃত অবস্থায় বজায় থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, সুলভে উহার শিক্ষাবিস্তার হইবে। সমালোচ্য গ্রন্থখানির দ্বারা এই দ্বিবিধ ফললাভেরই আশা করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থে যে সকল ওস্তাদী গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিই ধ্রুপদাঙ্গ, অধিকাংশ মিঞা তানসেন ও বৈজুবাওরা এই দুই শ্রেষ্ঠ গায়কের রচিত। তাঁহারা যে ভাবে গাহিয়াছিলেন গীতগুলি ঠিক সেই ভাবে বজায় আছে কি না তাহা এক্ষণে জানিবার কোন উপায় নাই। স্বরলিপি প্রচলিত না থাকায় তাহারা বিভিন্ন ওস্তাদের মুখে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা স্বীয় ওস্তাদের নিকট সেগুলি যে ভাবে শিখিয়াছেন, অবশ্য সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আকবর বাদশাহের সময় হইতে ওস্তাদের মুখে ফিরিয়া গীতগুলির যে কিছুই রূপান্তর ঘটে নাই, এরূপ বলা কঠিন। তবে এ কথা ঠিক যে, এখনও তাহাদের যে রূপ আছে, লিপিবদ্ধ না হইলে তাহাও ক্রমশঃ লোপ পাইত; এবং কালে ঐ সকল গীতের কি দুর্গতি হইত তাহা ভাবিবার বিষয়। গ্রন্থকর্ত্তা তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুসঙ্গীতের কত উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

পক্ষান্তরে গ্রন্থখানিকে প্রথম শিক্ষার্থিগণের সম্পূর্ণ উপযোগী করা হইয়াছে।

* নিষাদর্ষভগান্ধারঃ ষড়জমধ্যমধৈবতাঃ।
পঞ্চমশ্চেত্যমী সপ্ত তন্ত্রী কণ্ঠোত্থিতাঃ স্বরাঃ॥

ইহা হইতে কেহ না মনে করেন যে, সঙ্গীতে একেবারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিনা সাহায্যে ইহা আয়ত্ত করিতে পারিবেন। যাহার অক্ষর-পরিচয় হয় নাই এমন বালকের নিকট যদি একখানা বর্ণপরিচয় পুস্তক ফেলিয়া দেওয়া যায়, সে যেমন শুধু 'অ' 'আ' 'ই' প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না, তেমনই যে ব্যক্তির স্বরগ্রামসাধনা হয় নাই, সে যে শুধু 'সা' 'গা' 'পা' প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া গান শিক্ষা করিতে পারিবে তাহা আশা করা যায় না। প্রথম প্রণালীগুলি গুরুর সাহায্যে রীতিমত অভ্যাস করিয়া যদি কেহ এই পুস্তক হইতে গান শিক্ষা করিবার প্রয়াস পায়েন তিনি সফল হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্বরলিপি দেখিয়া গান শিক্ষা প্রথম প্রথম কিছু কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে। সেটা সকল ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। রীতিমত অক্ষর পরিচয় হইবার পরেও একটানা পড়িয়া যাওয়া প্রথম প্রথম কঠিন বোধ হয়। কিন্তু পড়িতে পড়িতে এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, অক্ষর দেখিয়া ভাবিবার আবশ্যক হয় না; দৃষ্টি ও আবৃত্তির মধ্যে যে মস্তিষ্কের একটা ক্রিয়া হইয়া যায় সেটা ধরিতেই পারা যায় না। সেইরূপ স্বরলিপি অভ্যস্ত হইয়া গেলে তদ্দৃষ্টে গান-সাধনা অতি সহজ ব্যাপার হইয়া পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে বিস্তারিত স্বরসাধনপ্রণালী, পরে কয়েকটি রাগিনীর 'সরগম', তদনন্তর কতকগুলি সহজ গানের স্বরলিপি এইরূপে সিঁড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রথম শিক্ষার্থীর শিক্ষার পথ যথেষ্ট সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিশেষ পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যে স্থানে কাব্যশাস্ত্রের ছন্দের সহিত সঙ্গীতের তালের ঐক্য সমাধান করা হইয়াছে সে স্থানটি অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। তনুমধ্যা ছন্দের সহিত সুর ফাক্তা তালের তুলনা করা হইয়াছে। ছন্দোমঞ্জরী তনুমধ্যার এই প্রকার লক্ষণ দিয়াছেন—

মূর্ত্তির্মুরশত্রো রত্যদ্ভুতরূপা।
আস্তাং মম চিত্তে নিত্যং তনুমধ্যা।

দণ্ডচিহ্নের দ্বারা স্থিতিকাল জ্ঞাপন করিলে উক্ত ছন্দের হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব এইরূপে দেখান যায়:—

॥	॥	।	।	॥	॥		॥	॥	।	।	॥	॥
মূ	র্ত্তি	র্মু	র	শ	ত্রো		র	ত্য	দ্ভু	ত	রূ	পা

জলদ সুরফাক্তা তালের বোল এইরূপ:—

॥	॥	।	।	॥	॥
ধা	ঘেনে	গ	দি	ঘেনে	নাক্

সুতরাং দেখা যাইতেছে তনুমধ্যা ছন্দের প্রত্যেক চরণে সুরফাক্তা তালের দুই ফের্‌তা আছে।

স্বরলিপিকরণে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রবর্ত্তিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। নিজের খেয়ালমত নূতন সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রবর্ত্তন করা অপেক্ষা প্রচলিত চিহ্ন ব্যবহার করা যে সর্ব্বতোভাবে সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে হয় ত বলিবেন, প্রচলিত সাঙ্কেতিক চিহ্নে নানাপ্রকার ত্রুটি আছে। তাহা স্বীকার করিলেও প্রচলিত চিহ্ন ছাড়িয়া নূতন চিহ্ন ব্যবহার করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা অক্ষরের অনেক ত্রুটি আছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা অক্ষরকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার পরামর্শ দেন, তবে তাঁহার পরামর্শ সৎপরামর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।

কেহ কেহ বলেন, ইংরাজী নোটেশন ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে স্বরলিপি সকল জাতিরই পক্ষে সহজবোধ্য হইবে। এ দেশে একলিপি-বিস্তারের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহার ফলাফল না দেখিয়া এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশের প্রচলিত সঙ্কেত ব্যবহার করাই ভাল।

একটা কথা বলিয়া এই সমালোচনা শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এতদ্দেশীয় সঙ্গীতে ধ্বনির উত্থানপতনের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, সঙ্গীতের রসসৃষ্টিক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এইজন্য বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপরে উহা সম্যক উপভোগ করিতে পারেন না। বিশেষজ্ঞেরও যে উপভোগ সে কতকটা বোধাত্মক; সম্পূর্ণ অনুভবাত্মক নহে। কিন্তু সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণমাত্রায় রসসৃষ্টি হইলে তাহা সকলেরই উপভোগের বিষয় হইবার কথা। সঙ্গীতবিৎগণ যদি এ বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিহার করেন, তাহা হইলে বোধ হয় সাধারণ্যে সঙ্গীতের আদর অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ওস্তাদী গানের নাম শুনিলেই সঙ্গীতানভিজ্ঞ লোকের নিদ্রাবেশ হয়। তাহার কতকটা কারণ যে, উহার রস-সৃষ্টিক্ষমতার অভাব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধ্বনি উপযুক্ত স্থলে প্রবল বা মৃদু না হইলে শুধু রাগিণী ও ছন্দের গুণে শ্রোতৃহৃদয়ে আঘাত করিতে পারে না। একটানা বক্তৃতা শুনিতে যেমন লোকের ভাল লাগে না; একটানা গান শুনিতেও তেমনই বিরক্তি জন্মে। ধ্বনির উত্থান ও পতনে সঙ্গীতের যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তাহা উপেক্ষনীয় নহে।

স্বরলিপিকারগণ যদি ধ্বনির উত্থানপতনের সঙ্কেত চিহ্ন উদ্ভাবিত করিয়া স্বরলিপি-গ্রন্থে উহা সন্নিবিষ্ট করেন তবে তদ্দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষা করা গান গাহিয়া যদি না জমাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্যমভঙ্গ হয়। শিক্ষানবীসের অদৃষ্টে সঙ্গীতানভিজ্ঞ শ্রোতাই অধিক জুটিয়া থাকে। অথচ তাহাদের মনোরঞ্জন করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। শিক্ষার্থীর গান সুরলয়তালসম্বন্ধে হয় ত নির্দ্দোষ, কিন্তু তথাপি তাঁহার গানে রসসৃষ্টি না হওয়ায় সাধারণ শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। শিক্ষার ঈদৃশ ফল দেখিয়া শিক্ষার্থীর আগ্রহ কমিয়া যায়। হয় ত তাঁহার শিক্ষা এই স্থানেই সাঙ্গ হয়। ধ্বনির উত্থান-পতনের দ্বারা ইহার আংশিক প্রতিবিধান হইলেও তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

'সঙ্গীতচন্দ্রিকার' গ্রন্থকর্ত্তা ভবিষ্যতে যদি এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া স্বরলিপি প্রস্তুত করেন তাহা হইলে তাঁহার স্বরলিপি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। আমরা তাঁহার গ্রন্থের প্রথম ভাগ দেখিয়া সম্পূর্ণ প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি, গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ সত্বর প্রকাশিত হইতে দেখিব।

শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত।

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

ব্রসেল্‌স্।

লণ্ডন হইতে অনেক পথে ব্রসেল্‌সে যাওয়া যায়। তবে ডোভার পর্য্যন্ত ট্রেনে যাইয়া তাহার পর Royal Belgian Mail Packetএ অষ্টেণ্ড পর্য্যন্ত এবং অষ্টেণ্ড হইতে ব্রসেল্‌স্ রেলে যাইবার পথই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দূর। মেল্ বোট-গুলি খুব ছোট ছোট; ডোভার-ক্যালের মধ্যে যেরূপ জাহাজ চলে সেই প্রকার। সমুদ্র শান্ত থাকিলে ২৷০ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টায় ডোভার হইতে অষ্টেণ্ড পৌছান যায়। আমি যে দিন যাই সে দিন সমুদ্র বড় সুবিধামত ছিলেন না। আকাশ মেঘাবৃত, সমুদ্র কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত, কাযেই ছোট জাহাজ বেশ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে বেশ আমোদ বোধ হইতেছিল; অর্দ্ধঘণ্টা পরে যখন আহারান্বেষণে নিম্নে যাইলাম, তখনও বেশ। কিন্তু কিছু আহারের পরেই একটা মাংসের ডিসে অতি ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলাম। প্রথমে মনে হইল বুঝি মাংস পচা; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, রোগ খাদ্যে নহে, খাদকে; আমাকে সমুদ্র পীড়ায় ধরিয়াছে। মনটা বড় খারাপ হইল। দুস্তর আরব সাগর প্রভৃতি অবলীলাক্রমে কাটাইয়া শেষে কিনা ক্ষুদ্র North Seaতে বিপাকে পড়িলাম! যাহা হউক, কিঞ্চিৎ উদ্গীরণ করিয়া দেহ অনেকটা সুস্থ হইল। অষ্টেণ্ড পৌছিতে চারি ঘণ্টা লাগিল। কপালের ভোগ, কে খণ্ডাইবে? সমুদ্রের ধারেই রেল ষ্টেশন। প্রথমে নামমাত্র কাষ্টম পরীক্ষা করিয়া রেলে উঠিতে দিল। দুই ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার পর ৬টার সময় ব্রসেল্‌স্ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পৌছিলাম। অক্টোবরের শেষ, প্রায় ৪৷৷০টায় সূর্য্যাস্ত হয়; কাযেই ৬টা বেশ রাত্রি, তদুপরি অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। হোটেলে পৌছিয়া হাত মুখ ধুইয়া আহার-কক্ষে যাইলাম। গিয়া দেখি, হোটেলে যাত্রীর সংখ্যা অনেক। ব্রসেল্‌সে তখন প্রদর্শনী চলিতেছে। যদিও প্রদর্শনীর প্রায় শেষ তথাপি অনেক লোক তখনও আসিতেছেন। টেবলে য়ুরোপের অনেকদেশবাসী লোকই দেখিলাম। এসিয়ার প্রতিভূ আমি ও একজন জাপানী যুবক। জাপানী-টির সহিত সামান্য পরিচয় হইল। তিনি বলিলেন, আগামী বর্ষে তাঁহার ভারতবর্ষ দেখিবার অভিলাষ আছে।

আহারের পর, হোটেল আপিস হইতে একজন "গেথো" সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। রাত্রিতে ঘণ্টা দুই ঘোরা গেল, বিশেষ ভাল লাগিল না। তখন অনেক জায়গাই বন্ধ এবং বৃষ্টি তখনও চলিতেছে। যে স্থান অগ্নিদাহে

ভস্মীভূত হইয়াছিল দেখিলাম, সে স্থলে লতাপাতা দিয়া সব ঢাকিয়া দিয়াছে। প্রদর্শনীর স্থান খুব প্রকাণ্ড বলিয়াই বোধ হইল। ট্রামে হোটেলে ফিরিলাম। সহরের যেটুকু দেখিলাম, অনেকটা প্যারিসের ন্যায় সুশোভন এবং প্যারিসেরই ন্যায় পাপপঙ্কিল মনে হইল।

সকালে কুক কোম্পানির প্রেরিত গাড়ি ও পরিদর্শক আসিল। তাহার সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলাম, ব্রসেল্‌সের রাস্তা অতি চমৎকার। অনেকগুলি রাস্তা খুব চওড়া। প্রথম দুই ধারে ফুটপাথ, তাহার পর দুই ধারে গাড়ির রাস্তা, তাহার পর দুই ধারে দুই সারি করিয়া বৃক্ষশোভিত প্রকাণ্ড avenue সংযুক্ত ফুট-পাথ এবং সর্ব্বমধ্যে পুনরায় চওড়া গাড়ির রাস্তা। এত প্রশস্ত রাস্তা ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে দেখি নাই। এরূপ রাস্তা ব্রাসেল্‌সে ও এণ্টওয়ার্পে অনেকগুলি আছে। ব্রসেল্‌সের এইরূপ একটি রাস্তা ২॥০ মাইল লম্বা, তাহারই শেষ সীমায় প্রদর্শনী ছিল।

বলা উচিত, বেলজিয়ম খুব সমতল দেশ। তবে ব্রসেল্‌স্ (দেশীয় ভাষায় ব্রুক্সেল) পার্ব্বত্য বটে। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে রাজবাটীর নিকটে বিচারালয় (Palais du Justice)। য়ুরোপে এত বড় বিচারগৃহ আর নাই। দেশটি খুব ছোট, তাই হাইকোর্টটি য়ুরোপে বৃহত্তম! প্রবেশ-পথের নিকটে সিঁড়ির দুই ধারে দুইটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, একটি ডিমস্থিনিসের, আর একটি কাহার মনে নাই। সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মূর্ত্তি কি মর্ম্মরের ?" তিনি বলিলেন, "না আমাদের গরীব দেশ, প্রস্তরমূর্ত্তি কোথায় পাইব ?" বিচারালয় দেখিয়া ত দেশ কিছুমাত্র দরিদ্র বলিয়া বোধ হইল না। যে স্থানে (কক্ষ বলিতে ভয় হয়) ব্যবহারজীবিগণ মোয়াক্কেলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন সেটি ত প্রায় আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের Quadrangle এর ন্যায় প্রশস্ত বলিয়া মনে হইল। অনেক ব্যারিষ্টার দেখিলাম, গাউনে ফার্ (fur) লাগান। বোধ হয় তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বড়দরের—King's Counsel জাতীয়। দুই একজন বিচারপতি দেখিলাম, মাথায় ছোট ছোট টুপি পরিয়া বিচারাসনে বসিয়া আছেন। ভাষা অজ্ঞাত থাকাতে অবশ্য মোকর্দ্দমা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আমার বাসস্থানের নিকটেই ব্রসেল্‌সের টাউনহল বা Hotel de Ville অবস্থিত। চকমিলান প্রকাণ্ড বাড়ী; ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। সম্মুখে বাঁধান উঠান; তথায় শাক সব্‌জি প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। এই বাটীতে মুনিসিপাল আপিস অবস্থিত।

ব্রসেল্‌সের ন্যাশনাল গ্যালারিতে অনেক ভাল ভাল চিত্র আছে, তবে ভ্যান-ডাইক (Van Dyck) চিত্রিত ছবিরই কিছু আধিপত্য। আর এক ভয়ানক চিত্রশালা আছে, Weirtz নামক একজন চিত্রকর নিজের অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র মৃত্যুর পর সাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বাটীতে সেগুলি রক্ষিত। চিত্রগুলি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। পাপের, রোগের ও মানসিক বিকারের চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি নাকি কাহাকেও এ সব চিত্র দেখান নাই। লোকটির শিক্ষা ও শিল্পদক্ষতা অসাধারণ, কিন্তু কি জন্য যে তিনি এ সব ভয়ানক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলা কঠিন। এক কোণে একটি কুকুর বদ্ধ রহিয়াছে; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এখনই কামড়াইবে, ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জীবন্ত নহে, অঙ্কিত। একটা প্রকাণ্ড চিত্র আছে, মৃত্যুর পর পাপীর শাস্তি। সে চিত্র দেখিলে অনেক দিন সুনিদ্রা হওয়া কঠিন।

বৈকালে পুনরায় প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন দেশের দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত। প্রত্যেক গৃহ বা কোর্ট দেখিতে একাধিক সপ্তাহ লাগে। যন্ত্রবিভাগে যাইয়া ভাবিলাম, একটা কোনরূপ যন্ত্র বিশেষ করিয়া দেখিব। কিন্তু সম্ভব হইল না;—প্রত্যেক প্রকারের অনেকগুলি যন্ত্র বর্ত্তমান। বিশেষজ্ঞ লোকের সাহায্য ব্যতীত কিছুই বুঝা যায় না।

প্রদর্শনীস্থান হইতে সেক্সপীয়ার পাঠকের সুপরিচিত আর্ডেন কানন (Forest of Ardennes) নয়নগোচর হয়।

অতি সঙ্গোপনে বলিতে হয়, ব্রসেল্‌স্‌বাসিনীদিগের মুখ কমনীয়তা ও কোমলতা বড় কম দেখিলাম।

য়্যাণ্টওয়ার্প।

য়্যাণ্টওয়ার্প (দেশীয় ভাষায় য়্যাভার্‌ন্‌) য়ুরোপের দ্বিতীয় বৃহৎ বন্দর। শুনিলাম যে, জর্ম্মনির একটি বন্দর ইহার অপেক্ষা বড়। নানাদেশীয় বৃহৎ বৃহৎ জাহাজে বন্দর পরিপূর্ণ। য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের ও আমেরিকার পোত তথায় রহিয়াছে। এই স্থানেও ব্রসেল্‌সের ন্যায় অনেকগুলি অতি প্রশস্ত রাস্তা দেখা যায়। একটি খুব বড় পার্ক আছে; তাহার মধ্যে একটি হ্রদে একটি ভাসমান উদ্যান। এই পার্ক য়্যাণ্টওয়ার্পবাসীর কাম্য স্থান। ইহার নিকটস্থ রাস্তায় একটি ভদ্রলোক কয়েকটি বাটী তৈয়ার করিয়াছেন, প্রত্যেকটি য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্থাপত্যাদর্শে নির্ম্মিত, মোটের উপর দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে।

*এ্যাণ্টওয়ার্পে রুবেন্‌স্ (Rubens) এর অত্যন্ত প্রভাব। রুবেন্‌সের মর্ম্মর মূর্ত্তি ও বিখ্যাত কর্ম্মকার চিত্রকর কুইনটিন ম্যাটসিস্ (Kuintin Matsys) এর মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। ন্যাসনাল গ্যালারিতে অতি সুন্দর চিত্র ও মর্ম্মর মূর্ত্তির সমাবেশ, অধিকাংশই রুবেন্‌স্ ও তাঁহার ছাত্রদ্বয় ভ্যান ডাইক্ ও জর্ডানের (Jordannes) অঙ্কিত।

এ স্থানের কেথিড্রাল বা গির্জ্জা অতি প্রসিদ্ধ। তথায় টিসিয়ানের (Titian) অঙ্কিত কয়েকটি সুন্দর তৈলচিত্র রক্ষিত আছে, রুবেন্‌সের চিত্রের ত কথাই নাই। তদ্ভিন্ন তথায় একটি আশ্চর্য্য বস্তু আছে। অল্টারের (Altar) ঠিক পশ্চাতে তিনটি চিত্র আছে। দেখিলে মনে হয় যেন মর্ম্মর মূর্ত্তি (Sculpture in relief) কিন্তু হাতে দিলে বুঝা যায়, Black and white painting মাত্র। আবার সরিয়া দাঁড়াইলে মনে করা যায় না যে, মর্ম্মরগঠিত নহে। কেথিড্রালের Stained glass windows গুলিও বড় চমৎকার; অতি সুন্দর চিত্রে পরিশোভিত।

কেথিড্রাল ভিন্ন সেণ্টপলের গির্জ্জা নামধেয় একটি ভজনালয়ের সন্নিকটে Calvary বা শ্মশান চিত্রিত আছে। তথায় মর্ম্মরে একটি পরিত্যক্ত শ্মশান গঠিত ও নরকের দৃশ্য প্রদর্শিত। স্থানটি বিভীষিকাময়।

এম্‌ষ্টারডাম।

এ্যাণ্টওয়ার্প হইতে হলাণ্ডের রাজধানী এম্‌ষ্টারডামে আসিতে পথের শোভা অতি মনোরম। বেলজিয়মে রেলের দুই ধারে জঙ্গল ও ঘন বন। রোসেনডাল নামক ষ্টেসনে Customs পরীক্ষা হয় ও ঘড়ি কুড়ি মিনিট বাড়াইয়া লইতে হয়। ইহাই হলাণ্ডের প্রথম ষ্টেশন। তাহার পর দুই ধারে কেবল জল ও জলাভূমি। জলের মধ্যে কাঠের বড় বড় গুঁড়ি ফেলিয়া মাটি চাপা দিয়া তাহার উপর রেল বসান। আমি যে গাড়িতে ছিলাম, তাহাতে দুইটি ইংরাজ ছিলেন। ইঁহারা পিতাপুত্র—পিতার বয়ঃক্রম ৯০, পুত্রের ৫০। পিতা বোধ হয় ইংলণ্ডের বাহিরে খুব কমই আসিয়াছেন। তিনি বিদেশে সবই অপছন্দ করিতেছিলেন। পথে কোনও ষ্টেশনে চা পাওয়া গেল না; বৃদ্ধ বড়ই বিরক্ত হইলেন। পুত্রের পিতৃভক্তি অনন্যসুলভ; তিনি পিতার সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিলাম।

এম্‌ষ্টারডাম সমস্ত সহরটাই জলের উপর অবস্থিত। বড় বড় গাছের ডাল সোজা জলের মধ্যে প্রোথিত করিয়া পার্শ্বস্থ স্থান ইট চূণ দিয়া ভরাট করিয়া সেই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মিত। এমন কি রাজবাড়ীও এইরূপ। রাণী

এ স্থানে খুব কমই বাস করেন। কিন্তু আবাসভবনটি খুব জমকালো ; মর্ম্মরের অত্যন্ত ছড়াছড়ি। প্রায় সকল কক্ষেই মর্ম্মরের উপর সুন্দর কারুকার্য্য (frieze) ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। তলস্থ বৃক্ষকাণ্ডগুলি এতকাল পচে নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না। রাজবাটীর একপার্শ্বে একটি Square এর মত। সেই দিকে একটি Balcony বা বারাণ্ডা। সেই স্থান হইতে রাণী (বা রাজা) প্রজাদের দর্শন দেন।

এম্‌ষ্টারডামে অনেক খাল ; তবে রাস্তাও আছে, কিন্তু অপ্রশস্ত, আমাদের দেশের গ্রাম্য রাস্তার মত। কাযেই দুই ধার দিয়া গাড়ি চলিতে দেয় না ; কোনও রাস্তায় হয় ত উত্তর হইতে দক্ষিণে গাড়ি যাইতে পায় না, সব শকটই উত্তরগামী। এইজন্য অতি নিকটস্থ স্থানেও যানারোহণে যাইতে হইলে অনেক সময় লাগে। ষ্টেশন হইতে আমি যে হোটেলে উঠিয়াছিলাম তথায় যাইতে দশ মিনিট লাগিয়াছিল, কিন্তু আসিবার দিন হোটেল হইতে ষ্টেশনে আসিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিল। তবে বলা উচিত যে, সহরের এক অংশ বেশ প্রশস্ত রাস্তায় সুশোভিত। য়ুরোপের মধ্যে এক হলাণ্ডে তামাকের শুল্ক নাই, কাযেই চুরুট অত্যন্ত সস্তা ও ভাল। Halland Havannas এর নাম সকল ধূমপায়ীই জানেন।

এম্‌ষ্টারডাম য়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন সহর বলিয়া খ্যাত। বাস্তবিকই সহরটি অতি পরিষ্কার। অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীতেও ময়লা বা আবর্জ্জনা দেখা যায় না। অনেক জায়গায় জলের মধ্যে pinelogs পুঁতিয়া reclaim করা হইতেছে দেখিলাম। দৃশ্য বড়ই কৌতুকাবহ।

এম্‌ষ্টারাডামে আমার যে প্রদর্শক জুটিয়াছিলেন তিনি অনেকদিন ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সাধারণ লোক বিশ্বাস করে না যে, ভারতবর্ষে ব্যাঘ্র সর্প ভিন্ন সভ্য মনুষ্যের বসবাস আছে। বেচারা রাত্রিতে জানালা বন্ধ করিয়া শুইতে পারেন না ও ঘরে অগ্নি সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করে।

এম্‌ষ্টারডামে একটি প্রকাণ্ড ম্যুজিয়ম আছে। তথায় হলাণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগের পরিচ্ছদ সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীর মূর্ত্তি গঠিত করিয়া পরাইয়া রাখিয়াছে। দেখিতে বড় চমৎকার। তদ্ভিন্ন চিত্র, মর্ম্মর মূর্ত্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম্ম প্রভৃতি অনেক রক্ষিত। চিত্র অধিকাংশই রেমব্রাণ্ট বা তাঁহার উপাসকগণের অঙ্কিত। Holland seems to be as much under the spell of Rembrandt as Antwerp is of Rubens and Brussels of Van Dyck.

এমষ্টারডাম যদিও নামে রাজধানী, রাজকীয় সমস্ত অফিস ও জাতীয় সভার অধিবেশনস্থান হাগে (La Haag বা Hague)। রাণীও অধিকাংশ সময় এমষ্টারডামে বাস করেন না।

কলোন।

ওডিকলোমের (Eau-de-Cologne) কৃপায় জার্ম্মাণ দেশস্থ কলোনের নাম আমাদের দেশে সুপরিচিত।

এমষ্টারডাম হইতে কলোন আসিতে পথে ক্লানেনবুর্গ নামক স্থানে জর্ম্মাণির আরম্ভ। এই স্থলেই Customs পরীক্ষা হয় ও ঘড়ি ৪০ মিনিট বাড়াইয়া লইতে হয়।

শুনিয়াছি, কলোন অতি সুন্দর নগর। কিন্তু বিধি বাম; আমি যতক্ষণ তথায় ছিলাম, ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ায় আমার নিকট কলোন মোটেই ভাল লাগে নাই, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ ত্যাগের পর প্রথম কলোনে মশার উপদ্রবে রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল।

কলোনের ক্যাথিড্রাল খুব প্রসিদ্ধ। ইহা আয়তনে অতি বৃহৎ; এতদ্ভিন্ন আর বড় কিছু দেখিলাম না। অবশ্য অঙ্কিত গবাক্ষ (illuminated windows) অনেকগুলি আছে; কিন্তু তাহাও খুব ভাল বোধ হইল না।

ওয়ালহফ্ ও রিকার্ট নামীয় দুইটি ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ ম্যুজিয়ম আছে। বাহিরে তাঁহাদের মর্ম্মরমূর্ত্তি সন্নিবেশিত, ভিতরে অবশ্য অনেক চিত্র। কিন্তু আমার নিকট প্রায় ছবিই অতি সাধারণ বলিয়া মনে হইল। কেবল জর্ম্মাণির রাণী লুইস্ এবং ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ মেরী কুইন অব-স্কটসের বধাজ্ঞা দস্তখত করিতেছেন এই দুইটি চিত্র বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, বিশেষতঃ দ্বিতীয়টি। এলিজাবেথের মুখে একাধারে হর্ষ, সাফল্য ও লোকদেখান বিষাদের ভাব অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত। চিত্রকরের নাম মনে নাই। কিন্তু তিনি যে কৃতী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কলোনের Town Hallএর যে ঘরে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে Hansa League সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই কক্ষে এখন ম্যুনিসিপালিটির অধিবেশন হয়। দেওয়ালে গুপ্ত niches আছে। তাহার ভিতর স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত casket প্রভৃতি রহিয়াছে। রক্ষী বাহির করিয়া দেখাইল।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

সংগ্রহ।

তাজমহল।

আগ্রার তাজমহল কে প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। কেহ বলেন, জনৈক ফরাসী কর্ত্তৃক তাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কেহ বলেন ইটালী দেশীয় একজন কারিকর উহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সংপ্রতি মিষ্টার নোটন্ ব্লকষ্টাড নামক এক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।

বিভিন্ন মত।

উক্ত লেখক লিখিয়াছেন, বাল্যকালে আমি শুনিয়াছিলাম, অষ্টেন অফ বোর্দ্দ নামক জনৈক ফরাসী তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাজমহলের গঠন তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত। তাজমহলের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, পাছে ইনি অন্য কোথাও এইরূপ সুন্দর স্থাপত্য কার্য্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেন, সেই জন্য বাদশা ইঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ইনি স্বদেশে রাজার ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, তাহার জন্য ইঁহাকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। ইনি সেই অর্থ লইয়া স্বদেশে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন,—তাহার পর আমি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম এবং লোক মুখে শুনিয়া ছিলাম যে, তাজমহলের গঠন, কল্পনা, জিওরোমিনো ভেরোনিয়ো নামক জনৈক ইটালীবাসীর মস্তিষ্কপ্রসূত; কিন্তু সংপ্রতি আমি বুঝিয়াছি যে, এ কথা সত্য নহে, আমার ন্যায় অনেকেই ইহা বুঝিয়াছেন। উল্লিখিত ফরাসী সাজাহানের বিখ্যাত ময়ূরসিংহাসন নির্ম্মাণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি তাজমহলের গঠন কল্পনা করিয়াছিলেন, অথবা তাহাতে মর্ম্মর প্রস্তরবিন্যাস কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণই নাই। তাজের গঠন সম্পূর্ণ পারসিক স্থপতি শিল্পের অনুরূপ। তিনি যদি উহার নির্ম্মাণকার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশবাসী বার্ণিয়ার, টিভেনো এবং টাভারনিয়ার তাহাদিগের লিখিত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিতেন; বিশেষতঃ টাভারনিয়ার যেরূপ বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লিখিত বিবরণে ঐ কথার উল্লেখ থাকিত। মান্‌রিক্ বিকাষ্ট্রো প্রমুখ পর্ত্তুগীজ পুরোহিতগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিতে হয় যে, ভেরোনীয়ো নামক জনৈক ইটালীবাসী তাজের গঠন কল্পনা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি মোগল সম্রাটের কর্ম্মচারী ছিলেন, ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইঁহার মৃত্যু হয়; আগরার প্রাচীন গোরস্থানে ইহার সমাধি এখনও বিদ্যমান আছে। প্রকৃত পক্ষে মহম্মদ ইশা এফেণ্ডি নামক জনৈক ব্যক্তি তাজমহলের গঠন কল্পনা করিয়াছিলেন। এফেণ্ডি তুর্ক বা পারস্য জাতীয়। ইঁহার বংশধরগণ এখনও আগ্রায় রহিয়াছেন। তাজের ভিত্তি হইতে শীর্ষস্থান পর্য্যন্ত সারাসেন-দিগের স্থপতি শিল্পের সম্পূর্ণ অনুরূপ, ইহাতে ভিনিসিয়ো স্থপতি শিল্পের একেবারে কিছুই নাই।

ইহার পর উক্ত লেখক লিখিয়াছেন যে, এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানগণ সাধারণতঃ নুরমহল এবং মমতাজ মহল নামে দুইজন সম্রাটমহিষীকে একই ব্যক্তি মনে করিয়া বিষম ভ্রম করিয়া বসেন। নুরমহল

পারস্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে বর্দ্ধমানের শাসক সের আফগানের সহিত বিবাহিতা হয়েন, এই সের আফগান সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে জাহাঙ্গীর নুরমহলের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছিলেন, এবং যে কোন উপায়ে ইঁহাকে বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। সের আফগানের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে নুরমহল জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লাহোরের সান্নিধ্যে সাহদারা নামক স্থানে নুরমহলের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

নুরমহল।

মমতাজমহল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাজমহল ইঁহারই সমাধিমন্দির। ইনি নুরমহলের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বয়স যখন ১৯ বৎসর, সেই সময় যুবরাজ খরমের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। যুবরাজ খরম সাজাহান নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাজাহান মমতাজকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মমতাজের মৃত্যুর পর সাজাহান ১৭ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ দশায় আগ্রার দুর্গে তিনি তাঁহার কন্যা জাহানারার সহিত ৮ বৎসর কাল বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের কথা পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে বিগলিত হইয়া উঠে। মৃত্যুর ছায়া যখন তাঁহার দেহে ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে একবার উঠাইয়া দাও। শয্যার উপর যখন তাঁহাকে উঠাইয়া বসান হইল, তখন তিনি কারাগারের গবাক্ষ দিয়া ধীরপ্রবাহিনী যমুনার প্রশান্ত জলরাশির পরপারে তাজমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। ঐ তাজমহল তাঁহার প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী মহিষীর সমাধিমন্দির। তাজমহলের উপর যেমন তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি পড়িল, অমনই তাঁহার শবদেহ শয্যার উপরে লুটাইয়া পড়িল।

মমতাজমহল

কেহ কেহ বলেন, মেরিয়ম বেগম নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ রমণী আকবরের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। লেখক বলেন, এই উক্তি সত্য নহে। এই উক্তি সত্য হইলে আকবরের চরিতলেখক বদাউনি বা আবুলফজল তাহার উল্লেখ করিতেন। মেরিয়ম জমানি নাম্নী আকবরের জনৈক হিন্দু মহিষী ছিলেন, ইনি জাহাঙ্গীরের মাতা। সেকেন্দ্রায় ইঁহার সমাধিক্ষেত্র বর্ত্তমান। সেই সমাধিমন্দিরে মিশনারীদিগের অনাথ আশ্রমের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মেরিয়ম বেগম

চৈত্র, ১৩১৮।

আর্য্যাবর্ত্ত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত।

—০—

সূচী।

———

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা] [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

আর্য্যাবর্ত্ত,—

কাঞ্চন জঙ্ঘা

The Paragon Press, Calcutta.

শৈল-স্মৃতি।

শিলিগুড়ি হইতে উষার আলোকে ধূসর মেঘের মত নগাধিরাজ হিমালয়কে প্রথম দেখিলাম। প্রভাত-বায়ু তখন রেলপথের উভয়দিকে তৃণাচ্ছন্ন ধরণীর সুপ্ত দেহে কোমল করপদ্ম বুলাইয়া ফিরিতেছিল। প্রকৃতির শান্তিরসাস্পদ তপোবনের মধ্যে যেন একটি ধ্যানমগ্ন ঋষির প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি নিঃশব্দে নয়নের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

পর্ব্বতের যতটুকু দেখিতে পাইলাম, দার্জ্জিলিং সহরটি তাহার উপরে হইলেই যথেষ্ট বিস্ময়ের বিষয় মনে করিতাম; কিন্তু শুনিলাম, গিরিশ্রেণীর প্রকাশমান অংশ উচ্চতায় কিছুই নহে—শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া মেঘলোকের বহু ঊর্দ্ধে আমাদিগকে উঠিতে হইবে। ক্ষুদ্র ট্রেনখানি সশব্দে বাষ্পোদ্গার করিতে করিতে ছুটিল। অনতিবিলম্বেই তরাইএর নিবিড় জঙ্গল চারিদিক্ হইতে আমাদিগকে চাপিয়া ধরিল। ক্রমোন্নত পাহাড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় বড় গাছ একেবারে ঠেলিয়া আকাশে উঠিয়াছে। কিন্তু মহতের সহিত বলপরীক্ষায় ক্ষুদ্রের বীর্য্য কতক্ষণ টিকিতে পারে?—ট্রেণ খানিকটা উঠিয়া একটা খোলা জায়গায় আসিলে দেখিলাম, সেই গগনস্পর্শী বিটপিশ্রেণী লজ্জায় শ্যামল দেহ সঙ্কুচিত করিয়া পাহাড়ের গাত্রে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও গাড়ী পশ্চাতে হটিতে হটিতে উপরে উঠিতে থাকে। এ স্থানগুলির নাম "রিভার্স" (reverse)। গল্প শুনিলাম, যে স্থানে প্রথম "রিভার্স" সেই অবধি রেল আনিয়া এঞ্জিনিয়ার দেখিলেন, পাহাড়ের অবস্থা যেরূপ তাহাতে আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এ সমস্যার কোন সমাধান করিতে না পারিয়া তিনি বিমর্ষভাবে গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় পত্নী তাঁহাকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপার শুনিয়া দুঃখিত হইয়া পত্নী বলিলেন, "then better retreat," "আর যখন আশা নাই, ফিরিয়া চল।" এই retreat হইতে reverse এর কৌশল বিদ্যুতের মত পতির মস্তকে খেলিয়া গেল।

আমরা বিমানচারী বিহগের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। চারিদিকে প্রতি মুহূর্ত্তে যে দৃশ্য দেখিতেছিলাম, তাহার প্রত্যেক অংশের

খণ্ড-সৌন্দর্য্য বোধ করি খুব অধিক হইবে না, কিন্তু মোটের উপর একটি স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি হইতেছিল। সুপুষ্ট মেষের লোমের মত পাহাড়ের স্থানে স্থানে চায়ের বাগান; চা-গাছগুলি স্তরে স্তরে বহু নিম্নে নামিয়া গিয়াছে, মাঝখানে দুগ্ধধবল কারখানার বাড়ীটি অতি ছোট দেখাইতেছে। কোথাও নির্ঝরিণীর কুলুকুলু ধ্বনি, কোথাও জলপ্রপাতের ভৈরব নিনাদ। শৈলদেহে কত অপরিচিত তরুলতার সমাবেশ, কত বিচিত্র কুসুমের শোভা, কত সুচিক্কণ "ফার্ণে"র প্রফুল্ল কান্তি, কত বিশাল বনস্পতির গভীর গাম্ভীর্য্য। সুদূর উপত্যকা হইতে শুভ্র লঘু মেঘ উঠিতেছে, তাহাদের নিম্নে নিবিড় ছায়া, উপরে উজ্জ্বল রৌদ্র।

ট্রেণ কার্শিয়াংএর নিকটে আসিল। প্রবাসগামী বন্ধুর বিদায় অভিনন্দনের জন্য সমতলভূমি শেষবার গিরিমূলে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘনপল্লবিত তরুশ্রেণী দূরত্ববশতঃ বৃক্ষশিশুর মত দেখাইতেছে, তাহাদের অন্তরালে রজৎ-রেখাবৎ বক্রগতি নদী; তটভূমি বালুকাময়।

দ্রুত বেগে উপরে উঠিতেছি। পদতলে মেঘ, মাথার উপর মেঘ,—চারিদিকে সজল বর্ষার জলদোৎসব চলিতেছে। পথের ধারে কাঠের রেলিং ঠেস দিয়া গাহাড়ী রমণী রেলগাড়ী দেখিতেছে। তাহার পৃষ্ঠের উপর ত্রিভুজের মত বাঁশের টুকরি বেতের রজ্জু অবলম্বন করিয়া মাথা হইতে ঝুলিতেছে। টুং ষ্টেশনে একটি বৃদ্ধ পাহাড়ী দম্পতি ভিক্ষা করিতেছিল। তাহাদের কাপড়ের বুট হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ট্রেণের সম্মুখে আসিয়া তাহারা "বেঞ্জুরা" বাজাইয়া গান ধরিল এবং তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে লাগিল। গানের ভাষা কিছুই বুঝিলাম না, কিন্তু সুর বড় করুণ। অদূরে টিনের ছাতওয়ালা কাঠের ছোট ঘরে পাহাড়ী দোকান; তথায় শুষ্ক মিঠাই, কাঁচা পেয়ারা, সরবতি লেবু, ছোলাভাজা এবং মকাইপোড়া সজ্জিত। দোকানদার সিগারেট টানিতে টানিতে আশু বিক্রয়ের আশায় মাঝে মাঝে ট্রেনের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

ক্রমে দূর হইতে দার্জ্জিলিং সহর দৃষ্টিগোচর হইল। একটির স্কন্ধের উপর আর একটি—এই ভাবে শাদা শাদা বাড়ীগুলি আকাশে উঠিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রকৃতির কেলিকুঞ্জের মত বিচিত্র বনরাজি গৃহ-শ্রেণীর বিচ্ছেদ নির্দ্দেশ করিতেছে। পাহাড়ের গাত্রে পথগুলি বৃহৎ অজগর সাপের মত হেলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে নামিতেছে। রাস্তার উপর রেলিং

দেওয়া কাঠের পুল; নিম্নে ঝরণার জল শিলা হইতে শিলান্তরে লাফাইতে লাফাইতে উপত্যকার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকেই ধূমাকার মেঘ; তাহারা বনের উপর, ঘরের ছাতে এবং টেলিফোঁর তারে আসন পাতিয়া লইয়াছে। এ স্থানে দিনের প্রখর আলোক বুঝি কখনও পীড়া দেয় না,—অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিচিত্র সুপ্তি রাত্রিদিন ছায়াময় পক্ষপুট বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে।

২১শে শ্রাবণ। গৃহস্থলী পাতাইয়া লইয়াছি। আজ হাটবার; সপ্তাহে রবিবারে মাত্র এ স্থানে হাট বসে,সেই দিন সমস্ত রসদ কিনিয়া রাখিতে হয়। দোকানীরা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক। তাহাদের কর্ণাভরণ স্বর্ণের, গলায় মালার আকারে বহু সোণার চাকৃতি। গহনা গড়াইবার পর বাঙ্গালী গৃহিণীদের সোণার যে অবস্থা হয়, পাহাড়ীদের সোণা সেরূপ নহে,—একেবারে নিখাদ,—কাঁচা হলুদের মত রং। স্বর্ণভারাক্রান্ত অঙ্গে দূর দূরান্তর হইতে মোট বহিয়া ইহারা বাজারে আইসে। কেহ কেহ আবার সুগৌরবর্ণ, মাংসল গণ্ডদেশ রক্তিমাভ। বোধ করি এই শ্রেণীর পসারিণীদের জন্যই কবি আক্ষেপ করিয়াছেন—"এত ভার মরি মরি, কেমনে রয়েছ ধরি, কোমল—করুণ—ক্লান্ত কায়!" হাটে শাক-সব্‌জী যথেষ্ট। পেয়ারা বলিয়া যে ফল কিনিতেছিলাম শুনিলাম, সেটা তরকারি, ফল নহে, নাম "স্কোয়াস"। "কটহর" এ স্থানে কাঁটাল নহে—আনারস। 'সানো 'সানো' অর্থাৎ ছোট ছোট "কটহর" পয়সায় দুই তিনটাও মিলে। কাঁচকলা বলিয়া যে সামগ্রী আনিয়াছিলাম, আহারের সময় দেখি, তাহা দুধের বাটিতে বিরাজ করিতেছে; নাম নাকি 'চিনি-চম্পা', অতি সুমিষ্ট কলা; দেখিতে কাঁচা। কলা মাত্রকেই যাহাতে কাঁচকলা ঠাওয়াইয়া না বসি, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যতে সাবধান হইয়াছিলাম।

৩০শে শ্রাবণ। সুরহরি বাবু শান্তিরাম আশ্রমে উঠিয়াছেন। তিনি গল্প করিতেছিলেন,বনবিভাগের একটি হৃষ্টপুষ্ট কর্ম্মচারী হাওয়া বদ্‌লাইতে আশ্রমে আসিয়াছেন; নাম রামদাস। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে একত্র আহারে বসিয়াছিলেন। রামদাসের পাত চক্ষুর নিমেষে বারংবার খালি হইতেছিল। সুরহরি বাবু বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার অসুখটা কি? প্রশ্নে তাঁহার ক্ষুধার প্রতি অপরাধজনক কটাক্ষ আছে মনে করিয়া রামদাস সুপ্তোত্থিত সিংহবৎ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি, আমার অসুখ নাই? কি জান্

বেন, মশাই—আজ বারো বৎসর 'ডায়াবিটিসে' আমি কত ভুগ্‌ছি।" সুরহরি মনে মনে জবাবটির অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া লইলেন—"সুস্থ শরীরে আমি বুভুক্ষিত নহি, আমার ক্ষুধা বহুমূত্রের জন্য।" তিনি অনুমান করেন, রামদাসের 'চেঞ্জ' খুব ভাল হইতেছে। আসল কথাটা এই যে, এ স্থানের এক একটি পথ এক একটি হজ্‌মিগুলি। ঘরের বাহির হইলেই চড়াই,—একেবারে কোমর বাঁধিয়া রাস্তার সঙ্গে লড়াই। রামদাসের অপরাধ কি?

৫ই ভাদ্র। কয়েকদিন খুব বাদ্‌লার পর আজ রৌদ্র উঠিয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার রজতমণ্ডিত মূর্ত্তি নীল আকাশের গাত্রে উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে। নির্ম্মেঘ আকাশের এমন সুন্দর নীলিমা সমতলভূমিতে স্বপ্নের অতীত। 'লরেটো কন্‌ভেন্টের' মেয়েরা দল বাঁধিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়াছে। সেকালে আমাদের দেশে বর্ষার দিনে অনধ্যায় হইত, এ স্থানে রৌদ্রের মুখ দেখিতে পাইলেই স্কুলের ছেলেমেয়েদের ছুটি। আজ এই মুক্ত আকাশের নিম্নে সবুজ পাহাড়ের গাত্রে শুইয়া ঝরণার গান শুনিতে শুনিতে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চাহিয়া থাকিলে যে আনন্দ ও জ্ঞানলাভ হইবে, পড়িবার কোন পুস্তকে তাহা পাওয়া যাইবে না, নিশ্চয়।

আমরা সুরহরি বাবুর সঙ্গে 'বার্চ হিলের' দিকে চলিলাম। বার্চহিলের সানুদেশে পথগুলি বড় নির্জ্জন, চারিদিকে অবিশ্রাম ঝিঁঝি ডাকিতেছে। এই ঝিল্লিঝঙ্কৃত বনপথে মধ্যাহ্নকালেও সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য। ঘুরিতে ঘুরিতে পাহাড়ের মাথায় উঠিলাম। এই স্থান হইতে তুষারশ্রেণী বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একপার্শ্বে সম্ভোগভুক্ত চা এবং বিস্কুটের নিদর্শন রহিয়াছে। না জানি কোন্ ভাবুক এ স্থানে চা-পান করিয়া গিয়াছেন! সুরহরি বাবু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্মুখে চা-পানে যে অধিক সুখানুভব হয়, এ তত্ত্ব দর্শনবিজ্ঞানে লিখে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দুইটি মাত্র সিদ্ধান্তের অবকাশ আছে। প্রথম—চা-খোর চিরন্তন তুষারকে সাক্ষী রাখিয়া চির-মৌতাতের সংকল্প দৃঢ় করিয়াছেন। দ্বিতীয়—তাঁহার মৎলবটা এই যে, যদিও গিরিরাজ ঠাণ্ডা বরফের ভক্ত তথাপি জগতে পরম পদার্থ গরম চা। "ধন মান চাহি না, শুধু, বিধি! যদি প্রাতে উঠে পাই একটি পেয়ালা চা।"

১৫ই আশ্বিন। আমাদের বাড়ীটির অধিকারী সিকিমের একজন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। এক দিন তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উপলক্ষে নেপালী নাচ দেখিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। কার্য্যানুরোধে যাওয়া হয় নাই; তবে শুনিয়াছি, নানা রকমের মুখস পরিয়া পাহাড়ীরা খুব লম্ফঝম্ফ করিয়াছিল। আজ স্থানীয় পাহাড়ীদের যে থিয়েটার দেখিলাম তাহা সোণার পাতরের বাটি, ভাবভঙ্গিতে বিশেষত্ব বড় কম। শিখাইয়াছেন বাঙ্গালী বাবুরা, সুতরাং কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের একটা পাহাড়ী সংস্করণ হইয়াছে। নৃত্যগীত বড় বেশি বেশি; এমন কি প্রথম দৃশ্যেই রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহাসন হইতে উঠিয়া একটি গান গাহিয়া পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন। ভয় হইতেছিল, একটু নাচিবেনও বুঝি! সুখের বিষয়, ততদূর গড়াইল না। অভিনয়ের শেষে একটা বাঙ্গালা গান হইল; পাহাড়ী ছেলেদের মুখে সেটি শুনাইল বেশ।

২১শে আশ্বিন। সন্ধ্যার সময় 'কার্টরোডে' দাঁড়াইয়া দার্জ্জিলিংএর আলোকমালা দেখিতেছিলাম। মনে হইল, তরল নভোমণ্ডল গাঢ় হইয়া পৃথিবীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে,—আর সেই ঘননীল আকাশে শত শত ভাস্বর তারা জ্বলিতেছে। এঞ্জিনের দীর্ঘ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া কুজ্ঝটিকার মধ্যে দূরে ট্রেণ আসিতেছিল। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে আলোটি ক্ষণে জ্বলিয়া ক্ষণে নিবিয়া অচিরাৎ সচল তারকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, অবশেষে সেই সান্দ্র নীলিমার নক্ষত্রমণ্ডলে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

১৬ই কার্ত্তিক। আট মাইল দূরবর্ত্তী 'টাইগার হিল' এ অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই টাইগার হিলে উঠিয়া সূর্য্যোদয় এবং 'মাউণ্ট এভারেষ্ট' দেখিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সুরহরি বাবু একটু গোল বাধাইয়াছেন। তিনি এ যাত্রা সিত্রাপংএ মিউনিসিপ্যালিটির 'বিজ্‌লি-বাতি'র কারখানা, দেখিতে চাহেন। সিত্রাপংএর পথ প্রায় পাঁচ মাইল; ভীষণ উৎরাই। কিন্তু সুরহরি বাবুর নাকি অসুবিধা হইবে না। একবার হাজারিবাগ জিলায় তিনি ঘোড়ায় চড়িয়াছিলেন। সহিস অশ্বের বল্গার ভার পাইয়াছিল এবং ভৃত্য পুচ্ছ ধারণ করিয়াছিল। সাঙ্গোপাঙ্গ সুরহরি এই ভাবিতে মিনিট পাঁচেক ঘোড়দৌড় করিয়া আইসেন। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হওয়ায় তিনি পুনরায় অশ্বারোহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। একজন সওয়ার সঙ্গীও জুটিয়াছে। যাইবার সময় উৎরাইয়ের পথে ঘোড়া চলিবে না,

তদ্ধেতু সুরহরি একটি ত্রিশূল সংগ্রহ করিয়াছেন ; এই ত্রিশূলে ভর দিয়া পাহাড়ে নামিতে বড় আরাম। ত্রিশূলহস্তে ভৈরববেশে তিনি সিঞ্চাপং যাত্রা করিবেন। পথের বহর যেরূপ তাহাতে ক্ষুধাও ভৈরবী রকমের হইবে সন্দেহ নাই ; অতএব সহিস শুধু অশ্বটি নহে, কিছু লুচিকচুরিও সঙ্গে লইবে। আমরা তর্কজাল বিস্তার করিয়া সুরহরির সিঞ্চাপং অভিযান আপাততঃ বন্ধ করিয়া দিলাম; স্থির হইল, সকলের একসঙ্গে টাইগার হিলেই যাওয়া উচিত।

রাত্রি তখন চতুর্থ প্রহরে পড়িয়াছে,—আমরা কাপড় চোপড়ে কাবুলী আজুর সাজিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাজারের দোকানগুলিতে আলো জ্বলিতেছে, পণ্যদ্রব্য সমস্তই আচ্ছাদিত, একজন পুলিশ প্রহরী ওভার-কোটের পকেটে দুই হাত পুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাগঝোরা ছাড়াইয়া সহরের প্রায় বাহিরে আসিলাম। নিম্নে পাহাড়ীদের কুটীরগুলি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। শুভ্র তুলারাশির মত মেঘের আড়াল হইতে 'একাদশীর খণ্ডশশী' বারংবার উঁকি দিতেছেন, পথের উপর তরুচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। প্রকৃতির পাষাণ দুর্গের বিশাল প্রাচীরের ন্যায় বামের উচ্চ পাহাড়ের মাথায় সেনানিবাসের চন্দ্রকরোজ্জ্বল বাড়ী-গুলি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ঘুম ষ্টেশনের তাপমান যন্ত্রে দেখিলাম, তাপ ৪২ ডিগ্রি; আর দশ ডিগ্রি নামিলেই জল জমিবার কথা। জোড়বাংলা হইতে চড়াই আরম্ভ করা গেল। আমরা যখন শিঞ্চলের শিখরে তখন অরুণরাগ পূর্ব্বাকাশে ধূসর মেঘে সোণালী পাড় বুনিয়া দিয়াছে। দুই দিকে গাছে গাছে কত না অর্কিড ; যেন জটাধারী তপস্বীদের নৈমিষারণ্য! অবশেষে টাইগার হিলের চূড়ায় উঠিলাম। অমনই মুহূর্ত্তমধ্যে তপন দেব সলিলময় গোলকের মত মেঘের-রাশি ভেদ করিয়া দেখা দিলেন। প্রণয়ীর প্রথম করস্পর্শে প্রেমিকার অঙ্গে বুঝি রোমাঞ্চ হইতেছিল; তাই বামদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার যোজনব্যাপী তুষারদেহে রামধনুর বিচিত্র বর্ণগুলি একে একে খেলিতেছে! সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি চলে, হিমানীমণ্ডিত অনন্ত গিরি-শ্রেণী দিগন্তে বিলীন হইয়াছে; তাহার নিম্নে অতলস্পর্শ ধবল মেঘ-সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গময় মেঘমণ্ডলীর অনন্তশয্যা। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে বিশ্বশিল্পী যে মহিমান্বিত সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের আবরণ অপসারিত করিয়াছিলেন,

মানুষের চঞ্চলতা তাহার বিকৃতি ঘটাইতে পারে নাই, কল্পান্ত পর্য্যন্ত এ শোভারাশি নব নব উষায় এমনই অনাহতভাবে দেখা দিবে!

এভারেষ্ট-দর্শন লইয়া টাইগার হিলের চৌকিদারের সঙ্গে আমাদের মতভেদ ঘটিল। ফটোগ্রাফের ছবির সহিত মিলাইয়া যে শৃঙ্গগুলিকে আমরা এভারেষ্ট ধরিয়া লইলাম, চৌকিদার বলিল, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি এভারেষ্ট নহে। সুরহরি বাবুর মতে, লোকটি যদিও চৌকিদার তথাপি এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ত বটে; সুতরাং আমরা যে জগন্নাথের বদলে ভাতের হাঁড়ি দেখিয়া গেলাম না, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না!

২রা অগ্রহায়ণ। চৌরাস্তার নিম্নে ভুটিয়া-বস্তির পথে দালাই লামার কয়েকজন অনুচরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। একজনের তিব্বতী পোষাকের উপর মাথায় হ্যাট; ইনি বেশ ইংরাজি বলিতে পারেন। দেখিলাম, চীনের অন্তর্বিপ্লবের সমস্ত খবরই ইঁহারা রাখেন। দালাই লামার বাড়ীটি লেব-ঙের দিকে; সিপাহী সঙ্গীণ-চড়ানো বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতেছে। লামা তখন বোধকরি উপাসনায় নিযুক্ত, ভিতর হইতে ঝর্-রং ঝর্-রং বাদ্যধ্বনি উঠিতেছিল। 'পুলিশ সাহেবের' অনুমতি পাইলে তবে লামার দর্শন-লাভ ঘটে। জপে তপে তাঁহার দিন কাটিতেছে মন্দ নহে।

ডেপুটি কমিশনর আফিসের একজন তিব্বতীয় কর্ম্মচারী একবার তিব্বতে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন; রাজনীতিক হাঙ্গামার সময় পলাইয়া আই-সেন। বৎসরে তিন চারি দিন কি বড় জোর মাসে একদিন কায করিতেন, অবশিষ্ট সময় লামাদের আশীর্ব্বাদ লইতে কাটিত! অন্য আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন কি? এই চাকরীই যে অসাধারণ আশীর্ব্বাদের ফল!

১৫ই অগ্রহায়ণ। দার্জ্জিলিং প্রায় জনশূন্য। বসন্তের কোকিলরা অধিকাংশই নামিয়া গিয়াছেন। শীতের মাত্রা ক্রমেই চড়িতেছে, পট্টু, লেপ ও কম্বল মাত্র এখন সম্বল। ঘরে ঘরে আগুণ জ্বালা সুরু হইয়াছে, চারিদিকে গৃহের চিম্‌নি হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে। আমাদের বাড়ীর সম্মুখে টংলু ও সন্দকফু শিখরে পূর্ব্বে বরফ দেখি নাই; আজকাল সেগুলি শাদা হইয়া গিয়াছে।

সুরহরি বাবু 'বিজ্‌লি-বাতির' কারখানা দেখিবার কল্পনা কার্য্যে পরি-ণত করিলেন। আমরা অপরাহ্নে সিদ্রাপংএ পৌঁছিলাম। একটা দোলায়-মান সেতুর উপর দিয়া ঝরণার জল সবেগে আসিয়া দুইটি তালাও

বা জলাশয়ে সঞ্চিত হইতেছে, পুনরায় তাহাও হইতে কারখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া ভীমবলে কলের চাকা ঘুরাইতেছে। কারখানার জমাদার আমাদিগকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া কলঘরে লইয়া গেল এবং চক্রব্যূহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সংক্ষেপে তিন কথায় সমগ্র বৈদ্যুতিক ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিল—"পানী ইধির্‌সে আতা, উধির্‌সে যাতা, ইধির্‌সে নিকাল্‌তা।" জলের রহস্য একেবারে জল! জমাদারের ঘরের পার্শ্বে একটি নূতন দৃশ্য দেখিতে পাওয়া গেল,—পাহাড়ের উপর আম কাঁটাল ও লিচুর গাছ। একটা কমলা লেবুর গাছে সুপক্ব লেবুও ঝুলিতেছিল।

ফিরিবার সময় সুরহরি বাবু কয়েকবার চিৎপাত হইয়া পথের উপর শুইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে বোধ-হয় পাহাড়ের শোভা দেখিতেছিলেন। রাত্রি আটটায় দার্জ্জিলিংএ পদার্পন করিতেই তিনি বলিলেন, মহীরাবণ বধের পর পাতালপুরী হইতে উঠিবার সময় রামচন্দ্রের অনুচরকে নিশ্চয় এতটা চড়াই করিতে হয় নাই, অথচ সিঞ্চাপংএ তিনি ধ্বংস করিয়াছেন মাত্র লুচি ও কমলালেবু!

১০ শে অগ্রহায়ণ। সুরহরি বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রঙ্গিৎ ও কালিম্‌-পংএ পদব্রজে যাইবার কল্পনাটা কেমন? রঙ্গিৎ দার্জ্জিলিং হইতে তের মাইল এবং কালিম্‌পং একত্রিশ মাইল। তিব্বতের কথা এখনও ভুলেন নাই!

শ্রীভুপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

কবি ও কাব্য।

নানা ফুল হ'তে যথা মধুপনিকর
মধুরাশি করি' আহরণ,
নির্ম্মাইয়া মধুচক্র রন্ধ্রে, রন্ধ্রে তা'র
সযতনে করে তা' রক্ষণ;
বিবিধ সৌন্দর্য্য হ'তে কবি সেইরূপ
ভাবসুধা করিয়া চয়ন
বিরচিয়া কাব্যগ্রন্থ ছত্রে ছত্রে তা'র
রাখি' দেন হৃদয়রঞ্জন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মালদহের পল্লী-কথা।

রামাবতীর মহল্লা

পিছলী গঙ্গারামপুর

লক্ষণাবতী বর্ণনাকালে রামাভিটা, ধর্ম্মপুর, চণ্ডীপুর ও কমলাবাড়ীর কথা বলা হইবে ; সুতরাং উক্ত চারিটি স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিয়া রামাবতীর অপরাপর মহল্লাগুলির বিবরণ লিখিত হইল।

রামাবতী নগরের অন্তর্গত মহল্লাগুলির পরিচয়প্রসঙ্গে যে সমুদায় বনাচ্ছন্ন প্রাচীন স্থানের পরিচয় প্রদত্ত হইবে হয়ত প্রাচীনকালে সেগুলিও রামাবতীর অন্তর্গত পল্লী বা তাহার উপনগর গ্রাম ও পল্লী মধ্যে ধরা হইত।

পিছলী।

বর্ত্তমান অমরাবতীর সন্নিকটে পিছলীর কাঠাল বিদ্যমান রহিয়াছে। গঙ্গার প্রাচীন গর্ভ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ইহার পশ্চিমপ্রান্তের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। কানাইপুর নামক গ্রামটি পিছলীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

বর্ত্তমান পিছলী।

মালদহের লোক বনভূমিকে 'কাঠাল' বলিয়া থাকে। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য পিছনী কাঠালে পরিণত হইয়াছে। তথায় বিবিধ বন্যবৃক্ষ তাল, খর্জ্জুর জন্মিয়াছে ; যথেষ্ট বেতবনও আছে। দেশের লোক সেই বেত সংগ্রহ করিয়া ঝুড়ি, পেতে, করন্জা, খালুই ইত্যাদি বুনিয়া সংসারের কার্য্যে লাগাইয়া থাকে। ভিতরে বহু পুরাতন পুষ্করিণী, ঝিল,পরিখা, গড়, সমতলক্ষেত্রমধ্যে উন্নত গৃহচিহ্নিত স্তূপ আর ইতস্ততঃ ইষ্টক-প্রস্তর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখা যায়। প্রাচীন সেতু (সাঁকো), বাঁধান ঘাট, আর দুই একটি প্রস্তরের ভগ্ন দেবমূর্ত্তিরও সন্ধান পাওয়া যায়। ভগ্ন মস্জেদও বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে পুরাতন বাঁধান পথের চিহ্নও ভ্রমণকারীর নেত্রগোচর হইয়া থাকে। এই স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এবং বর্ত্তমান দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রতীত হয়, স্থানটি একদিন বহুজনগণে ও হর্ম্ম্যমালায় শোভিত ছিল।

আমি যে সময়ে এই অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতাম তখন কানাই-পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ঝুমুকলাল সাহ ও শ্রীযুক্ত হারাধন সাহ বন্ধুদ্বয় আমার

সাহায্য করিতেন। পিছলী, গঙ্গারামপুর প্রভৃতি স্থানগুলির অধিকাংশ ভূভাগই তাঁহাদের সম্পত্তির মধ্যবর্ত্তী এবং তাঁহারা এ সকল স্থান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে উক্ত স্থানসমূহের বিবরণ সংগৃহীত হইত না। তাঁহারা সবিশেষ যত্নসহকারে আমাকে প্রত্যেক দ্রষ্টব্য স্থানে একাধিকবার লইয়া যাইয়া আমার অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

পিছলী কাঠালের উত্তর পশ্চিমে বর্ত্তমান কালিন্দী নামে এক নদী প্রবাহিত। কালিন্দী অদ্যাপি পিছলীকে গ্রাস করিতেছে। কালিন্দীর দক্ষিণ তীর উন্নত। নদীর গর্ভে পিছলী যতই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, ততই ভুগর্ভের মধ্যগত মানবচক্ষুর অগোচর অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি লোকলোচনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌড়ীয় ইষ্টকে গঠিত গৃহভিত্তি-কুলঙ্গি দেখা যাইতেছে; বহুসংখ্যক 'খেজুরে পাটের' কূপ বাহির হইয়া পড়িতেছে; সেকালের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বিবিধ প্রকার খেলনা, হাঁড়ী ইত্যাদি সুপ্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। দশ বার হাত মাটীর নিম্নেও অনেক মৃৎপাত্রের অবশেষ মিলিতেছে। কাযেই পিছলী যে কত পুরাতন সহর তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

প্রাচীন গৌড়ের ইষ্টকময় গৃহ-ভিত্তির চিহ্ন।

পিছলীর উত্তরস্থ কালিন্দীর পরপারে 'নাগরাই' নামক কাঠাল। পিছলী যখন সমৃদ্ধ ছিল 'নাগরাই' তখন ধনজনশোভায় গর্ব্বিত ছিল। পিছলী হইতে নাগরাই গমনাগমনের জন্য একটি কাঠের সেতু ছিল। এ কথা উক্ত স্থানের প্রাচীন ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন। এই কাঠের সেতুর কথা ঝুমুকলাল সাহ ও হারাধন সাহ বন্ধুদ্বয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছেন, একবার কালিন্দীর উক্ত অংশের জল গ্রীষ্মকালে খুব কমিয়া গিয়াছিল; সেই সময়ে তাঁহারা ও উক্ত অঞ্চলের অনেক লোক দেখিতে পায়েন, বড় বড় বাহাদুরী শালের গোটা গোটা গাছ সারি সারি স্তম্ভের ন্যায় দুই শ্রেণীতে প্রোথিত রহিয়াছে। এবং তাহার সহিত অন্য কাষ্ঠখণ্ড যে আবদ্ধ ছিল তাহারও চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। আমিও সেই স্থানটি দেখিয়াছি। কিন্তু তখন জল ছিল বলিয়া কাঠের থামগুলি দেখিতে পাই নাই। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, নদীস্রোতে পিছলী যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় তাহার জন্য সেকালে কাঠ পুতিয়া জলস্রোত ফিরাইবার চেষ্টা হয় ত হইয়াছিল। কিন্তু নাগরাই কাঠালের

কালিন্দীর উপর কাঠের সাঁকো।

দিকেও ঠিক ঐ প্রকার কাষ্ঠস্তম্ভশ্রেণী দণ্ডায়মান ছিল অবগত হইয়া বুঝিলাম, কালিন্দীর উপর কাষ্ঠের সেতু ছিল।

আবার শুনিতে পাই, বড় গঙ্গা বাহিয়া বড় বড় সওদাগরী নৌকা পিছলীর ঘাট হইতে রামাবতী পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে বদ্ধ থাকিত। এই স্থানের ঠিক পরপারেই রাজমহল। যখন রাজমহল হইতে পিছলী পর্য্যন্ত নদী বিদ্যমান ছিল তখন এই স্থান হইতে অন্য-স্থান দেখা যাইত। পিছলীর পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত নদী-বিধৌত বলিয়া বানিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। বণিকগণ বানিজ্য ব্যপদেশে পিছলীতে বাস করিত। দক্ষিণ দিক হইতে অর্থাৎ তরতীপুর, গৌড়, লক্ষ্মৌতী, টাঁড়া হইতে যে রাস্তা গঙ্গার কূলে সোনাতলা, কাঞ্চন সহ-রের মধ্য দিয়া, পিছলীর মধ্য দিয়া বিস্তৃত থাকিয়া, গঙ্গারামপুর, ভগী-রথপুর, দৈবকীপুর, কোতোয়ালী, তারাপুর হইয়া নিমোসরাই পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল বণিকগণের বিবিধ বিপণিতে শোভিত ছিল। আজিও লোক বলিয়া থাকে যে, সন্ধ্যার পর রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকানের আলোকেই এই সুদীর্ঘ পথটি আলোকিত হইয়া থাকিত। এ কথা আজিও বহু স্থানে বৃদ্ধগণের নিকট শুনিতে পাই।

পথের দুই পার্শ্বে দোকান।

কালুপাহালমানের দরগা

মালদহবক্ষে প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে বা কৌতূহল-চরিতার্থ করিবার জন্য মালদহে গিয়া গৌড়-পাণ্ডুয়া দেখিয়া আইসেন। কিন্তু তাঁহাদের ভ্রমণসীমা অতীব সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। যে প্রাচীন স্থান-গুলি বহু বার বহু লোক দেখিয়া মাপিয়া গিয়াছেন—নবাগত ভ্রমণকারীর দল সেই স্থানগুলির উপর ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন গৌড়-পাণ্ডুয়ার একটা চিত্র লইয়া ফিরিয়া আইসেন—তাঁহাদের নয়নে ও চিন্তাক্ষেত্রে সেই সসীম স্থানটির কল্পনাই প্রাচীন গৌড়ের নিখুঁত চিত্র বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক ইহা ছাড়া যে আরও গৌড়-পাণ্ডুয়ার লুকায়িত অলৌকিক চিত্র আজিও বিদ্যমান তাহা তাঁহাদের চিন্তাক্ষেত্রে কখন উদিত হয় কি না তাহা বলিতে পারি না। বনের মধ্যে যে স্থানে শ্বাপদের ভয়, যে স্থানে রাখালদল গরু চরায়, যে স্থানে জলে অসংখ্য কুম্ভীর ভাসে, যে স্থানের বনের মধ্যে সর্পের

বাস, যে স্থানে ম্যালেরিয়া নিরাকার বেশে আত্মপ্রচার করিয়াছে, সেই বনের মধ্যে ময়ূরের নৃত্য, হরিণের ভয়চকিত নেত্র দেখিতে দেখিতে কত শত প্রাচীন চিত্র পুঞ্জীকৃতভাবে নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয় তাহা তাঁহারা বুঝেন না। বলিতে কি, গৌড়ের কাহিনী সেই বনভূমিতে অনাদরে লুণ্ঠিত আছে। কে কখন তাহাদের প্রাচীনকথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবে সেই আশায় যেন তাহারা আজিও অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে।

পিছলীর মধ্যে যদিও এখন আর বড় বন জঙ্গল নাই, তথাপি কোথায় সামান্য একটু নিদর্শন পাইব বলিয়া কেহ পিছলী ভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। পিছলীর বনটি বেশ করিয়া ঘুরিয়া দেখিলে পিছলীর অতীত গৌরবের নিদর্শন পাইতে পারি। গৌড়ের ইতিহাসের এক অধ্যায় পিছলীর কাঠালে অযত্নরক্ষিতভাবে আজিও রহিয়াছে।

পিছলীর প্রাচীন কাহিনী মুছিয়া যাইতে যাইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। আজিও দুই চারিজন বৃদ্ধের নিকট তাঁহাদিগের দেশের অতীত গৌরবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আজিও তাঁহারা দেশের প্রাচীন কাহিনী বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। দেশের ধনদৌলত ও মহিমার কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া পড়েন; গল্পের শেষে মুখখানি মলিন করিয়া বিষণ্ণভাবে কাহিনীর উপসংহার করেন। আমাদিগকেও মালদহের পল্লীকথা শেষকালে ঐ প্রকার বিষাদের গীত গাহিয়া উপসংহার করিতে হইবে।

পিছলীর এক বীরের কথা এই স্থানে বলিব। পিছলী যখন ধনজনপূর্ণ ছিল তখন তথায় কালু পাহালমান (কালু পালোয়ান) নামে এক মল্ল বাস করিতেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, ইহা ব্যতীত তাঁহার জাতির কথা আর কিছু কেহ জানে না। কানাইপুরের উত্তর-পশ্চিমে, গঙ্গারামপুরের পশ্চিমে মহানন্দার তীরে কালুর বাড়ী ছিল। আজিও তাঁহার বাড়ীর ভিটা ও তথায় ইষ্টক প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে। লোক দেখাইয়া দেয়, ঐ স্থানেই কালু পাহালমানের বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বেই কালুর একটা মস্‌জেদ আজিও রহিয়াছে। সেই মস্‌জেদটি গঙ্গারামপুর সীমার মধ্যে পড়িলেও পিছলীর কাঠালমধ্যগত বলিয়া প্রকাশ। সে মস্‌জেদটি কালুর কি না তাহা পরে বলিব। কালু কোন অনিবার্য্য কারণে মোসলমান হইয়া পড়েন। কেন তিনি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন তাহার কথা কেহ বলিতে পারে না।

কালুর কাহিনী।

কালুর সময় গৌড় নগরে তাঁহার সমকক্ষ মল্ল আর কেহ ছিল না। তাঁহার নিকট অনেকে কুস্তিশিক্ষা করিত বলিয়া তাঁহার অনেক চেলা ছিল। কালু সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার 'আখড়াবাড়ী' বহু মল্লের ক্রীড়াভূমি ছিল। আখড়াবাড়ীর দক্ষিণে একটি ঘাটবাঁধান পুকুর ছিল—আজিও আছে, তবে বাঁধান ঘাটটির আর বড় অবশেষ নাই। আখড়ার পার্শ্বেই 'মস্‌জেদবাড়ী'। এই মস্‌জেদকেই দেশের লোক 'কালু পাহালমানের দরগা' বলে। এই দরগার সীমামধ্যে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া আছে। তাহার এক পার্শ্ব চিত্রিত; দেখিলেই বোধ হয় ইহা কোন প্রস্তর-গঠিত প্রাসাদের অংশবিশেষ ছিল। লোক ঐ প্রস্তরখণ্ড দেখাইয়া বলে, কালু ঐ পাতরে বসিয়া থাকিতেন, নামাজের সময় পদ ধৌত করিতেন, কুস্তির সময় ঐ পাতরখানিই তুলিয়া নানারূপ ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতেন। যদি কোন মল্ল তাঁহার সহিত বলপরীক্ষার জন্য আসিত তবে তিনি তাহাকে ঐ পাতরখানিই অগ্রে তুলিতে বলিতেন। যে ঐ পাতরখানি তুলিতে পারিত তাহার সহিত তিনি বলপরীক্ষা করিতেন, যে ব্যক্তি উহা তুলিতে না পারিত, তাহাকে কালুর শিষ্য হইয়া মল্লক্রীড়া শিক্ষা করিতে হইত।

কালু এক সুন্দরী মোসলমান যুবতীকে বিবাহ করেন। তিনি বিবাহের পর গৌড়ের বাদসাহের একজন সেনাপতি হয়েন। পিছলী নগরে বাস করিবার পূর্ব্বে তিনি পিছলীর এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কালিন্দীর পরপারে অশ্বখুরাকৃতি এক ঝিলের সন্নিকটে বাস করিতেন। সেই ঝিলের নাম 'কালাপাহাড়ের ঝিল'। 'নাগরাই' বর্ণনাকালে ইহার বিষয় বর্ণিত হইবে। এই কালু যখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তখন তাঁহার শৈবধর্ম্মে আস্থাবান থাকিবার পরিচয় দেশের লোক দেখাইয়া দেয়। লক্ষণাবতীর দক্ষিণস্থ লোহাগড়ের দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে এক সুবৃহৎ গৌরীপট্টসমেত শিবলিঙ্গ পতিত আছেন। দেশের লোক ঐ শিবকে 'কালাপাহাড়ের শিব' বলে। কালু ঐ শিবের পূজা করিতেন।

এই সমুদায় বিবরণদ্বারা মনে হয় 'কালু পাহালমান' নয়নচাঁদের পুত্র কালাচাঁদ বা রাজু হইবেন।

কালুর জীবনী যাহা এ প্রদেশের লোক বলিয়া থাকে তাহা কতকটা কালাপাহাড়ের জীবনীর মত। কালুর পূর্ণ ইতিহাস 'তাণ্ডা' বর্ণনকালে বর্ণিত হইবে।

কালুর নামে যে মস্‌জেদটি খ্যাত তাহার কিয়দংশমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে প্রস্তর অপেক্ষা ইষ্টকের প্রাধান্যই অত্যধিক দৃষ্ট হয়। আজিও বহু বিদেশী মোসলমান ভক্তিপূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া নামাজ করিয়া থাকেন। মস্‌জেদের একটি ক্ষুদ্র কুটুরিতে বহুসংখ্যক প্রাচীনকালের 'কুজো' ভগ্ন অভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেই কুজাগুলি কি কারণে এই ভাবে রহিয়াছে তাহা জানিবার বিষয়। প্রবাদ, যাহারা মক্কাসরিফ যাইত ও তথা হইতে আসিত তাঁহারাই তথা হইতে 'জম্ জম্' কূপের জল আনিয়া এই মস্‌জেদে প্রদান করিত। সেই কুজাগুলি বিদেশীয়। বাস্তবিক ইহা সত্য কি না তাহা বলা যায় না। তবে ঐ প্রকার কুজা মালদহের কোথাও প্রস্তুত হইতে দেখি না বা আর কোথাও বিদ্যমান নাই।

কালুর দরগা ও কুজো।

এই দরগায় অক্ষরমালাক্ষোদিত একখানি দীর্ঘ শিলা-ফলক বিদ্যমান আছে। ইহাতে কোরাণের বায়েত ক্ষোদিত। ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭ ফিট প্রস্থে ১ ফিট ২½ ইঞ্চি। প্রস্তরে ক্ষোদিত তারিখ ৬৪৭ হিজিরা বা ১২৪৯ খৃষ্টাব্দ।* মসজেদের বিশেষ বিবরণ এ স্থলে প্রদান করিলাম না। গৌড়পাণ্ডুয়াপ্রদর্শক (Guide to Gour and Pundua) নামক পুস্তকে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি হইতে উহা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

অক্ষরমালা ক্ষোদিত শিলা-ফলক।

কালু পাহালমানের দরগার নিকটেই 'হজরৎ সাহ জালালউদ্দিনের তাকিয়া' নামক স্থান বিদ্যমান। এই প্রকারের কয়েকটি তাকিয়া মালদহের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। 'তাকিয়া' আস্তানার এক প্রকার সংস্করণ মাত্র। সাহ জালাল উদ্দিন সম্বন্ধে এ প্রদেশের হিন্দুমোসলমান যে প্রাচীন কাহিনী বলিয়া থাকেন তাহাতে সাহ জালাল উদ্দিনের অপার মহিমার কথাই ব্যক্ত হইয়া থাকে। সাহ জালাল উদ্দিন একজন সিদ্ধ ফকির। তিনি এই স্থানে ক্ষণস্থায়ী আস্তানা করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি এই আস্তানায় অনেক সময় থাকিতেন।

হজরৎ সাহ জালালউদ্দিনের তাকিয়া।

যখন গৌড় নগরে রাজা লক্ষণ সেন রাজত্ব করিতেন তখন সেখ সাহ

* Vide J. A. S. Vol. p 246.

জালাল উদ্দিন এ দেশে আসিয়াছিলেন। দেশের লোক এই কথাই বলিয়া থাকে। কিন্তু ইতিহাস তাহা বলিতে চাহে না। আমরা এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের গণ্ডি ছাড়িয়া ভ্রমণের অধিকার লইয়াছি। কারণ বর্ত্তমান প্রবন্ধ 'মালদহের পল্লী-কথার' অংশবিশেষ; ইতিহাস নহে—ইতিহাসের উপাদান। লক্ষণাবতী হইতে পিছলী পর্য্যন্ত সে সময় লোকে লোকারণ্য ছিল, সহস্র সহস্র হর্ম্ম্য ভাগীরথীতীরে শোভিত ছিল, তখন সেখ একাকী এই হিন্দু দেশে আগমন করেন। তিনি কোন প্রকারে পিছলীতে আইসেন, এবং তথা হইতে কালিন্দী নদী পার হইয়া পাণ্ডুয়ায় যাইবার জন্য কালিন্দীর খেয়াঘাটের পাটনীর নিকট গমন করেন। পাটনী তাঁহার বেশভূষা অপূর্ব্ব-দর্শন দেখিয়া কোন প্রকার ছদ্মবেশী ও বৈদেশীক বলিয়া অবধারণ করে এবং পার করিতে চাহে না। সেখ বারম্বার পাটনীকে পার করিয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিলেও পাটনী রাজাদেশলঙ্ঘনের ভয়ে পার করিতে চাহে না। তখন পাটনী অজ্ঞাত, অপরিচিত, অদ্ভুতবেশধারী কাহাকেও সন্দেহবশতঃ পার করিত না। শেষে সেখ আলখেল্লার 'জেব' হইতে রুমাল বাহির করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন ও বলিলেন—'কীস্তি হো' দেখিতে দেখিতে রুমালখানি নৌকা হইয়া গেল। সেখ তাহাতে চড়িয়া নদী পার হইয়া গেলেন। পাটনী বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল; ভয়ে আর কোন কথা বলিল না।

সেখ কাহিনী।

রুমালের নৌকা।

যে স্থানে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহার সন্নিকটেই কালু পাহালমানের দরগা ভবিষ্যতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে স্থানে সেখ দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই স্থানেই 'তাকিয়া' নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সেখের এই অলৌকিক কার্য্যের কথা স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইবে। কারণ সেখের সহিত পিছলীর সম্বন্ধ অধিক নহে।

"চতুর্ব্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈক শতাধিকে।
বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরুষ্ক সমুপাগতঃ॥"
(সেখ শুভোদয়া)

ইহার মতে ১১২৪ শকে বিহারভূমি পাটনায় তুরুষ্ক আগমন করিয়াছিল। সেই কালের কোন একদিন লক্ষ্মণ সেন গৌড়পার্শ্বস্থ গঙ্গাতীরে

সেখ আবির্ভাব। দাঁড়াইয়া "দেবীং গঙ্গা গঙ্গেতি" শব্দ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সেই সময়ে জলের উপর দিয়া এক অলৌকিক বেশধারী পুরুষ হাঁটিয়া আসিলেন।

"কৃষ্ণাম্বরধরঃ শূরঃ শিরোবেষ্টনতৎপরঃ।
শীঘ্রাচ্ছীঘ্রতরং বীক্ষ্ণ্ আয়াতি নৃপসন্নিধৌ॥"
(সেখ শুভোদয়া)

কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রপরিহিত মাথায় পাগড়ীবিশিষ্ট পশ্চিমাস্তদেশবাসী সেখ সর্ব্বপ্রথম গৌড়ে আসিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু এই সময় হইতেই মোসলমানগণের এ দেশে গতায়াত আরব্ধ হইয়াছিল। তিনি বাণিজ্য-তরণীতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া বর্ণনকালে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। পিছলীর বন্দরে সেখাবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

পিছলীর কাঠালের অন্তর্গত দর্শনযোগ্য বিশেষ কোন স্থান আর নাই। যে দিকে দেখিবেন সেই দিকেই প্রাচীন নগরধ্বংসের চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পীরের দরগার চিহ্ন দেখা যায়। ভগ্ন বুদ্ধ-মূর্ত্তি। ঝুমুক সাহের বাগানে একটি কাঁঠাল গাছের তলদেশে কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মানবপ্রমান ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি পতিত থাকিতে দেখিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে তাম্র, পিত্তল ও প্রস্তরের মূর্ত্তি ভূগর্ভ খননকালে বাহির হইতেও শুনা যায়।

ভগীরথপুর।

পিছলীর দক্ষিণে ভগীরথপুরের কাঠাল। পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরেই ভগীরথপুর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গঙ্গার দয়া হারাইয়া ভগীরথপুর জনহীন বনে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই ভগীরথপুর একদিন কেবল দেব-দেবীর মন্দির ও গোলাগঞ্জে পূর্ণ ছিল। আজিও 'গোলাঘাট' 'চাঁদনীবাড়ী' নামক স্থানগুলি অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। চাঁদনীবাড়ী ও গোলাঘাট। অতি অল্প দিন হইল এই স্থানের জলস্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া এই স্থানে বড় বড় নৌকা ধান্য চাউল ইত্যাদি বোঝাই লইয়া গতায়াত করিত। উক্ত অঞ্চলের বৃদ্ধগণ গল্প করিয়া থাকেন যে, নিকটবর্ত্তী স্থানের দুর্গা প্রতিমা-গুলি দশমীর দিন ভগীরথপুরের চাঁদনীবাড়ী নামক ঘাটের ধারে নৌকা-

যোগে আনীত হইত। তখন উক্ত স্থানে মেলা বসিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। গোলাঘাটের দক্ষিণেই চাঁদনীবাড়ী। গঙ্গার বাঁধাঘাটের উপর চাঁদনীবাড়ী ছিল সেই জন্য আজিও দেশের লোক ইহাকে চাঁদনীবাড়ী বলিয়া থাকে। যোগ উপলক্ষে যখন গঙ্গাস্নানের সময় আসিত তখন বরেন্দ্র হইতে ও নগরের বিভিন্ন পল্লী হইতে ভগীরথপুরের চাঁদনীবাড়ী ঘাটে গঙ্গাস্নানের মেলা হইত। যোগের দিন ব্যতীত প্রত্যহ বিভিন্ন স্থান হইতে আগত নরনারীর স্নানের এইটি প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল।

সেকালের সম্ভ্রান্ত জনগণ গঙ্গাবাস উপলক্ষে এই ভগীরথপুরে বাস করিতেন। সন্ধ্যার সময় ভাগীরথীতীরস্থ ভগীরথপুর দেবতাগণের আরত্রিক-বাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠিত। গঙ্গাবক্ষে শত শত দীপালোক তরঙ্গে তরঙ্গে ঘূর্ণীত হইত।

ভগীরথপুরের কালীবাড়ী ও ঠাকুরবাড়ী প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় সন্ধ্যার পর আরত্রিক দেখিবার জন্য যথেষ্ট লোকসংঘট্ট হইত। ভগীরথপুর প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল গোলা গঞ্জ বন্দর ও দেবালয়ে পূর্ণ ছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত।

দারিদ্র্য।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত।)

দারিদ্র্য হইতে হয় লজ্জার উদয়,
লজ্জা-পরিগত জন শক্তিহীন হয়।
শক্তিহীন হ'লে তা'র ঘটে পরাজয়,
পরাজয় হ'তে জন্মে নির্ব্বেদ নিশ্চয়
নির্ব্বেদ হইতে শোক, শোকে বুদ্ধি ক্ষয়,
বুদ্ধিক্ষয়ে মানবের মৃত্যু নিঃসংশয়।
যে দুষ্ট দারিদ্র্য এত আপদের মূল,
কি পাপ সংসারে আর তা'র সমতুল!

সনাতনী।

গত ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের 'সনাতনী'র যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থখানি 'প্রবাসী' কার্য্যালয়ে বোমার মত গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যিনি যত্নের সহিত গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন, তিনি ইহাতে পিক্রিক এসিডের গন্ধমাত্রও প্রাপ্ত হইবেন না। বিশ্বাসী গ্রন্থকার তাঁহার আজন্মলব্ধ অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফল সমাজকে দান করিয়াছিলেন—শ্রদ্ধার সহিত দান করিয়াছেন—অশ্রদ্ধার সহিত দান করেন নাই।

আজকাল রাজনীতি ও অর্থনীতির আদর্শদ্বারা সামাজিক যাবতীয় প্রথার দোষগুণ বিচারিত হইতেছে। বাল্যবিবাহে সমাজের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; জাতিভেদ থাকায় ভারতবর্ষে নেশন গঠনের প্রতিবন্ধকতা হইতেছে—সুতরাং জাতিভেদ প্রথা বর্জ্জনীয়; বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করায় হিন্দু জাতির বংশবৃদ্ধি হইতেছে না, সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত: এবংবিধ যুক্তিদ্বারা অনবরত সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হইতেছে। সমাজসংস্কারের প্রয়োজন নাই, এ কথা বলিবার সাহস আমাদের নাই; কিন্তু সংস্কারপ্রয়াসীদলের এতাদৃশ যুক্তি ঘাত-সহিষ্ণু বলিয়া আমাদের মনে হয় না। প্রত্যেক সামাজিক প্রথার দোষগুণ সর্ব্বোচ্চ আদর্শদ্বারা বিচারিত হওয়া উচিত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ কিছু সর্ব্বোচ্চ আদর্শ নহে। কিন্তু বর্ত্তমান অবিশ্বাসের যুগে অনেকেই তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শে বিশ্বাস করেন না। বিভিন্ন আদর্শ অবলম্বন করি বলিয়া আমরা কোনও বিষয়ে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না।

উদার ও রক্ষণশীল যাবতীয় হিন্দুই হিন্দু জাতির মহত্ত্বের গর্ব্ব করিয়া থাকেন। জগতের অন্যান্য জাতি হইতে আমাদের বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা সকলেই বিশ্বাস করি। এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা হিন্দু, এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা আজি পর্য্যন্ত স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি। ভারতের উজ্জ্বল রত্ন, ব্রাহ্ম সমাজের শিরোমণি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল গত সার্ব্বজনীন মহাসভায় বলিয়াছিলেন,

"What does India represent? Not universal Empire like the Eternal City. Not universal spiritual domination, like the mother of all the churches. India in the shadow of the glacierclad Himalayas nd he roar of the Southern Ocean, has ever dreamt of other than a historic eternity. India dreamt of building up the foundations of the life spiritual preaching Ahimsa, the sacredness and inviolableness of all life and sentiency not for their own sake merely, but as progressive manifestation of the Life Eternal. India sought to organize the successive stages of life as in

social amphitheatre, so as to lead up to the high tableland, the Sinai peak, the rare and pure air, in which the universal self, the self of all that lives and moves, reveals itself to the searching gaze of Man. That fair fabric of a nationality on the basis of universal Peace, peace between man and man, and between man and every sentient creature was cruelly shattered by the shock and collision of Historic force. For it was necessary that the world should painfully learn the cult of a painful historic development from the brute to the man.

ভারতবর্ষ কিসের প্রতিনিধি?—বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের নহে; ধর্ম্মজগতে সকলের উপর প্রভুত্বেরও নহে। তুষারাচ্ছন্ন হিমাচলের ছায়ায় এবং দক্ষিণ মহাসমুদ্রের গর্জ্জনের মধ্যে ভারতবর্ষ চিরকালই এক সনাতনত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছে; যে সনাতনত্ব ঐতিহাসিক নহে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি সংস্থাপনের কল্পনা করিয়াছিল, ভারতবর্ষ অহিংসা—যাবতীয় জীব ও বেদনাবোধশীল পদার্থের অধৃষ্যা প্রচার করিয়াছিল। যাবতীয় জীব ও বেদনাবোধশীল পদার্থ সেই সনাতন পুরুষের ক্রমবিকাশশীল প্রকাশ বলিয়া অহিংসা প্রচারিত হইয়াছিল,—কেবল এই সমস্ত জীব ও পদার্থের প্রতি দয়াবশতঃ নহে। জীবনের বিভিন্ন কালকে ভারতবর্ষ এমনভাবে ব্যবস্থিত করিয়াছিল, যে তদ্দ্বারা মানুষ উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে আরোহণ করিয়া পরিশেষে এমন স্তরে পেঁছিতে পারে যে স্থানে সেই বিশ্বাত্মা মানবের দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েন। বিশ্বজনীন শান্তি, মানবে মানবে শান্তি, মানব ও প্রতি বেদনাবোধশীল পদার্থের মধ্যে শান্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সুন্দর জাতীয়তার সৌধ ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের সংঘাতে ভূপতিত হইয়াছিল। পশুত্ব হইতে মানবত্বের কষ্টকর উদ্বর্ত্তনের উপায় সমগ্র মানব-সমাজের জানা প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থার সমালোচনা করিবার সময় শীল মহাশয় ভারতবর্ষের যে মহত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিয়া যাই, ভারতবর্ষের ঋষিগণ সমাজব্যবস্থার সময় টাকাকড়ির হিসাব একেবারেই করেন নাই, পরন্তু ধর্ম্মসাধন মানবজীবনের উদ্দেশ্য ধরিয়া লইয়া ভারতীয় সমাজ গঠিত হইয়াছিল।—এ কথা ভারতসমাজ সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। জীবন সংগ্রাম নহে—স্বস্তি—এ কথাটি ভূলিলে হিন্দু সমাজের কিছুই বুঝা যাইবে না। পশুর জীবন সংগ্রামমাত্র। পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া না খাইলে তাহার চলে না। অসভ্য অবস্থায় মানুষও এই সংগ্রামের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। পাশ্চাত্য সমাজে এই সংগ্রাম অতি ভীষণভাবে চলিতেছে। যিনি এই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারেন জগতের ভোগ্য পদার্থ তাঁহারই করায়ত্ত হয়। কিন্তু যে স্থানে একজন জয়লাভ করেন সে স্থানে একশত জন পরাজিত হইয়া দুঃখের বোঝা বহিয়া জীবন শেষ করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেগ তীব্রবেগে বর্দ্ধিত হইয়া যাইতেছে—সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে মানবজীবন সংগ্রামক্ষেত্রই

রহিয়া যাইবে। আমাদের সমাজের ভিত্তি ছিল—শান্তি, মানুষে মানুষে শান্তি, মানুষে ও ইতর জীবে শান্তি। পাশ্চাত্য দেশের বিষদুষ্ট বাতাস আমাদের দেশে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে—এখন হইতে সতর্ক না হইলে সমাজের অধিকাংশের জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে।

'সনাতনী' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয় প্রাচীন ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। "ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি—অন্যান্য দেশ ভোগভূমি"—সরকার মহাশয় বলিয়াছেন ভারতসন্তানকে এ কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। অন্যান্য দেশের সমাজব্যবস্থা ভোগসাধনের সহায়; সে সমস্ত দেশে সংস্কারকগণের লক্ষ্যই ভোগ। যাহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের ভোগলালসা চরিতার্থ হইবার সুবিধা হয়, সমাজকে তাঁহারা সেই ভাবে পুনর্গঠিত করিতে চাহেন। ভারতসন্তানের ভোগ করিতে নিষেধ নাই--কিন্তু তাহাকে এমন ভাবে ভোগ করিতে হইবে যাহাতে ধর্ম্মসাধনের সুবিধা হয়। "এই কথাটি যদি আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, এবং শাস্ত্রের উপদেশ মত কার্য্য করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমরা এই পুণ্য ভূমিতে বাস করিবার অধিকারী, নতুবা ডিক্রুস্, গোমেস্ বা ব্রাউন, স্মিথ—চট্টগ্রাম চুনাগলি প্রভৃতি স্থানে যে অধিকারে বাস করিতেছেন আমাদের অধিকার তাঁহাদেরই মত।" "যদি তুমি গৃহস্থ হও এবং অতিথি, দেবতা, পিতৃপুরুষ প্রভৃতির নিয়মিতরূপে অন্নজলাদি দান না কর, তবে তুমি নিরামিষ হবিষ্যান্নই ভোজন কর, আর পিষ্টক পলান্নই গ্রহণ কর, সে কেবল শূকর-পেটপূরণ।" এই যে ভোগকে ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক করিবার চেষ্টা, ভারতের সমাজব্যবস্থার পদে পদেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। চেষ্টা যে ফলবতী হইয়াছিল—পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বের সামাজিক জীবনের আলোচনা করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বড়লোক ও দরিদ্রের জীবনযাপনপ্রণালীর বিশেষ তারতম্য ছিল না। নিজের ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ নিয়োগ করা পূর্ব্বে নিতান্তই নিন্দনীয় ছিল। অর্থ হইলেই দশজনকে খাওয়াইয়া ও প্রতিপালন করিয়া তাহা ব্যয় করিতেই সকলের আগ্রহ ছিল। আজ নিজের ভোগটি ঠিক রাখিয়া আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম করি। পৈতৃক আয় একই আছে—কিন্তু পৈতৃক ক্রিয়াকর্ম্মগুলি আমরা ছাড়িয়া দিতেছি। কেন না যে টাকা পূর্ব্বে এই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যয়িত হইত অধুনা তাহা না হইলে আমরা ফিটন ব্রুহাম্ মোটরকার রাখিতে পারি না।

ভোগপ্রবৃত্তিকে যে কত ভাবে সংযত করিবার চেষ্টা আমাদের দেশে হইয়াছে যাঁহার দৃষ্টিশক্তি আছে তিনিই তাহা দেখিতে পায়েন। একটি উদাহরণ এ স্থানে দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। 'বৃথা মাংস' ভোজন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। জীবহিংসা অকর্ত্তব্য; কিন্তু মাংস ভোজনের জন্য যাহার বলবতী স্পৃহা—সে স্পৃহা চরিতার্থ করিতে না দিলে, তাহার অনেক প্রকার ক্ষতি হইতে পারে। তাই শাস্ত্র ব্যবস্থা দিলেন, "দেবতার পূজার্থে পশু বলি দিয়া সেই পশুর মাংস দশ জনকে দিয়া তুমি ভোজন করিতে পার।" নিজের ভোগ-প্রবৃত্তিকে দেবপূজা ও অপর দশজনের তৃপ্তির অধীন করিয়া দিয়া শাস্ত্রকার ভোগকে যথেষ্টই সংযত করিয়া দিয়াছেন।

সরকার মহাশয় প্রাচীন হইলেও ভবিষ্যতের দিকে আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিবার শক্তি হারাণ নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, এ কর্ম্মভূমিকে তুমি কিছুতেই ভোগভূমিতে পরিণত করিতে পারিবে না।" কিন্তু তাঁহার মত ভবিষ্যতের দিকে চাহিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি—চারি দিকে সংযমের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে; পাশ্চাত্য ভোগবিলাসের আদর্শ ক্রমশঃই আপনার স্থানপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছে; আধ্যাত্মিকতা অর্থহীন ও মনুষ্যত্বনাশক বন্ধন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে—দেবদানবের যুদ্ধে দানব ক্রমশঃ জয়ী হইতেছে এবং ঋষিদিগের সমাজব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদ্ভব হয়। ভগবান করুন—সরকার মহাশয়ের আশা সফল হউক। হয় ত ভোগাসক্তির পরিণাম দেখিয়া দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত ভারতসন্তান পুনরায় সেই প্রাচীন আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিবে। তাহাই যদি ভগবানের উদ্দেশ্য হয়—সরকার মহাশয়ের গ্রন্থখানি সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করিবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

ধর্ম্মসাধনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন, সরকার মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের বিশেষ বিরোধের কোন কারণ নাই। কিন্তু আজিকালি অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, practical না হইলে ধর্ম্ম পালনীয় নহে। 'সনাতনীতে' এই আপত্তির বেশ খণ্ডন আছে। "ধর্ম্ম আদর্শ। আদর্শ বলিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব। practical ধর্ম্মও অশ্বডিম্বসমান। তাই বলিয়া ধর্ম্ম যে পালনীয় নহে, তাহা নহে। ধর্ম্ম মরীচিকার মত মিথ্যা মোহজময় পদার্থ নহে ও বৃথা আশায় আশ্বাসিত করিয়া হঠাৎ নিরাশার কঠোরতায় আচ্ছন্ন করে না। ধর্ম্ম সত্য পদার্থ, নিত্য পদার্থ, উজ্জ্বল,শান্ত, ধীর, স্থির, আভাময়, ধর্ম্মের দিকে যত অগ্রসর হইবে ততই তুমি আশ্বস্ত হইবে, শীতল হইবে, অথচ চিরজীবন, জন্মে জন্মে সাধু ব্যক্তি ক্রমেই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, কখনই স্পর্শ করিতে পারেন না। সামীপ্য ক্রমেই গাঢ়তর হয়, অথচ সাযুজ্য অনন্তকালসাধ্য।" আমাদের সমাজব্যবস্থাপকগণ এই দুঃসাধ্য ধর্ম্ম প্রত্যেকের জন্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যেককেই এই unpractical ধর্ম্মের যাজনা করিতে হইবে। আদর্শ সকলের পক্ষেই সমান—তবে সাধনার প্রকারভেদ আছে।

ধর্ম্ম আদর্শ হইলেও তাহা জানিবার উপায় কি? গ্রন্থারম্ভেই সরকার মহাশয় তাঁহার পাঠকগণকে বলিয়াছেন "স্বচ্ছন্দতা (individuality) কষ্টি পাথর নহে; তথাকথিত বিবেক কষ্টিপাথর হইতে পারে না।" পাশ্চাত্য চরিত্রনীতিশাস্ত্রে ধর্ম্মাধর্ম্মের কষ্টিপাতর লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। সে সমস্ত আলোচনা সত্বেও সরকার মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন।

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টি রেবচ।" মনু ২।৬।

অখিল বেদ, বেদবিদগণের স্মৃতি ও শীল, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি এই সমুদায় ধর্ম্মের মূল।

এই বিংশ শতাব্দিতে বেদ ও শিষ্টাচারের দোহাই দেওয়া বাস্তবিকই অসম সাহসের পরিচায়ক ; কিন্তু সত্য কথা বলিবার সাহস থাকা প্রয়োজন। সত্য বটে 'বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ', এবং মহাজনও অনেক, কিন্তু তবুও মহাজনের পন্থা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বিবেক সকলের একরূপ নহে; অর্জ্জিত জ্ঞানদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা সকল সময় সম্ভবপর নহে। সুতরাং মহাজনের পন্থানুসরণ ভিন্ন উপায় আর কি আছে? মহাজন অনেক বলিয়া আত্মতুষ্টির কথা বলা হইয়াছে। সন্দেহজনক স্থানে যে মহাজনের পন্থানুসরণ করিলে তোমার আত্মতুষ্টি হয় তাঁহার অনুসরণ করিলেই তোমার ধর্ম্ম হইবে। ন্যায়ান্যায়ের কষ্টিপাতর যাহাই হউক তাহার প্রয়োগ যখন সুসাধ্য নহে এবং প্রয়োগদ্বারা সকলে যখন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না—তখন আত্মতুষ্টি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই আত্মতুষ্টি বেদস্মৃতিশিষ্টাচারসম্মত বিষয়ে হওয়া চাহি তদ্বিগর্হিত বিষয়ে আত্মতুষ্টি হইলে বুঝিতে হইবে, তোমার অধর্ম্মেই তুষ্টি, ধর্ম্মে নহে। 'সনাতনী'তে একথা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের কষ্টিপাতর নির্ণয় করিয়া গ্রন্থকার ধর্ম্মসাধনের অনেকগুলি উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহু সহস্র বৎসরের সাধনার ফলে ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে—অহিংসা নিত্যধর্ম্ম। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহি—শরীররক্ষার্থে জীবহিংসা ধর্ম্ম। সরকার মহাশয় বলেন, "ব্রহ্মচর্য্য সকলের পক্ষেই সকল সময়েই পালনীয়" "আর ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ভোগসাধন হইতে বিরতি।" ব্রহ্মচর্য্য সকলের পালনীয় এই জন্য যে এই অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কেবল ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই নিত্য নির্বিকার সত্তার উপলব্ধি করা যায়। সমাজের যে যে ব্যবস্থায় এই ব্রহ্মচর্য্যের পরিপোষণ করে, সরকার মহাশয় মিনতি করিয়া বলিয়াছেন, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না। এই ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া গ্রন্থকার গৃহস্থের ধর্ম্ম, নারীর ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য ধর্ম্ম, প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্তের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের তিনটি মূল কথা ;—অঋণী হওয়া, অপ্রবাসী হওয়া ও নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা। অপ্রবাসী হওয়া কেন উচিত তাহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"প্রবাসে স্বস্তি ও শান্তি দুর্ল্লভ, প্রবাসে বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না এবং মনুষ্যত্বের সম্যক স্ফূরণ হয় না।" প্রবাসে এক শূকর পেটের পূরণ আর মিত্র বা অমিত্র ভোগে খাসীচর্ব্বির খানায় দানবোদরের সম্পূরণ ছাড়া ক্রিয়াকলাপ কিছুই নাই। প্রবাসীর পৈতৃক গৃহদেবতার সেবা হয় না, প্রবাসীর পৈতৃক গৃহে অতিথি স্থান পায় না। প্রবাসীর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক নাই—শ্রাদ্ধ নাই, শান্তি নাই, দেশের লোকের খোঁজখবর নাই ; প্রবাসে হিন্দুর মনুষ্যত্ব থাকে না। সন্তোষ হইতে আলস্য আসিয়া পড়িতে পারে। এ কথার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—যদি অতিথি দেবতার পূজা, অবশ্যপোষ্যের পালন, পেট-পূজার মত প্রয়োজনীয় মনে করি তাহা হইলে আমরা অলস হইবার অবসর পাইব না। শ্রাদ্ধের পর আমরা পিতৃলোকের নিকট বর চাহি—

"দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।" মনু। ৩।২৫৯।

"আমাদের কুলে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক—দেয় বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি হউক।" যে ঐকান্তিকতা সহকারে এরূপ প্রার্থনা আপনার পিতৃপুরুষদের কাছে করিতে পারে, সে কি কখন আর অলস হইতে পারে? নারীধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থকার মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে ও স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে; কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না। স্ত্রীলোকের স্বামীর সঙ্গে ভিন্ন যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত ও উপবাস নাই, কেবল পতি-সেবা দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন। গ্রন্থকার স্ত্রীপুরুষের সাম্যব্যবস্থার বিরোধী।

এ সমস্তই সনাতনী কথা কিন্তু যে রকম দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে এ সমস্ত কথার পুনরুক্তির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সমস্ত ভিন্ন আর একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা 'সনাতনী'তে আছে। সেটি জাতিভেদ। গ্রন্থকার বলিয়াছেন "জন্মভেদেই জাতির সৃষ্টি; বিবাহের নিয়মেই ইহার স্থিতি এবং শঙ্করবীজেই জাতকের জাতি নষ্ট; গুণ-ভেদে জাতিভেদ অসম্ভব কথা। আপনার গুণে সিবিলিয়ান হওয়া যায়, ইলবর্টবিলের গুণে সমান অধিকার পাওয়া যায় কিন্তু কোনও বিধি ব্যবস্থায় বাঙ্গালী ইংরেজ হইতে পারে না।" বিশ্বামিত্র মহা তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়া ছিলেন মাত্র, ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। বীজশুদ্ধির জন্য বিবাহশুদ্ধির আবশ্যক। বীজশুদ্ধির জন্য অন্নশুদ্ধি আবশ্যক বটে; কিন্তু ভিন্ন বর্ণের অন্নে অন্নশুদ্ধি হয় না, এ মতটি সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। মহাভারতের সময়ে শূদ্র সূপকারের অন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলেই গ্রহণ করিতেন।

গ্রন্থখানির একটু পরিচয় দিলাম। এখন 'প্রবাসী'র সমালোচনার একটু পরিচয় দিয়া উপসংহার করিব। গ্রন্থের পূর্ব্বপীঠিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন "আজকাল অনেক শিক্ষিত লোকেই পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী; মনে করেন ধর্ম্মে, সমাজে, শিক্ষায়, দীক্ষায় সকল বিষয়েই নিয়ত পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। সংসারের গতিই যেন কেবল নিয়ত পরি-বর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। পরিবর্ত্তনদ্বারাই সকল পদার্থের যেন পরিস্ফুটন হইতেছে। এটী তাঁহাদের বিশ্বাস, কিন্তু এটী একটী বিষম ভ্রমাত্মিকা ধারণা"। 'প্রবাসী'র সমালোচক এই মন্তব্যের উপর তীব্র শ্লেষবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের বক্তব্যটি বোধ হয় উপরোক্ত কয়েক পংক্তিতে সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই। এই সংসারের গতি যে কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেই পারে না। তাঁহার বক্তব্য—অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এক নিত্য নির্ব্বিকার সত্তা রহিয়াছে। পরিবর্ত্তন সৎ নহে। সুতরাং চতুর্দ্দিকে অনবরত পরিবর্ত্তন সংঘ-টিত হইতেছে বলিয়াই যে জোর করিয়া পরিবর্ত্তনকে টানিয়া আনিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। পরিবর্ত্তন যে নিত্য পদার্থকে প্রকাশিত করিতে চাহে কিন্তু প্রকাশিত করিতে পারে না তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পরিবর্ত্তনের জন্যই পরিবর্ত্তনকে আহ্বান করা সম্মত নহে। এই পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য জগতে অপরিবর্ত্তনীয় কিছু না পাইয়া জগতের প্রত্যেক যুগেই সাধক ও দার্শনিকগণ পরিবর্ত্তনের নিম্নদেশে এক

নির্ব্বিকার পদার্থের অনুসন্ধান করিয়াছেন। পরিবর্ত্তন যেমন জগতের নিয়ম, এই অপরিবর্ত্তিতের সন্ধানও তেমনই মানবমনের সহজাত অভ্যাস। যেমন জড়জগতে তেমনই মানব-সমাজে পরিবর্ত্তনরাশির নিম্নদেশে সেই নিত্য পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। এই প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে কোনও সেতু আমাদের সাধারণ চক্ষুর গোচর নহে। কিন্তু অপ্রকাশ যখন আচ্ছন্ন তখন তাঁহাতে পৌঁছিবার পথও নিশ্চয়ই আছে। সৃষ্টির আদি হইতে এই পথ আবিষ্কারের জন্য মানুষ অবিরাম চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টায় সফল হইয়াছেন বলিয়া অনেকে দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে সেই নির্ব্বিকার সত্তার লাভ অবশ্যম্ভাবী। শুধু পথের নির্দ্দেশ করিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হয়েন নাই; তাঁহারা সমাজকে এমন ভাবে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন—যাহাতে উক্ত পথ অবলম্বন করা সহজসাধ্য হয়। সরকার মহাশয় বিশ্বাস করেন, এই পথে সেই নির্ব্বিকার সত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুতরাং জগৎ সতত পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া এই পথ পরিত্যাগ করতঃ পরিবর্ত্তন আনয়ন করা তাঁহার মতে সঙ্গত নহে। যে সমাজব্যবস্থা এই পথকে সুগম করিয়া দেয় তাহার পরিবর্ত্তনেরও তিনি সমর্থন করেন না। কুবিধি সমাজে যথেষ্ট আছে; তাহার পরিবর্ত্তন কর, কিন্তু যে বিধিগুলি সেই নিত্য পদার্থের দিকে আমাদিগকে লইয়া যায়—তাহারও যদি পরিবর্ত্তন করিতে চাহ, তাহা হইলে বলিব "থামো, আর নয়"। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল,—অতি সত্য। না হইলে ত বাঁচিয়া যাইতাম। উপরোক্ত সনাতন পথের উপকারিতায় ক্রমেই লোকের বিশ্বাস লোপ হইবে তাহাও সত্য, সনাতন বিধি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাহাই পরিবর্ত্তনের শেষ নহে তাহার পরেও পরিবর্ত্তন আছে; সে অতি ভীষণ; সে মহাপ্রলয়ের পরিবর্ত্তন। সব ধ্বংশ হইবে, কিন্তু পরবর্ত্তী মন্বন্তরে সেই সনাতন পথ আবার অতি কষ্টে আবিষ্কৃত হইবে, আবার লক্ষ লক্ষ লোক সেই পথে চলিবে; পুনরায় ত্যাগ করিবে; আবার সব প্রলয়-সাগরে লীন হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝি তাহাকে ছাড়িব কেন?

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন "গুণভেদে জাতিভেদ অসম্ভব কথা।" 'প্রবাসীর' সমালোচক গীতা হইতে "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" উদ্ধৃত করিয়া সরকার মহাশয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ স্থানেও সমালোচকের অনবধানতা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে গুণভেদ অস্বীকার করা যে সরকার মহাশয়ের উদ্দেশ্য নহে, সে কথাও বলিয়া দিতে হইতেছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। গুণভেদ ত আছেই; কিন্তু সেই গুণভেদ হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি হয় নাই। আজিকালি অনেকে বলিয়া থাকেন—বল্লাল সেন যেমন গুণবিভাগ দ্বারা কৌলিন্য প্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনই পূর্ব্বকালে জাতি-বিভাগও সংঘটিত হইয়াছিল। সরকার মহাশয় এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এক আর্য্যজাতি কালক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের অনার্য্যগণ শূদ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছিল—একথা ত

বেশী দিন উঠে নাই। এ কথা উঠিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাতি যে বীজতঃ ভিন্ন এ কথা সকলেই বিশ্বাস করিত। সেই প্রাচীন মতকেই সরকার মহাশয় সত্য বলিয়াছেন। এই মতের একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও তাঁহার পুস্তকে না আছে এমন নহে। 'সনাতনীর' ৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় আছে "অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থকেন প্রথমে ব্রাহ্মণেরা ভারতে আগমন ও অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রমে ক্রমে পরে পরে আসেন।" বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া থাকেন—তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই। বীজশক্তি সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র সমালোচক অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার Darwin, Weismann, Spencer প্রভৃতি পণ্ডিতের সহিত যথেষ্ট পরিচয়ের প্রমাণ থাকিলেও আসল কথাটির কোনও মীমাংসা নাই। সরকার মহাশয় বীজসংমিশ্রণের বিরোধী। তাঁহার মতের খণ্ডন করিতে হইলে বীজসংমিশ্রণে জাতির উন্নতি হয়, দেখাইতে হইবে :— সমালোচক তাহা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় নিগ্রোজাতি যদি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়া থাকে—সে উন্নতির কারণ শিক্ষা, অন্য জাতির সহিত রক্তসংমিশ্রণ নহে। বহুকাল গত হইলে কি হয়, বলা যায় না, কিন্তু কয়েক পুরুষ যাবত রক্তসংমিশ্রণের ফল যে নিতান্তই খারাপ হয়, তাহার প্রমাণ সর্ব্বদেশেই পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়াই আমাদের দেশের ঋষিগণ শঙ্করত্বকে বড় ভয় করিতেন। সমালোচক বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান ভারতীয় হিন্দুজাতি যে বহু বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য, এবং উপজাতি সকলের যে কত সংমিশ্রণ হইয়াছে—তাহার তো ইয়ত্তাই নাই।" রক্তের সংমিশ্রণ যে ভারতে হয় নাই—এ কথা বলিবার সাহস আমাদের নাই। কিন্তু মিশ্ররক্তোৎপন্ন জাতি কখনও শুদ্ধবীজ জাতির সহিত মিশিয়া যাইতে পারে নাই. আজ পর্য্যন্ত তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া আছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিলে উক্ত বিবাহোৎপন্ন কন্যার বংশধরের (বিবাহশুদ্ধি অবলম্বন করিলে) কয়েক পুরুষ পরে ব্রাহ্মণ হইবার বিধি মনুতে আছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ যে তাহা হয় নাই—অসংখ্য মিশ্র জাতির অস্তিত্ব দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে মিশ্র রক্ত যে খুব কমই আছে—মিষ্টার রিজলী ও তাঁহার মতাবলম্বী কয়েকজন ভিন্ন আর কেহই তাহা অস্বীকার করিবেন না।

শিক্ষাদ্বারা যে প্রত্যেক জাতিই উন্নতিলাভে সমর্থ সে কথা সরকার মহাশয়াও অস্বীকার করেন না। তিনি সর্ব্বজাতির শিক্ষারও বিরোধী নহেন। 'সনাতনী'র ১৩৩ পৃষ্ঠায় আছে "শিক্ষিত অশিক্ষিতে পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে কি সমাজের শৃঙ্খলা থাকে না মঙ্গল হয়? ধনের ন্যায় বিদ্যাও কেবল দানে সার্থক হয়। কিন্তু ধনদানে ও বিদ্যাদানে পার্থক্য বিস্তর। × × × × × × এ হেন বিদ্যা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া যদি পাঁচ জনকে না দিলে, অথবা মূল্য লইয়া যদি তাহার বিক্রয় করিতে থাকিলে, তাহা হইলে তুমি বিদ্যার সৌন্দর্য্য ফুটিতে দিলে না, তা মঙ্গল হইবে কিরূপে? + + + + যেরূপ শরীরের জন্য জল, বায়ু আতপ; মনের জন্য, আত্মার জন্য সেইরূপ সৎশিক্ষা প্রয়োজনীয়।

যে সমাজে সাধারণ লোকে তাহা সহজে সুলভে না পায়, সে সমাজ আর সভ্য কিসে? সেই সমাজকে সভ্য অথবা সভ্যসাজন্ত বলিতে হয় বল, কিন্তু তাহা মনুষ্যত্ব-হীন।” সরকার মহাশয় বলেন, প্রত্যেক জাতিই স্বীয় বীজ শুদ্ধ রাখিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে, কিন্তু অশুদ্ধ বীজে উন্নতি সম্ভব নহে। উন্নতি বলিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ বুঝিলে হইবে না, মনের প্রকৃত উন্নতি বুঝিতে হইবে। আর শুধু বীজ শুদ্ধ থাকিলেই যে উন্নতি হইবে তাহাও নহে। ব্রাহ্মণের বীজ শুদ্ধ হইলেও দিল্লী, আগ্রা, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে যে ব্রাহ্মণের অবস্থা অত্যন্ত হীন সরকার মহাশয়ই তাহা বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বড় ছিলেন—তিনি ব্রহ্মধারণা করিতে পারিতেন বলিয়া। তাঁহার “উত্তমাঙ্গোদ্ভব” ও “জ্যৈষ্ঠ” এই ব্রহ্মধারণার সহায়তা করিয়াছিল মাত্র। উত্তমাঙ্গোদ্ভব ও জ্যেষ্ঠ হইয়াও ব্রহ্মধারণে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব কখনই হইত না। এই ব্রহ্ম-ধারণায় সক্ষম ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ বড় হইয়াছিলেন। যে সময়ে সমাজ ব্যবস্থিত হইয়াছিল—তখন ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মধারণায় সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষার গুণে যাবতীয় জাতিই যদি ব্রহ্মধারণায় সক্ষম হয়—তাহা হইলে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব থাকিবে না। আর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মধারণায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রভুত্বও যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু এত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও যে ব্রাহ্মণ এত দিন টিকিয়া আছে—তাহার বীজবিশুদ্ধিই ইহার কারণ। এই বীজ বিশুদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মণ এখনও ইচ্ছা করিলে বড় হইয়া উঠিতে পারিবেন, পুনরায় পৈতৃক গুণের অধিকারী হইবেন। সমালোচক মহাশয় Darwin, Weismann, Spencer এর কথা না তুলিলেই ভাল করিতেন। কেন না স্বোপার্জ্জিত গুণ সন্তানে সংক্রমিত হয় কি না সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সমালোচক যে accidental variation এর কথা বলিয়াছেন—তাহার অর্থ variation কেন তাহার কারণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু variation এর কারণ ত আছেই ভগবৎ কৃপাও বিনা কারণে কেহ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং এই “accidental variation” বা ভগবৎ কৃপা কেন হয়—যত দিন তাহার কারণ আবিষ্কৃত না হয় তত দিন চৌধুরী মহাশয় অতটা রোষপ্রকাশ না করিলেই ভাল হয়।

“সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় যাহাদিগকে শূদ্র বলা হয়, তাহাদিগের মধ্যে এমন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহাদিগের চরণতলে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বহুবৎসর শিক্ষালাভ করিতে পারেন ও উন্নত হইতে পারেন”—সমালোচকের এই উক্তি প্রতিবাদের অযোগ্য। জাতিভেদ ও জাতিবিদ্বেষ এক কথা নহে। জাতিভেদ আমাদের দেশে ছিল, জাতি-বিদ্বেষ ছিল না।

পরিশেষে বক্তব্য, সরকার মহাশয় জীবনের সায়াহ্নে স্বদেশবাসীর উপকারার্থ গ্রন্থখানি লিখিয়া প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র অবশিষ্ট আছেন। আশা করি, তাঁহার লেখনি আরও বহুদিন পর্য্যন্ত সবল থাকিয়া রুগ্ন, বিশ্বাসহীন, হতাশ বাঙ্গালীর গৃহে স্বাস্থ্য বিশ্বাস ও আশা বিতরণ করিবে।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য।

"Soil of Ancient India, Cradle of humanity hail! hail!! Venerable and efficient nurse whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion, hail! Fatherland of love, of poetry, and of science, may we hail a revival of thy past...."

—M. Louis Jacolliot's, 'Bible in India.'

আজ আমাদের—অভাবের অন্ত নাই—আর সকলে সেই অভাবগুলি পূর্ণ করিয়া দিতেছে।—ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ! কিন্তু বর্ত্তমান, উন্নত জাতি সকল যখন ঘোর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ছিল, ভারত তখন উন্নতির উচ্চ সোপানে অবস্থিত ছিল।

পৃথিবীর অধুনাতন যাবতীয় উন্নত জাতির পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষেই প্রথম উন্নতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাহা হইতেই তদানীন্তন গ্রীক্, ইতালীয় ও মিশরীয় জাতিরা উন্নত হইতে পারিয়াছিল।*

অতি পুরাকালে হিন্দুদিগের সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভা যে অর্থনীতিতেও বিকশিত হইয়াছিল তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্ণবিভাগ। মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে,

---

* The natives of India were not only more early civilised, but had made greater progress in civilization than any other people.

—Robertson's Hist. Disq. Con. Anc. India.

Modern researches by western scholars and savants distinctly point out that the mythologies, philosophies, creeds and customs of ancient Greece, Italy and Egypt were of Asiatic, especially of indian origin.

—Bose's Hindoo Civilazation in Anc. America

Some of the most ancient of the Greek philosophers travelled into India, that by conversing with the sages of that country they might acquire some portion of the knowledge for which they were distinguished.

-Robertson's Hist. Disq. Con Anc. India.

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদির যে বর্ণবিভাগ ইহা শুধু এক একটি বিষয়ের উন্নতিকল্পে এক একটি শ্রেণী; ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনের ফলে এই শ্রেণীবিভাগ সমাজক্ষেত্রে এক একটি প্রাচীরস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ইহার নিরাকরণ সে সময় ব্রাহ্মণেতর জাতির অসাধ্য ছিল।

তদানীন্তন ব্রাহ্মণ জাতিরা যেরূপ অসাধারণ প্রতিভাবলে এই শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা শেষে আপনারাই রাখিতে পারিলেন না, অর্থাৎ আর কার্য্য দেখিয়া বর্ণবিচার করা হইল না, যে যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিবে সে সেই বর্ণ হইল এবং এই চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্যও নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।*

এই বর্ণবিভাগ পূর্ব্বে কর্ম্মানুরূপ ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ কর্ম্ম বর্ণগত হইয়া উঠিল। কেন যে এরূপ হইল তাহা বলা কঠিন। প্রথমতঃ চারিটি বিভাগ হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ জ্ঞান শিক্ষা দিবে, কেহ রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা করিবে, কেহ ধন উপার্জ্জন করিবে ও দেশে যাহাতে অর্থাগম হয় তাহাই করিবে, আর শেষোক্ত জাতি উক্ত জাতিত্রয়ের দাসত্ব করিবে। পরে ইহাদের মধ্যে তৃতীয়োক্ত জাতি নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিল। যত উপায়ে ধনার্জ্জন হয় ততগুলি শাখা জাতিও হইল। ইহাতে শিল্প বাণিজ্য কৃষির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণী বিভক্ত হইয়া গেল। কিন্তু এই শ্রম-বিভাগ (Division of labour) ক্রমে জন্মস্বত্বে পরিণত (Birthright) হইল। কিন্তু আবার এই বর্ণবিভাগের পরও দেখা যায় যে, কেহ কেহ কর্ম্মভেদে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।×

---

* অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণা নামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া"—মনু, ১ম অধ্যায়, ৮৮-৯১ শ্লোক।

× ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং।—মহাভারত।

মানুষ যখন উন্নতিচক্রে উঠিতে থাকে তখন ক্রমশঃ তাহাকে কতকগুলি অভাব বোধ করিতে হয়। অভাব হইলে তাহার মোচনের পথও আবিষ্কৃত হয়। এই অভাব মোচনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতেই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি বিকশিত হয়। যে জাতি যত অধিক উন্নত ও সভ্য হইবে তাহার অভাবও ঠিক সেই মত বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অভাব নানা প্রকারের, তাহার মোচনও নানা উপায়ে করিতে হয়। অর্থই তাহার মধ্যে প্রধানতম। কাযেই অর্থাগমের জন্য শিল্প বাণিজ্য কৃষির আশ্রয় লইতে হয়। অভাবই উন্নতির মূল। মানুষের জাতীয় অবস্থা এই অভাবের মধ্য দিয়াই পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।

এই হিন্দু জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ যখন এইরূপে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।" এখন, আমরা এই বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য ও বণিক্ জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বোধ হয় জগতে আর নাই। সেই গ্রন্থেই প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের বাণিজ্য ব্যবসায় ও এই বাণিজ্যার্থেই সমুদ্র যাত্রার অনেক উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। (ঋগ্বেদ ; ১ম মণ্ডল, ২৫ সূক্ত ; ৭ ঋক্ ; ১ম মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত, ৩ ঋক্)।

ইহা ব্যতীত মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা গ্রন্থেও ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। মহাভারতীয় সভা পর্ব্বে ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে নানা দেশাগত রাজন্যবর্গের প্রদত্ত উপঢৌকনের তালিকা দৃষ্টে অনেক প্রকার বস্তুর নাম দেখা যায়। সে সকল ভারতবর্ষে উৎপন্নই হয় না—বিদেশ হইতে আনীত। এবং আরও দেখা যায় যে, হিন্দুদিগের সহিত অন্য দেশীয়দিগের সম্প্রীতি ছিল। রামায়ণেও অযোধ্যার সমৃদ্ধি বর্ণনায় আদি কাণ্ডে ও সুন্দর কাণ্ডে, শিল্প বাণিজ্যের চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। মনুসংহিতায় বাণিজ্যসংক্রান্ত সকল প্রকার বিধিই আছে, যেমন সমুদ্র যাত্রা (যখন বিলাস-বাসনা অথবা অধ্যয়ন-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে য়ুরোপে যাওয়ার প্রথা ছিল না, তখন বাণিজ্যই তাহার একমাত্র কারণ গণ্য করা যাইতে

মনু বৈবস্বতের সন্তানের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ বা শূদ্রও হইয়াছিলেন। নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র একবার বৈশ্য হইয়াছিলেন পুনরায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

পারে), পণ্য বিক্রয়ে লাভ ও ক্ষতি, যৌথ ব্যবসায়, শুল্ক, বণিকের প্রতারণার শাস্তি, দুর্ভিক্ষের সময় পণ্যপ্রেরণ নিষেধ, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট পণ্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে শাস্তি, ঋণ, কুসীদ প্রভৃতি বাণিজ্যসংক্রান্ত নানা বিষয়ের উপদেশ ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে। বাণিজ্যের জন্য যখন দণ্ড বিধিও প্রচলিত, তখন বাণিজ্য যে বহুল পরিমাণে ছিল, এবং সমুদ্র-যাত্রার কথায় ভারতের বাহিরেও যে ভারতের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল—এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় কথা, তখন যাঁহারা বাণিজ্যকেই জীবনবৃত্তি করিয়াছিলেন সেই বণিক্ জাতির অধিকার ও সম্মান শুনিলে বাস্তবিক স্তম্ভিত হইতে হয় ; এবং বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালের লোকের বাণিজ্যের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণের তালিকায় বলিতেছেন "মাননীয় বৈশ্যগণকে আমন্ত্রণ করিবে"। * সে কালে বেদে অধিকার বড় একটি সোজা কথা ছিল না, কিন্তু বৈশ্য জাতির বেদাধিকারও ছিল। শুধু অধিকার নহে, বেদাধ্যয়ন তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। †

মনুসংহিতায় হিন্দুদিগের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক বিধি ব্যবস্থা ব্যতীত বাণিজ্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী লিখিত, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। রামায়ণে ও মহাভারতে যে প্রাচীন হিন্দুদিগের আর্থিক অবস্থার বর্ণনা আছে তাহাতে বেশ নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে ভারতবর্ষ শিল্পবানিজ্যের মহামেলা ছিল। কারণ, মানুষের উন্নত অবস্থায় যে সমস্ত বিলাসোপযোগী সামগ্রীর প্রয়োজন সেগুলি শিল্প বানিজ্য বিনা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভবপর নহে। এ সব কি তবে কবির কল্পনা বলিয়া উপেক্ষার কথা? যাহা আছে কবি তাহারই বর্ণনা করেন। কবির কাব্যই ভবিষ্য ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন। মহাত্মা টড সত্যই বলিয়াছেন "Bards may be regarded as the primitive historians of mankind."—(Tod's Introduction to Rajasthan).

* "আমন্ত্রয় ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান ভূমিপালথ।
বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাং শ্চ সর্ব্বানানয়তে তিচ"—মহাভারত, সভাপর্ব্ব।

† "অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥—মনু, ষষ্ঠ-অঃ, ৩৭শ্লোঃ
দ্বিজ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

পণ্ডিত প্রবর রবার্টসন তাই বলেন —"Whoever examines the whole work cannot entertain a doubt of its containing the jurisprudence of an enlightened and *commercial* people."—Robertson's Hist. Disq. Con. Anc. India.

অদ্য হইতে প্রায় সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে গরম মশলা, নীল, ও অন্যান্য অনেক বস্তু মিশরে প্রেরিত হইত। মিশর ও ইতালী দেশ হইতে বহু সংখ্যক পণ্যবাহী পোত আসিয়া মালাবার উপকূলে উপস্থিত হইত এবং এই ভারতবর্ষ হইতে অনেক প্রকার পণ্যসম্ভার লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত। এইরূপ সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত বর্ষ প্রতীচ্য দেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিল।

চীন দেশ কৌষেয় বস্ত্রের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। এই চীনদেশীয় বস্ত্র ভারতবর্ষেও আমদানি হইত। চীনের সেই বস্ত্র এ দেশে তখন অত্যন্ত সমাদৃতও হইত। চীন বস্ত্রের উল্লেখ কালিদাসের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ
চীনাংশুক মিবকেতোঃ প্রতিবাতংনীয়মানস্য।"

——শকুন্তলা, প্রথম অঙ্ক।

হিন্দুরা এই প্রাচীন বাণিজ্যকল্পে যে সমুদ্র-যাত্রাও করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এ বিষয় পরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। হিন্দুরা তৎকালে অতি প্রবল বণিকজাতি ছিল, তাঁহারা বাণিজ্যের জন্য জীবন পণ করিয়াছিলেন—কিসে দেশে বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি হয়। পরবর্ত্তী পুরাণোক্ত নিষেধবিধিই প্রমাণ করিতেছে যে, পূর্ব্বে হিন্দুদিগকে সমুদ্র-যাত্রা করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত না।

এ দেশে জায়ফল, দারুচিনি উৎপন্ন হয় না, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেই এ গুলি প্রভূত পরিমানে জন্মে; কিন্তু তাৎকালিক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঔষধের উপাদান-স্বরূপ এগুলির যে নাম দৃষ্ট হয় ইহাতেই বুঝা যায় যে, এগুলিও এ দেশে আমদানি হইত।

রামায়ণে আছে, ভরত যখন অযোধ্যায় আইসেন তখন তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে কম্বল, হরিণচর্ম্ম, উত্তম বস্ত্র ও অনেকগুলি কুকুর দিয়াছিলেন।

রাজা মটুক রায়।

কেতাবের যে স্থানে আরব্য উপন্যাসের কুমার কমরল ও চীনরাজ-কুমারী বেদৌরার উপাখ্যানের মত পরীগণ গাজী ও চম্পাকে একত্র করিল সেই স্থান হইতে জনপ্রবাদের সহিত কেতাবের আদৌ মিল নাই। জন-প্রবাদ এইরূপ—গোরা গাজী নামে এক ফকির বাদা বনে বুজরুকি দেখাইয়া বেড়াইত। যখন মটুক রাজার সুন্দরী কন্যা চম্পাবতী ওরফে সুভদ্রার বিবাহের কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট হইয়া পড়িল তখন নানা স্থান হইতে নানা রাজা উপঢৌকন সহ কন্যার তত্ত্ব করিতে আসিতে লাগিলেন। গোরা-গাজীও কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিবার মানসে তাঁহার চেলা কালু-সাহের নিকট এক হাঁড়ি গহনা মুখবন্ধ করিয়া উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হাঁড়ি রাজবাটীতে পৌঁছিলে কেহ তাহার মুখ খুলিতে পারিল না, চম্পাবতী যেমন হাঁড়ি স্পর্শ করিলেন অমনই হাঁড়ির মুখ খুলিয়া গেল; রাজকন্যা আগ্রহ সহকারে তাহার ভিতর যে সমস্ত সুবর্ণের অলঙ্কার ছিল তাহা অঙ্গে পরিধান করিলেন। সেই গহনা আর কেহ রাজকন্যার অঙ্গ হইতে খসাইতে পারিল না। কালু বলিলেন, গহনা যখন কন্যার গাত্র হইতে খসি-তেছে না তখন গাজী সাহেবের রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। রাজা কালুর কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন এবং নগরে আদেশ প্রচার করিলেন যে, ফকির দেখিলেই তাহাকে বন্দী করিবে। গাজী সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া সুন্দর বন হইতে বহু সংখ্যক বাঘ সংগ্রহ করিয়া মটুক রাজার রাজ্য ধ্বংস করিতে আগমন করিলেন।

খেয়ার পাটনিগণ বাঘ দেখিয়া নৌকা ফেলিয়া পলায়ন করিল, গাজী সাহেব ব্যাঘ্রদিগকে মন্ত্রবলে ভেড়া করিয়া রাখিলেন ও নদীর উপর কড়ে জাঙ্গাল দিয়া নদী পার হইয়া মটুক রাজার জীবৎ কুণ্ড গোরক্ষে অপবিত্র করিয়া দিলেন। মটুক রাজা কালী-সাধক ছিলেন, কূপের জল কলুষিত হওয়ায় রাজার সাধনার ব্যাঘাত হইল, মটুক রাজা গাজীর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। গাজী সাহেব মটুক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুর দাস ও কন্যা চম্পাবতীকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তথায় একটি মুসলমানের দরগা স্থাপিত করিলেন। ঠাকুর দাস মুসলমান হইয়া ঠাকুর বর নাম ধারণ করি-

লেন আর চম্পাবতী—মাই চাম্পা নামে অভিহিতা হইলেন। চম্পাবতীকে গাজী সাহেব মুসলমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহ করিতে না পারিয়া কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া অবশেষে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বেত্রবতী নদীর সন্নিকটে জিলা বোর্ডের সদর রাস্তার ধারে মাই চাম্পার দরগা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সেই দরগায় ছাগ ও কুক্কুট দিয়া এখনও পূজা ও মানত করিয়া থাকেন। ফাল্গুন মাসে তথায় একটা মেলা বসে। আর ২৪ পরগণা জিলার মধ্যে গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে চার গ্রামে ঠাকুর বর সাহেবের দরগা বর্ত্তমান আছে। এ স্থানেও ফাল্গুন মাসে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পীর সাহেবকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এই দরগার পীর ঠাকুর বর সাহেবের অঙ্গে পৈতার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, সেবাইৎ ফকিরগণ সেই ব্রাহ্মণ পীরের যজ্ঞোপবীতের চিহ্নটি আজিও রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। চার ঘাটের ব্রাহ্মণ পীর ঠাকুর বর সাহেবের ইতিহাসে একটি প্রাচীন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু বণিকের জীবনী নিহিত আছে। এক্ষণে দেখা যাউক, মুসলমান কেতাবের বয়ান অনুসারে সুন্দর বনে কোন সময়ে সেকন্দর নামে কোন মুসলমান রাজার নাম পাওয়া যায় কি না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমরা পাঠান রাজা সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকন্দর বাদসাহের নাম পাই। তিনিই পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্ম্মাণ করান। তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দিন যুদ্ধে পিতাকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজা হয়েন। আমাদের সহিত ইতিহাসের এই সেকন্দর বাদসাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

আমাদিগকে দেখিতে হইবে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুন্দর বনের নিকটবর্ত্তী স্থানে সেকন্দর নামে কোন বাদসাহের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা?

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিয়াছেন—One Tajkhan Mansad Ali, accompanied by his younger brother Sikondar Pahalwanir the Wustter, conquered Hijili and founded a Muhammadan settlement at the month of the Rasulpar river, Tajkhan's tomb still exists there but the inscriptions attached to the vault have not yet been published. Mansad Ali was

a holy man, Mansad Ali village south of Contaic still exists. After the death of Sikondar Pahalwan Tajkhan governed the country alone till in 1515 he buried himself alive.

সেকন্দর পলোয়ান নামে একজন মুসলমান যোদ্ধা হিজিলিতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; আর তাঁহার রাজত্ব তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দীল্লির সম্রাটের হস্তগত হইয়াছিল; ইহা আমরা জানিতে পারিলাম। সেকন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন সাধু পুরুষ ছিলেন। রাজার ছেলের ফকিরি লওয়া বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ইহা সচরাচর চলিয়া আসিতেছে। অতএব সেকন্দর পলোয়ানের পুত্র গাজী সাহেব যে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া ফকির হইবেন তাহা অসম্ভব নহে। মনসদ আলি যোদ্ধা ভ্রাতা সেকন্দর পলোয়ানের সাহায্যে রাজ্যস্থাপন করিলেন আবার ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে মনসদের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে রাজ্যেরও লোপ হইয়া গেল। তাজ খাঁ ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, রাজ্য শাসন করা তাঁহার পক্ষে বড়ই দুরূহ কায ছিল. নতুবা তিনি শত্রুর ভয়ে জীবন্ত কবর পাইবেন কেন? এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেকন্দরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাজ খাঁরও অস্তিত্ব শেষ হইয়াছিল। সেকন্দরের মৃত্যু যদি ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের কাছা কাছি হয় তাহা হইলে গাজী সাহেবের জন্মও ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে হইবার সম্ভাবনা। গাজী সাহেব যখন সাবালক হইয়াছেন, পিতা তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, সেই সময় তিনি ও কালু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা "সাগর সমান" নদী পার হইয়া সুন্দর বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক সেকন্দর বাদসাহার বিরাট নগর—ইতিহাসের হিজিলি, কোন্ স্থানে অবস্থিত। আর সেই হিজিলি হইতে সুন্দর বন অঞ্চলে আসিতে হইলে পথে "সাগর সমান" কোন নদী পার হইতে হয় কি না?

Hunter বলেন Hijili is the name of the coastland extending from the mouth of the Rupnorayan along the right bank of the Hugli river near Jaleshwar. Mr. Grant includes it in the Sundarbans.

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, বর্ত্তমান যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিকার-

গাহার সন্নিকটে লাউজিনি গ্রাম—মটুক রাজার সেই ব্রাহ্মনা নগর—হইতে সেকন্দর বাদসাহের হিজিলি ঠিক পশ্চিম না হইলেও একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করিতেছে। হিজিলি তমলুক অঞ্চল এক্ষণে মেদিনীপুরের মধ্যে পড়িলেও তখন সুন্দর বনের অন্তর্গত ছিল। হিজিলি হইতে বহির্গত হইয়া প্রকৃত সুন্দর বনে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমে "সাগর সমান" ভাগীরথী নদী পার হইতে হয়। গাজী সাহেবও সর্ব্ব প্রথমে আশার সাহায্যে এই নদী পার হইয়া সুন্দর বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাত বৎসর বনভ্রমণ করিয়া ফকিরদ্বয় শ্রীরাম রাজার ছাপাই নগরে আগমন করেন। কেতাবের এই বয়ানে কোন ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া অনুমান হয় না, তবে মটুক রাজার বাড়ীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বার বাজারে শ্রীরাম রাজার বাস্তভিটা ও প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। হিজিলি হইতে বাহির হইয়া অগ্রে মটুক রাজার রাজ্য পার না হইয়া শ্রীরাম রাজার বার বাজারে (ছাপাই নগর) প্রবেশ করা যায় না। গাজী সাহেব যে অগ্রে মটুক রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়া পরে শ্রীরাম রাজার রাজ্য নষ্ট করিয়াছিলেন তাহা আমরা পরে দেখাইব। হিজিলি হইতে সোনাপুর ব্রাহ্মনা নগর যাইবার পথে শ্রীরাম রাজার সহিত কালু গাজীর সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। কেতাবে আছে, গাজী ও কালু শ্রীরাম রাজার ছাপাই নগর পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর বনে সোনাপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। মাতলা লাইনে বারুইপুর সবডিবিসনের উত্তরে সোনাপুর গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। হিজলী হইতে সোনাপুর অধিক দূর নহে। সুন্দর বনে প্রবেশ করিয়া বরাবর উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে সম্মুখে সোনাপুর গ্রাম পড়ে। কালু ও গাজী অসংখ্য নদীখালপরিবৃত দুর্গম বন ভ্রমণ করিতে করিতে যে দীর্ঘ সাত বৎসর পরে সোনাপুরে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা অসম্ভব নহে। এই সোনাপুরেই পল্লীগণ চম্পাবতীর সংবাদ গাজীকে দিয়াছিল ও দক্ষিণ দেশে মটুক রাজার বাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। কিন্তু সোনাপুর হইতে মটুক রাজার বাড়ী উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থান করিতেছে। মটুক রাজার বাটী সম্বন্ধে পল্লীগণের ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু মটুক রাজার সেনাপতি মানুষ ছিলেন, তিনি দিক্ নির্ণয়ে কোন ভুল করেন নাই। দক্ষিণ রায় গঙ্গাদেবীর স্তুতি করিবার সময় বলিয়াছিলেন—

"পশ্চিম দেশেতে আছে বিরাট নগর,
পিতা তার বাদসা জান নাম সেকন্দর।"

ব্রাহ্মণা নগর হইতে হিজিলি বিরাট নগর পশ্চিম দিকে বলিলে অন্যায় বলা হয় না। অদ্যাপিও মধ্যবঙ্গে প্রবাদ আছে 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।' সুন্দর বনে গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরেরই একরূপ রাজত্ব ছিল। এই বাঘ কুমীর যে বশ করিতে পারিত তাহার পসার বাড়িয়া যাইত; সেই কারণে আমরা মুসলমান ফকিরগণের বুজরুকির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ব্যাঘ্র বশ করিবার ক্ষমতা দেখিতে পাই। যে স্থানে ফকির ও পীরের দরগা আছে সেই স্থানেই ব্যাঘ্রের কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, সুন্দর বন তখনও reclaimed হয় নাই, ব্যাঘ্র জঙ্গলের যথায় তথায় ঘুরিয়া বেড়াইত, ব্যাঘ্র চর্ম্ম সংগ্রহ করা সে সময় বড় কঠিন কায ছিল না। মটুক রাজার সৈন্যদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য যে গাজী সাহেব সৈন্যদিগকে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরাইয়া ব্রাহ্মণা নগরে উপস্থিত হয়েন নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে?

উত্তর-পশ্চিম হইতে কোন শত্রু আসিয়া মটুক রাজার নগর আক্রমণ করিতে হইলে তাহাকে হরিহর নদী পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইত। এই কারণে আমরা মটুক রাজার রাজধানীর দক্ষিণে 'কড়ে জাঙ্গালের' নাম শুনিতে পাই। এই 'কড়ি জাঙ্গালই' যে হরিহর নদীর বাঁধ তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। কড়ি জাঙ্গাল শত্রুগণের দ্বারাও প্রস্তুত হইতে পারে কিম্বা ইহা হয় ত মটুক রাজা অথবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক পারাপারের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। গাজী সাহেবের ব্যাঘ্র আছে আর মটুক রাজার যদি কুম্ভীর না থাকিলে তবে যুদ্ধ প্রবল হয় না। দক্ষিণ রায় এমন বীর যে, ব্যাঘ্রদলকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু গাজীর সহিত যুদ্ধে তিনি বাঁধা পড়িলেন, তাহা না হইলে গাজী সাহেবকে বড় করা যায় না। গাজী সাহেবের মাসী গঙ্গা দেবী, অজুপা সুন্দরী তাঁহার ভগিনী; মটুক রাজাও গঙ্গাদেবীর বরপুত্র, গাজীও গঙ্গাদেবীর ভগিনীপুত্র। গাজী সাহেব মুসলমান হইয়াও হিন্দু; তাই তাঁহার সহিত চম্পার বিবাহটা বড় বিসদৃশ হয় না। রাজার পুত্র সৎজ্ঞান লাভ করিয়া ফকিরী লইয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন, পীর পয়গম্বর হইয়া পড়িলেন, আবার তিনিই যদি এক হিন্দু রমণীর রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে

তাহা সিদ্ধ ফকিরের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা হয়। সেই কারণেই বোধ করি মুসলমান পুঁথিকার এইরূপ একটা সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যাহা হউক গাজী সাহেব যে মটুক রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়াও তৎকন্যা চম্পাবতীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হয়েন নাই, তাহা আমরা চম্পাবতীর কথায় দেখাইব। সেকেন্দর সাহের প্রথম হিজিলির settlement যদি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে হয়, তাহা হইলে গাজী সাহেবের ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্ম হয়। গাজী সাহেবকে সাবালক হইয়া গৃহ ত্যাগ করিতেও অন্ততঃ ১৮।১৯ বৎসরের কম লাগে নাই। গাজী সাহেব প্রথমে সুন্দর বনেই ৭।৮ বৎসর ঘুরিয়াছেন; পরে সোনাপুর নগর নির্ম্মাণ করিয়া কিছু দিন বাস করিয়াছেন; তাহার পর চম্পাবতীকে বিবাহ করিবার লালসায় সুন্দর বনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া এই দুর্গম বনভূমি পার হইয়া তবে মটুক রাজার দেশে গিয়া উঠিয়াছিলেন। তথায় তিনি নগর অবরোধ করিয়াছেন, যুদ্ধ চলিয়াছে, তবে মটুকরাজা ধ্বংস হইয়াছেন। যাহা হউক যদি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের সমকালে গাজীসাহেব জন্ম হইয়া থাকে তাহা হইলে ১৫৩০—১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই মধ্যবঙ্গের প্রবল প্রতপান্বিত, প্রতিভাশালী সাধক হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা মটুকরায়ের রাজত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

বর্ষ-চক্র।

১

নিদাঘ আসিল যবে প্রখর পিপাসালয়ে—
আকুল উদাস,
তপ্ত বায়ু সনে তা'র এল মোর বাঞ্ছিতার
বিবহ-নিশ্বাস।

২

সঘন বরষা যবে নামিল গগনপথে
ঘিরি' চারিধার,
ঝরে বারি অবিরল ;— এযে শুধু অশ্রুজল
ব্যথিতা প্রিয়ার।

৩

শরতে নির্ম্মল দিশি, উজ্জ্বল ধরণীতল,
প্রসন্ন আকাশ ;
শেফালি-কমল-বাসে জলে স্থলে ভেসে আসে
প্রিয়াদেহবাস।

৪

আসিল হেমন্ত রাণী— হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্রে
অঞ্চল সোনার,
কুণ্ঠিত সোনার রবি ;— সরম-সঙ্কোচ ছবি
প্রিয়ার আমার।

৫

কুহেলি-আবৃত মুখ, নির্ব্বাক্ শিশির আসি'
হানে হিম-বাণ,
আনে অবসাদ ঘোর ;— এযে দয়িতার মোর
নিরদয় মান।

৬

বসন্ত আসিল লয়ে নব পত্রপুষ্পরাশি—
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস,
বহিছে মলয় বীর ;— এ যে মোর প্রেয়সীর
অঞ্চল-বাতাস।

৭

প্রতি ঋতু দিয়া গেল প্রিয়ার আভাস মোর,
বর্ষ ঘুরে যায়;
তবু আনিল না প্রিয়া— পূর্ণ রূপরাশি নিয়া
আজি সে কোথায়!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

উন্মাদিনী।

১

কেরে অই দাঁড়াইয়া বকুল-তলায় ?
ভস্ম, ধূলা, মাটি মেখে,
শরীর গিয়েছে ঢেকে,
রুক্ষ কেশে জটাভার ধরেছে মাথায়।
কেরে অই অভাগিনী বকুল-তলায় ?

২

শতগ্রন্থিযুক্ত বাস ছিল পরিধান।
সে চীর বসনখানি,
খুলিয়া ফেলেছে টানি' ;
নাহি লজ্জা, ভয় মনে, মান, অভিমান।
সকলি সুদূরে ওর করেছে প্রস্থান॥

৩

এত করি' সুধাইনু না দেয় উত্তর।
কা'র অভাগিনী মেয়ে,
বুঝি মনে দুঃখ পেয়ে,
গৃহ ছাড়ি' আসিয়াছ অরণ্যভিতর,
কি গভীর মনোদুঃখে আছ নিরুত্তর ?

৪

আয় আয় অভাগিনি ! আয় মোর কাছে।
ধূলা, মাটি ধোয়াইব,
নব বাস পরাইব,
অন্তরের স্নেহ দিব, যাহা মোর আছে,
আয় অভাগিনী নারী, আয় মোর কাছে।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

রামায়ণী সভ্যতা।

সাহিত্য।

১

অথর্ব্বের উল্লেখ রামায়ণে আছে; কিন্তু তাহা বেদবাচ্যে অভিহিত নহে। ইহাতে মনে হয়, রামায়ণে অথর্ব্ব ঋষির নামীয় মন্ত্রেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণ প্রবাদও, অথর্ব্ব বেদের বিভাগকাল রামায়ণী যুগের পরে বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

বেদের পর ব্রাহ্মণের স্থান, বেদ মন্ত্রে যে জ্ঞানরাশি নিহিত আছে ব্রাহ্মণে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সমাজে বৈদিক ভাষা লোপ হইয়া ক্রমে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা প্রচলিত হইয়া গেলে বেদমন্ত্র সাধারণের নিকট অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডলোপ আশঙ্কা করিয়া সমাজের নেতৃগণ বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন ও তদ্দ্বারা বেদপ্রচলিত ক্রিয়াকলাপ রীতি নীতি জনসমাজকে সাধারণ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। বেদমন্ত্রের এই ব্যাখ্যা ও সমাজের নেতৃগণ কর্ত্তৃক মুখেমুখেই প্রচারিত হইয়াছিল। বেদের ব্যাখ্যা বা ব্রাহ্মণ-ভাগ চাতুর্ব্বর্ণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ হইতেই পরবর্ত্তী বেদব্যাখ্যাকারী বা সমাজের নেতৃগণ ব্রাহ্মণ উপাধি লাভ করেন।* অতঃপর চতুর্ব্বর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়েন। বেদের ব্যাখ্যা বা ব্রাহ্মণ ঠিক এক সময়ে এক স্থানে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। বেদব্যাখ্যাচ্ছলে ব্রাহ্মণে এমন অনেক গল্প বর্ণিত হইয়াছে যাহা বেদে নাই। বেদের ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত হইয়াছিল এবং তাহা রামায়ণের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইতে আরম্ভ

* ব্রাহ্মণই বেদের একমাত্র প্রকাশক এই ভাব হইতেই বোধ হয় "ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদে অন্যের অধিকার নাই" এই ভাবটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ভাব রামায়ণ যুগের বহু পরে প্রচারিত হইয়াছে।

হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের পরেও অনেক ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছে। রামায়ণে ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। (অ—১৪)

রামায়ণী যুগের পর লিপিপ্রণালী প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণগুলি লিখিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত হইয়াছে। রামায়ণের সময় কতগুলি ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল ও তাহা কি কি তাহার কোন উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধ রাজা দশরথের উক্তি "জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমতিরোচয়ে।" অ-২।৮ হইতে আরণ্যকের আভাস উপলব্ধি হয়। কিন্তু তখন কোন আরণ্যক ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল কি না অবগত হওয়া যায় না। এই সকল লৌকিক ভাব হইতেই ক্রমে ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ রচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রথম ভাগ কর্ম্মকাণ্ড শেষভাগ জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ড আধুনিক। আরণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এইগুলি বেদের অন্তভাগে সংযুক্ত বলিয়া ইহাদিগকে বেদান্তও বলে। বেদাঙ্গের ন্যায় বেদান্তের উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও এখন যে সকল গ্রন্থ বেদাঙ্গ বেদান্ত বলিয়া কথিত রামায়ণী যুগে সে সকল বিষয়ের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না।

রামায়ণে পুরাণের উল্লেখ আছে। আদি কাণ্ডের নবম সর্গে সুমন্ত্র দশরথকে বলিতেছেন "শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণেচ যথা শ্রুতম্। ১ বর্ত্তমান সময় যে সকল পুরাণ গ্রন্থ প্রচলিত আছে সেই পুরাণ গ্রন্থগুলি (মৎস্য পুরাণ, কূর্ম্ম পুরাণ প্রভৃতি) সকলই রামায়ণের পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে। রামায়ণে যে পুরাণের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা বেদের ব্রাহ্মণভাগকে নির্দ্দেশ করিতেছে। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগে ব্রাহ্মণই পুরাণ বলিয়া অভিহিত হইত।

তৈত্তিরীয় কঠ প্রভৃতি বেদের শাখাগুলি রামায়ণের পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের প্রাচীন অংশ বৈশম্পায়ন ঋষি তাঁহার শিষ্য যাস্ককে শিক্ষা প্রদান করেন। যাস্ক স্বীয় শিষ্য তৈত্তিরীকে শিক্ষা দেন; তৈত্তিরী কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদকে নিজনামে প্রচার করেন। এই জন্য প্রাচীন কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতা নামেও পরিচিত। বেদের শাখাগুলি লিপিপ্রণালী প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী কালের হইলেও এই দুইটি শাখার উল্লেখ রামায়ণে (অ-৩২) কোন সুযোগে প্রবেশ লাভ করিতে

পারিয়াছে। রামায়ণের যে স্থলে এই শাখাদ্বয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহা পাঠ করিলেই পাঠক দেখিবেন, ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বেদের যে যে শাখার উল্লেখ রামায়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে ঐ ঐ শাখাধ্যায়ী ব্যক্তিগণ দ্বারাই তাহা পরবর্ত্তী কালে রামায়ণে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। রামায়ণে সহাঙ্গ বেদ ও ষড়ঙ্গ বেদের উল্লেখ আছে। হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াই ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বেদধ্বনি শ্রবণ করিলেন;

> ষড়ঙ্গবেদ বিদুষাং ক্রতু প্রবরযাজিনাম্।
> শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্ম রক্ষসাম্॥ সু ১৮।২

রামায়ণে উল্লিখিত বেদের এই ষড়ঙ্গ কি কি তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না।

> শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষং তথা!
> ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥

ষড়ঙ্গের এই সূত্র রামায়ণের অনেক পরবর্ত্তী রচনা। নিরুক্ত ও কল্প গ্রন্থাদি রচিত হইবার পরে বেদের এই ষট্অঙ্গ নির্দ্ধারিত হইয়া সূত্র নির্ণীত হইয়াছে।

বেদের "শিক্ষা" অঙ্গটি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় ঋষিগণের আয়ত্ব ছিল। শিক্ষা সংজ্ঞায় সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে জ্ঞানদ্বারা বেদের বর্ণ (Letters), স্বর (Accents), মাত্রা (Quantity), বল (Organs of Pronunciation), সাম (Delivery), সন্তান (Euphonic laws) বুঝা যায় তাহাকেই শিক্ষা বলে।

বৈদিক ঋষিগণ শিষ্যদিগকে বেদপাঠের এই নিয়মটি মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন।

কল্প গ্রন্থে বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কল্প গ্রন্থ গুলি কল্প সূত্র নামেও পরিচিত। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, দক্ষিণ ভারতে আর্য্য বসতি বিস্তৃত হইবার পর সূত্র গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল।

কল্প সূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বে 'ব্রাহ্মণ' দ্বারাই বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইত। কল্প সূত্রগুলি ব্রাহ্মণের বিশ্লেষণ। আশ্বলায়ন, আপ-

শুল্ব, বোধায়ণ প্রভৃতি ঋষিগণই কল্প সূত্রগুলির প্রণেতা * ইহাঁরা সকলেই বাল্মীকির পরবর্ত্তী ঋষি। কল্প সূত্র রামায়ণের পরে রচিত হইলেও রামায়ণের এক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিকাণ্ডের ১৪শ সর্গে লিখিত হইয়াছে—

ত্র্যহোঽশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ। ৪০

ব্যাকরণের উল্লেখ রামায়ণের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে রাম বলিতেছেন—

"নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন বিগঞ্চিদপশব্দিতম্॥

কি। ৩।২৯

বোধ হইতেছে নিশ্চয়ই তিনি বহুবার ব্যাকরণ শ্রবণ করিয়াছেন ইত্যাদি।

ঐ সময় কাহার প্রণীত ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, তাহা রামায়ণে অবগত হওয়া যায় না। কেহ কেহ রামায়ণকে পাণিনির পরবর্ত্তী রচনা বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তি পাণিনির সূত্রে দৃষ্টান্তচ্ছলে রামায়ণের বিন্দু মাত্রও উল্লেখ নাই। এ দিকে রামায়ণেও পাণিনির উল্লেখ নাই। সুতরাং এইরূপ যুক্তি তত সমীচীন নহে। পাণিনির ব্যাকরণ বৈদিক ব্যাকরণ এবং অতি প্রাচীন। ইহা লিপিপ্রণালী প্রবর্ত্তনের পরে লিখিত। পাণিনিতে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের নাম—আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ, গালব, চক্রবর্ম্মণ, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক্, স্ফোটায়ন প্রভৃতি। পাণিনিতে ইঁহাদিগের নামের উল্লেখ থাকায় ইঁহারা যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ইহাদিগের সকলেই যে রামায়ণরচনার সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। 'মাহেশ ব্যাকরণ' নামে আরও একখানি বৈদিক ব্যাকরণ লিপিপ্রচলনের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। রামায়ণের সময় পাণিনির উল্লেখিত কোন ব্যাকরণ অবশ্যই প্রচলিত ছিল ইহা অনুমান করা যায়।

নিরুক্ত।—বৈদিক শব্দসমূহের ধাতু অর্থ প্রভৃতি যাহার দ্বারা প্রকাশ পায় তাহাই নিরুক্ত। অর্থাৎ বৈদিক শব্দের নিরপেক্ষ ভাবপ্রকাশক

---

* রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক ঋবিদিগের নাম ও সূত্র প্রচারিত আছে। সেগুলি যথার্থই তাঁহাদের প্রণীত কি না সন্দেহ!

অর্থে নিরুক্ত শব্দ বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল। লিপিমালা প্রবর্ত্তনের পর যাস্কের নির্ঘণ্টু রচিত হইলে লোক সেই নির্ঘণ্টুকেই নিরুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাস্কের নিরুক্ত (?)* বৈদিক অভিধান গ্রন্থ। রামায়ণের সময় নিরুক্ত নামক কোনও অভিধানের প্রচার ছিল না। গুরু মুখে মুখেই শিষ্যকে শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। শিক্ষার ন্যায় নিরুক্ত তখন গুরুর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছিল না।

ছন্দঃ ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কোন রচনাও রামায়ণের সময় প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় যে সকল কথার উল্লেখ আছে তাহা আমরা বিজ্ঞান-প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

নাট্যশাস্ত্র ভারতের অতি প্রাচীন সম্পদ। রামায়ণীযুগে নাটকাভিনয়ের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অযোধ্যায় বিচিত্র বধূ ং নাট্যশালা স্থাপিত ছিল; রাজধানীর বর্ণনায় আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। রাম মিশ্র ভাষায় রচিত নাটকাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা কাণ্ডের ৬৯ সর্গে লিখিত হইয়াছে, ভরত মাতুলালয়ে অশুভ স্বপ্ন দেখিয়া বিমর্ষভাবে অবস্থান করিলে তাঁহার বয়স্যগণ তাঁহার মানসিক শান্তিবিধান-মানসে নৃত্য গীত বাদ্য ও নাটক অভিনয় করিতে লাগিলেন।

"বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে :
নাট্যকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানিচ ॥" ৪

ওয়েবারপ্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের অনুকরণে উৎপন্ন। ওয়েবার বলেন, ব্যাকট্রীয় গ্রীক্ রাজাদের দরবারে গ্রীক নাটকের অভিনয় হইত, সেই

---

* যাঁহারা যাস্ককে নিরুক্তের প্রণেতা বলিয়া অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহারা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিম্নলিখিত রচনা পাঠ করুন,

Professor Max Muller has pointed out a common mistake made in calling Yaska's work as the Nirukta. Nirukta is a work as Sayana says where only a number of words is given. Yaska takes up such an old existing Nirukta and on this text (which is usully known as the Nighantu) he writes a commentary which is his work."

History of Civilization in Ancient India

সকল অভিনয় দেখিয়া পঞ্জাব ও গুজরাটের হিন্দুদের অনুকরণবৃত্তি উত্তেজিত হয়; এইরূপে হিন্দু নাট্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ তাহা ফরাসি পণ্ডিত সিলভেন লিভি প্রদর্শিত করিয়াছেন। বাস্তবিক গ্রীক্ সংশ্রবের পূর্ব্বেও যে ভারতে নাট্যশাস্ত্রের প্রচলন ছিল বুদ্ধের উপদেশ তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে যে দশটি উপদেশ প্রদান করেন তাহার মধ্যে একটি উপদেশ—"নাট্য ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে।" এই উপদেশে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ভারতে নাট্যশাস্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল। রামায়ণের পূর্ব্বে কোনও গ্রন্থে নাট্যসাহিত্যের উল্লেখ নাই। পাণিনিতেও নট শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পর রামায়ণে ইহার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থ ব্যতীত কিরূপে নাটকাভিনয় হইতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামায়ণ প্রথমেই গ্রন্থাকারে লিখিত হইয়া প্রচলিত হয় নাই। কথিত আছে তাহা বাল্মীকি কর্ত্তৃক সঙ্গীতাকারে রচিত হইয়া এবং স্মৃতিসাহায্যে কুশীলব (?) কর্ত্তৃক গীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। স্মৃতিসাহায্যে সঙ্গীত ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা গীত হইলেই তাহাতে নাটকীয় ভাব প্রকাশ পায়। এইরূপ ভাবপ্রকাশ হইতেই নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার পর গ্রন্থযুগে ভরত মুনি নাট্যসূত্র প্রচার করিয়া নাট্যশাস্ত্রের উন্নতি বিধান করেন। ইহার পর বৈদেশিক ভাবের আদানপ্রদানে গ্রীক্ প্রভাব সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে।

স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা রামায়ণী সমাজ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। তখন হিন্দু সমাজের স্মৃতিতে অনুশাসন বিরাজ করিত ও যে অনুশাসনের বলে সমাজ পরিচালিত হইত গ্রন্থযুগে তাহাই সংগৃহীত ও কালভেদে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আধুনিক মনুসংহিতার স্থূল কলেবর গঠিত হইয়াছে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

হাইডলবার্গ।

লতাপাদপপরিপূর্ণ পর্ব্বতপরিবেষ্টিত খরস্রোতা নেকারের (Neckaar) উভয় কূলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ালঙ্কৃত হাইডলাবর্গ বাস্তবিকই অতি মনোরম স্থান। পরিশ্রান্ত জীবনের শেষভাগে পৃথিবীর কোলাহল হইতে অপসৃত হইয়া ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপন করিবার পক্ষে এমন উপযোগী স্থান অধিক দেখা যায় না।

কলোন হইতে হাইডলবার্গ যাইতে রেলে প্রায় ৪৷৷০ ঘণ্টা সময় লাগে। এই পথটি অতি সুদৃশ্য। প্রায় সমস্ত ক্ষণই রাইন নদীর তীর দিয়া ট্রেণ চলে। নদীর তীরেই পাহাড়, কোথাও বা দুই ধারেই পাহাড়, কোথাও জঙ্গল, পাহাড়ের গাত্র দ্রাক্ষাক্ষেত্রময়—সুন্দর সুন্দর গাছ বড় চমৎকার দেখায়। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন নভেম্বর মাস,গ্রীষ্মকালে যখন উভয় কূল ফলপুষ্পে মণ্ডিত থাকে তখন এই নদীর উপর দিয়া ছোট ষ্টীমারে (pleasure steamer) বেড়াইতে কি আনন্দ হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নদীর মধ্যে এক স্থানে এক পাহাড়ের উপর একটা সেকেলে Castle দেখিলাম, স্বতঃই Grimm's Fairy Talesএর দৈত্যদের Castleএর কথা মনে হইল।

জার্ম্মাণিতে আমাদের দেশের ন্যায় রেলে চারি শ্রেণী, তবে মধ্যম শ্রেণী নাই, একেবারে খোলাখুলি ভাবে ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ। আর একটা উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার—রেলের কর্ম্মচারীরা সন্ধ্যার পর স্ব স্ব বক্ষে লণ্ঠন ঝুলান। রেলওয়ে ষ্টেশনগুলিও অতি বৃহৎ ও প্রকাণ্ড ব্যাপার। ওয়েটিংরুমগুলি প্রায়ই মর্ম্মরমণ্ডিত ও অতি সুন্দর কারুকার্য্যময়। এ শুধু জার্ম্মাণিতে নহে, য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই—বিশেষ এণ্টওয়ার্পে ও এমষ্টারডামে রেলওয়ে ষ্টেশন দুইটিতে।

সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরে আমি যখন হাইডলবার্গে পৌছিলাম তখন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া ধরিত্রী স্নিগ্ধ হইয়াছে। হোটেলে জিনিসপত্র ফেলিয়াই একাকী বেড়াইতে বাহির হইলাম। সহরটি ক্ষুদ্র। হাঁটিতে হাঁটিতে বিশ্ববিদ্যা-লয়ে পৌছিলাম। তথায় একজন অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি অতি

আর্য্যাবর্ত্ত,—

হাইডলবার্গ

The Paragon Press, Calcutta.

সদাশয়; বলিলেন, "এখন রাত্রি হইয়াছে আপনি কল্য দশটার পর আসিলে আপনাকে সমস্ত দেখাইয়া দিবে; আমি বলিয়া রাখিব।"

পরদিন প্রথমে সহরের পার্শ্বস্থ দুইটি পাহাড়ের উপর বেড়াইতে যাইলাম। নদীর ধারেই পাহাড়। অল্প দূর পর্য্যন্ত কয়েকটি বাড়ী আছে, উচ্চে কেবল গাছপালা। প্রায় শিখর পর্য্যন্ত গাড়িতে যাওয়া যায়। ঘোড়াগুলি কি ভাবে উপর পর্য্যন্ত উঠে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিসমার্কের স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত। এই স্থানে বৎসরে এক দিন খুব উৎসব হয়। পাহাড়ের গাত্রে এক পার্শ্বে একটি ছোট গৃহ, তথায় ছাত্ররা দ্বৈরথ যুদ্ধ (Duel) করেন। এ স্থানে ছাত্রদিগের অনেকেরই মুখে ও মাথায় তরবারির আঘাতচিহ্ন! কাহারও বা আঘাত অতি অল্পদিনের,—মাথায় ও মুখে sticking plaster লাগান। ইহা একরূপ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত। কোন কোন ছাত্র কলেজে পাঠাভ্যাস কালেও plaster লাগাইয়া রহিয়াছেন দেখা যায়। পাহাড়ের উপর ও নদীর কূলে অতি সুন্দর বন অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাস্তবিক হাইডলবার্গে পাহাড়, নদী ও বনের অতি আশ্চর্য্য সমাবেশ।

নদীর ধারে সহরের দিকে একটি পুরাতন দুর্গ দেখা যায়। তথায় দুইটি মদের পিপা আছে। একটিতে ৬০,০০০ বোতল ও অন্যটিতে ৩,০০,০০০ বোতল মদ ধরে। সিঁড়ি দিয়া বড় পিপাটির উপর উঠিলাম; একটি প্রকাণ্ড ঘরের ন্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে এই দুর্গ হইতে funicular railway আছে। ঈফেল টাওয়ারের প্রসঙ্গে যেরূপ রেলের কথা বলিয়াছি ইহা তদ্রূপই। এই রেলে বার্লিনবাসী মধুমাসযাপনকারী এক দম্পতির সহিত আলাপ হইল। তাঁহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি জানেন। শুনিয়াছি, এখন জর্ম্মাণির স্কুলে ইংরাজি ভাষা অবশ্যপাঠ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ দেখিবার জিনিষ ছাত্রদিগের কারাগৃহ। ছাত্ররা কোনও অপরাধ করিলে বা সহরের মধ্যে গোলমাল করিলে তাহাদিগকে এই কারাগারে বদ্ধ রাখে। দুইটি ঘর নির্জ্জন কারাবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট! দরজায় অনেক ছাত্র অপরাধীর ফটোগ্রাফ রক্ষিত। তাঁহারা হয় ত এখন খুব গণ্য মান্য ব্যক্তি। আবার ঘরের ভিতর অনেকে কবিতা প্রভৃতি লিখিয়া রাখিয়াছেন। একটির অনুবাদ এই:—"এ স্থানে আমি বেশ আছি। কারাগারের বাহিরে আমি অতি নগন্য ছিলাম কারাগারে আমাকে অনেক সুন্দরী ও মার্কিণ ভ্রমণকারী দেখিতে আসিতেছেন।" অনেকে আবার পেন্সিল বা কয়লা দিয়া দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

হাইডলবার্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি গির্জ্জা আছে। তাহার নাম Churuch of the Holy Ghost একই ভজনালয়ে এক পার্শ্বে প্রোটেষ্টাণ্টরা এবং অপর পার্শ্বে রোমান ক্যাথলিকরা ভজনা করেন। মাঝে একটা সামান্য সরু দেওয়াল ব্যবধান। এ উদারতা য়ুরোপে আর কোথাও দেখি নাই।

ম্যুনিক।

জার্ম্মাণির অন্তর্গত ব্যাভেরিয়া রাজ্যের রাজধানী ম্যুনিক খুব বড় সহর। ইহা ইজার নদীর তীরে অবস্থিত। কবি ক্যাম্বেলের Hohenlinden নামক কবিতায় পড়িয়াছিলাম Isar, rolling rapidly দেখিলাম ও তাহাই। নদীটি খুব ক্ষুদ্র; আবার ম্যুনিকের নিকট দুই অংশে বিভক্ত, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগতি; বহু উপলে শীর্ণা নদীর বক্ষ আস্তৃত—কিন্তু কি খরবেগে স্রোত চলিয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য মনে হয়।

ম্যুনিকে দ্রষ্টব্য স্থান অনেক, বিশেষ এ স্থানে চিত্রশালার বাহুল্য। সহস্র সহস্র বহুমূল্য তৈলচিত্রে ম্যুনিক বিভূষিত। এক ফ্লরেন্স ভিন্ন আর কোথাও এত চিত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিকই ম্যুনিকের চিত্র-সম্পদ অতি মহার্ঘ্য ও অনন্যসাধারণ। এত চিত্রের মধ্যে কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা দেখি অল্প সময় ক্ষেপণকারী যাত্রীর পক্ষে তাহা স্থির করা দুষ্কর; ঠিক "বাঁশবনে ডোম কাণা।" এই জন্যই বোধ হয় আমার নিকট ম্যাক্সিমিলিনিউম (Maximilianeum) নামক মাত্র ত্রিশখানি ছবিযুক্ত একটি গ্যালারি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

ম্যুনিকে আসিলে প্রথমেই এই স্থানের লোকের পোষাক দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। অনেক রকম পোষাক এ দেশে দেখা যায়। ব্যাভেরিয় কৃষক, পুরুষ ও রমণী, উভয়েরই পরিচ্ছদ বড় সুদৃশ্য—picturesque প্রায় লোকেরই টুপিতে হয় হরিণের লেজ না হয় পাখীর পালক প্রভৃতি বসান। আর কত রকম বেরকমের আচ্ছাদনবাস (cloak)! স্ত্রীলোকদিগের মুখ লাল লাল ফুলা ফুলা; কিন্তু সৌন্দর্য্য বিশেষ আছে বলিয়া বোধ হইল না। বাস্তবিক সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে এক প্যারিসের মহিলাদের মুখে কমনীয়তা ও লাবণ্য কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান, আর কোথাও তাহা চক্ষুতে পড়িল না। নিশ্চয়ই আমার নয়নের দোষ।

ম্যুনিকে রাজারাজড়ার অত্যন্ত ছড়াছড়ি। অনেক বাড়ীর সম্মুখে সান্ত্রি

দণ্ডায়মান। প্রশ্ন করিলে জানা যায়, অমুক প্রিন্সের বাড়ী। অনেক রাজাই আমাদের দেশের রাজাদের ন্যায় ভূমিশূন্য। দেশের প্রকৃত অধিপতি উন্মাদ, তাঁহার পিতৃব্য Regent বা রাজপ্রতিভূ, তিনিই কার্য্যতঃ রাজা।

ম্যুনিক আল্পস পর্ব্বতের অতি নিকটে অবস্থিত। বৈকালে বেড়াইতে যাইয়া তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের সুস্পষ্ট দৃশ্য দেখিতে পাওয়া গেল। প্রদর্শক বলিল, পাহাড় যখন এত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কল্য নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। ঘটিলও তাহাই।

ম্যুনিকের দ্রষ্টব্য স্থান গুলির মধ্যে (১) ও (২) পিনাকোথেকদ্বয় (৩) ম্যাক্সিমিলিনিউম (৪) ম্যুজিয়ম (৫) ব্যাভেরিয়ার মূর্ত্তি ও Hall of Fame এবং (৬) বিয়র গৃহ। এই কয়টির মাত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। এতদ্ভিন্ন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য আর একটি জিনিষ আছে; Rathans বা ম্যুনিসিপাল আপিষের ঘড়ি। বেলা ১১টার সময় এই ঘড়িতে প্রথমে কতকগুলি পূর্ণাবয়ব স্ত্রীপুরুষ অশ্বসাদি প্রভৃতি নৃত্য ও যুদ্ধ প্রদর্শন করে, তাহার পর অতি সুন্দর ভাবে Chimes বাজে, সর্ব্বশেষে একটি কুক্কুট বহির্গত হইয়া তিনবার শব্দ করে। সর্ব্ব সমেত প্রায় ১৫ মিনিট এই সব চলে। প্রত্যহ ইহার জন্য লোকের ভিড় হয়। খুব অদ্ভুত।

(১) পুরাতন পিনাকোথেক:—পিনাকোথেক শব্দের অর্থ চিত্রভাণ্ডার। এই পুরাতন ভাণ্ডার ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। মর্ম্মর মূর্ত্তি ব্যতীত এ স্থানে প্রায় দুই সহস্র সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। র‍্যাফেল, বটিচেলি, কোরেজিও, রুবেন্‌স্, ভ্যানডাইক, রেমব্রাণ্ট, ডুরে, হোলবাইন, টিসিয়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সমস্ত চিত্র-করেরই অঙ্কিত চিত্র এ স্থানে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বনিম্নতলে বহু পুরাতন মৃৎপাত্র (Old Vases) রক্ষিত আছে। বর্ণনা করিয়া সে চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

(২) নূতন পিনাকোথেক—এ স্থানে আধুনিক চিত্রকরদিগের চিত্র সং-রক্ষিত, চিত্রে লিখিত বিষয়গুলি অধিকাংশই আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাস-বর্ণিত। এতদ্ভিন্ন জার্ম্মাণির প্রধান প্রধান ব্যক্তির তৈল চিত্র এবং ম্যুনিকের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অনেক চিত্র আছে।

(৩) ম্যাক্সিমিলিনিউম—সহরের ঠিক বহির্ভাগে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর এই গৃহ দণ্ডায়মান। দুই পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকার পথে উঠিয়া আসিতে হয়। দুইটি প্রকাণ্ড হল ও দুইটি বারাণ্ডা। হল দুইটিতে মাত্র ত্রিশ খানি তৈল-

চিত্র। আদম ইভের স্বর্গচ্যুতি হইতে আরম্ভ করিয়া জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জীবন ও লাইপজিগের যুদ্ধ পর্য্যন্ত মানবেতিহাসের ত্রিশটি প্রধান প্রধান ঘটনা এই চিত্র কয়টিতে লিখিত। অবশ্য ইতিহাস বলাতে য়ুরোপের ইতিহাসই বুঝিতে হইবে। এসিয়ার ইতিহাসবিষয়ক চিত্রের মধ্যে কেবল মহম্মদের মক্কাভি-গমন এবং হারুণ অল রসিদের চিত্র দেখা যায়। বারাণ্ডা দুইটিতে জগতের প্রধান প্রধান প্রায় দুই শত লোকের চিত্র ও মর্ম্মররচিত আবক্ষ মূর্ত্তি আছে। বাস্তবিক য়ুরোপের চিত্রশালার মধ্যে এই গ্যালারিটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বোধ হইয়াছিল। নভেম্বর মাসে ইহা বন্ধ থাকে, তাই রক্ষীকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া দেখিতে হইয়াছিল।

(৪) ন্যাশনাল ম্যুজিয়ম—এই স্থানে আমাদের কলিকাতা ম্যুজিয়মেরই মত প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের অনেক অস্ত্রশস্ত্র, বাসন, পুস্তক, মর্ম্মরমূর্ত্তি, প্রভৃতি রক্ষিত; অবশ্য অনেক চিত্রও আছে। তদ্ভিন্ন ব্যাভেরিয়াবাসীদের পুরাতন ও আধুনিক বসন প্রভৃতি ও Ceramic শিল্পের অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে।

(৫) ব্যাভেরিয়ার মূর্ত্তি এবং যশোমন্দির—একটি প্রান্তরের এক পার্শ্বে ৬২ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড এক ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি ফুলের মালা হাতে লইয়া দণ্ডায়-মান। ইহাই ব্যাভেরিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্ত্তি। নিকটে একটি দরদালান (Colonnade); তথায় ব্যাভেরিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের আবক্ষ মূর্ত্তি—ইহাই ব্যাভেরিয় যশোমন্দির। আমি ত অনেকেরই নাম শ্রুত ছিলাম না, কেবল শেলিঙ (Schelling) এবং রিক্‌টার (Ican Paul Richter) এই দুইটি পরিচিত নাম দেখিলাম।

(৬) বিয়র গৃহ (Hoibranhans) :—আমরা যেরূপ জল খাই, জার্ম্মাণির লোক তাহা অপেক্ষাও অবাধে ও ঘন ঘন বিয়র পান করে। বিয়রই জার্ম্মাণির National drink। বিয়র সর্ব্বত্রই প্রস্তুত হয়, তবে ম্যুনিকের বিয়র খুব প্রসিদ্ধ। এই দ্বিতল গৃহটি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তুত। নিম্নে দুইটি লম্বা হল; কতক-গুলি টেব্‌ল ও তাহার চতুঃপার্শ্বে বেঞ্চ। তাহাতে নানা পরিচ্ছদ পরিহিত শত শত স্ত্রীপুরুষ বিয়র পান ও ধূম পান করিতেছে। উপরেও ঠিক ঐরূপ, তবে তথায় টেব্‌লগুলি ছোট ছোট ও বেঞ্চের পরিবর্ত্তে চেয়ার রক্ষিত। তথায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর লোক আইসেন। নিম্নে যে বিয়রের দাম এক বোতল তিন আনা তাহাই উপরে ছয় আনা মূল্যে বিক্রীত হয়। এ স্থানটি সহরের

রাইন প্রপাত।

The Paragon Press, Calcutta

প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত ও সর্ব্বদাই খুব সরগরম। ম্যুনিকে একটি প্রকাণ্ড পার্ক আছে। তাহার নাম English Gardens. কেন এ নাম হইল বুঝিতে পারিলাম না। প্রদর্শক বলিলেন—একজন ইংরাজ এই উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন তাই এই নাম; কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে স্থপতির স্মৃতিস্তম্ভে দেখিলাম, তিনি মার্কিনবাসী। তবে এ নাম কেন?

নয়হাউসেন্।

বেলা দশটার সময় যখন ম্যুনিক হইতে যাত্রা করি, তখন আকাশ প্রায় পরিষ্কার, রৌদ্র হাসিতেছে। মাত্র মিনিট দশেক পরেই আকাশ মেঘাবৃত হইল। রেলের কাচমণ্ডিত জানালার ভিতর দিয়া পথে দেখিলাম; তুলা পড়িয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কোথাও শিমুল গাছ দেখিতে পাইলাম না। সহযাত্রী কেহই ইংরাজিনবিশ ছিলেন না, জিজ্ঞাসাও করিতে পারি না। পরে জানালাতেও সেইরূপ দেখিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল, এ তুলা নহে তুষার-পাত। দেখিতে দেখিতে সব ধবলাকার, অতি চমৎকার দৃশ্য। তুষারধবল কথাটি পূর্ব্বে অনেক স্থানে পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাবগ্রহণ করিতে পারি নাই। আজ বুঝিলাম, তুষারধবল এবং শ্বেত এ দুইটিতে কত পার্থক্য। খোলার বাড়ীর উপরে বরফ পড়িয়া ঢালু জায়গায় জমা হইতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন গোলা চূণ ঢালিয়া চূণকাম করিতেছে। বেলা প্রায় দুইটার সময় Lake of Constance নামক হ্রদের ধারে উপনীত হইলাম। চতুর্দ্দিকে পাহাড়; মধ্যে প্রকাণ্ড হ্রদ। পাহাড়ের অঙ্কে স্থানে স্থানে ছোট ছোট গ্রাম, সে আর এক সুন্দর দৃশ্য। ক্ষুদ্র ষ্টীম বোটে হ্রদের অপর পারে আসিলাম। এখন আমি সুইট্জারল্যাণ্ড দেশে। এক রাস্তার ধারে বোট হইতে নামাইয়া দিল। সেই-স্থানেই ট্রেণ আসিবে। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। প্রায় ট্র্যামের মত, তবে অনেকগুলি গাড়ি। প্রত্যেক গাড়ির মধ্যস্থল দিয়া যাতায়াতের রাস্তা, দুই পার্শ্বে বেতমোড়া বেঞ্চ, জিনিষ পত্র গাড়িতে লইবার নিয়ম নাই। প্রত্যেক বেঞ্চে মাত্র দুইজনের বসিবার স্থান। কেবল প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে বেঞ্চগুলি গদি-আঁটা। দুইটি মাত্র ষ্টেশন পরে আমাকে গাড়ি বদল করিতে হইল। নূতন গাড়িতে উঠিয়া দেখি, অত্যন্ত স্থানাভাব। দুঃখের বিষয় আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল, সে শ্রেণী পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আমার সঙ্গে দুইতিনটি ব্যাগ, সে দেশের ভাষা জানি না—সময়ের অল্পতা-

নিবন্ধন ব্রেকে দিতে পারিলাম না, কাযেই মোট লইয়া একখানা গাড়িতে কণ্ডাকৃটারের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া গিয়া উঠিলাম। মধ্যে যে সামান্য সরু রাস্তা তাহাই অবরোধ করিয়া অবাধে দাঁড়াইয়া রহিলাম; যাত্রীরা কলরব করিতে লাগিল, গার্ড বকাবকি করিতে আরম্ভ করিল; আমি ভাষা বুঝি না, ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বেগতিক দেখিয়া কণ্ডাকৃটার আমাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে ডাকিয়া তাহার সহিত যাইতে বলিল। তখন গাড়ি চলিতেছে; খুব জোরে বরফ পড়িতে সুরু করিয়াছে। গার্ড আমাকে এক প্রথম শ্রেণীর কক্ষে লইয়া গেল। তথায় দেখি, একজন ইংরাজ। তাঁহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তবু কিছুক্ষণ কথা বলা যাইবে। তিনিও আমাকে পাইয়া আহ্লাদিত। সেই বিদেশে আমরা যেন এক-দেশবাসী। গার্ড তাঁহাকে বলিয়া গেল, আমি যেন কিছুক্ষণ পরে স্থান হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাই। তথাস্তু বলিয়া দুইজনে গল্প আরম্ভ করিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সহযাত্রী নামিয়া গেলেন, এ সময়টা বড় সুখে কাটিল। দুই ধারে কাল ও নীল পাহাড়, তাহার উপরে বরফ জমিয়া রহিয়াছে, কোথাও কোথাও শ্যামল তরুলতা, কোথাও বা হ্রদ দেখা যাইতেছে, চারিপার্শ্বে ধবল হিমানী—বড় সুন্দর দৃশ্য। অল্পক্ষণ পরে যখন সন্ধ্যা হইল, পাহাড়ের গাত্রে বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জ্বালিয়া দিল তখন নয়নসমক্ষে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রতিভাত হইল। সন্ধ্যার পরে সুইট্জারল্যাণ্ডের রাজধানী জ্যিওরিক্ (Zurich) এ পৌঁছিলাম। এ স্থানে অর্দ্ধ ঘণ্টা অবস্থানের পর পুনরায় অন্য ট্রেণে যাত্রা করিলাম। তখন তুষারপাত বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু বেশ বৃষ্টি পড়িতেছে। রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার, পথে কিছুই দেখা গেল না। তবে ষ্টেশনে আমাদের দেশে পরিচিত রেলের ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। য়ূরোপে আর কোথাও রেলে ঘণ্টা বাজান শুনি নাই। প্রায় এক ঘণ্টা পরে নয়হাউসেনে পৌঁছিলাম। এটি সুইট্জারল্যাণ্ডের উত্তর সীমায় একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। বিলাতে আসার পূর্ব্বে ইহার নাম শুনি নাই। আমি যখন লণ্ডনে বসিয়া য়ূরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতেছিলাম, তখন আমাদের হাইকোর্টের জজ বন্ধুবর মিষ্টার সরফুদ্দিন পরামর্শ দেন, নয়হাউসেন না দেখিয়া যাইও না। এ স্থানে রাইন নদীর একটি প্রপাত আছে। নদী এ স্থানে মাত্র ১২৫ গজ চওড়া, কিন্তু খুব খরস্রোতা। কতকগুলি পাতরের গাত্রে আহত হইয়া জল প্রায় একশত ফুট উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে। অতি গম্ভীর দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে জল আঘাতে চূর্ণ হইয়া শত ধারায় উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রপাতের শব্দও খুব গুরু গম্ভীর।

ঠিক মধ্যস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ চওড়া পাতর আছে। ক্ষুদ্র নৌকায় প্রাণ হাতে করিয়া সেই প্রপাতের ভিতর দিয়া তাহার উপর উঠিয়া তথায় চা-পান করা একটা অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। বাতাসে জলের কণা রেণুর ন্যায় অঙ্গে পড়ে, কাযেই তথায় যাইতে হইলে ওয়াটারপ্রুফ গাত্রে দিয়া যাইতে হয়। গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করে, তখন নিশ্চয়ই বড় সুন্দর দেখিতে হয়। আমি শীতকালে গিয়াছিলাম, সে সব কিছু দেখি নাই।

এই নয়হাউসেনে বড় কৌতুক হইয়াছিল। বলা উচিত যে, সুইট্জার-ল্যাণ্ডে সর্ব্বত্রই হোটেল, অন্য দেশবাসীরা বলেন সুইট্জারল্যাণ্ড না বলিয়া হোটেলল্যাণ্ড বলা উচিত এবং ইহার জাতীয় বীরের নাম William Tell (উইলিয়ম টেল) না হইয়া উইলিয়ম্ হোটেল হওয়া উচিত। সে যাহা হউক বড় বড় কয়েকটি স্থান ভিন্ন অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট সময় (Season) আছে। বৎসরের মধ্যে সেই কয় মাস এই সব স্থান আমোদআহ্লাদে ও যাত্রীদের কলহাস্যে মুখরিত, অন্য সময়ে প্রায় সমস্ত হোটেলই বন্ধ থাকে, এক আধটা যাহাও বা খোলা থাকে, সে সকলে দাসদাসীর একান্ত অভাব। আমি যখন নয়-হাউসেনে পৌঁছিলাম তখন সে স্থানের Season শেষ হইয়া গিয়াছে। যে হোটেলে যাইলাম তথায় অন্য অতিথি কেহই ছিলেন না, কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে দুইজন রমণী ও একটি দাসী; তাঁহারা কেহই ইংরাজি জানিতেন না, আমারও ইংরাজি ভিন্ন অন্য য়ুরোপীয় ভাষা জানা নাই। কাযেই কথাবার্ত্তা আকার ইঙ্গিতেই চলিল, যখন ভাষার নিতান্ত দরকার তখন বাঙ্গালা ব্যবহার করিতে লাগিলাম, কারণ তাঁহাদের পক্ষে ইংরাজি ও বাঙ্গালা দুইই সমান। শ্রোত্রীবর্গ হাসিয়া কুট পাট। আমার জানিবার প্রয়োজন হইল যে, ভারতবর্ষের ডাক কবে যায়। ইহা ত আর ইঙ্গিতে বুঝান যায় না! কাগজে লিখিয়া অনেক কষ্টে একজনকে বুঝাইলাম যে, কাগজখানা ডাক ঘরে পাঠান প্রয়োজন। দেড় ঘণ্টা পরে অনেক চেষ্টার পর পোষ্ট-মাষ্টার একজন ইংরাজিনবিশকে বাহির করিয়া আমার চিঠি পড়াইয়া জবাব লিখাইয়া দিলেন। এ ভোগ আর কোথায়ও ভুগিতে হয় নাই। অন্য সব স্থানেই ইংরাজিজানা লোক হোটেলে পাইয়াছিলাম।

পরদিন বৈকালে লুসার্ণ যাত্রা করিলাম। সুইট্জারল্যাণ্ডে কোনও মাল বিনা মাশুলে রেলে লইতে দেয় না। ছোট হ্যাণ্ডব্যাগেরও মাশুল দিতে হয়। অন্য দেশের তুলনায় মাশুলও খুব বেশী।

রেল জিওরিক পর্য্যন্ত প্রায় পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে। পথে প্রায় তিন মাইল একটি আঁকা বাঁকা নদীর ধারে ধারে সর্পাকৃতি লাইন। দেখিলাম, নদীর একেবারে কিনারা পর্য্যন্ত কর্ষিত, কেবল দুই পাহাড় মাত্র পাইনাদি বৃক্ষে শোভিত। রেলের দুইপার্শ্বে পর্ব্বতগাত্র তৃণমণ্ডিত; উচ্চ শিখরগুলি পাদপহীন ও তুষারমণ্ডিত। পাইন গাছগুলিতে সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। পথে সমস্ত দিন সূর্য্যদেব বৃষ্টির সহিত লুকোচুরি খেলিতেছিলেন, তাই দুই ধারের দৃশ্য আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

পথে চ্যাম (Cham) নামক গ্রাম দেখা গেল। তথায় "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ" (Milkmaid brand Condensed Milk) এর কারখানা, গ্রামটিতে ঐ কারখানার অধিবাসী ব্যতীত আর বিশেষ কোন অধিবাসী আছে বলিয়া মনে হইল না। তবে একটি গির্জ্জা দেখিলাম, তাহার চূড়া ব্রোঞ্জমণ্ডিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ৪॥০টার সময় লুসার্ণ পৌঁছিলাম।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

নর ও নারী।

নর বলে, "নারী তোরা বড় ভয়ঙ্করী,
তোদের রূপের দাহে মোরা পুড়ে মরি।"
নারী বলে, "ওহে নর, মিছা তব রোষ,
পতঙ্গ পুড়িলে নিজে বহ্নির কি দোষ?"

শ্রীজীবানন্দ মল্লিক।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

—*—

পরিবর্ত্তনশীলা পৃথ্বী।

—:•:—

বিলাতের 'রেকার্ডী' নামক পত্রিকায় জনৈক লেখক বর্ত্তমান যুগের মানব জাতির অশান্তি ও তাহার ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। লেখক বর্ত্তমান সময়ের য়ুরোপীয় সমাজের চাঞ্চল্যের সহিত সম্যক পরিচিত। সেই পরিচয় বা অভিজ্ঞতা হইতে তিনি সমস্ত মানব সমাজের চাঞ্চল্যের কারণ নির্ণয় ও তাহার ভাবী ফল নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার রচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁহার মতের সহিত অনেকের ঐকমত্য না জন্মিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। যাহা হউক, আমরা নিম্নে সংক্ষেপে সেই সন্দর্ভের আভাস ও তৎসহ আমাদের মন্তব্য প্রদান করিলাম।

অশান্তি।

লেখক লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে মানবজাতির মধ্যে ঘোর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। চাঞ্চল্যের লক্ষণ দিকে দিকে দেদীপ্যমান। পৃথিবীময় ইহার কোলাহল শ্রুত হইতেছে। মানবজাতি এখনও বন্য ভাবাপন্ন রহিয়াছে,—জাঙ্গল বিধি ব্যবস্থা এখনও মানব সমাজকে অনুশাসিত করিতেছে, এই সত্য প্রীতিপ্রদ নহে। কিন্তু বন্য বিধি চিরদিনই মানব সমাজকে অনুশাসিত করিয়া আসিতেছে। আমরা অবিশ্রাম যে চাঞ্চল্যের কথা শুনিতেছি—সেই চাঞ্চল্য মানব সমাজকে পার্থিব শান্তির দিকে অধিকতর অগ্রসর করিবে,—এইরূপ অনুমান অন্ততঃ সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কারণ নির্দ্দেশ।

অতঃপর লেখক এই সার্ব্বজনীন অশান্তির কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রধানতঃ তিনটি কারণ হইতে এই চাঞ্চল্য উদ্ভূত হইয়াছে। প্রথম কারণ;—যে সমস্ত মানব পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত হইতেছে তাহাদের মনে অধিকতর সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আকাঙ্ক্ষার অভ্যুদয়। দ্বিতীয় কারণ,—মানবজাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্ষয় ও পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতার অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের উদ্ভব। তৃতীয় কারণ,—স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়।

রমণীর অধিকার।

পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে লেখক মহিলাদিগের কথা প্রথম আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মহিলাগণ পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার প্রাপ্তির জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন,—তাহা ভ্রান্তিমূলক। যাঁহারা এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহারা যে, অপরিবর্ত্তনীয় কঠোর

নিয়মে পৃথিবী শাসিত হইতেছে,—তাহার কিছুই বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। ভূমি,জল, বায়ু, পৃথিবীর স্থানসংস্থাপন ও পরম্পরাগত রীতি পদ্ধতি ও জ্ঞান দ্বারাই সেই নিয়ম বিনিয়োজিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের শক্তি যে পৃথিবীর ইতিহাসে এবং ক্রমে য়ুরোপের সহিত এসিয়ার সম্বন্ধসংস্থাপন ব্যাপারে কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে তাহা এই নবোদ্ভূখিত 'রামণীক' দল উপলব্ধি করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয় না। কার্ল মার্ক্স ও নিয়েটসির প্রবর্ত্তিত মতের প্রভাবে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই সম্বন্ধে মানবজাতির মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী। সমুদ্র হইতে দূরে থাকিয়াই উভয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রাজ্যাধিকার ও খাদ্য সামগ্রীর উৎপত্তি দার্শনিক গবেষণায় দ্বারাও সম্ভবে না;—উহাতে শক্তির প্রয়োজন। সাগর হইতে যাহারা দূরে বাস করে সেই সকল নরনারীর উপর সাগর কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে তাহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না;—তাঁহারা পৃথিবীর ব্যাপার সম্পর্কিত একটা গুরুতর বিষয় উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আর এক কথা; যাঁহারা 'রমণীর তুল্যাধিকার' লইয়া এত তোলপাড় করিতেছেন, তাঁহারা এই কথাটিই ভুলিয়া যায়েন যে, পৃথিবীর অনেক অত্যাবশ্যক কার্য্য অবিশ্রাম অতি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে হয়। স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক নিয়মে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। সমগ্র স্তনন্ধয় জীবের নারীজাতি প্রকৃতির নির্দ্দেশে যে কার্য্যসম্পাদন করিতে বাধ্য হইয়াছে;—সেই কার্য্যই তাহাদিগকে অবিশ্রাম কঠোরপরিশ্রমসাধ্য কার্য্য সাধনের অযোগ্য করিয়াছে। মানবী সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূতা নহেন। সুতরাং যাঁহারা মানবীকে মানবের তুল্য অধিকার দান করিবার জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ আন্দোলনের উদ্দিষ্ট বিষয়টি পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। তবে এই আন্দোলন মানবী সমাজের শক্তি ও ভাব নূতন খাতে প্রধাবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা সূচনা করিতেছে। ইহার পরিণাম স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ-বিপর্য্যয়;—উভয়ের তুল্যাধিকার-প্রাপ্তি নহে। ইহাতে স্ত্রীজাতি পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে ভোটাধিকার পাইবে অথবা শ্রমসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে ইহা বুঝায় না।

লেখক এই বিষয়টির বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন; স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোন্ কোন্ কার্য্য সাধনে অযোগ্য তাহারও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে স্ত্রীবিড়ম্বনা সম্পর্কিত আন্দোলন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ

আমাদের ম]

করে নাই—উহার অতি ক্ষীণ অতি মৃদু তরঙ্গ মাত্র অনুভূত হইতেছে। ফলে আমাদের সমাজেও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ধীরে ধীরে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। ইহা কালেরই প্রভাব। জনসমাজে চিন্তাশক্তির পরিবর্ত্তনের সহিত এই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য মতের প্রভাবে এ দেশে কেহ কেহ স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন। এ ধারণা ভ্রান্ত। স্ত্রী ও পুরুষ জাতির যেরূপ আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈষম্য বিদ্যমান,—সেইরূপ তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রও স্বতন্ত্র।

ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্ষয় এই অশান্তির প্রধান কারণ। পৃথিবীর সকল স্থানেই মানবজাতির

ধর্ম্ম-বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের ক্ষয় মানবজাতির অভ্যুন্নত প্রকৃতির পরিচায়ক কি না তাহাই বিচার্য্য। মানবজাতির উন্নতির প্রত্যেক যুগান্তর-সময়ে পূর্ব্বতন যুগের বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া যায় এবং অভিনব বিশ্বাসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অপচয় উপচয় লইয়াই ক্রমবিকাশ। এক এক যুগান্তে ক্রমশঃ যেরূপ বিশ্বাসের ক্ষয় হইয়া জড়বাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ;—অমনই নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস আসিয়া মানব সমাজে আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছে। এপিক্টেটাস, সেনেকা, ক্রমওয়েলীয় পিউরিটান্, ললার্ড ও হিউগোনট দল যুগাবসানে ও কালপ্রভাবে অভ্যুত্থিত জড়বাদ নষ্ট করিয়া নূতন বিশ্বাস লইয়া অভ্যুত্থিত হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বত্রই নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ব্যাকুলতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। লোক-চক্ষুর অন্তরালে মানবের যে পরম সখা আছেন তাঁহাকে পাইবার জন্য জনসমাজ ব্যস্ত হইয়াছে। অনেক উন্নত লেখকের লেখায় তাহা প্রকাশ পাইতেছে। মিঃ হালডেন ম্যাক্ফল 'ইংলিশ রিভিউ' পত্রে লিখিয়াছেন, অর্থপিপাসা ভিন্ন আত্মতৃপ্তির জন্য আরও কিছুর প্রবল আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে। এক সময়ে ধর্ম্মই কলা বিদ্যার ন্যায় সুন্দর, চিত্তহারক ও ভাবের উত্তেজক ছিল। তাহার পর লোক কলা বিদ্যাকেই উপেক্ষা করিয়া কেবল 'টাকা আনা পাই' বা লাভ লোকসান লইয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অর্থই তখন সর্ব্ব সুখের মূলাধার বলিয়া গণ্য হইল। বিশ্বাসের ক্ষয় হইতেছে—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহা মানবজাতির উন্নতির নূতন যুগ আবির্ভাবের সূচনা করিতেছে। সাধারণ মানবমণ্ডলীকে পাপপঙ্ক হইতে ও পার্থিব কর্দ্দম হইতে মুক্ত করিতে হইলে ধর্ম্মের সহিত কলাবিদ্যার সম্মিলনসাধন, অপরিহার্য্য না হউক, অত্যাবশ্যক বটে। ক্রিকেট খেলায় পরাজিত হইলে বা অন্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় সুলভ খেলনা প্রস্তুত করিতে না পারিলেই জাতীয় অবনতি সূচিত হয় না। কলাবিদ্যার দ্বারাই মানব ভাবপ্রকাশে সমর্থ হইয়া থাকে। জনসমাজকে যাহা সুন্দর, পূর্ণ বা নিখুঁত তাহাকেই ভালবাসিতে এবং যাহা বেতালা, বেসুরা ও লজ্জাজনক তাহাকেই ঘৃণা করিতে শিখাইয়া কলা বিদ্যাকে প্রীতিজনক করা আবশ্যক। এই প্রকারে ধর্ম্ম মানব-সমাজে পুনরায় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইবে।

ধর্ম্ম বিশ্বাসের ক্ষয়।

কলা বিদ্যাবিহীন জীবন মরুতুল্য নিষ্ফল ও নিরানন্দ। কারণ উপভোগযোগ্য সৌন্দর্য্য না থাকিলে,—সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা না থাকিলে—চিত্ত স্বতঃই অবসন্ন হইয়া পড়ে। প্রতিদিন নূতন নূতন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিলেই সৌন্দর্য্যের সাহচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করা হয়। পুস্তক, প্রতিমূর্ত্তি, ব্যক্তি, ধর্ম্মবিশ্বাস ও মত প্রভৃতিতে এইরূপ নিত্যই নূতন সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। উক্ত লেখক লিখিয়াছেন যে, রাজনীতি পিউরিটানদিগের নীরস ভাবা ও অন্তঃসারশূন্য ভাক্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া আমাদের সময়ে বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে। রাজনীতি প্রকৃত পক্ষে বিবদমানগৃধ্নু বায়স তুল্য,—কিন্তু উহা 'ভিজা বিড়ালের' ন্যায় নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদকারী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে চাহে।

উন্নতির পূর্ব্বলক্ষণ।

জীর্ণ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে আত্মোপভোগের ও আত্মোন্নতির নিষ্পাদক কিছু পাইবার জন্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা কেবল প্রতীচ্যখণ্ডে আত্মপ্রকাশ করে নাই, প্রাচ্য খণ্ডেও পুরাতন বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইতেছে,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার স্থানে নূতন বিশ্বাস গঠিত হয় নাই। নূতন বিশ্বাস গঠনের উপকরণসমূহ প্রস্তুতই রহিয়াছে। এখন কেবল ধর্ম্মোপদেশদ্বারা জন-সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করা সম্ভবে না। আগামী অর্দ্ধ শতাব্দী কাল সম্ভবতঃ রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলাই মানবজাতির চরিত্র ও মতামত গঠনে সাম্প্রদায়িক উপদেশ অপেক্ষা অধিকতর প্রভাব বিস্তৃত করিবে। সত্যকে যদি সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া লোকের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা সকলের তৃপ্তিসাধক হইবেই হইবে। সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সত্যের প্রভাব প্রতিহত হইবার নহে। কি করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা শুনিয়া শুনিয়া লোক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অকর্ত্তব্যের কথা শুনিয়াই মানব জাতি খিন্ন ও নির্ব্বিণ্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বাসের মন্দির ভগ্ন হইয়া এখন ধূলায় লুটাইতেছে; কর্ত্তব্যের ভিত্তির উপর আবার নূতন করিয়া তাহার গঠন করিতে হইবে—অর্থাৎ এখন কি করা আবশ্যক লোককে তাহারই উপদেশ দিতে হইবে। এসিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকা সর্ব্বত্রই মানব সমাজে একই বিধ স্পন্দন অনুভূত হইতেছে,—সে স্পন্দন অপচয় বা মৃত্যুর পূর্ব্বসূচনা করিতেছে না,—উহা উপচয়ের—নবজীবন সঞ্চারের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিতেছে।

আমাদের মন্তব্য।

বিশ্বাস সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন,—তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। অন্যে পরে কা কথা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই ধর্ম্মবিশ্বাস অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়াতে লোক অত্যন্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের একেবারেই ধর্ম্মবিশ্বাস নাই,—তাহাদের হৃদয়মধ্যে কেমন একটা শূন্যতা, কেমন একটা অভাব অনুভূত হয়। বায়ুমণ্ডলে অকস্মাৎ কোনও শূন্যতা (vacuum) উদ্ভূত হইলে যেমন প্রবল ঝটিকার উদ্ভব হয়,—বিশ্বাসহীনের মনে তেমনই কেমন একটা বিক্ষোভ জন্মিয়া থাকে। বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর দেহে শোণিত রস শুষ্ক হইলে যেমন প্রাণহারিণী পিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে,—বিশ্বাসবিহীন ব্যক্তি ও সমাজে সেইরূপ ধনপিপাসা, মানপিপাসা ক্ষমতা পিপাসা অতি তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যে পিপাসা স্বাস্থ্যের পরিচায়ক ও ফলস্বরূপ,—যাহার ফল উপচয়, সে পিপাসা হইতে এই অতিতীব্র পিপাসার পার্থক্য এই যে, উহা কখনই নিবৃত্তি পায় না। কুবেরের ধন, যমের ক্ষমতা, ইন্দ্রের সম্মান দিলেও সে পিপাসা শান্ত হয় না,—"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োএবাভি বর্দ্ধতে'। এই পিপাসা বর্ত্তমান দেহের অবসান করিয়া নূতন দেহ প্রদান করিয়া থাকে,—কিন্তু সেই নূতন দেহ পাইতে হইলে শ্মশানভূমির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। সুতরাং বিশ্বাসহীনতাজনিত বর্ত্তমান অশান্তির ফল যে, শুভ হইবেই—এ কথা বলা যায় না। উক্ত লেখক বলিয়াছেন, বিশ্বাসকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিতে হইবে, তবে সে বিশ্বাস টিকিবে। এ কথা সত্য। সাধনমার্গে ইহা বিশ্বাসের উর্দ্ধতর স্তর। প্রাচ্যখণ্ডে, এসিয়াখণ্ডে, বিশেষতঃ পুণ্যভূমি ভারতে, ধর্ম্ম জগতে সেই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বিশ্বাসের দর্শন মিলিয়া থাকে। তাহার নাম প্রেম। বিশ্বাসের বিষয়ীভূতকে যদি সুন্দর বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে

তাহাতে 'প্রেম' জন্মে না। তাই রাধার শ্যাম সুন্দর, সাধকের শিব সুন্দর। হিন্দু বিশ্বাসকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে জানে। কেবল তাহাই নহে, তাহার সাধনার পথে প্রেমের উপর আরও একটা স্তর—আরও একটা অবস্থা আছে, তাহা ভক্তি। ভক্তি প্রেমের পরাকাষ্ঠা—উহা অহেতুকী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে,—ভারতের সাধকগণ বিশ্বাস হইতে ক্রমে প্রেম ও ভক্তি সাধনায় পরা নির্ব্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন সেই ভারতেই যখন প্রতীচ্য জড়বাদমূলক শিক্ষা বিশ্বাসের মূল শিথিল করিয়া লোকের মনে অশান্তির গরল-ধারা ঢালিয়া দিতেছে, তখন জড়বাদপ্লাবিত য়ুরোপে প্রেমের মন্দাকিনীর প্রবাহ বহিবার সম্ভাবনা কোথায়? বিশ্বাস ব্যতীত প্রেম থাকিতেই পারে না। কারণ প্রেমই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বিশ্বাস। কিন্তু যদি চৈতন্যদেব আবার জন্মিয়া য়ুরোপে প্রেমগঙ্গা প্রবাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলে জড়বাদের মরুতে নন্দনের শোভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে,—অশান্তি পরমা শান্তিতে পর্য্যবসিত হইবে,—বিশ্বাস মানবের শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিবে। লেখক যে জড়বাদের সাহারায় জন্মিয়াও প্রেমবারিধারায় আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন,—তাহাতে তাঁহার দূরদর্শিতাই সূচিত হইতেছে।

তৃতীয় কারণ।

লেখকের মতে বর্ত্তমান চাঞ্চল্যের আর একটি কারণ খাদ্যসম্পর্কিত। খাদ্য দ্রব্যের উৎপত্তিই শ্রমশিল্পের প্রধান বিষয়। ইহা ভিন্ন মধ্য ও শীত কোটীবন্ধে বস্ত্র, ইন্ধন, ও গৃহের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। সকল দেশে গৃহের বা বাসস্থানের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া থাকে। এই সকল আবশ্যক দ্রব্য উৎপন্ন করিলেই চলিবে না,—ইহা নানা স্থানে প্রেরণের জন্য দ্রুতগামী যানাদি পরিচালনের ব্যবস্থাও আবশ্যক। এই যানাদির পরিচালন সম্বন্ধে লেখক অনেক কথাই লিখিয়াছেন।

মন্তব্য।

খাদ্য সামগ্রীর অভাবজনিত চাঞ্চল্যের কথা আমাদের দেশবাসীকে বিস্তৃতভাবে বলাই নিষ্প্রয়োজন। ইহা অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। যাহাতে খাদ্য দ্রব্যের উৎপত্তি বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা না করিলে আমাদের আর নিস্তার নাই। সাধারণ ভদ্রলোকগণ তাস দাবা পাশায় কালহরণ না করিয়া যদি আপনাদের প্রাঙ্গণপ্রান্তে আবশ্যক তরকারী প্রভৃতির উৎপাদনে সামান্য চেষ্টাও করেন, তাহাতেও সুফল ফলিতে পারে।

প্রত্যাবর্ত্তন।

১

বিবাহের পর দুই বৎসর সুখে কাটিয়া গেল; বরং সুখের আতিশয্য ব্যতীত অপ্রাচুর্য্য ছিল না। তাহার প্রধান কারণ, সে সুখ কেবল প্রকৃত নহে, তাহার অধিকাংশ কল্পনারঞ্জিত হইয়া সুরম্য হইয়াছিল। সংসারে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে, একের হৃদয়ে অপরের হৃদয় প্রতিভাত হয়, বাস্তবের আলোকে কল্পনাকুহেলিকা অপসৃত হইয়া যায়—এ দুই বৎসরে পত্নী কুমুদমালার সহিত মৃণালকান্তির সে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। কারণ, কুমুদমালা তখনও কখন বা পিত্রালয়ে কখন বা পতিগৃহে থাকিত। কুমুদমালা ষোড়শ বৎসরেও সংসার বুঝিয়া সংসারে প্রবেশ করে নাই। তাহারও হৃদয়ে তখন প্রেমের প্রথম বন্যায় আর সব ভাসিয়া গিয়াছিল। বসন্তে যেমন কুসুমে কুসুমে কঠিন শাখার অঙ্গ আবৃত হইয়া যায়—তেমনই প্রথম প্রণয়বিকাশে হৃদয়ের সহস্র দোষ পর্য্যন্ত আবৃত হইয়া যায়—কেবল কমনীয় কান্তিমাত্র প্রকাশ পায়।

কিন্তু আঘাত না করিলে যেমন মুদ্রার স্বরূপ প্রকাশ পায় না, আঘাত না পাইলে তেমনই হৃদয় চিনিতে পারা যায় না। বিবাহের দুই বৎসর পরে এইরূপ আঘাতের কারণ ঘটিল;—সঙ্গে সঙ্গে মৃণালকান্তির পক্ষে হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীর দেবীত্বে সন্দেহের কারণ ঘটিল। মৃণালকান্তি সাধারণ পাঠ শেষ করিয়া কিছু অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিপরীক্ষায় তাহাকে প্রতিবার সফলচেষ্ট দেখিয়া কুমুদমালার ধনী পিতা তাহাকে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। মৃণালকান্তি মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন; তাহার সংসারের আলা অল্প—কারণ এক জননী ব্যতীত তাহার সংসারে আর কেহ ছিলেন না। এ অবস্থায় সে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল তাহাতে সামান্য সাফল্যেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইতে পারে। বিশেষ তাহার জননীর হস্তে কিছু টাকাও যে না ছিল—এমন নহে। তাহার শ্বশুর এই সব বিবেচনা করিয়া কায করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোড়-দৌড়ে অনেক সময় যে অশ্ব সমস্ত পথ অগ্রে থাকে, শেষ সময় সে পিছাইয়া পড়ে। মৃণালকান্তির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। অদৃষ্ট-দেবতা অনেককে

অবহেলা করিয়া সরস্বতীর সাধনায় মৃণালকান্তিকেই সফলসাধন করিয়াছিলেন; এখন যেন সেই অকারণ আনুকূল্যে লজ্জিত হইয়া স্বীয় কৃত দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ব্যবসায়ের প্রবেশপথে পরীক্ষায় মৃণালকান্তি উপর্য্যুপরি দুইবার ব্যর্থমনোরথ হইল।

মৃণালকান্তির শ্বশুর তাহার পূর্ব্বসাফল্য লক্ষ্য করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সাফল্যের আশা করিয়াছিলেন এবং সেই আশার উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। কাযেই মৃণালকান্তির অসাফল্যে তিনি বিরক্ত হইলেন। কুমুদমালার সে কথা জানিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। ফলে স্বামীর উপর তাহার অভিমান হইল; কিন্তু সে অভিমানের মূলে অসাফল্যদুঃখকাতর স্বামীর দুঃখে সহানুভূতির বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না, বরং তাহা সহানুভূতিস্নিগ্ধ।

কিন্তু ইহার পর আর একটি ঘটনা ঘটিল। মৃণালকান্তি যখন দ্বিতীয়বার ব্যর্থচেষ্ট হইল তখন কেহ কেহ দোষটা কুমুদমালার স্কন্ধেই চাপাইলেন। যে এতদিন অসাফল্য কাহাকে বলে তাহা জানে নাই, সে যে আপনার দোষে বা পত্নীর দোষ ব্যতীত অন্য কারণে ব্যর্থচেষ্ট হইতে পারে, তাহা বুঝিতে অস্বীকৃতা হইয়া তাহার শাশুড়ীর কোন কোন আত্মীয়া এবং সমস্ত নিঃসম্পর্কীয়া পরমাত্মীয়া একবাক্যে কুমুদমালাকেই দোষী স্থির করিলেন। তাঁহাদের চরম বিচার এক তরফা হইলেও তাহার বিরুদ্ধে 'আপিল' চলিতে পারে না।

অম্লকণা দুগ্ধে পতিত হইলে যেমন তাহাকে বিকৃত করিয়া ফেলে এই কথায় তেমনই কুমুদমালার হৃদয়ের ভাব বিকৃত হইয়া গেল; সহানুভূতি বিরক্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না।

২

যখন বাহিরে লজ্জায় পীড়িত ও হৃদয়ে হতাশায় কাতর হইয়া মৃণালকান্তি সহানুভূতির জন্য লোলুপ হইয়াছিল সেই সময় যাহার সামান্য সহানুভূতিলাভের আশায় সে আর সব সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল,—জগতের উৎকট উপহাস ও নিদারুণ নিষ্ঠুরতার মধ্যে সে যাহার নিকট সহানুভূতিলাভের আশা করিয়াছিল, তাহার সেই পত্নী তাহাকে একান্ত দোষী মনে করিয়া ক্ষমা করিতে অসম্মতা হইল। যে আর সব আশা ছাড়িয়া দৃঢ় বিশ্বাসে এক আশায় নির্ভর করে সে সে আশায় হতাশ হইলে জগৎ অন্ধকার

দেখে। যে স্থানে আশা যত অধিক সে স্থানে বেদনাও তত প্রবল। আপনার প্রেমপূর্ণ হৃদয় দিয়া সে পত্নীর হৃদয় বিচার করিয়াছিল—তাই সে একান্ত হতাশ হইল। তাহার কল্পনারচিত—পুষ্পিত দ্রুমলতাচ্ছাদিত—বিহগকূজিত রম্য উপবন মুহূর্ত্তে মরুভূমিতে পরিণত হইল। হতাশাকাতর মৃণালকান্তির হতাশাবেদনা যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু প্রেম বাহির হইতে আপনার রক্ষার উপায় না পাইলেও কিছু দিন আপনার সঞ্চিত রসে আপনি জীবিত থাকে এবং সেই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পাইবার চেষ্টাও যে না করে—এমন নহে। মৃণালকান্তির হৃদয়ে যৌবনের নিষ্কলঙ্ক, স্বার্থকলুষলেশহীন প্রথম প্রবল প্রেমও এক দিনে লুপ্ত হইবার নহে; তাহা এক দিনে বিলুপ্ত হইল না। সে আপনাকে আপনি বুঝাইয়া কুমুদমালাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইল। প্রেম প্রেমিককে সহজে প্রেমাস্পদের দোষ দেখিতে দেয় না। মৃণালকান্তি আপনার নিকট আপনাকে দোষী করিয়া পত্নীকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। সে প্রথমে মনে করিল,—সে অতিরিক্ত অসম্ভবের আশা করিয়াছিল—তাই হতাশ হইয়াছে। সে কেবল কল্পনায় সম্ভব আদর্শে পত্নীকে বিচার করিয়াছে—অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু পত্নীর ব্যবহার লক্ষ্য করায় সে সান্ত্বনা জলবিম্বের মত মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল। তখন সে চিন্তান্তরের আশ্রয় লইল।

ইহার পর সে মনে করিল, স্বামীর অত্যধিক প্রেমাতিশয্যে পত্নীর হৃদয়ে বিরক্তির সঞ্চার হয়। হয় ত সে পত্নীর বালিকা-হৃদয়ে প্রেমবিকাশ সূচিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার নিকট প্রেমতৃষ্ণা জানাইয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়াছে। তখনও তাহার মনোবৃত্তি উপযুক্তরূপে বিকশিত হইতে পায় নাই। সে তখনও প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে শিখে নাই—বুঝিতে পারে নাই। অবিচলিত নির্ভরশীলতা—অসাধারণ সহিষ্ণুতা যে প্রেমের ভিত্তি, তাহা সে তখনও বুঝে নাই। কি মূল্যে কি কিনিতে হয়, কি লাভের জন্য কি ত্যাগ করিতে হয়—তাহা সে তখনও জানে নাই। তাই সে বিরক্ত হইয়াছে। তখন লজ্জাধিক্যে সে সে কথা তাহার নিকটেও প্রকাশ করে নাই। হৃদয়ে প্রেম স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বেই বিরক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে জন্য তাহাকে একান্ত দোষী করা সঙ্গত নহে। এইরূপ চিন্তায় সে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিত।

কিন্তু পত্নীর ব্যবহারে পদে পদে তাহার প্রেম লাঞ্ছিত, সহানুভূতিলাভ-

চেষ্টা ব্যর্থ ও সমর্পিত প্রত্যর্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে সকলরূপ সান্ত্বনা-লাভই অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্যসীমার অতিক্রমও অবশ্যম্ভাবী হইতে লাগিল। অতি দরিদ্র ভিক্ষুকও চাহিয়া চাহিয়া শেষে পাইবার আশা ত্যাগ করে—চাহিতেও নিবৃত্ত হয়। বিলম্বিত হইতে হইতে শেষে আশাও রসলেশশূন্য মরুভূমিতে লতিকার মত শুকাইয়া যায়। মৃণাল-কান্তিরও ক্রমে তাহাই হইতে চলিল। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল।

৩

পূর্ব্বকথিত দারুণ দুশ্চিন্তার জ্বালায় মৃণালকান্তি সমস্ত বৎসর পাঠে যথোচিত মনোযোগদান করিতে পারে নাই। যাহাকে নিশীথে সুপ্তোত্থিত হইয়া যাত্রা করিয়া প্রভাতেই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে হইবে, সে যদি সহসা জাগিয়া দেখে, প্রত্যুষের আর অধিক বিলম্ব নাই—নিশাবসানের স্বচ্ছান্ধকারে দোয়েল প্রভাতী গাহিতেছে—তবে সে যেমন নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া অতি দ্রুত পথ চলিতে আরম্ভ করে, মৃণালকান্তিরও তেমনই ঘটিল। পরীক্ষার প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে সে দেখিল, দুই মাসে সব পাঠ্য পুস্তকের একবার আবৃত্তি করাও দুঃসাধ্য। সে চিন্তিত হইল, এবং অতিরিক্ত পরি-শ্রম করিয়া নষ্ট সময়ের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য প্রয়োজনমতে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে অসম্মত হইয়া প্রথমে নানারূপ সামান্য সামান্য অসুখে সে অসম্মতি জানাইল। মৃণালকান্তি যখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না তখন সে কিছু উৎকটরূপেই সে অস-ম্মতি জানাইতে প্রবৃত্ত হইল।

নিস্তেজ দেহে—শ্রান্ত মস্তিষ্কে, স্বাস্থ্যহীন দুর্ব্বলতায় গুরুতর মানসিক শ্রম করা দুই এক দিন চলে,—দুই একমাস চলে না। কিন্তু না চালাইলে নহে মনে করিয়া মৃণালকান্তি নিবৃত্ত হইল না এবং শেষে অনন্যোপায় হইয়া চিকিৎসকের স্মরণ লইল। চিকিৎসক সব শুনিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, এ অবস্থায় মানসিক শ্রম একেবারে নিষিদ্ধ—অন্যথা পীড়া বাড়িয়া শীঘ্রই দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

মৃণালকান্তির মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। পরীক্ষার আর দুই মাস সময়ও নাই। এখন উপায় কি? সে চিকিৎসককে সে কথা বলিল;—এই দুই মাস কোনরূপে স্বাস্থ্যরক্ষার কোন উপায় কি নাই? নাই—শুনিয়া সে বলিল, "আমার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায় সেও ভাল—এই দুই মাস যাহাতে

আমি শ্রম করিতে পারি তাহার উপায় করিয়া দিতেই হইবে।" চিকিৎসক তাহার জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কোন উপায়ই নাই। তিনি বলিলেন, "এখন অবহেলা করিলে চিররোগী হইয়া থাকিতে হইবে।"

মৃণালকান্তির চক্ষুতে জল আসিল। হায় কেন সে পূর্ব্বে এ কথা ভাবে নাই? সে এখন কি করিবে? প্রথমে সে চিকিৎসকের কথা উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম করিতে লাগিল। কিন্তু সে সহজেই বুঝিতে পারিল, তাহা সম্ভব নহে। হতাশায়—বেদনায়—যাতনায় তাহার হৃদয় একান্ত চঞ্চল ও কাতর হইল।

তবুও এ কথা সে আর কাহাকেও—জননীকেও—বলিবার পূর্ব্বে কুমুদমালাকে বলিতে আসিল। কুমুদমালা তখন হর্ম্ম্যতলে বসিয়া সেলাই করিতেছিল। দ্বারপথে একজন প্রবেশ করিতেছে বুঝিয়া সে একবার মুখ তুলিয়া দেখিল। স্বামীর মুখ অন্ধকার বোধ হইল; কিন্তু সে তাহাতে বিশেষ মন দিল না।

মৃণালকান্তি বিপদে পড়িল; কেমন করিয়া কথাটা আরম্ভ করে? বিশেষ পত্নীর ভাব দেখিয়া তাহার আগ্রহ কমিয়া গেল। শেষে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া—মাথা চুলকাইয়া সে বলিল—"আমার বড় বিপদ উপস্থিত।"

কুমুদমালা কোন কথা কহিল না।

গুরুভার প্রস্তরখণ্ড প্রথম নড়ানই কষ্টসাধ্য; একবার নড়াইতে পারিলে তাহাকে গড়াইয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তখন কথাটা একবার আরম্ভ হইয়াছে—মৃণালকান্তি বলিল, "এবার পরীক্ষা দেওয়া হইয়া উঠিতেছে না।"

কুমুদমালা দন্তে একটা সূত্র কাটিতেছিল; সেই অবস্থায় মুখ তুলিয়া বলিল, "কেন?"—তাহার দৃষ্টিতে তীব্র তিরস্কার।

মৃণালকান্তি বলিল, "শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে।"

কুমুদমালার ওষ্ঠাধরে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল, "কেন, পরীক্ষার সময় আসিতেছে বলিয়া?"

হায় ইহারই নিকটে সে সহানুভূতিলাভের আশা করিয়াছিল? আর সহ্য হইল না—মৃণালকান্তি বলিল, "ইহার পর যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে, স্পষ্ট করিয়া বলিও, উপহাসের আবরণে অবিশ্বাস আবৃত করিও না।"

কুমুদমালা কি উত্তর করিল মৃণালকান্তি তাহা শুনিল না। সে দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

৪

আপনার কক্ষে আসিয়া মৃণালকান্তি কাঁদিতে চাহিল। কিন্তু অতি দারুণ যাতনায় ক্রন্দন আসিল না। তখন বিবাহিত জীবনের সকল কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

সন্দেহ একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে বিপদের আর অন্ত থাকে না। সে অতি তুচ্ছ ত্রুটিকে অত্যধিক প্রমাণ করে, গুণেও দোষ দেখায়। আজ মৃণালকান্তির তাহাই হইল। আজ বিবাহিত জীবনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনায় পত্নীর ব্যবহারে সে পদে পদে অবহেলা, অবিশ্বাস, উপেক্ষা, ঘৃণা লক্ষ্য করিতে লাগিল। অতি তুচ্ছ ঘটনাও বিষম যাতনার কারণ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার প্রেমতৃষ্ণা—তাহার প্রেম পত্নীর অবহেলা ও অবিশ্বাস পরস্পরের সংস্পর্শে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে প্রেম দিয়া উপেক্ষা লাভ করিয়াছে, প্রেম চাহিয়া ঘৃণা পাইয়াছে। প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান বটে! ভিক্ষুকের ভাগ্যে আর কি লাভ ঘটিয়া থাকে? হায়—প্রেম এমনই অবহেলার?

ক্রমে প্রেমের স্থানে প্রতিহিংসা জাগিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিশোধ কাহার উপর? কে লইবে?

চিন্তার যাতনা ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। মৃণালকান্তি চঞ্চল হইয়া কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিল, শেষে ভাবিতে ভাবিতে গৃহ ছাড়িয়া রাজপথে বাহির হইল?

৫

চিন্তা সঙ্গে গেল। রাজপথে অবারিত জনস্রোতঃ; নরনারী আপন আপন কার্য্যে যাইতেছে। স্বার্থসংঘাতসংক্ষুব্ধ মহানগরীর পাষাণপথে অবিরাম জনস্রোতে স্বার্থ ও পরার্থ দুই ধারা এক পথে যাইতেছে। ভাল মন্দ সবই আছে। সেই জনস্রোতে ভাসিতে ভাসিতেও কেবল সেই চিন্তা মৃণালকান্তির মনে সমুদিত হইতে লাগিল—হায়, সে কি ভ্রান্ত! সে কাহার নিকট সহানুভূতিলাভের আশা করিয়াছিল! সে আশায় সে সর্ব্বপ্রথমে তাহারই নিকটে আপনার দারুণ দুঃখ জানাইতে গিয়াছিল? সে তাহার উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখন সে কি করিবে?

নানা দুশ্চিন্তার তাড়নে সে একটি কথা ভুলিল—কর্ত্তব্য যাহার তাহারই। অপরের ব্যবহারে তাহার ইতর বিশেষ সকল সময় হয় না। বিশেষ যে স্থানে

একই কর্ত্তব্যে নানাজন বদ্ধ সে স্থানে সে কর্ত্তব্য একের জন্য ত্যাগ করা ন্যায়সঙ্গত নহে—যে বৃক্ষের ছায়া ও ফল দশ জনের ভোগ্য একজনের দোষে বা একজনের জন্য তাহার ছেদন করা যেমন অন্যায়, তেমনই নিন্দনীয়।

সে মনে করিল, সে যখন উপেক্ষিত হইয়াছে তখন সেই দারুণ অস্ত্র ব্যবহার করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় নহে। শিকারী যেমন শিকারে যাইবার পূর্ব্বে আপনার বন্দুক নাড়িয়া চাড়িয়া আনন্দ লাভ করে সেও তেমনই সেই অস্ত্রের কথা ভাবিয়া আনন্দ লাভ করিল।

সে মনে করিল,স্ত্রীর ব্যবহারে স্ত্রীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে।

সে দিন মৃণালকান্তির গৃহে ফিরিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। ইহা তাহার পক্ষে কিছু নূতন। কার্য্য ব্যতীত—সখ করিয়া সে কখনও সন্ধ্যার পর বাহিরে থাকিত না। তাহার প্রধান কারণ, সে বাল্যকালেই পিতৃহীন, সংসারে লোক অল্প। মা'র কায অল্পক্ষণেই সম্পন্ন হইয়া যাইত। সে জানিত, মা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন,—তাহার সামান্য বিলম্বে তিনি ব্যস্ত হইবেন। ক্রমে অভ্যাস স্বভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল,—বিনা কারণে সন্ধ্যার পর বাহিরে থাকিলে সে আপনি চঞ্চল হইয়া উঠিত—আপনার নিকট যেন আপনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

পরদিনও এইরূপ হইল।

এ দিকে কুমুদমালা স্বামীর যাতনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে, সে যাতনার তীব্রতা কল্পনাও করিতে পারিল না। কাযেই সে মৃণালকান্তির ব্যবহার ক্ষমা করিবার কোনও কারণ দেখিল না—ক্ষমা করিল না। সে আপনাকে অযথা অপমানিতা মনে করিল। সেও রাগ করিল।

ফলে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিল।

ক্রমে এমনই দাঁড়াইল—মৃণালকান্তি যেন গৃহ অপেক্ষা গৃহের বাহিরেই ভাল থাকে। গৃহ তাহার দৈনন্দীন জীবনের কেন্দ্র ছিল, এখন দূর পরিধি-রেখায় বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু মা'র কাছে একটা ওজর আবশ্যক; তাই মৃণালকান্তির বন্ধুগৃহে নিত্য নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল।

পুত্রের অধিকাংশ বন্ধুর কথা—বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদিগের কথা মা অবগত ছিলেন। সহসা তাহার বন্ধুবাহুল্যে—বিশেষ বন্ধুদিগের বন্ধুনিমন্ত্রণে অকারন উৎসাহাতিশয্যে মা চিন্তিত হইলেন। পুত্রের প্রকৃতি তিনি জানি-তেন—পুত্রের হৃদয় তিনি নখদর্পণে দেখিতেন।

মা'র মনে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহার সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে বিলম্ব হইল না। পুত্রের ও পুত্রবধূর ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তিনি সহজেই পুত্রের বন্ধুবাহুল্যের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

মৃণালকান্তি ক্রমেই গৃহের সংশ্রবত্যাগের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল: গৃহের বাহিরে সহসা তাহার এত কায যুটিয়া গেল যে, গৃহে থাকিবার সময় অল্প হইয়া আসিল। মা জিজ্ঞাসা করিলে হয় কার্য্য নহে ত নিমন্ত্রণ এইরূপ উত্তর পাইতে লাগিলেন। পুত্রের বাহিরে এই কর্ম্মবাহুল্যও যে তাহার নিমন্ত্রণেরই মত অস্তিত্বহীন মা'র তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মিথ্যার সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহজেই সত্য দেখিয়া লইল। পুত্রের কার্য্যের বিষয় তিনি যে না জানিতেন, এমন নহে; কারণ পূর্ব্বে পুত্র আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক কথাই তাঁহাকে জানাইত।

বাহিরে পুত্রের কায যে পরিমাণে বাড়িয়া চলিল মা'র দুশ্চিন্তা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি সহসা কোন কায করিতে সাহস করিলেন না। তিনি কি করিবেন?

এই ভাবে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে পতিপত্নী কেহই বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল না; কেহই স্থায়ী সুখের উৎস-সন্ধানে যাইতে প্রস্তুত হইল না। উভয়েরই বিশ্বাস, সে অযথা অপমানিত—সে অত্যাচারপীড়িত—সে কোনরূপে দোষী নহে। কাযেই উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা কমিল না, বরং দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

৭

ক্রমে যখন বাহিরে পুত্রের কায নিতান্তই বাড়িয়া উঠিল; "মা, আমার ফিরিতে বিলম্ব হইবে; আমার জন্য অপেক্ষা করিও না"—এই কথা তাহার নিত্য বক্তব্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

এক দিন অপরাহ্নে মা পুত্রবধূর নিকটে আসিয়া বসিলেন। পুত্রবধূ তখন পশম মিলাইয়া একটা গলাবন্ধ বুনিতেছিলেন। মা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মা, তোমাদের কি হইয়াছে?"

কুমুদমালা উত্তর দিল না; মুখ নত করিয়া রহিল।

মা পুনরায় বলিলেন, "মা, আমি যত দিন পারিয়াছি চুপ করিয়া ছিলাম কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিবার সময় নাই। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আর লজ্জা করিবার সময় নাই।"

কুমুদমালা মুখ তুলিল না।

মা বলিলেন, "কারণ যাহাই হউক, একই কারণে আমরা উভয়ে বিপন্ন।"

কুমুদমালা বিস্মিতনেত্রে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিল।

মা বলিলেন, "আমরা মৃণালকে হারাইতে বসিয়াছি।"

কুমুদমালা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

মা বলিলেন, "আমি মৃণালকে জানি। এই ছাব্বিশ বৎসর তাহার কায, তাহার বস্তু সবই আমি জানি। আজ সে আমাকে কি বুঝাইবে? তাই আমি চিন্তিত হইয়াছি।"

কুমুদমালার মুখে বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে আশঙ্কার ছায়াপাত লক্ষিত হইল।

মা বলিলেন, "মা, আমরা তাহাকে হারাইতে বসিয়াছি। দুই জনে যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে রাখিতেই হইবে। যে সর্ব্বস্ব, তাহাকে হারাইয়া কি লইয়া থাকিব?"

অন্ধকার নিশায় পর্ব্বতপথে পথভ্রান্ত পথিক যদি সহসা বিদ্যুদালোকে সম্মুখে অতি গভীর গহ্বর দেখিতে পায়, তবে যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার নিকট তাহার সমস্ত বিপদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তেমনই শাশুড়ীর এই কথায় আজ কুমুদমালার অভিমানে উদ্ধত হৃদয়ে তাহার প্রকৃত বিপদের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিল।

সে ব্যস্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় কক্ষদ্বারে মৃণালকান্তির পদধ্বনি ধ্বনিত হইল। মৃণালকান্তি বাহিরে যাইতেছিল। মাতাকে দেখিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, কক্ষমধ্যে পত্নীকে দেখিয়া সরিয়া আসিল, যেন সে সহসা সম্মুখে সর্প দেখিয়াছে। সে মা'কে বলিল, "মা, আমি বাহিরে যাইতেছি। আমার আসিতে বিলম্ব হইতে পারে। আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।"

মা কাতর দৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখে চাহিলেন। পুত্রবধূর নয়নেও সেই কাতরতা। উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিয়াছেন। সেই দৃষ্টিতে উভয়ের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইয়া গেল। বাক্য সকল সময় ভাব-প্রকাশের জন্য একান্ত আবশ্যক নহে।

দুইটি রমণী হৃদয় হইতে অতি কাতর দীর্ঘশ্বাস উঠিল।

মা ডাকিলেন, "মৃণাল!" সে স্বরে কি কাতরতা!

কিন্তু মৃণালকান্তি ততক্ষণে দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া

গৃহ হইতে রাজপথে উপস্থিত হইয়াছে। সে মা'র সে আহ্বান শুনিতে পাইল না।

সে রাত্রিতে মৃণালকান্তি গৃহে ফিরিল না। পূর্ব্বে কখনও এমন হয় নাই। তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইলেও সে ফিরিত। সে না ফিরিলে মা ঘুমাইতে যাতেন না। আজও মা জাগিয়া বসিয়া রহিলেন। তবে আজ আর একজন তাঁহার সঙ্গে জাগিয়া বসিয়া রহিল। আজ কুমুদমালার নয়নেও নিদ্রা নাই—আজ কেবল বেদনায় ও আশঙ্কায় তাহার হৃদয় চঞ্চল, এ চাঞ্চল্য সে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই।

ক্রমে প্রভাত হইল। দিবালোকবিকাশের পূর্ব্বেই পাষাণ নগরীর পাষাণ পথে জীবনের কোলাহল শ্রুত হইল। মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বধূর দিকে চাহিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কুমুদমালার মনে হইল—সে একান্ত অপরাধী—শাশুড়ীর এই যাতনার জন্য যেন সে-ই দায়ী।

দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল। পুত্রের আহার্য্য সজ্জিত করিয়া মা অনাহারে বসিয়া রহিলেন। পুত্র ফিরিল না। কুমুদমালা শাশুড়ীকে জল স্পর্শ করাইতে পারিল না। মা বলিলেন, "আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই।" কুমুদমালার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন মা মৃণালকান্তির পত্র পাইলেন। সে লিখিয়াছে—তাহার শরীর অসুস্থ—সে কিছু দিনের জন্য বেড়াইতে যাইতেছে।

সেই দিন অপরাহ্ণে কুমুদমালার পিতা জামাতৃগৃহে আসিলেন। তাঁহার এক পুত্রের বিবাহ—দুই দিন পরে "পাকা দেখা" ও এক পক্ষ পরে বিবাহ। বৈবাহিকাকে সে কথা জানাইয়া ও কন্যাকে পরদিবস স্বগৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণাল কোথায় ?"

মা বলিলেন, "তাহার শরীর অসুস্থ। সে আজ কয় দিন হইল বেড়াইতে গিয়াছে।"

শুনিয়া কুমুদমালার পিতা বিরক্তি গোপন করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "সম্মুখে পরীক্ষা—এখন বেড়াইতে যাইবার সময়ই বটে! আমি দেখিতেছি,—মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে; নহিলে এত সম্বন্ধ ছাড়িয়া এই সম্বন্ধেই আমার মত হইবে কেন ?"

মা'র মনে হইল বলেন, "তখন আপনিই বিশেষ চেষ্টা করিয়া এ কায

করিয়াছিলেন।" তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা।"

বৈবাহিক প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাহা সত্য।"—মনে মনে বলিলেন, "যেমন ছেলে—তেমনই মা।" তিনি আবার বলিলেন, "তাহার ঠিকানা কি? পত্র না লিখিলে আবার হয় ত রাগ করিবেন—বিষ না থাকিলেও যে কুলার মত চক্র থাকে।"

মা'র পক্ষে আর আত্মসংযম দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বহু কষ্টে স্থির ভাবে বলিলেন, "আপনাকে আর লিখিতে হইবে না।"

কন্যাকে পরদিন যাইতে বলিয়া পিতা বিদায় লইলেন।

কুমুদমালা আসিয়া দেখিল, শাশুড়ীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সেও কাঁদিয়া ফেলিল। আজ শাশুড়ীর বেদনা সে আপনার হৃদয়ে অনুভব করিল, শাশুড়ীর অপমানে সে আপনাকে অপমানিতা মনে করিল।

পরদিন পিত্রালয় হইতে তাহাকে লইবার জন্য গাড়ী আসিলে সে শাশুড়ীকে বলিল, "মা, আমি যাইব না।"

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"আমার যাইতে ইচ্ছা নাই।"

"তাহা ভাল হয় না।"—তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা, সংসারে ইহাই বড় জ্বালা যে, লোকে বলিবে কি এই ভয়ে আপনার যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহা করা যায় না।"

৯

পিত্রালয়ে জননী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই কুমুদমালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মৃণালকান্তি কোথায়? স্বামী কোথায় গিয়াছেন তাহা সে জানে না—ইহাতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ ইহা বিশ্বাসই করিতে চাহিলেন না। তাহার সমবয়স্কারা ইহাতে তাহাকে বহুবিধ বিদ্রূপ করিল—কেহ কেহ মৃণালকান্তিকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দার বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই বিস্ময়ে কুমুদমালা বুঝিল, সে একান্তই অভাগিনী। যাহা সকল পত্নীর অবশ্য প্রাপ্য সে তাহা পায় নাই। কিন্তু সে তাহার আপনার দোষেই তাহা পায় নাই। মৃণালকান্তির উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত নিদারুণ বাণ তাহাকেই আহত করিয়া অসীম যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

ভ্রাতার বিবাহ পর্য্যন্ত তাহার পিত্রালয়ে থাকিবার কথা। কিন্তু শাশুড়ীর কষ্ট হইতেছে বলিয়া সে "পাকা দেখার" পর দিন স্বামীগৃহে চলিয়া আসিল। শাশুড়ীর প্রতি বধূর এই "অস্বাভাবিক" ভালবাসার জন্য তরুণীরা তাহাকে বিদ্রূপ করিলেন। সে কোন কথা শুনিল না—শাশুড়ীর নিকট চলিয়া আসিল ; কারণ সমবেদনার সহানুভূতিস্নিগ্ধ সান্ত্বনায় তপ্ত হৃদয় শীতল হয়।

তাহার পর যখন তাহাকে লইতে পুনরায় পিত্রালয় হইতে গাড়ী আসিল, তখন সে শয্যা লইল—কিছুতেই পিত্রালয়ে গেল না। ললাটে দুর্ভাগ্যের টীকা লইয়া সে আনন্দোৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করিল।

গাড়ী ফিরিয়া যাইলে সে মৃণালকান্তির বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। তথায় প্রাচীরে বিলম্বিত স্বামীর আলেখ্যের নিম্নে হর্ম্মতলে লুটাইয়া সে দারুণ বেদনায় কাঁদিয়া মনের ভারলাঘব করিল ; স্বামীর উদ্দেশে বলিল—হে আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, আমার অপরাধের অন্ত নাই। কিন্তু তুমি ক্ষমা না করিলে আর কে আমায় ক্ষমা করিবে ?

মা বধূকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কক্ষদ্বারে আসিলেন ; বধূকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যাইলেন।

দারুণ দুঃখে পুত্রবিরহব্যথিতা জননীর ও পতিবিরহবিধুরা পত্নীর দিন কাটিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে প্রায় একমাস ঘটিল।

১০

ভাল লাগে না। বেদনার যে উত্তেজনায় মৃণালকান্তি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহার তীব্রতার হ্রাস হইল। অভিমানের স্থানে মনে কর্ত্তব্যের কথা স্থায়ী হইল। গৃহ ত্যাগ করিয়া রাজপথে আসিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, চিকিৎসক তাহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে বলিয়াছিলেন। সে তাহাই করিল। তথায় কয় দিনে তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার কথা মনে পড়িল। সে পুস্তক আনাইয়া পড়িতে লাগিল। বিদেশে পাঠ ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই—আছে কেবল চিন্তা। চিন্তা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সে কখনও মা'কে ছাড়িয়া বিদেশে যায় নাই। না জানি মা কি দুশ্চিন্তায়—কি আশঙ্কায়—কি বেদনায় দিনযাপন করিতেছেন ? তখন তাহার মনে হইল, সে অতি গর্হিত কায করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল সে ভুলিয়াছে কর্ত্তব্য পালনেই মনুষ্যত্ব। যদি পালনেই কুমুদমালা তাহার কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছে তথাপি সে কেন তাহার কর্ত্তব্যচ্যুত হইবে ? বিশেষ সে কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া দুইজন রমণীকে একান্ত অভিভাবকশূন্য অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছে।

সে পুত্রগতপ্রাণা জননীর কথা যতই ভাবিতে লাগিল —ততই ব্যকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে সে কর্ত্তব্য স্থির করিল—প্রত্যাবর্ত্তের আয়োজন করিল।

১১

প্রভাতে ট্রেণ আসিয়া হাওড়ায় দাঁড়াইল। মৃণালকান্তি গাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহে চলিল। পথে অন্য একখানি গাড়ীর উপর হইতে কে শকট-চালককে গাড়ী থামাইতে বলিল। মৃণালকান্তি চাহিয়া দেখিল, গাড়ীর উপর তাহার পুরাতন ভৃত্য।

মা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন।

মৃণালকান্তি গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল; আসিয়া মা'কে প্রণাম করিল। পুত্রকে দেখিয়া মা'র নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। মা কোন কথা কহিতে পারিলেন না; কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। যে সর্ব্বস্ব—যাহাকে হারাইয়া জীবন মরুভূমি হইয়াছিল—সে ফিরিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিবার আর কি আছে? আজ যেন মা'র আশঙ্কারও আর কিছু নাই।

১২

মাতাপুত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মৃণালকান্তি পরিচিত পথে আপনার বসিবার ঘরে গেল। কুমুদমালা সযত্নে স্বামীর সেই ঘরের দ্রব্যাদি ঝাড়িয়া যথাস্থানে রাখিতেছিল। সে ভৃত্যদিগকে সে ঘরের কায করিতে দিত না; স্বয়ং না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না। আজ সে হোয়াটনটে পুস্তকগুলি ঝাড়িয়া উপরের থাকে ফটোগুলি ঝাড়িতেছিল। তিনখানি ফ্রেমে তিনখানি ফটো।—কুমুদমালা শ্বশুরের ফটোখানি ঝাড়িয়া রাখিল—শাশুড়ীর ফটোখানিও ঝাড়িয়া রাখিল; তাহার পর মৃণালকান্তির ফটোখানি তুলিল। ফটোখানি অঞ্চলে মুছিয়া সে তুলিয়া ধরিল—তাহার পর অসীম আবেগে সেইখানি চুম্বন করিল।

ফটোখানি যথাস্থানে রাখিয়া সে ফিরিয়া দেখিল, কক্ষে মৃণালকান্তি। আনন্দে ও লজ্জায় তাহার মুখে রক্তভা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

রবিকরবিকাশে যেমন মুহূর্ত্তে অন্ধকার দূর হইয়া যায় তেমনই কুমুদমালার কার্য্যে মৃণালকান্তির মনের সমস্ত ভার দূর হইয়া গিয়াছিল। সে অগ্রসর হইয়া পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইল—পত্নীর লজ্জানত আননে চুম্বন দান করিল। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এত দিনের মনোমালিন্য প্রেমের প্রবাহে ভাসিয়া গেল।

* * * *

অল্প দিন পরেই পরীক্ষায় মৃণালকান্তির সাফল্যগৌরবে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে মা'র ও কুমুদমালার আনন্দ যেন আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।